বিষয়-নির্ঘণ্ট

5063

শিক্ষার ভাবধারা

মানবসভ্যতা ও শিক্ষা

প্রায় তেতাল্লিশ কোটি আশী লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে জীবনের সঞ্চার হ'য়েছে। কিন্তু মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। কোটি কোটি বৎসরের বিবর্তনের ফলে সামান্য এমিবা হতে বনমানুষের মত মানুষের (Pithecanthropus) যেদিন সৃষ্টি হ'ল, সেও প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। এই বনমানুষ থেকে যেদিন আদিম মানবের পরিচয় পাই তা পৃথিবীর ইতিহাসের পটভূমিকায় খুব অল্প দিনেরই কথা—মাত্র হাজার বিশ বা ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। কিন্তু সভ্যতার জন্ম হ'ল আরও অনেক পরে। মাত্র দশ পনেরো হাজার বছর আগে সুরু হ'ল সভ্য জীবনের সূচনা—মানুষ সবেমাত্র শিখল কি করে মৃৎপাত্র তৈরী করতে হয় বা কি করে বীজ বপন করতে হয়। আরও পাঁচ দশ হাজার বছর কেটে গেল, তখন দেখা দিল বড় বড় নগর, লিখন-প্রয়াস, মানব ইতিহাসে ছাপ রেখে যাবার বাসনা; অর্থাৎ মাত্র হাজার পাঁচেক বছর আগে সভ্যতার হ'ল সৃষ্টি। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বলেছেন গোণবার বা বোঝবার সুবিধার জন্য যদি ধরে নেওয়া যায় যে পৃথিবীতে জীবনের বিকাশ মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হয়েছিল, তা হলে বনমানুষের কাল হতে আদিম ও উপমানবের কাল এই পঞ্চাশ বৎসরের শেষ মাস বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই অনুমান অনুসারে হাজার বছরের মান হয় মাত্র এক ঘণ্টা। এই সূত্র ধরে আমরা অনায়াসে বলতে পারি মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনা হ'ল মাত্র দশ পনেরো ঘণ্টা আগে। মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে তাই এক হিসেবে আমরা দেখছি মানবের প্রাচীন-তম সভ্যতাও অতি নবীন, অতি আধুনিক; আজ যে মানবসভ্যতরা

রূপ বা বিকাশ আমরা দেখছি তা যে এর চরম পরিণতি নয়, মানবসভ্যতার বয়স যে অত্যন্ত কম—সে যে অনন্তকালের ক্রোড়ে সামান্য শিশু, সে ধারণা আমাদের সুস্পষ্ট থাকা প্রয়োজন, এবং সে বিশ্বাসও আমাদের অটুট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এর প্রধান কারণ আণবিক সংঘর্ষের বিভীষিকা নয় বা জগতে উন্মত্ত হিংসার প্রাদুর্ভাবও নয়, এর প্রধান কারণ অনেক নৃতত্ত্ববিদ্, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্[১] মনে করেন নব প্রস্তর যুগের (Neolithic Age) মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ধারণার সংগে আধুনিক মানুষের সভ্যতার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, প্রগতির বিশেষ কোন প্রমাণ নেই মনের বিবর্তনের দিক থেকে,—বিশেষ করে আধুনিক মানুষের নৈতিক বোধ ও ধর্মের দিক দিয়ে। নব প্রস্তর যুগের (আনুমানিক এখন হ'তে প্রায় বারো হাজার বৎসর পূর্বের) লোক প্রস্তরখণ্ডকে ঘসে মেজে কেটে কুঁদে যে অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রাদি (কুড়োল, শাবল, ইত্যাদি) তৈরী করবার কৌশল আয়ত্ত করল সেগুলি ছিল প্রাচীন প্রস্তর যুগের অপেক্ষা অনেক মসৃণ ও তীক্ষ্ণ, আবার অনেক সময় কারুকার্যখচিত। কুমোরের চাকার সৃষ্টি হওয়ার সংগে সংগে মৃৎপাত্র নির্মাণের কৌশলও এরা শিখল। চাষবাস করে শস্যোৎপাদনও এরা করতো; রান্নাবান্না করে খাওয়া-দাওয়া করতো, কাঠের ঘরবাড়ী তৈরী করে বসবাস করতো। তারা মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও করতো। আজও পৃথিবীতে নব প্রস্তর যুগস্তরের বহু আদিম অধিবাসীর বংশধরদের আমরা দেখতে পাই যাদের জীবনযাত্রার প্রণালী একটুকুও বদলায়নি।

কিন্তু এই নিওলিথিক মানুষের শিক্ষা-ব্যবস্থা বেশ ভালই ছিল। 'শিশুজীবন' বলে যে জিনিষটি বর্তমান সভ্যতার একটি বিশেষ অংগ

১। Marett : The Threshold of Religion. p. 191
Marett : Psychology and Folk Lore. p. 194
Bernard Bosanquet : Where Religion Is ? (Passim)
Helen Wodehouse : A Survey of History of Education. p. 5

তা সে যুগের শিশুদেরও ছিল ; অল্পবয়সেই লেখাপড়া বা সংসারের চাপে নিষ্পেষিত না হয়ে তারা অনেকদিন পর্যন্ত খেলাধূলো করে মাঠে ঘাটে বিচরণ করে আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারতো ; তাদের শেখবারও ছিল অনেক, করবারও ছিল অনেক। প্রাচীন প্রস্তর যুগের লোকেরা সে যুগের শেষের দিকে ছবি আঁকতে শিখেছিল ; আবার নিওলিথিক মানুষ শিখল গল্প উপকথা বানাতে। তাই ছোটদের সময় কাটতো ভাল—ছবি এঁকে, গল্প শুনে বা খেলাধূলো করে। বয়স হ'লে ছেলেদের হ'তো দীক্ষা গোষ্ঠীর নাগরিকত্বে, মেয়েরা করতো গৃহস্থালী, দরকার হ'লে করতো পুরুষকে সাহায্য। ধর্ম, বিজ্ঞান, আইন, রীতিনীতি এসব আলাদা করে কেউ দেখতো না, ধর্মের প্রভাবই ছিল সব চেয়ে বেশী, ধর্মের নামেই হ'তো সব। ছেলেমেয়েদের বলা হ'তো গল্প ও ধর্মের রীতিনীতি ; গান গেয়ে, নৃত্যের তালে তালে বা অভিনয়ের ভেতর দিয়ে তারা সেগুলো মর্মের ভেতর গেঁথে রাখতো—বিশেষ করে নৃত্যের ভেতর দিয়ে প্রত্যেকটি ভাব তারা করতো প্রকাশ এবং নৃত্যই ছিল তাদের শিক্ষার বাহন, সবকিছু প্রকাশের মাধ্যম এবং সব চেয়ে বড় শক্তি। চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হয়েছে, সূর্য অন্ধকারে আবৃত হয়ে আসছে, অমনি নাচ সুরু হ'ল। নৃত্যের এমনি শক্তি চন্দ্র আবার তরল রৌপ্যে আবৃত করে দিলো ভূ-চরাচর, সূর্যের তীব্র আলোকে আবার উদ্ভাসিত হ'ল পৃথিবী, নৃত্য চললো আরো উদ্দাম বেগে শত্রুর পরাভবে।

তাই প্রশ্ন জাগতে পারে নিওলিথিক শিশুর জীবন আজকের শিশুজীবনের চাইতে কি কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল—তার নৈতিক জীবনও কি উন্নততর ছিল না ? যদিও এসব যুক্তি অনেকের কাছে অগ্রাহ্য নয়, তবুও এ মেনে নেওয়া সুকঠিন কারণ তাহ'লে, মানব-প্রগতির পথ একেবারে হয়ে যায় রুদ্ধ, যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাকেও করতে হয় অস্বীকার ; শিশু মানবসভ্যতা যে একদিন কৈশোর ও যৌবনের দীপ্ত গরিমায় দৃঢ় পদক্ষেপে চলবে সে

সম্ভাবনাও হয়ে যায় লুপ্ত। আগেই বলেছি মানবসভ্যতা অভিযানের সুরু হয়েছে মাত্র; যদিও তার অগ্রসর হয়েছে শম্বুকগতিতে তবুও তার আর কোন মহিমাময় পরিণতি নেই একথা কোন চিন্তাশীল বিবর্তনবাদী মেনে নেবেন না।

অবশ্য একথা কেউ অস্বীকার করবে না যে কোন কোন প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন সুচিন্তিত ও সুসংগত ছিল যে আমরা তা থেকে আজও অনেক উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা পাচ্ছি, বর্তমান যুগের আবর্তে পাক খেয়ে তা থেকে অনেক জিনিষ নিতেও সচেষ্ট হচ্ছি। এই প্রকৃতির বিধান—দেওয়া আর নেওয়া; অতীত ও বর্তমান এই সম্বন্ধেই আবদ্ধ—বর্তমান এগিয়ে চলে সত্য, কিন্তু অতীতকে সে কখনও অস্বীকার করে না।

যদিও মানবসভ্যতা ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়েছে, হয়ত বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে কখন কখন বা পিছিয়েও পড়েছে তবু সে থামেনি, আবার এগিয়ে চলবার প্রয়াস পেয়েছে এবং সে চেষ্টায় যে সে জয়যুক্ত হয়নি তাও নয়। তবে দ্রুত পবিবর্তন কোন দিন হয়নি একথা বললেও ভুল হবে; শিল্পবিপ্লবের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আমূল পরিবর্তন হয়েছে সমাজ ও সভ্যতার অতি দ্রুতবেগে; তাই শিক্ষাতেও দেখি এর প্রতিফলন—যে সব পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রায় একইভাবে চলে আসছিল কুইন্টিলিয়ানের যুগ থেকে ম্যাথু আরনল্ডের যুগ পর্যন্ত (খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত) তারও হ'ল দ্রুত পরিবর্তন সমাজের অগ্রগতির সংগে সংগে।

কিন্তু যাঁরা বর্তমান সভ্যতায় অবিশ্বাসী তাঁরা বলেন শিল্পবিপ্লব ও শিক্ষার ফলে ধনসম্পদ যেমন বেড়েছে, আরামবিলাসের নানা ব্যবস্থা হয়েছে, বা পৃথিবীর দূরত্ব কমে আমরা একে অন্যের প্রতিবেশী হয়ে দাঁড়িয়েছি, আবার তেমনি শ্রেণীবৈষম্য বেড়েছে, জগতের দুঃখ কষ্টের কিছু লাঘব হয়নি, শান্তি বা সুখ কি মানুষ তা ভুলে গেছে, বাসনা কামনার অন্ত নাই, লোভ ও পৈশাচিকতারও সীমা নাই।

কিন্তু সে যাই হোক, একথা বোধ হয় অনস্বীকার্য যে একদিকে বিজ্ঞান-চর্চা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সৃষ্টি ও অপর দিকে জনশিক্ষার প্রসারের ফলে আজ বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এসেছে, মানুষের খানিকটা বিচারবুদ্ধি জন্মেছে; যে অন্ধ কুসংস্কারের ফলে ষোড়শ, সপ্তদশ শতাব্দীতে মানুষ মানুষের সংগে পাশবিক ব্যবহার করতো তা অনেকটা প্রশমিত হয়েছে; ভাবাবেগে অতর্কিতে বুদ্ধি বিভ্রম ঘটলেও শান্ত চিন্তার ফলে অশুভকে ত্যাগ করে শুভ ও শ্রেয়কে মানুষ আঁকড়ে ধরতে চায়—সবাই না চাইলেও অন্তত সমাজের একটা বেশ বলিষ্ঠ অংশ চান যাঁরা শেষ পর্যন্ত জনমত গঠন করেন। চরম বিশ্লেষণে বোধ হয় এই গিয়ে দাঁড়ায় নিওলিথিক মানুষ আর আজকের মানুষের মধ্যে প্রভেদ বা বিভিন্নতা।

এই বিভিন্নতা যে শিক্ষার ফল একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। কত বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রবাহিত হয়ে গেছে শিক্ষার ধারা, কত ভুলভ্রান্তি ভেদ করে, কত প্রতিকূল অবস্থার সংগে সংগ্রাম করে, কত আবর্জনা ধুয়ে মুছে—আবার হয়ত বা অনুকূল হাওয়ায় পাল তুলে চলেছে শিক্ষার তরী তার গন্তব্য স্থানে, কখনও বা তার কাণ্ডারী হয়েছে ধর্ম, কখনও বা দেহ ও মনের সৌন্দর্য, কখনও বা শাসন, কখনও বা স্বাধীনতা, সৃষ্টির আনন্দ ও মনোবিজ্ঞান। চলেছে শিক্ষার তরী তার কল্প-মানসের রত্নদ্বীপে—হয়ত মানবসভ্যতা প্রসারের সংগে সংগে মনের মণিকোঠায় সে রত্নদীপ নোতুন নোতুন রূপ পরিগ্রহণ করবে কিন্তু তার নব রূপায়ণ যাই হোক, শাশ্বত কালের জন্য নানা অবস্থার সংঘাতের ভেতরও সে তেমনি ভাস্বর দীপ্তিতে মানবচক্ষুর সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করবে, মানবকে উদ্বুদ্ধ করবে নানা প্রচেষ্টায়, তাকে প্রেরণা দেবে তার দেবভাবকে প্রকট করতে, তার দানবীয় ভাবকে চিরনির্বাসন দিতে বা দ্বিধাহীন হয়ে তাকে সংহার করতে।

শিক্ষার ইতিহাসে চিরদিন এই শাশ্বত আদর্শের কথা উঠেছে যাকে অনুসরণ করে চলেছে শিক্ষার কাজ, চলেছে ছাত্রদল,

চলেছেন অভিভাবক ও শিক্ষকসমাজ—সে আদর্শ গোষ্ঠীগত কল্যাণই হোক, দেবতার অনুশাসনই হোক, ধর্ম বা ন্যায়ের পথই হোক, স্বাধীনতা ও সৃষ্টির আনন্দই হোক, প্রকৃতির নিয়মই হোক বা বিচারবুদ্ধির বিজয় ঘোষণাই হোক। কিন্তু সংগে সংগে শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মনে যুগে যুগে প্রশ্ন উঠেছে, সন্দেহ জেগেছে—এই যে আদর্শ আমরা পালন করছি তা কি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীগণের উপযুক্ত; কালধর্ম নির্বিশেষে তা কি পালনীয়; তা কি করছে তাদের জীবনকে, তাদের ব্যক্তিত্বকে ব্যাহত, তাদের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে জীর্ণ, ভংগুর? এ সংঘাত, এ প্রশ্ন থেকেই হয়েছে যুগে যুগে শিক্ষার আদর্শের নব নব রূপায়ণ, সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষাধারার চলমান প্রবাহ, কোথাও সে জলার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বিচিত্র গতিতে, বিচিত্র পথে চলেছে সে সাগরসংগমে আপন আনন্দে। এ পরিবর্তন, এ নব রূপ পরিগ্রহ যদি না থাকতো তাহলে মানবসভ্যতাও হয়ে পড়তো অচল, জড়; জীবনের সাবলীল গতি স্পন্দিত হ'ত না মানবের শিক্ষায়, সভ্যতায়, সাধনায়।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যেদিন থেকে গোষ্ঠীগত বা পারিবারিক জীবনের সুরু হয়েছে, যেদিন থেকে পিতামাতা সন্তানকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছেন, সেদিন থেকেই শিক্ষা-ব্যবস্থারও উৎপত্তি হয়েছে। তবে কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন জীবনের পর্দা ভেদ করে সে শিক্ষার আবরণ উন্মোচন করার কাজ কৌতূহলের উদ্রেক করতে পারে বা গবেষণার খাদ্য জোগাতে পারে, কিন্তু আদিম মানবের পথের সন্ধান হাতড়ে বেড়ানোর ইতিহাস আয়ত্ত করায় বিশেষ কোন সার্থকতা নাই হয়ত। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার ইতিহাস সুরু হয় বহু পরবর্তী কালে যেদিন মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তির পরিবর্তে চিন্তাশীলতাকে দেয় উচ্চতর আসন, অন্ধ প্রকৃতির পরিবর্তে সাধনা ও প্রচেষ্টাকে দেয় মহত্তর শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাই আমরা সুরু করবো শিক্ষার ইতিহাস আর্যদের শিক্ষা-ব্যবস্থা

থেকে—ভারত, গ্রীস, রোম এই সব আর্য উপনিবেশ থেকে শিক্ষার যে মূল উৎস নির্গত হয়েছিল তারই সঞ্জীবনী ধারায় অবগাহন করে। তবে মিশর, ইরাণ, ইস্রায়েল, চীন এই সব সুপ্রাচীন প্রাচ্য দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকেও যে আলো ঠিকরে পড়েছিল তার কথা ভুললেও চলবে না।

হিন্দুশিক্ষা

ভারতবর্ষের মাটিতে আর্য জাতির আগমনের সংগে সংগে সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের এক নোতুন জীবনসাধনার সূত্রপাত হয়। আপন বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ এই সাধনাই হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি নামে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সংগে সমান্তরাল এক অভিনব জীবনপ্রবাহ সৃষ্টি করে। এই সাধনার অসামান্যতা নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। রাজনীতি, ধর্মনীতি, আচার, অনুষ্ঠান, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমস্ত কিছুর মধ্যেই ঐ সাধনার মূল সুরটি যুগে যুগে ধ্বনিত হ'য়ে এসেছে। কিন্তু আজ এই বৃহৎ পরিবর্তনের যুগে যখন মানুষের মন থেকে সমস্ত প্রাচীন মূল্য-চেতনা অন্তর্হিত হ'য়ে নোতুন মূল্য-চেতনার আবির্ভাব হ'চ্ছে, তখন প্রাচীন হিন্দুশিক্ষার তত্ত্ব ও নীতি সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা লাভ করতে হ'লে প্রথমেই প্রয়োজন হিন্দু জীবনসাধনার মর্মার্থ সম্বন্ধে একটা সাধারণ অথচ স্পষ্ট বোধের।

হিন্দু জীবনদর্শনের প্রথম কথাই হ'চ্ছে যে মানুষের আত্মা অবিনশ্বর, দেহ নশ্বর। দেহের অবসান ঘটলে আত্মা অন্য দেহ অবলম্বন করে আবির্ভূত হয়। আবার সেই দেহ জীর্ণ হ'য়ে ঝরে পড়লে আত্মা আবার অন্য দেহের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এমনি করেই মানুষের জীবন নিয়ে জন্মমৃত্যুর এক দীর্ঘ মালা গাঁথা হয়েছে। এই জন্মানুক্রমের মধ্যে মানুষের জাগতিক অস্তিত্ব একক ও স্বতন্ত্রভাবে অর্থহীন, জন্মমৃত্যুমালার শুধু মাত্র একটি বিশেষ

যোগসূত্র হিসাবেই তা অর্থসমন্বিত হ'য়ে ওঠে। হিন্দুজীবনের এই মূল তত্ত্বটি বেদ, উপনিষদ্, ধর্মশাস্ত্র, মহাভারত, পুরাণ, কাব্য, নাটক, লোকগাথা, সংক্ষেপে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র ও সাহিত্যের মধ্যে বারবার নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কঠোপনিষদে আছে যে প্রত্যেক মানুষই শস্যের ন্যায় জীর্ণ হ'য়ে মৃত্যু কবলিত হয়, আবার শস্যের ন্যায় জন্মলাভ করে[১]। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নোতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করে এক নোতুন দেহ পরিগ্রহ করে[২]।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে জন্মচক্র অবিশ্রান্ত ঘুরে চলেছে, তা কেন? হিন্দুদর্শনে, শুধু হিন্দুদর্শন কেন চার্বাকদর্শন ব্যতীত, অন্য সমস্ত ভারতীয় দর্শনেই বলা হয়েছে যে মানুষের প্রত্যেক কর্মের মধ্যে একটা বিশেষ ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা নিহিত থাকে এবং কর্মের স্বভাব অনুযায়ী তার ফলের স্বভাব নিরূপিত হয়, অর্থাৎ কর্মের ভালমন্দের উপর নির্ভর করে, ফলের ভালমন্দ। ঐ কর্মার্জিত ফল মানুষ ভোগ করে ভবিষ্যতে। ফল যদি এমন হয় যে তা বর্তমান জীবনে ভোগ করা সম্ভব নয়, তাহলে সেই ভালমন্দ কর্মফল-সঞ্চয় (কর্মাশয়) ভোগ করার জন্য মানুষকে আর একটি জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই জন্মান্তর ও কর্মফল সম্বন্ধে একটি সুন্দর উক্তিতে বলা হয়েছে যে, একটি জোঁক যেমন যে ঘাসের শীষে সে অধিষ্ঠিত সেটি পরিত্যাগ করে তখনই, যখন আর একটি ঘাসের শীষ সে আঁকড়ে ধরেছে, তেমনি আত্মা যখন অন্য একটি বিভিন্ন ধারনের জীবনে অন্য একটি দেহ আশ্রয় করে তখন তা বর্তমান দেহটি পরিত্যাগ করে। আবার একজন

---

১ "শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ"। কঠ ১।৬

২ "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী"॥ গীতা ২।২২

স্বর্ণকার যেমন একতাল সোনাকে তার ইচ্ছামত সুন্দর ও সুন্দরতর নোতুন নোতুন বস্তুতে রূপান্তরিত করে, তেমনি আত্মা নিজেকে ইচ্ছামত নোতুনতর ও সুন্দরতর রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে[১]। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আর একস্থানে বলা হয়েছে যে মানুষ পুণ্য কর্মের ফলে পুণ্যাত্মা হয় ও পাপকর্মের ফলে পাপাত্মা হয়[২]। শুধু তাই নয়, কর্মফল অনুযায়ী মানুষ পরজন্মে যেমন মহাপুরুষ, মহাভাগ্যবান হয়েও জন্মগ্রহণ করতে পারেন[৩] তেমনি আবার নিকৃষ্টতম প্রাণী হিসাবেও তার জন্ম হতে পারে[৪]। সহজভাবে বলা যেতে পারে যে, যে যেমন কর্ম করে তেমন সে ফল তার পায় (যৎ কর্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে বৃহ ৪।৪।৫)। হিন্দু মনীষীরা বলেছেন যে মানুষ যতক্ষণ কর্মে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সুকর্মের ফলে যদিও সুজন্ম হয়, তবুও সেই জাগতিক জীবন আত্মার বন্ধনদশা মাত্র। তা হলে প্রশ্ন জাগে জীবন যদি বন্ধনই হয়, তবে এই কর্মবিপাক থেকে মুক্তি পাবার কি কোন উপায় নেই ? হিন্দু-ঋষিরা বলেছেন যে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি বা মোক্ষলাভ করাই হ'চ্ছে মানবজীবনের পরম ও চরম উদ্দেশ্য। সংসার অতি ভয়ংকর স্থান, সেখানে মানুষের দুঃখের আর অন্ত থাকে না। কেন সংসার দুঃখময় ও তা কত ভয়ংকর তার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় মহাভারতে[৫]। এই দুঃখবাদ ভারতীয় জীবনদর্শনের

---

১ বৃহ ৪।৪।৩-৪

২ "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি। পাপঃ পাপেনেতি। বৃহ ৩।২।১৩

৩ পিত্র্যং বা। গান্ধর্বং বা। ব্রাহ্মং বা। প্রাজাপত্যং বা। দৈবং বা। মানুষং বা। অন্যেভ্যো বা ভূতেভ্যঃ। বৃহ ৪।৪।৪

৪ স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্বা শার্দূলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা পরশ্বা বা পুরুষো বাঽন্যো বৈ তেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম যথাবিদ্যম্। কৌষীতকী উপনিষদ্ ১।২।

শ্বযোনিম্ বা শূকরযোণিম্ বা চণ্ডালযোণিম্ বা। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১০।৭

৫ মহাভারত স্ত্রীপর্ব ৫-৬ অধ্যায়।

একটি মূল কথা। এই দুঃখভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া মানে জন্মমৃত্যুচক্র থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অর্থাৎ মোক্ষলাভ। কিন্তু ভারতীয় দুঃখবাদ মোটেই নৈরাশ্যবাদে পরিণত হয়নি। অপর পক্ষে, হিন্দু মনীষীরা মানবজীবন সম্বন্ধে ছিলেন গভীর আশাবাদী। দুঃখ ও আশা মানবজীবনের এই বিরোধীভাবের সমন্বয় হ'চ্ছে হিন্দু জীবন-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে মোক্ষলাভ করা এই জাগতিক অস্তিত্বের মধ্য দিয়েই সম্ভব, তার বাইরে নয়, মানুষের পার্থিব জীবন মোক্ষলাভ করার একটি সুযোগ। আর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার উপায় হ'চ্ছে ধর্ম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন হিন্দু, জাগতিক অস্তিত্ব স্বরূপ আত্মার বন্ধনদশা থেকে মুক্তি চেয়েছে বটে, কিন্তু অস্বীকার করেনি তার প্রয়োজনীয়তাকে।

বোঝা গেল যে হিন্দু জীবনদর্শন অনুযায়ী মোক্ষলাভ মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্যে উপস্থিত হবার উপায় হ'চ্ছে ধর্ম। হিন্দু চিন্তাধারায় ধর্ম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জীবনই হ'চ্ছে হিন্দুধর্ম। হিন্দু ঋষি ও শাস্ত্রকারেরা নানাভাবে ধর্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে নানামত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বৈচিত্র্য এই যে গভীরভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে বিভিন্ন মতগুলি পরস্পর বিরোধী নয়। ধর্ম শব্দের তাৎপর্য হ'চ্ছে সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের শাস্ত্রনির্দেশিত ও শাস্ত্রানুমোদিত অধিকার ও কর্তব্য অনুযায়ী কর্ম করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কর্মত্যাগের দ্বারাই যদি মোক্ষলাভ করার একমাত্র উপায় হয় তাহ'লে ধর্মাচরণের দ্বারা মোক্ষলাভ কি করে সম্ভব? কেননা ধর্মের অর্থই বলা হয়েছে কর্ম। এই প্রশ্নের চমৎকার সমাধান দিয়েছেন মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতের শান্তিপর্বে[১]। কিন্তু সেই সমাধান বুঝতে হ'লে আগে জানা দরকার যে সৃষ্টিকর্তা

১ মহাভারত শান্তিপর্ব ২৩৯।১০-১৫

ব্রহ্মা পৃথিবীতে চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেন—যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র[১]। এই চারটি বর্ণের মধ্যে প্রথম তিনটি আর্য গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং চতুর্থটি সেই গোষ্ঠীর বহির্ভূত, এবং যেহেতু তার সৃষ্টি পায়ের থেকে, তার কাজ হ'চ্ছে উচ্চতর তিন বর্ণের পদসেবা করা। আর্য গোষ্ঠীর অন্তর্গত হিসাবে তিনটি উচ্চবর্ণের আয়ুষ্কাল চারটি আশ্রমে বা স্তরে ভাগ করা হয়েছে—যথা ব্রহ্মচর্য (ছাত্রজীবন), গার্হস্থ্য (গৃহস্থ জীবন), বাণপ্রস্থ (গৃহত্যাগী বনবাসী জীবন) ও সন্ন্যাস (সর্বত্যাগী ভিক্ষুকের জীবন)।

এখন মহাভারতের সমাধান অনুযায়ী জীবনের চারটি আশ্রম মোক্ষলাভের পথে চারটি সোপান। এই সোপান চারটির সাহায্যে অর্থাৎ আশ্রমবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ ব্রহ্মলাভ বা মোক্ষলাভ করতে পারে। সমাজে মানুষের গুণ ও কর্ম অনুযায়ী যে চারটি বর্ণের সৃষ্টি করা হয়েছে তার মধ্যে ব্রাহ্মণের কর্ম হ'চ্ছে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়দের কর্ম দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, প্রজাপালন এবং নৃত্য, গীত ও স্ত্রীলোকের প্রতি সর্বদা আসক্ত না থাকা; বৈশ্যদিগের কর্ম দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম, পশুপালন; এবং শূদ্রদের কর্ম হ'চ্ছে ঈর্ষাহীন হ'য়ে তিন বর্ণের সেবা করা[২]। প্রত্যেক বর্ণের আপন আপন নির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত থাকা উচিত; যদিও নিজ বর্ণের কর্ম নিকৃষ্ট হয় তবুও অন্য বর্ণের কর্ম করা

---

১ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসী দ্বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। ঋগ্বেদ ১০।৯০।১২
লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্য শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥ মনু ১।৩১
মুখতঃ সোঽসৃজদ্বিপ্রাণ্ বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াংস্তথা বৈশ্যাংশ্চাপ্যুরুতো রাজন্! শূদ্রান্ পদ্ভ্যাং তথৈব চ। মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৬৬।১৭-১৮

২ মনু ১।৮৮-৯১
কৌটিল্য ১।৩

অনুচিত[১]। নিজ বর্ণের কর্ম যতই নিকৃষ্ট হোক না কেন, সেই কর্ম যথার্থভাবে সম্পন্ন ক'রলে কোন পাপ স্পর্শ করে না[২]। প্রত্যেক বর্ণের যে বিভিন্ন কর্ম তাকে বলা হ'য়েছে বর্ণধর্ম, আর চারটি আশ্রমের জন্য নির্দিষ্ট কর্মকে বলা হয়েছে আশ্রমধর্ম। কৌটিল্য বলেছেন যে, দেশের রাজার দেখা উচিত যে বিভিন্ন আশ্রমে মানুষ আশ্রমবিহিত কর্ম যথার্থভাবে সম্পন্ন করছে, কেননা আশ্রমবিধি লংঘন করলে বর্ণ এবং কর্মবিভ্রান্তি ঘটবে, যার ফলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে[৩]। অবশ্য মনুর একটি শ্লোকের[৪] ব্যাখ্যা কালে ভাষ্যকার কুল্লুকভট্ট "জাবাল শ্রুতিঃ" উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে ব্রহ্মচর্য বা গৃহস্থাশ্রম থেকে সরাসরিভাবে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা যায়। যাজ্ঞবল্ক্যও মনুর মতকে সমর্থন করেছেন[৫]। আশ্রমধর্ম যথাযথভাবে পালন করলে কৌটিল্যের মতে পৃথিবীর উন্নতি হবে, কখন ধ্বংস হবে না[৬]।

বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম হ'চ্ছে বিশেষ ধর্ম এবং সেগুলো প্রধানভাবে আনুষ্ঠানিক। আনুষ্ঠানিক ধর্ম বর্ণ বিশেষে পৃথক্ হলেও, ধর্মের আন্তরস্বরূপ ও লক্ষ্য সমস্ত বর্ণের পক্ষেই সমান। ধর্মের লক্ষ্য হ'চ্ছে লোকবিধৃতি, চিত্তপ্রসাদ, ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ। সুতরাং প্রত্যেক বর্ণের আপন আপন বিশেষ ধর্ম থাকলেও

---

১ বরং স্বধর্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥ মনু ১০।৯৭
স্বধর্ম্মো বিগুণঃ শ্রেয়ান্ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ গীতা ৩।৩৫

২ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ শ্রেয়ান্ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ গীতা ১৮।৪৭

৩ কৌটিল্য ১।৩

৪ মনু ৬।৩৮ কুল্লূক ব্যাখ্যা।

৫ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ৩।৫৬

৬ কৌটিল্য ১।৩

কতকগুলি সর্বজনীন ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম বর্ণনির্বিশেষে সকলের পক্ষেই পালনীয়। বিভিন্ন শাস্ত্রকারেরা যে সমস্ত ধর্মকে সর্বজনীন ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি হ'ল, ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, অহিংসা, অপ্রমাদ, সংবিভাগিতা (সমবণ্টন), আতিথেয়তা, স্বদাররতি ও অনসূয়া[১]।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা, অতি প্রাচীন হলেও তা আদিম বা এলোমেলো ছিল না। একটা নিটোল সামাজিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন হিন্দু জীবনপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হ'ত। এককথায় বলা যায় যে হিন্দু জীবনের একটা পূর্ণাংগ থিওরি (theory) ছিল। সে থিওরি বা পরিকল্পনা ভাল কি মন্দ বা আজকের দিনে তার প্রযুক্ততা আছে কিনা সে সব প্রশ্ন এখানে অবান্তর। সে থিওরি বা পরিকল্পনা যে ছিল এখানে সেটুকুই জানা প্রয়োজন, কেননা প্রাচীন হিন্দুশিক্ষা-পদ্ধতি হিন্দু জীবনের সেই সাধারণ থিওরি থেকেই স্বাভাবিক-ভাবে উদ্ভূত। সেই প্রাচীন কালে একটি হিন্দু কিশোর যখন জীবনের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করল, তখন থেকেই তার সুরু হ'ল ঐ সুপরিকল্পিত জীবনদর্শনের তত্ত্বগুলি শেখা। তারপর দীর্ঘকাল শিক্ষার পর যখন সে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবার জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করল, তখন সে জেনেছে জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে সে জীবনযাপন করতে

---

১ ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥ মনু ৬।৯২
সত্যমস্তেয়মক্রোধো হ্রীঃ শৌচং ধীর্ধৃতির্দমঃ।
সংযতেন্দ্রিয়তা বিদ্যা ধর্মঃ সর্ব উদাহৃতঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৬৬
সর্বেষামহিংসা সত্যম্ শৌচমনসূয়া'নৃশংস্যম ক্ষমা চ। কৌটিল্য ১।৩
অদত্তস্যানুপাদানং দানমধ্যয়নং তপঃ।
অহিংসা সত্যমক্রোধ ইজ্যা ধর্মস্য লক্ষণম্॥ মহাভারত শান্তি ৩৬।১০,৫৯।৯

হবে। সে জেনেছে যে চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়েই পুরুষার্থ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও অবশেষে মোক্ষলাভ করা সম্ভব। ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে যে একেবারে সন্ন্যাস অবলম্বন করা যায় না তা নয়, কিন্তু সাধারণভাবে তা করণীয় নয়। কেননা একজন ব্যক্তি হিসাবে সমাজের কাছে সে তিনটি ঋণে[১] আবদ্ধ। সেই ঋণ সে যথার্থভাবে পরিশোধ করুক সমাজ তার কাছে এই দাবী করে। ঋণ তিনটি হ'চ্ছে ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণ। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আচার্যের কাছে নিয়মিতভাবে জ্ঞানার্জন করে সে ঋষিঋণ পরিশোধ করতে পারে; গৃহস্থাশ্রমে বিধি-সম্মতভাবে জীবনযাপনের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে সে পিতৃঋণ পরিশোধ করতে পারে এবং বাণপ্রস্থাশ্রমে সেই আশ্রম-বিহিত কর্মের দ্বারা সে দেবঋণ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি ঋণ হ'চ্ছে সমাজের কাছে মানুষের ঋণ। এই তিনটি ঋণ মুক্ত হ'য়েই মানুষের মোক্ষলাভের জন্য আত্মাহুতি দেওয়া উচিত। মানুষের আয়ুষ্কালকে আশ্রমে ভাগ করার উদ্দেশ্যই হ'চ্ছে কঠিন নিয়মানুবর্তিতা ও সংযমের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে জাতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা, জাতির উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং অবশেষে জাগতিক বন্ধন থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। এ ছাড়াও একজন ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হ'চ্ছে লোকমর্যাদা, লোকস্থিতি ও লোকযাত্রা প্রতিষ্ঠা করা। লোকমর্যাদার অর্থ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন বর্ণের আপন আপন কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা। লোকস্থিতি হ'চ্ছে সমাজে নিয়ম ও শৃংখলার প্রতিষ্ঠা করা ও লোকযাত্রার অর্থ হ'চ্ছে সাধারণ জীবনে মানুষকে অন্তরে ও বাহিরে সংযমী ও শৃংখলা-পরায়ণ হ'য়ে ও সাধারণ ধর্ম পালন ক'রে সমাজদেহকে পুষ্ট,

১ তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬।৩।১০।৫

মনু ৬।৩৫-৩৬

স্থায়ী, দৃঢ় ও উন্নতিশীল করা। আরও পরিষ্কারভাবে বললে বলা যায় যে প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক এই সত্যই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে মানবজীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি যথার্থ ভাবে পূর্ণ করতে হয় তাহলে প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশের। তাই মানবজীবনের বিভিন্ন দশার ক্রমের সংগে সংগতি রেখে বিশেষ বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেই প্রত্যেকটি পরিবেশ মানুষের জীবনের এক একটি দশায় এমনভাবে তাকে গড়ে তুলবে, তার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করবে যার ফলে সে সহজভাবে তার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয় মোক্ষলাভ, তাহলে, মোক্ষলাভের পথে বিভিন্ন আশ্রমগুলিই হ'চ্ছে এক একটি পরিবেশ এবং আশ্রম ও বর্ণ বিহিত কর্মগুলিই হ'চ্ছে ধর্ম। আর একটা কথা। সাধারণভাবে মানুষ তার শক্তি, বুদ্ধি বা সুবিধা অনুযায়ী তার জন্য নির্দিষ্ট কর্মের অধিক করবার অধিকারী নয়। কেননা কর্ম পরিমাণে অধিক ও গুণে শ্রেষ্ঠতর হলেও তার মোক্ষলাভের সহায়ক হবে না, শুধু কর্মাশয়ের সৃষ্টি করে তাকে এক নতুন কর্মজগতে ঠেলে দেবে। সুতরাং কর্মাশয়কে শূন্য করবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে এবং গুণ অনুপাতে কর্ম করতে হবে। সহজ কথায় বলা যেতে পারে যে, যতটা সম্ভব পৃথিবী থেকে ততটা আদায় করে নেওয়া নয়, বর্ণবিশেষের যতটুকু অধিকার এবং লোকবিধৃতির স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই কর্ম করা উচিত—তার বেশীও নয় কমও নয়। সামাজিক জীবনে পরম সমাবস্থা রক্ষা করাই মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

মানুষের জীবনের আদর্শই হ'চ্ছে তার শিক্ষার আদর্শ। বহুর সম্মিলনেই সমাজ গড়ে উঠেছে। বহুর যে বহু বৈচিত্র্য, বহু স্বর তার সামঞ্জস্য সৃষ্টি করাই হ'চ্ছে সমাজের আদর্শ, জীবনের আদর্শ, শিক্ষার আদর্শ। হিন্দু জীবনাদর্শ আধ্যাত্মিক কিন্তু তা মানুষের পার্থিব জড় অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না বরং তাকে

আঁকড়ে ধরতে চায়। হিন্দু মতে জীবন দুঃখময় সত্য, কিন্তু মানুষ তাতে ভীত নয়। কেননা সে জানে এই জগৎ একটা নিরবসান ক্রম মাত্র। এই ক্রমের ফলে এক থেকে বহুর সৃষ্টি হ'চ্ছে আবার কর্মাবসানে বহু সেই একের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। দুঃখ জাগতিক এবং ক্ষণস্থায়ী কিন্তু আত্মা স্বভাবতই স্বর্গীয় ও তার গন্তব্য হ'চ্ছে এক পরম আনন্দলোক। জীবন সম্বন্ধে এই ধারণাই মানুষকে নির্ভীক ও জীবন সম্বন্ধে উৎসাহিত করে। দুঃখবাদ ও মংগলবাদের এই বিচিত্র সমন্বয় হ'চ্ছে হিন্দু সংস্কৃতির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে মানুষের জীবনে জৈব ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের সমন্বয়। মানুষের জন্ম হয় এবং জন্ম হ'লেই মানুষ হিসাবে তাকে সমাজে বাঁচতে হয়। বেঁচে থাকবার পরিকল্পনা হ'চ্ছে বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম। ব্যক্তির চরম স্বার্থ মোক্ষলাভ কিন্তু সমাজের স্বার্থ হ'চ্ছে স্থায়ীত্বলাভ, পরম্পরা ও ঐতিহ্য রক্ষা, ক্রমোন্নতি ও লোকবিধৃতি। জীবন-যাপনের যে পরিকল্পনা প্রাচীন হিন্দু মনীষীরা দিয়েছেন তা যথাযথভাবে অনুসরণ করলেই ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের সমন্বয় সাধিত হয়। আর একটি কথা। হিন্দুদর্শন নিরাসক্ত সত্যানুসন্ধান নয়, সুতরাং তা নিছক তত্ত্বীয় চিন্তাধারা বা পদ্ধতিও নয়। সমস্ত হিন্দু দর্শনতত্ত্বের একটা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য আছে এবং চার্বাক দর্শন বাদে, তা হ'চ্ছে মোক্ষলাভ। দার্শনিক সত্য শুধু চিন্তার দ্বারা আবিষ্কার করলে হবে না, জীবনযাপনের দ্বারা সেই সত্যকেও প্রমাণ কোরতে হবে। সেই জন্যই হিন্দু-দর্শনের অপর নাম মোক্ষশাস্ত্র। দেখা যাচ্ছে তাহলে যে হিন্দু-দর্শনই হ'চ্ছে হিন্দুধর্ম, হিন্দুজীবন।

হিন্দু শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষানীতির আলোচনায় উপরোক্ত ভূমিকার অবতারণা করার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে এই সত্যকে প্রতিপন্ন করা যে, হিন্দুশিক্ষার অর্থ জীবনের একটা বিশেষ পর্যায়ে শুধু বুদ্ধি প্রক্রিয়ার সাহায্যে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বোধ ও জ্ঞান অর্জন

করা (process of learning about things) ছিল না, তা ছিল এক সুনিয়ন্ত্রিত জীবনসাধনা (mode of living)। জীবনই শিক্ষা এবং শিক্ষাই জীবন, এই দু'য়ের অনন্যতাই হ'চ্ছে হিন্দু-শিক্ষার অনুপম বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ। পরিণত বয়সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করার উপায় মাত্র, বা ব্যবহারিক জগতে খ্যাতি, শক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা বা জীবনে নানাবিধ সুখ, সুবিধা ও প্রাচুর্য ভোগ করার উপায় মাত্র, এই দৃষ্টিতে শিক্ষার মূল্য বিচার করা হ'ত না। দ্বিজাতির পক্ষে চতুরাশ্রমেই অবস্থানুযায়ী শাস্ত্রতত্ত্ব অধ্যয়ন ও মনন করাই ছিল ধর্ম। শিক্ষা ছিল উপায় এবং উপেয় দুইই। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ না করার স্বাধীনতা দ্বিজাতির ছিল না। সংক্ষেপে, দ্বিজাতির আয়ুষ্কালের সমস্ত স্তর এবং অবস্থাতেই পরিস্থিতি ও সুবিধা অনুযায়ী শাস্ত্রালোচনা, জ্ঞানার্জন ও তত্ত্বচিন্তা আবশ্যিক ছিল।

এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে যে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য ধর্মশাস্ত্র-কারদের এই যে অসংখ্য অনুশাসন, এগুলো কি সর্বকালে, সার্বিক-ভাবে পালিত হ'ত ? না, তা হ'ত না। প্রাচীন ভারতের হিন্দুসমাজে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুতির উদাহরণের অভাব নেই, আর তাছাড়া সময়োপযোগী করবার জন্য শাস্ত্রানুশাসন যুগে যুগে শিথিল করা হয়েছে[১]। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিখুঁতভাবে স্বধর্ম পালনে সংসক্ত এই রকম সমাজ কাল্পনিক। মনে রাখা দরকার যে আর্যরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করে তখন তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। আর্যশক্তি প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের সংগে সংগে নানা কারণে আর্য জীবনে (হিন্দু শব্দ পরবর্তী কালে প্রচলিত হয়) বহু সমস্যার উদ্ভব হয় এবং নানা প্রকার নিয়মের প্রবর্তন ক'রে সেই সব সমস্যার সমাধান করতে হয়; ফলে সামাজিক ব্যবহার ও নিয়মগুলি ক্রমশঃ জটিল,

১ অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥ মনু ১।৮৫

ব্যাপক ও আনুষ্ঠানিক হ'য়ে দেখা দেয়। এই নিবন্ধে অবশ্য সেই পরিবর্তনের ধারা আলোচনা করার অবকাশ নেই। এখানে শুধু সাধারণভাবে হিন্দু শিক্ষাবিধি বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে।

শিক্ষালাভে অধিকার—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা শুরু হ'ত। তিন বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার ছিল এবং নিয়মিতভাবে উপনিষৎ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করা কর্তব্য ছিল[১]। শূদ্র ছিল আশ্রম ধর্মের বহির্ভূত। বেদপাঠে শূদ্রের অধিকার ছিল না। অবশ্য ছান্দোগ্য[২] উপনিষদে জানশ্রুতির গল্প থেকে জানা যায় যে শূদ্ররাজা জানশ্রুতি বেদবিদ্যা লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঋষি গৌতমের লেখায় পাওয়া যায় যে শূদ্র যদি ইচ্ছা করে বেদ শ্রবণ করে, বা বেদ উচ্চারণ করে, বা বেদজ্ঞান লাভ করে, তাহলে তার কী ভয়াবহ শাস্তি হবে[৩]। সে শাস্তির অর্থ মৃত্যু। তবে বেদে অধিকার না থাকলেও শূদ্র মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি ব্রাহ্মণের সাহায্যে শ্রবণ করতে পারত এবং তার মধ্য দিয়েই বেদাদির মর্মার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারত। মহামতি বিদুর যদিও শূদ্রাগর্ভজাত ছিলেন তবুও তিনি সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। সাধারণভাবে বলা যায় যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষালাভ করার নিয়ম ছিল।

পাঠ্য-তালিকা—অতি প্রাচীন কাল থেকেই ব্রহ্মচারীর পাঠ্য-তালিকা ছিল অতি বৃহৎ। ছান্দোগ্য উপনিষদে[৪] নারদ সনৎকুমারকে বলছেন যে তিনি চতুর্বেদ, ইতিহাস-পুরাণ (পঞ্চম বেদ), ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধবিষয়ক শাস্ত্র, রাশি (গণিত), দৈব

---

১ মনু ২।১৬৫

২ ছান্দোগ্য ৪।১-২

৩ গৌতম ২।৩।৪

৪ ছান্দোগ্য ৭।১।২

(উৎপাত বিজ্ঞান), নিধি (গুপ্তধন আবিষ্কার বিদ্যা), বাকোবাক্য (প্রশ্নোত্তর নীতি বা তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যা (শিক্ষা এবং ছন্দ), ভূতবিদ্যা (ওঝার বিদ্যা), ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা ও দেবজনবিদ্যা (নাচ, গান, বাজনা, প্রলেপ তৈরী ইত্যাদি), এইসব নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন[১] ছাত্র যদি দেবতা ও পিতৃপুরুষকে তুষ্ট করতে চায় তাহলে সাধ্যানুযায়ী তার বেদ, বাকোবাক্য, পুরাণ, নারাসংসী, গাথা, ইতিহাস ইত্যাদি প্রত্যহ পাঠ করা উচিত। বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ১৪টি বিদ্যার নাম করেছেন যথা—চতুর্বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র। অন্য কয়েকজন এর সঙ্গে আরও চারটি বিদ্যা যোগ করে দিয়েছেন, যথা—আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। কৌটিল্য[২] বলেছেন যে ত্রয়ী (তিন বেদ), আন্বীক্ষিকী (দর্শন ও ন্যায়), বার্তা (কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য) এবং দণ্ডনীতি (রাষ্ট্রনীতি), এই চারটি বিদ্যা শিক্ষণীয়। সমস্ত ছাত্রকে যে উপরোক্ত সমস্ত বিদ্যা শিখতে হবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না। বৃত্তি ও পছন্দ অনুযায়ী ছাত্ররা বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষা করত। রাজধর্ম যথাযথভাবে পালন করার জন্য ক্ষত্রিয়দের বেদ, উপবেদ, আন্বীক্ষিকী, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ অধ্যয়ন করা প্রয়োজন ছিল[৩]। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য[৪] বলেছেন যে রাজাকে বেদ, আন্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি ও বার্তা (খাদ্যশস্য ও সম্পদ উৎপাদন বিদ্যা), এই চার বিদ্যায় পারদর্শী হ'তে হবে। মহাভারতে[৫] বলা

---

১ যাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৪-৪৫

২ কৌটিল্য ১।২।

৩ গৌতম ২।২।১৯

৪ মনু ৭।৪৩

যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩১১

৫ মহাভারত সভাপর্ব ৫।১২১-১২১

ব্যাপক ও আনুষ্ঠানিক হ'য়ে দেখা দেয়। এই নিবন্ধে অবশ্য সেই পরিবর্তনের ধারা আলোচনা করার অবকাশ নেই। এখানে শুধু সাধারণভাবে হিন্দু শিক্ষাবিধি বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে।

শিক্ষালাভে অধিকার—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা শুরু হ'ত। তিন বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার ছিল এবং নিয়মিতভাবে উপনিষৎ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করা কর্তব্য ছিল[১]। শূদ্র ছিল আশ্রম ধর্মের বহির্ভূত। বেদপাঠে শূদ্রের অধিকার ছিল না। অবশ্য ছান্দোগ্য[২] উপনিষদে জানশ্রুতির গল্প থেকে জানা যায় যে শূদ্ররাজা জানশ্রুতি বেদবিদ্যা লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঋষি গৌতমের লেখায় পাওয়া যায় যে শূদ্র যদি ইচ্ছা করে বেদ শ্রবণ করে, বা বেদ উচ্চারণ করে, বা বেদজ্ঞান লাভ করে, তাহলে তার কী ভয়াবহ শাস্তি হবে[৩]। সে শাস্তির অর্থ মৃত্যু। তবে বেদে অধিকার না থাকলেও শূদ্র মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি ব্রাহ্মণের সাহায্যে শ্রবণ করতে পারত এবং তার মধ্য দিয়েই বেদাদির মর্মার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারত। মহামতি বিদুর যদিও শূদ্রাগর্ভজাত ছিলেন তবুও তিনি সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। সাধারণভাবে বলা যায় যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষালাভ করার নিয়ম ছিল।

পাঠ্য-তালিকা—অতি প্রাচীন কাল থেকেই ব্রহ্মচারীর পাঠ্য-তালিকা ছিল অতি বৃহৎ। ছান্দোগ্য উপনিষদে[৪] নারদ সনৎকুমারকে বলছেন যে তিনি চতুর্বেদ, ইতিহাস-পুরাণ (পঞ্চম বেদ), ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধবিষয়ক শাস্ত্র, রাশি (গণিত), দৈব

---

১ মনু ২।১৬৫

২ ছান্দোগ্য ৪।১-২

৩ গৌতম ২।৩।৪

৪ ছান্দোগ্য ৭।১।২

(উৎপাত বিজ্ঞান), নিধি (গুপ্তধন আবিষ্কার বিদ্যা), বাকোবাক্য (প্রশ্নোত্তর নীতি বা তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যা (শিক্ষা এবং ছন্দ), ভূতবিদ্যা (ওঝার বিদ্যা), ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা ও দেবজনবিদ্যা (নাচ, গান, বাজনা, প্রলেপ তৈরী ইত্যাদি), এইসব নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন[১] ছাত্র যদি দেবতা ও পিতৃপুরুষকে তুষ্ট করতে চায় তাহলে সাধ্যানুযায়ী তার বেদ, বাকোবাক্য, পুরাণ, নারাসংসী, গাথা, ইতিহাস ইত্যাদি প্রত্যহ পাঠ করা উচিত। বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ১৪টি বিদ্যার নাম করেছেন যথা—চতুর্বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র। অন্য কয়েকজন এর সঙ্গে আরও চারটি বিদ্যা যোগ করে দিয়েছেন, যথা—আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। কৌটিল্য[২] বলেছেন যে ত্রয়ী (তিন বেদ), আন্বীক্ষিকী (দর্শন ও ন্যায়), বার্তা (কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য) এবং দণ্ডনীতি (রাষ্ট্রনীতি), এই চারটি বিদ্যা শিক্ষণীয়। সমস্ত ছাত্রকে যে উপরোক্ত সমস্ত বিদ্যা শিখতে হবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না। বৃত্তি ও পছন্দ অনুযায়ী ছাত্ররা বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষা করত। রাজধর্ম যথাযথভাবে পালন করার জন্য ক্ষত্রিয়দের বেদ, উপবেদ, আন্বীক্ষিকী, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ অধ্যয়ন করা প্রয়োজন ছিল[৩]। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য[৪] বলেছেন যে রাজাকে বেদ, আন্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি ও বার্তা (খাদ্যশস্য ও সম্পদ উৎপাদন বিদ্যা), এই চার বিদ্যায় পারদর্শী হ'তে হবে। মহাভারতে[৫] বলা

---

১ যাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৪-৪৫

২ কৌটিল্য ১।২।

৩ গৌতম ২।২।১৯

৪ মনু ৭।৪৩
যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩১১

৫ মহাভারত সভাপর্ব ৫।১২১-১২১

হয়েছে যে রাজাকে হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনু ও বিভিন্ন যন্ত্রের (সম্ভবত যুদ্ধের জন্য) ব্যবহার ও নাগর বিদ্যা অর্থাৎ যাতে নগরের হিত হয় এমন বিদ্যা শিখতে হবে। হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে মহারাজা খারবেল (আঃ খৃঃ পূঃ প্রথম শতক) সম্বন্ধে লেখা আছে যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি রূপা (মুদ্রা), গণনা (অর্থনীতি ও হিসাব সংরক্ষণ), লেখ (সরকারী পত্র লিখন প্রণালী) এবং ব্যবহার (আইন ও বিচার প্রণালী) সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

বৈশ্যদের সম্বন্ধে মনু বলেছেন[১] যে সৃষ্টিকর্তা পশু সৃষ্টি করে বৈশ্যদের ওপর তার প্রতিপালনের ভার দেন। পশুপালনবিদ্যা বৈশ্যবর্ণের প্রায় একচেটিয়া বিদ্যা ছিল, সুতরাং পশুপালন বিজ্ঞান বৈশ্যকে নিয়মিতভাবে শিখতে হত। বৈশ্যদের বেদপাঠ করতে হত, কিন্তু অর্থনীতিতেই ছিল তাদের বিশেষ অধিকার। মনু বলেছেন[২] বৈশ্যকে জানতে হবে বাণিজ্যের স্বার্থে বিভিন্ন দেশের ভাষা, বিভিন্ন রত্ন, ধাতু, কাপড়, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বস্তুর উত্তম, অধম ও মধ্যমভেদে কত মূল্য হ'তে পারে, কোন্ জমিতে কিভাবে বীজ বপন করলে ভাল শস্য উৎপন্ন হতে পারে, কোন্ দেশে কোন বস্তুর বেশী চাহিদা আছে, কোন্ দ্রব্য কতদিন সঞ্চয় করে রাখা যেতে পারে, কোন্ দ্রব্যে কি মেশান যেতে পারে, কোন্ ভৃত্যকে কত বেতন দেওয়া যেতে পারে, ইত্যাদি। শূদ্রদের সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রগুলি প্রায় একরকম নীরব। তারা ক্রমশ সামাজিক মর্যাদা লাভ করে এবং বৈশ্যদের শিক্ষানবীশ হিসাবে কৃষিবিদ্যা ও নানারকম শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পাঠ্য-তালিকার মধ্যে বেদাদি গ্রন্থ পাঠ উচ্চ তিন বর্ণের অবশ্য কর্তব্য ছিল ; তাছাড়া বৃত্তি অনুযায়ী অন্য বিদ্যাও আয়ত্ত করতে হ'ত। প্রাচীন ভারতে বেদজ্ঞান লাভ

১ মনু ৯।৩২৭
২ মনু ৯।৩২৯-৩৩২

করা হিন্দুদের সবচেয়ে বড় আদর্শ কেন ছিল এবং তা লাভ করলে কি ফল হ'ত তা সুন্দরভাবে শতপথ ব্রাহ্মণে[১] বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে "বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন মানুষের আনন্দের উৎস ; (তাতে) সে হয় একাগ্রচিত্ত ও স্বাবলম্বী ; নিত্য তার অভ্যুদয় ঘটে, সে অব্যাকুলিত চিত্তে নিদ্রা যায় ; সে হয় নিজেই নিজের পরম চিকিৎসক ও ইন্দ্রিয়জয়ী, সংযমী, স্থিতধী ; তার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায় ও সে যশের অধিকারী হয়। আর, সে মানুষকে উৎকর্ষের পথে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব সম্পাদন করে।" সহজ কথায় বেদ পাঠ (স্বাধ্যায়) মানুষের মনুষ্যত্বকে প্রস্ফুটিত করে, তার ব্যক্তিত্বকে প্রাণময়, সমাজচেতন ও সুষম করে তোলে।

শিক্ষারম্ভের বয়স—কোন্ বয়সে ছাত্র শিক্ষা আরম্ভ করবে সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানের ছাত্রজীবন শুরু (উপনয়ন) হওয়া উচিত তাদের জন্মের বা মাতৃগর্ভে আগমনের যথাক্রমে আট, এগারো ও বারো বছরে ; এবং তাদের উপনয়নের বয়স যথাক্রমে ষোল, বাইশ ও চব্বিশ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে[২]। যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলেছেন[৩] যে কুলরীতি অনুসারে (যথাকুলম্) সুবিধামত সময়ে উপনয়ন হতে পারে। উপনয়নের সময় সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মোটামুটিভাবে আশ্বলায়নের মতই প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে আরও অল্প বয়সে উপনয়ন হ'তে পারে এবং তার উদ্দেশ্য কী সে বিষয়ে মনুর মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন[৪] যে

১। শতপথ ব্রাহ্মণ ১১-৫-৭-১

২। অষ্টমে বর্ষে ব্রাহ্মণমুপনয়েত্। গর্ভাষ্টমে বা। একাদশে ক্ষত্রিয়ম্। দ্বাদশে বৈশ্যম্। আ ষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালঃ। আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য। আ চতুর্বিংশাদ্বৈশ্যস্য। আশ্বলায়ন গৃ, সূ ১।১৯।১-৬

৩। যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৪

৪। ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে॥ মনু ২।৩৭

ব্রাহ্মণ পিতা যদি তাঁর পুত্রের ব্রহ্মবিদ্যায় বিশেষ উৎকর্ষ কামনা করেন, ক্ষত্রিয় পিতা যদি তাঁর পুত্রের শক্তির এবং যুদ্ধবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ কামনা করেন এবং বৈশ্য পিতা যদি কামনা করেন যে তাঁর পুত্র অর্থোপার্জনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, তাহলে তাদের যথাক্রমে পাঁচ, ছয় এবং আট বছরে উপনয়ন হতে পারে। উপনয়নের বয়স যে তিন বর্ণের পক্ষে তিন রকম তার কারণ হচ্ছে যে তিন বর্ণের বৃত্তি তিন রকমের। ব্রাহ্মণ বর্ণ শ্রেষ্ঠ এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনই হচ্ছে তার কাজ সুতরাং তার শাস্ত্রজ্ঞান অন্য দুই বর্ণের চেয়ে ব্যাপক ও গভীর হওয়া প্রয়োজন, সুতরাং তাকে সকলের আগে শিক্ষা আরম্ভ করতে হয়। তাছাড়াও ব্রাহ্মণ শিশু যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়, সেই পরিবেশ তার মধ্যে শাস্ত্রানুশীলনে গভীর সংস্কার সৃষ্টি করে ; ফলে তার পক্ষে ওই বয়সেই শিক্ষা শুরু করা সহজে সম্ভব হয়।

উপনয়ন—উপনয়ন হচ্ছে শিক্ষার্থীকে ছাত্রজীবনে দীক্ষিত করা। উপনয়ন শব্দের অর্থ "সমীপে নিয়ে যাওয়া" অর্থাৎ শিক্ষার জন্য আচার্যের কাছে উপস্থিত করা। উপনয়নের একটা আনুষ্ঠানিক দিক ছিল, অর্থাৎ আচার্যের কাছে উপস্থিত হোলেই শিক্ষার্থী শিষ্য হিসাবে গৃহীত হ'ত না। একটা বিধিসঙ্গত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উপনয়ন সম্পন্ন করতে হ'ত। প্রথম অবস্থায় অবশ্য উপনয়ন একটি সরল অনুষ্ঠান ছিল। শিক্ষার্থী সমিধ্ হাতে নিয়ে আচার্যের কাছে উপস্থিত হ'ত এবং তাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গ্রহণ করবার জন্য আচার্যকে অনুরোধ করত। বৃহদারণ্যক্ উপনিষদে[১] উল্লেখ আছে যে পূর্বকালে বিদ্যার্থীরা আচার্যের কাছে উপস্থিত হ'য়ে বলত যে "আমি আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি", এর পরেই সুরু হ'ত পাঠ গ্রহণ করা। কিন্তু ক্রমশ উপনয়ন বেশ একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে[২] উপনয়ন

১ "উপৈম্যহম্ ভবন্তম্ ইতি" বৃহ ৬.২।৭

২ শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৫।৪

বিধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে বিদ্যার্থী আচার্যকে বলবে "আমি আপনার ব্রহ্মচর্যাশ্রমে উপস্থিত, আপনি আমাকে ব্রহ্মচারী হিসাবে গ্রহণ করুন।" আচার্য তখন বিদ্যার্থীর নাম ধাম সমস্ত জিজ্ঞাসা করবেন, এবং তারপর তাকে কাছে নিয়ে এসে, তার হাত ধরে বলবেন, "তুমি ইন্দ্রের ব্রহ্মচারী, অগ্নি তোমার আচার্য, আমি তোমার আচার্য", ইত্যাদি। আচার্য আরও বলবেন, "তুমি জল পান কর, কাজ কর, আগুনে একখণ্ড কাঠ দাও, দিনে নিদ্রা যেয়োনা।" তারপর তিনি তাকে সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করবেন। পরবর্তীকালে গৃহ্যসূত্রগুলিতে আরও আড়ম্বরপূর্ণ উপনয়ন অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায়।

উপনয়ন অনুষ্ঠানের কয়েকটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। আচার্য ব্রহ্মচারীর কোমরে একটি মেখলা পরিয়ে দেন) নিয়ম ছিল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর মেখলা হবে মুঞ্জঘাসের তৈরী, ক্ষত্রিয়ের মূর্বা ঘাসের (যা দিয়ে ধনুকের ছিলা তৈরী হ'ত) এবং বৈশ্যের শণের। আচার্য ব্রহ্মচারীকে একটি দণ্ড (লাঠি) দান করতেন। তিন বর্ণের দণ্ডও তিন রকম কাঠের তৈরী হওয়ার বিধান ছিল। এ সম্বন্ধেও ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে মোটামুটি নিয়ম ছিল যে পলাশ অথবা বেল কাঠের দণ্ড ব্রাহ্মণের জন্য, বটের দণ্ড ক্ষত্রিয়ের জন্য এবং ডুমুর কাঠের দণ্ড বৈশ্যের জন্য। অবশ্য এও বলা হয়েছে যে-কোন বর্ণ যে-কোন কাঠের দণ্ড ব্যবহার করতে পারে। দণ্ডের বহু উপকারিতা ছিল ; আচার্যের গরু-বাছুর সামলাবার জন্য, রাত্রে পথে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে এবং নদী পার হবার সময় পথপ্রদর্শকরূপে দণ্ডের উপকারিতা খুবই অনুভূত হ'ত।

যজ্ঞোপবীত পরিয়ে দেওয়া ছিল উপনয়নের এক বিশিষ্ট অংশ। যজ্ঞোপবীত ব্যবহারের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা তথ্য পাওয়া যায়। এখানে তার অবতারণা করার প্রয়োজন নেই। তবে যজ্ঞোপবীত বলতে এক গুচ্ছ সূতোই যে শুধু বোঝাত তা নয়। একটা বিশেষ পদ্ধতিতে উত্তরীয় পরিধান করাই ছিল যজ্ঞোপবীত ধারণ

করা। শুধু তাই নয়, যদি কোন বস্তু ওই বিশেষ পদ্ধতিতে (বাঁ কাঁধ থেকে ডান দিকের কোমর পর্যন্ত কোণাকুণিভাবে) পরিধান করা হ'ত তাকেই বলা হ'ত উপবীত। খুব সম্ভব প্রাচীনকালে যজ্ঞোপবীত হিসাবে সুতোর ব্যবহার ছিল না, উত্তরীয়টিই বিভিন্ন কর্মে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিধান করা হ'ত। পরবর্তী কালে সুতোর ব্যবহার প্রচলিত হয়। বিভিন্ন বর্ণের জন্য যজ্ঞোপবীত সুতো, শণ, পশম, কুশ, ঘাস ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হ'ত[১]। আচার্য ব্রহ্মচারীকে যজ্ঞোপবীত পরিয়ে দিতেন। তারপর ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য পালন করার সঙ্কল্প ব্যক্ত করলে আচার্য্য সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে ব্রহ্মচারীকে গ্রহণ করতেন। উপনয়নের পরে ব্রহ্মচারী আর্য জীবনযাত্রার অধিকার লাভ করত, তার দ্বিতীয় জন্ম হ'ত ও সে দ্বিজ হিসাবে পরিগণিত হ'ত। যদি উপযুক্ত বয়সে তিন বর্ণের সন্তানদের উপনয়ন না হ'ত তবে তারা 'সাবিত্রীপতিতা' বা পতিতসাবিত্রীক হিসাবে পরিগণিত হ'ত, অর্থাৎ সাবিত্রী মন্ত্রশিক্ষা করার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হ'ত, তারা হ'ত ব্রাত্য, 'আর্য বিগর্হিতা'।[২]

কোন্ বর্ণ কত বয়সে উপনয়নের জন্য আচার্যের কাছে উপস্থিত হবে, সেকথা আগে বলা হয়েছে। উপনয়নের প্রশস্ত সময় তিন বর্ণের পক্ষে বিভিন্ন। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে[৩] যে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হওয়া উচিত বসন্তকালে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মে এবং বৈশ্যের শরতে। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকারেরাও এই মত দিয়েছেন। উপনয়ন শুক্লপক্ষে এবং সুতিথিতে হওয়া উচিত একথাও ধর্মশাস্ত্রকারেরা বলেছেন।

---

১ মনু ২।৪৪, বিষ্ণুধর্মসূত্র ২৭।১৯, বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১।৫।৫, গোভিল গৃহসূত্র ১।২।১

২ মনু ২।৩৯, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৮

৩ "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্যঁ শরদিবৈশ্যং" ইত্যাদি। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।১।১।১৯

উপনয়ন যথাবিধি সম্পন্ন করে আর্য সন্তান এক নোতুন জীবনে প্রবেশ করত। ব্রহ্মচর্যাশ্রম তার মুক্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই আশ্রমে সে যে শুধু কতকগুলো বিষয়ে জ্ঞানলাভ করত তা নয়, এই আশ্রম তার কাছে ছিল এক বিচিত্র কর্মজীবন, যে জীবনের সে একজন সক্রিয় অংশীদার, যে জীবন সাধনায় সে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করত। ব্রহ্মচারীর কাছে ব্রহ্মচর্যাশ্রম এক অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। এখানে সে যা করে ও শেখে তা তার মনুষ্যত্বকে বিকশিত করে, তার মুক্তির পথ আলোকিত করে ("সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে")। তাই ব্রহ্মচারীর ওপর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের দাবী অনেক। প্রথম কথা তাকে থাকতে হবে গুরুর আশ্রমে বা আচার্যকুলে, গুরুর সঙ্গে। গুরুর আশ্রমই ছিল শিষ্যের ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এই আশ্রমে গুরু শিষ্যকে দীক্ষা ও শিক্ষা দিয়ে আপন ধর্ম পালন করতেন, এবং শিষ্যও দীক্ষিত হ'য়ে এবং শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে তার ধর্ম পালন করত।

গুরুগৃহে বাস—সম্ভবত অতি প্রাচীনকালে পুত্র পিতার কাছেই শিক্ষিত হ'ত। তারপর ক্রমশ গুরুগৃহে বাস করাই নিয়ম হ'য়ে দাঁড়ায়। তবে এও সত্য যে গুরুগৃহে বাস করা সাধারণ নিয়ম হ'লেও, রাজা মহারাজারা স্বগৃহে আচার্যকে রেখে সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। ভীষ্ম, কৌরব ও পাণ্ডব রাজপুত্রদের শিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্যকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। দ্রুপদ রাজাও তাঁর পুত্র কন্যাকে এইভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। রাজর্ষি জনকও স্বগৃহে আচার্য পঞ্চশিখের কাছে বিদ্যার্জন করেছিলেন। বাণভট্টের কাদম্বরীতে আছে যে রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় গুরুগৃহে যান নি, রাজধানীর বাইরে তাঁর শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি নিয়মের ব্যতিক্রম; সাধারণ নিয়ম ছিল গুরুগৃহে বাস করা। তবে বৃত্তির জন্য ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ঘটা

খুবই স্বাভাবিক। ধনীর পুত্রদের পক্ষে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কঠিনজীবন যাপন করা যে খুবই কষ্টসাধ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রকারেরা বলেছেন[১] যে, ব্রহ্মচারী আমৃত্যু গুরু-গৃহে বাস করে গুরুর সেবা ও বেদপাঠ করতে পারে। গুরুর মৃত্যু হ'লে গুরুর উপযুক্ত পুত্রকে, অথবা গুরুর স্ত্রীকে অথবা গুরুর সপিণ্ডকে, অথবা সকলের অভাবে গুরু যে অগ্নি প্রজ্জলিত করে গিয়েছেন সেই অগ্নির পরিচর্যা করতে পারে। এই রকম চিরব্রহ্মচারীকে বলা হ'ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। যে সব ব্রহ্মচারী গুরুকে সাধ্যমত দক্ষিণা দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত তাদের বলা হ'ত উপকুর্বাণ।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বাস করতে হ'ত দীর্ঘকাল। সম্ভবত ১২ বছর ছিল সাধারণ নিয়ম[২]; তবে ১০০ বছর বা ৭৫ বছরের ব্রহ্মচর্যের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। চারটি বেদ আয়ত্ত করতে ৪৮ বছরের প্রয়োজন হয় একথাও নানা সূত্রে[৩] পাওয়া যায়। এক একটি বেদের জন্য ১২ বছর, এই রকম কোন একটা ব্যবস্থা সম্ভবত ছিল অর্থাৎ সমস্ত বেদ আয়ত্ত না করে, যে কোন একটিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করাই হয়ত নিয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কালে কালে বেদসাহিত্য এত বিরাট হয় যে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সম্পূর্ণ চারটি বেদ আয়ত্ত করা সম্ভব হ'ত না, এবং সেইজন্যই হয়ত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের স্থিতিকাল অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হ'ত। তবে একথা পাওয়া যায় যে গুরুগৃহে থাকা কালেই উতঙ্কের চুল সাদা হ'য়ে গিয়েছিল।

দক্ষিণা—ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে যতদিনই অতিবাহিত বা যত ইচ্ছা জ্ঞানই অর্জন করুক না কেন তার জন্য গুরুকে কোন বেতন বা পারিশ্রমিক দিতে হ'ত না। শিক্ষা ছিল

১ মনু ২।২৪৩, ২৪৪, ২৪৭—২৪৯। যাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৯-৫০

২ ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪।১০।১, ৬।১।২

৩ গোপথ ব্রাহ্মণ ২।৫, পারস্কর গৃহ্যসূত্র ২।৫, বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র ১।২।১-৫

অবৈতনিক। ধনরত্নপূর্ণ এই বিরাট পৃথিবীর চেয়েও ব্রহ্মবিদ্যা বেশী মূল্যবান। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যা দান করে গুরুর ঋণ শোধ করা যায়। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কোন পারিশ্রমিকের পরিবর্তে যে গুরু (ভৃতকাধ্যাপক) বিদ্যা শিক্ষা দেন এবং যে শিষ্য সে শিক্ষা গ্রহণ করে (ভৃতকাধ্যাপিত) তাঁরা উভয়েই কোন শ্রাদ্ধাদি কর্মে নিমন্ত্রিত হবার অযোগ্য[১]। তবে মেধাতিথির ভাষ্য এবং মিতাক্ষরায়[২] বলা হয়েছে যে ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করাটাই যে অন্যায় তা নয়, তবে গুরু যদি আগেই শিষ্যের সঙ্গে চুক্তি করেন যে একটা বিশেষ পরিমাণ অর্থের পরিবর্তেই তিনি তাঁকে শিক্ষা দেবেন তবে সেটা অন্যায় হবে। ব্রহ্মচারী শিক্ষা সমাপনান্তে আপন সাধ্যমত দক্ষিণা গুরুকে দিতে পারত। তবে বাজসনেয়ি সংহিতায়[৩] বলা হয়েছে যে দক্ষিণা দিয়ে গুরুর কাছে লব্ধ জ্ঞানের মূল্য দেওয়া যায় না; দক্ষিণা হচ্ছে গুরুর প্রতি শিষ্যের গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন মাত্র।

গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয় গুরুকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য। শিষ্যের কাজ এবং ব্যবহারে গুরুর সন্তুষ্টিই তাঁর প্রকৃত দক্ষিণা[৪]। যে শিক্ষক অর্থ অথবা জীবিকার জন্য বেদ বা বেদাঙ্গ শিক্ষা দেন তাঁকে বলা হ'ত উপাধ্যায়[৫]। শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে গুরু যে দক্ষিণা চাইতেন তা দেওয়াই ব্রহ্মচারীর কর্তব্য ছিল। গুরু যদি দরিদ্র হতেন তাহলে শূদ্রের কাছ থেকেও ভিক্ষা করে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার নিয়ম ছিল। গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে বা গুরুর কোন বিশেষ উপকার করবার পর সে সব

---

১ মনু ৩।১৫৬, যাজ্ঞবল্ক্য ১।২২৩,

২ মেধাতিথিভাষ্য মনুসংহিতা ২।১১২, মিতাক্ষরা যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৩৫

৩ বাজসনেয়ি সংহিতা ১৯।৩০

৪ দক্ষিণা পরিতোষো বৈ গুরূণাং সদ্ভিরুচ্যতে। মহাভারত আশ্বমেধিকপর্ব ৫৬।২১, শান্তি পর্ব ১২২।১৩

৫ মনু ২।১৪১

বিষয়ে অপরের কাছে অহঙ্কার করা বা নিজে চিন্তা করা খুবই অন্যায় বলে পরিগণিত হ'ত। তবে কখন ও কখনও গুরু বা গুরুপত্নীর আকাঙ্ক্ষিত দক্ষিণা সংগ্রহ করতে শিষ্যকে যে কি সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হ'ত তা মহাভারতে উতঙ্কের গল্প[১] পড়ে জানা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষা বা শিক্ষণ কোনটাই অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত না এবং আচার্যের শিক্ষা, তা যতই সামান্য হোক না কেন, এক অপরিশোধ্য ঋণ বলে মনে করা হ'ত।

আচার্য—প্রাচীন ভারতে বিদ্যার মূল্য ছিল বলেই যিনি বিদ্যা দান করতেন তিনি সমাজের কাছে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা পেতেন। আচার্য ছিলেন ব্রহ্মচারীর পরমার্থিক পিতা (spiritual father)[২] কেননা তিনিই ব্রহ্মচারীর উপনয়ন সম্পন্ন করতেন, তাকে দ্বিতীয়বার জন্ম দিতেন এবং তার মুক্তির জন্য তাকে ধর্মজীবনে দীক্ষিত করতেন। আপস্তম্ব বলেছেন যাঁর কাছ থেকে ধর্ম আহরণ করা হয় তিনিই আচার্য[৩]। মাতাপিতা সন্তানের শরীর সৃষ্টি করেন; আচার্য তাকে জড়জীবন থেকে উত্তোলন করে মহাজীবনের পথে প্রতিষ্ঠিত করেন। উপনয়নের সময় আচার্য, যেখানে হৃদ্‌পিণ্ড থাকে, ব্রহ্মচারীর বুকের সেইখানে হাত রেখে বলতেন, "আমার ব্রতে আমি তোমার অন্তরকে নিয়োজিত করছি, তোমার অন্তর যেন আমার অন্তরের অনুগামী হয়, তুমি একমনা হ'য়ে যেন আমার বাক্য পালন করতে পার; বৃহস্পতি যেন তোমাকে আমার হাতে তুলে দেন[৪]।" ব্রহ্মচারীকে আচার্য গ্রহণ করতেন সম্পূর্ণ নিজের মতন করে। আচার্য ও ব্রহ্মচারী

১ মহাভারত আদি পর্ব ৩য় অধ্যায়

২ অথর্ববেদ ১১।৫।৩, মনু ২।১৭০, গৌতম ১।১।১০,

৩ "যস্মাদ্ধর্মানাচিনোতি স আচার্য্যঃ"। আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ১।১।১।১৪

৪ পারস্কর গৃহ্যসূত্র ২।২

মানব গৃহ্যসূত্র ১।২২।১০

একত্রে প্রার্থনা করেতন—"(ব্রহ্ম) আপনি আমাদের উভয়কে রক্ষা করুন; উভয়কে একত্রে অন্নদান করুন; উভয়কে শক্তিশালী তেজোময় করুন; উভয়ের জ্ঞান বর্ধিত হোক, দীপ্ত হোক; আমরা উভয়েই যেন নির্বিরোধে বেঁচে থাকতে পারি। শান্তি, শান্তি, শান্তি[১]!" আচার্যের কর্তব্য ব্রহ্মচারীকে পুত্রবৎ স্নেহে পালন করা এবং অতি যত্নের সহিত, কোন সত্য ও তথ্য গোপন না করে নিখুঁতভাবে সমস্ত সত্য শিক্ষা দেওয়া। আচার্যের এও কর্তব্য ছিল যে শুধু বিপদ্‌কাল ছাড়া, কখন যেন তাঁর নিজের কোন কাজের জন্য ব্রহ্মচারীর শিক্ষার ব্যাঘাত না ঘটে সে বিষয়ে সচেতন থাকা[২]। গোপথ ব্রাহ্মণে[৩] গল্প আছে যে ঋষি মৈত্রেয় যখন বুঝতে পারলেন যে একটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না, তখনই তিনি ছাত্রদের বিদায় দিয়ে সেই বিষয়টি অধ্যয়ন করতে শুরু করলেন।

আচার্যের সদভিপ্রায়, নিঃস্বার্থ স্নেহ, চরিত্রের দৃঢ়তা ও মহত্ত্ব, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য স্বভাবতই ব্রহ্মচারীর মনে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সঞ্চার করত। আচার্যের আশীর্বাদেই সে সর্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত হ'ত এবং মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হ'তে পারত। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে কায়মনোবাক্যে এবং কর্মের দ্বারা ব্রহ্মচারী গুরুর হিতসাধন করবে। শিক্ষালাভের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে গুরুর জন্য এবং সমাহিত চিত্তে তাকে শ্রবণ করতে হবে গুরুর বাক্য[৪]। শোয়া, বসা, চলা, খাওয়া, পরা সমস্ত বিষয়েই গুরুর কাছে ব্রহ্মচারীকে খুবই সংযত হ'তে হবে। গুরুনিন্দা সত্য বা অসত্য

---

১ ওঁ! সহ নাববতু। সা নৌ ভুনক্তু। সহবীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মাবিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১

২ আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।২।৮।২৫-২৬

৩ গোপথ ব্রাহ্মণ ১।১।৩১

৪ যাজ্ঞবল্ক্য ১।২৬-২৭

যাই হোক না কেন, শুনলেই শিষ্য কান বন্ধ করবে বা সেই স্থান পরিত্যাগ করবে[১] এই ছিল নিয়ম। বলা হয়েছে যে নিন্দা করবার কারণ থাকলেও যদি ব্রহ্মচারী গুরুকে নিন্দা করে তাহলে সে পরজন্মে গাধা হ'য়ে জন্মাবে এবং যদি অযথা নিন্দা করে তাহোলে কুকুর হ'য়ে জন্ম নেবে[২]।

আচার্যকুলে অন্তেবাসীকে এক অতি কঠোর জীবন সাধনায় প্রবৃত্ত হ'তে হ'ত। প্রতি পদে তাকে নানা রকম বিধি-নিষেধের সম্মুখীন হ'তে হ'ত এবং সেগুলিকে হৃষ্টচিত্তে ও নিভুর্লভাবে পালন করতে হ'ত। সূর্যোদয়ের পূর্বেই ব্রহ্মচারীকে শয্যাত্যাগ করতে হ'ত। দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ ছিল। প্রত্যহ প্রত্যূষে এবং সন্ধ্যায় তাকে সন্ধ্যা উপাসনা করতে হ'ত। অতি বিনম্র ও লজ্জামুক্ত চিত্তে তাকে অন্ন ভিক্ষা করতে হ'ত[৩]। ভিক্ষালব্ধ অন্ন অকপট চিত্তে গুরুকে নিবেদন করে এবং গুরুর অনুমতি পেলে তবে তা ভক্ষণ করার নিয়ম ছিল[৪]। নিয়ম ছিল শুধু নিজের জন্য ভিক্ষা করা চলবে না; গুরুর অনুপস্থিতিতে গুরুর পরিবারকে ভিক্ষালব্ধ অন্ন নিবেদন করতে হ'ত। তাদের অনুপস্থিতিতে পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের কাছে নিবেদন করে তাদের অনুমতি নিয়ে তবেই তা ভক্ষণ করতে হ'ত। ভিক্ষা ছাড়া অন্য কিছু কারোর নিকট থেকে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। ভিক্ষালব্ধ খাদ্য অতি বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত হ'ত[৫], পতিত যে তার নিকট থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। কোন একজন ব্যক্তির গৃহে আহার করা সাধারণভাবে নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। বিভিন্ন গৃহ থেকে সংগৃহীত খাদ্যই খাওয়ার নিয়ম ছিল।

---

১ মনু ২।২০০
২ মনু ২।২০১
৩ শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৩।৩।৫
৪ মনু ২।৫১, আপস্তম্ব ধর্ম সূত্র ১।১।৩।৩১-৩৫
৫ মনু ২।১৮৯, বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১।৫।৫৬, যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৮৭

আহার—ধর্মশাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচারীর আহার সম্বন্ধে নানা বিধান দিয়েছেন। মনু বলেছেন[১] যে ব্রহ্মচারী সকালে একবার ও সন্ধ্যায় একবার, দিনে এই দুবার মাত্র ভোজন করবে। এর মাঝে তৃতীয় বার ভোজন করা নিষিদ্ধ। অতি ভোজন করা উচিত নয়, কেননা অতি ভোজনের ফলে রোগ জন্মায়, আয়ু কমে যায়, পুণ্য সঞ্চয়ে বাধা সৃষ্টি হয়, স্বর্গলাভ ঘটে না ও লোকে পেটুক বলে নিন্দা করে। মাংস, মধু, পচা খাবার, পরের উচ্ছিষ্ট, পান, প্রভৃতি খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল[২]। এছাড়াও আহার সম্বন্ধে আরও কতকগুলি নিয়ম পালন করবার বিধি ছিল[৩], গুরুর উচ্ছিষ্ট খাওয়ার নিয়ম ছিল।

পরিচ্ছদ—ব্রহ্মচারীর পোষাক ছিল দুটি, অধোবাস—কোমর থেকে নীচের অঙ্গের জন্য এবং উত্তরীয়—উপরের অংশের জন্য। তিন বর্ণের পরিচ্ছদ তৈরী হ'ত তিন রকম বস্তু দিয়ে। কোন বর্ণ কোন্ বস্তু ব্যবহার করবে পরিচ্ছদের জন্য সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত[৪]। মনু বলেছেন যে ব্রহ্মচারীর পরিধেয় হচ্ছে কৃষ্ণসার চর্মের উত্তরীয় ও শণের তৈরী অধোবাস, ক্ষত্রিয়ের হচ্ছে রুরু নামে এক রকম মৃগের চর্মের উত্তরীয় ও রেশমী অধোবাস এবং বৈশ্যের জন্য ছাগ চর্মের উত্তরীয় ও পশমের অধোবাস। পারস্কর গৃহ্য-সূত্রে[৫] বলা হ'য়েছে যে, তিন বর্ণের উত্তরীয়ের জন্য যে চামড়া ব্যবহার করার বিধান দেওয়া হয়েছে, তা যদি না পাওয়া যায় তবে প্রাণীশ্রেষ্ঠ গরুর চামড়া ব্যবহার করা যেতে পারে।

---

১ মনু ২।৫৬-৫৭ মহাভারত শান্তিপূর্ব ১৯৩।১০

২ মনু ২।১৭৭, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩, পরাশর ১।৫০

৩ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১।২২।১৭, বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র ২।৫।৫৫

৪ মনু ২।৪১, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।১।২।৩৯—১।১।৩।১-৩
বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র ১১।৬১-৬৩ ৬৪—৬৭, গৌতম ১।১৭—২০

৫ পারস্কর গৃহ্যসূত্র ২।৫

ব্রহ্মচারীর জীবন—আচার্যকুলে ফুল, গোবর, মাটি, কুশ ঘাস সংগ্রহ করা, জল তোলা, হোমের জন্য সমিধ্ আহরণ করা, গোপালন ও কৃষিকার্যে সহায়তা করা প্রভৃতি কাজ ছিল অন্তেবাসীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। গুরুকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সর্বদাই শিষ্যকে তৎপর থাকতে হ'ত। তাঁকে স্নানে সাহায্য করা, তাঁর অঙ্গমর্দন করে দেওয়া প্রভৃতি কাজ শিষ্যকে করতে হ'ত। গুরু, গুরুপত্নী ও গুরু পুত্রকে নানাভাবে শ্রদ্ধা জানাবার বিধান ছিল। তাছাড়াও ব্রহ্মচারীর ব্যবহার সম্পর্কে কত যে বিধি-নিষেধ ছিল তার আর অন্ত নাই[১]। সে সত্যবাদী হবে, কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না, অশ্লীল বা কটুবাক্য উচ্চারণ করবে না, গর্বিত বা নিষ্ফল আলোচনায় প্রবৃত্ত হবে না; তাকে প্রত্যহ স্নান করতে হবে। সূর্য্যের দিকে তাকানো, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার, ফুল দিয়ে নিজেকে অলঙ্কৃত করা, দিবানিদ্রা, গায়ে তেল মাখা, চোখে কাজল বা সুর্মা দেওয়া, শকটে চড়া, জুতা পরা, ছাতা ব্যবহার করা, প্রেমালাপ করা, ক্রুদ্ধ, লোভী বা মোহগ্রস্ত হওয়া, গান, বাজনা বা নৃত্য করা, গরম জলে আরামে স্নান করা বা স্নান করতে নেমে হুটোপাটি করা, স্ত্রীলোকের দিকে তাকান, যুবতীকে স্পর্শ করা, বিপদসঙ্কুল স্থানে যাওয়া, জুয়া খেলা, দুষ্ট বা নীচ শ্রেণীর লোকের সেবা করা ইত্যাদি একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মচারীকে কঠিন কৌমার্য পালন করতে হ'ত। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাকে একা শয়ন করতে

---

১ গৌতম ১।২।১৩,১৪,১৮ ইত্যাদি

আপস্তম্ব ১।১।২।২১-৩০ ; ১।১।৩।১১-২৪

'উপানহৌ ছত্রং যানমিতি চ বর্জয়েৎ' আপস্তম্ব ১।২।৭।৫

যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩

নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্বদা গুরুসন্নিধৌ।

গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ ॥ মনু ২।১৯৮

হ'ত এবং খাট বা অনুরূপ কোন বস্তু শয়নের জন্য ব্যবহার করা চলত না। জোরে হাসার নিয়ম ছিল না; হাসি পেলে মুখ চেপে হাসতে হ'ত। আচার্যের শয্যাত্যাগের পূর্বে তাকে শয্যা ত্যাগ করতে হ'ত এবং তিনি শয়ন করবার পর তা'র শয়ন করবার নিয়ম ছিল। আচার্যের চেয়ে নীচু আসনে তাকে বসতে হ'ত; আচার্যের সামনে হাই তোলা, বা আঙ্গুল মট্‌কানো নিষিদ্ধ ছিল। আচার্য ডাকলেই যেখানেই থাকুক তাকে সাড়া দিতে হ'ত ও অতি সত্বর তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে হ'ত। এই রকম নিয়ম-নিষেধের অরণ্য ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ব্রহ্মচারী মাত্রই যে খুব সহজভাবে এবং হৃষ্টচিত্তে সমস্ত বিধি-নিষেধের সংগে নিজেকে মানিয়ে নিত বা নিতে পারত তা নয়। মহাভারতে আচার্য বেদের গল্প পড়ে তা জানা যায়[১]। ব্রহ্মচর্য যে কি কঠোর ব্রত ছিল তা স্পষ্ট জানা যায় মহাভারতে আচার্য ধৌম্য ও তাঁর শিষ্যদ্বয় আরুণি ও উপমন্যুর গল্প পড়ে[২]।

আশ্রম—প্রাচীনকালে আশ্রমের পরিবেশ কি রকম ছিল তা'র অতি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় কালিদাসের রঘুবংশে[৩]। উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে আশ্রম-জীবন ছিল শান্ত, সরল ও স্নিগ্ধ। সেখানে মহারাজ দিলীপ ও মহারাণী সুদক্ষিণাকেও পর্ণকুটীরে তৃণশয্যায় শয়ন করতে হ'য়েছিল। অতি প্রত্যূষে বেদমন্ত্র গানে যে আশ্রম মুখর হ'য়ে উঠত সে কথাও জানা যায়। কণ্বমুনির আশ্রমে প্রবেশ করতে করতে মহারাজ দুষ্মন্ত বেদধ্বনি ও ব্রহ্মচারী ঋষিদের সামগান শুনতে পেয়েছিলেন[৪]।

---

১ দুঃখাভিজ্ঞো হি গুরুকুলবাসস্য শিষ্যান্ পরিক্লেশেন যোজয়িতুং নেয়েষ। আদি ৩।৮১

২ আদি ৩য় পর্ব

৩ রঘুবংশ ১।৩৫-৯৫

৪ মহাভারত আদিপর্ব ৭০।৩৭-৩৮

ছাত্র সংখ্যা—আচার্যকুলে শিষ্য সংখ্যা সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল বলে মনে হয়না। মহর্ষি বেদব্যাসের চারজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়—সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈল। রঘুবংশে বর্ণিত বশিষ্ঠের আশ্রম ও মহাভারতে বর্ণিত কণ্বের আশ্রমের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে কোন কোন আশ্রমে অনেক অন্তেবাসী বাস ক'রত।

শিক্ষা-পদ্ধতি—ব্রহ্মচারীদের শিক্ষণ কার্য কিভাবে চলত তা'র প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ঋগ্বেদে[১]। সেখানে বলা হয়েছে যে বর্ষা নামলে যেমন ব্যাংগুলি একে অপরকে অনুকরণ ক'রে সমস্বরে চীৎকার করে, তেমনি ছাত্রেরাও গুরুর সঙ্গে একতানে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে সন্তানের শিক্ষার ভার পিতার ওপর ন্যস্ত থাকলেও, ছাত্র পরিবৃত হ'য়ে আচার্যও শিক্ষা দিতেন। মুখে মুখে পাঠ দান ও গ্রহণ চলত। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়েও পাঠ সম্পন্ন হ'ত। না বুঝে মুখস্থ করা খুবই নিন্দনীয় ছিল। নিরুক্তে[২] বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি না বুঝে বেদ মুখস্থ করে সে গাছ ও যষ্ঠির মত ভারবাহীমাত্র; যে তা' বোঝে সে সমস্ত সুখের অধিকারী হয়, ইত্যাদি। দক্ষ বলেছেন[৩] বেদপাঠের জন্য পাঁচটি জিনিষের প্রয়োজন; প্রথমে তা মুখস্থ করতে হবে; তারপর তা'র তাৎপর্য সম্বন্ধে মনন করতে হবে; স্মরণ রাখবার জন্য বারবার তা পড়তে হবে; মনে মনে জপ করতে হবে এবং শিষ্যকে শেখাতে হবে। মনুও[৪] বলেছেন বেদের তাৎপর্য ছাত্রকে ভালভাবে

---

১ যদেষামন্যো অন্যস্য বাচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ সর্বং তদেষাং সমৃধেব পর্ব যত্‌ সুবাচো বদথনাধ্যপ্সু। ঋক্‌ ৭।১০৩।৫

২ নিরুক্ত ১।১৮

৩ বেদস্বীকরণং পূর্বং বিচারোঽভ্যসনং জপঃ। ২।৩৪

৪ মনু ১২।১০৩

বুঝতে হবে। ‘শ্রবণ’, ‘মনন’ ও ‘নিদিধ্যাসন’ এই তিন উপায়েই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হ’ত। আচার্য যা বলেন তা’ শ্রবণ করা হচ্ছে ‘শ্রবণ’; কোন একটা বিশেষ তত্ত্ব সম্বন্ধে ন্যায়শাস্ত্র-বিহিত পদ্ধতিতে গভীরভাবে চিন্তা করাকে বলা হ’ত ‘মনন’ এবং ‘নিদিধ্যাসনে’র অর্থ হচ্ছে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা।

বেদ থেকেই সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং বেদের মত সুবৃহৎ গ্রন্থকে শুধু শুনে আয়ত্ত করা এক অকল্পনীয় মেধা, স্মৃতিশক্তি ও মনযোগের সাধনা। পরবর্তীকালে পাঠ্য বিষয় নানা শাখায় বিভক্ত হওয়ার ফলে, বেদের কোন বিশেষ শাখা বা অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করাই যথেষ্ট ছিল। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে শিক্ষা-পদ্ধতিতে বুদ্ধি প্রক্রিয়ার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল। আর্য জীবনে মেধার গুরুত্ব যে কত ছিল তা বোঝা যায় তাদের ‘মেধাজনন’ অনুষ্ঠান লক্ষ্য করলে। জন্মের পরেই এবং উপনয়নের সময় এই অনুষ্ঠান করা হ’ত; উদ্দেশ্য ছিল শিশু ও ব্রহ্মচারীর মধ্যে মেধা উৎপাদন করা। আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। নিয়ম ছিল যে, কোন ছাত্র যদি কোন কারণে অনুপস্থিত থাকে তাহলে পাঠের যে বিষয়টি বা অংশটি সকলে একত্রে পাঠ করছিল, সেটি যতক্ষণ না অনুপস্থিত ছাত্রটি ফিরে আসে, ততক্ষণ আর পাঠ করা হবেনা[১]।

‘সংবাদাভিজয়’ অনুষ্ঠান হ’তে প্রমাণ হয় যে নানারকম সাহিত্যিক বিতর্ক সভা হ’ত। বিতর্কগুলি খুবই প্রতিযোগিতামূলক হ’ত এবং সেগুলি অনুষ্ঠিত হ’ত জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে।

শিক্ষাদান বা গ্রহণ কোথায় করা উচিত সে সম্বন্ধে যা নিয়ম প্রচলিত ছিল তা আলোচনা করলে মনে হয় যে একেবারে উন্মুক্ত স্থানে শিক্ষাকার্য সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ ছিল। সম্ভবত পাঠে

---

১ আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।৩।১১।১১, গৌতম ১৬।৩৩

মনযোগের নানারকম বিঘ্ন ঘটত বলেই উন্মুক্ত স্থানে পাঠকার্য করায় বাধা ছিল।

অনধ্যায়—অনধ্যায় বা ছুটির প্রথা ছিল। অনধ্যায়ের দিনে সব রকম শিক্ষাকার্য বন্ধ থাকত। কোন্ কোন্ তিথিতে অনধ্যায় পালন করতে হবে সে সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রকারেরা নানা বিধান দিয়েছেন[১]। অনধ্যায় অল্পক্ষণের জন্যও হ'ত আবার কয়েকদিন ধরে চলত। অনধ্যায়ের দু'একটি কারণ উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ কোন অতিথির আগমন, গুরু বা রাজা বা কোন সহপাঠীর মৃত্যু, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ প্রভৃতি কারণে অনধ্যায় পালন করা হ'ত। যে সমস্ত তিথিতে নিয়মিতভাবে পাঠ বন্ধ থাকত সেগুলিকে বলা হ'ত 'নিত্য' অনধ্যায়, আর যখন বিশেষ কারণে পাঠ বন্ধ থাকত তাকে বলা হ'ত 'নৈমিত্তিক অনধ্যায়'।

শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে সাধারণত আশ্রমের শিক্ষাকার্যকাল শুরু হ'ত। শুরু হবার আগে 'উপাকরণ' অনুষ্ঠান করা হ'ত। শুরু হবার পর সাড়ে চার বা সাড়ে পাঁচ বা ছ'মাস শিক্ষাকার্য চলত। তারপর সাধারণত মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে 'উৎসর্গ' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম শিক্ষাকার্যকাল সমাপ্ত হ'ত।

ভ্রাম্যমাণ আচার্য ও একাধিক গুরুকরণ—প্রাচীনকালে ভ্রাম্যমাণ আচার্যের উল্লেখও পাওয়া যায়। কৌশিতকী উপনিষদে[২] আছে যে, বালাকের পুত্র গার্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে যশোলাভের জন্য মৎস্য, কুরু, পঞ্চাল, কাশী, বিদেহ প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, এবং কাশীর অধিপতি অজাতশত্রুর কাছে উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও[৩] আছে যে অধ্যয়নের জন্য ব্রাহ্মণরা দেশ পর্যটন করতেন। শিষ্যেরাও যে সব সময় এক গুরুর কাছে

১ মনু ৬।১১৩-১১৪, যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৪৬, বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১।১১।৪২-৪৩ ইত্যাদি।

২ কৌশিতকী উপনিষদ্ ৪।১ ৩ বৃহ উপনিষদ্ ৩।৩।১

থাকতেন এমন নয়। গুরুর কোন দোষ ঘট্‌লে শিষ্যরা তাঁকে পরিত্যাগ করত। তাছাড়াও নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করবার জন্য জ্ঞানপিপাসু ছাত্রেরা বিখ্যাত আচার্যদের কাছে এসে উপস্থিত হ'ত[১]। যে সব ছাত্রের আবার অভ্যাস ছিল গুরুবদল করা তাদের বলা হ'ত 'তীর্থকাক'।

শাস্তিদান প্রথা—প্রাচীন ভারতে অপরাধের জন্য শিষ্যকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা ছিল। ধর্মশাস্ত্রকারেরা একবাক্যে অপরাধের জন্য শিষ্যকে শুধু ভৎর্সনা নয় শারীরিক শাস্তি দেবার বিধান দিয়েছেন। মারার জন্য বেত অথবা সরু ছড়ি ব্যবহার করার বিধি ছিল। তবে শারীরিক শাস্তি সম্বন্ধে মনু বলেছেন যে, মধুর বাক্য দ্বারাই[২] শাসন করা উচিত। যদি শারীরিক শাস্তি দিতে হয় তা'হলে আঘাত পিঠেই করা উচিত মাথায় নয়[৩] (নোওমাঙ্গে)। শাস্তি দেওয়া উচিত শিষ্যকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত ও তার চরিত্র শোধন করার জন্য। দৃষ্টি রাখা উচিত শিষ্যের কল্যাণ ও উন্নতি যাতে হয় সেই দিকে। মহাভারতও[৪] এবিষয়ে ধর্মশাস্ত্রকারদের সঙ্গে একমত।

পঙ্গুদের শিক্ষা—হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বোবা, কালা, অন্ধ, অঙ্গহীন, একেবারে বুদ্ধিহীন (idiot) প্রভৃতিদের শিক্ষার জন্য নানা বিধান দিয়েছেন। এই সমস্ত হতভাগ্যদের জন্য উপনয়নের ব্যবস্থা ছিল ; তবে তাদের উপনয়ন বিধি সাধারণ নিয়ম থেকে ভিন্ন ছিল। এদের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হওয়াই উচিত এই বিধানই পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর ব্যাভিচারজাত জারজ সন্তানদেরও সম্ভবত পঙ্গুদের মত উপনয়নের ব্যবস্থা ছিল। তবে এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদ আছে।

পড়ুয়া-শিক্ষক প্রথা—আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীনকালে 'সমাদিষ্ট' বা পড়ুয়া-শিক্ষক (pupil-teacher)

---

১ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১।৪ ২ "বাক্‌চৈবমধুরা শ্লক্ষ্ণা" মনু ২।১৫৯
৩ মনু ৮।২৯৯-৩০০ ৪ মহাভারত অনুশাসন পর্ব ১০৪।৩৭

প্রথা প্রচলিত ছিল[১]। পড়ুয়া-শিক্ষক আচার্যের আদেশেই ছাত্রদের অধ্যাপনা করেন সুতরাং ছাত্ররা তাঁকে আচার্যের মতই সম্মান করবে, এই নিয়ম ছিল।

শারীরিক শিক্ষা—প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে শারীরিক ব্যায়াম বা ব্যায়াম শিক্ষার বিশেষ কোন স্থান ছিল না, যদিও উপনয়ন অনুষ্ঠানের সময় শক্তি ও বীর্য লাভের জন্য ইন্দ্র ও অগ্নির কাছে প্রার্থনা করা হ'ত[২]। তবে সেই প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মচারীকে যেভাবে জীবন যাপন করতে হ'ত, এবং যে সমস্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে হ'ত, তারপর আর বিশেষভাবে শরীর চর্চা বা অঙ্গচালনা করবার প্রয়োজন হ'ত না। প্রথম কথা, ব্রহ্মচারী বাস ক'রত সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে, তা'ছাড়াও তাকে প্রত্যহ ভিক্ষার্জনে এবং সমিধ সংগ্রহ করতে বনে বেরোতে হ'ত। প্রাত্যহিক জীবনে তাকে যে প্রক্রিয়াগুলি ক'রতে হ'ত তাতে যথেষ্ট ব্যায়াম হ'ত বলে মনে হয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক প্রক্রিয়া ছিল সন্ধ্যাবন্দনার সময় প্রাণায়াম করা। প্রাণায়াম যে সমগ্রভাবে শরীরকে সবল করে তোলে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

সমাবর্তন—উপনয়নের মত 'স্নান' বা 'সমাবর্তন' প্রাচীন হিন্দুর জীবনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হিসাবে পালন করা হ'ত। উপনয়নের মধ্য দিয়ে কিশোর বালক যে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করত সেই ব্রতের উদ্‌যাপন ঘোষিত হ'ত সমাবর্তনের মধ্য দিয়ে। স্নান (আপ্লবন) বা সমাবর্তন হ'ল বেদবিদ্যালাভ করবার পর আনুষ্ঠানিক স্নান এবং গুরুকুল থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন। মনু বলেছেন[৩] যে

---

১ "তথা সমাদিষ্টেধ্যাপয়তি"। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র। ১।২।৭।২৮

সমাদিষ্টমধ্যাপয়ন্তং যাবদধ্যয়নমুপসংগৃহ্নীয়াত। নিত্যমর্হন্তমিত্যেকে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।৪।১৩।১৩-১৪

২ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১।২১।৪

৩ গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥ মনু ৩।৪

গুরুর অনুমতি পেলে ব্রহ্মচারী বিধানানুসারে ব্রতাঙ্গ স্নান সমাপন করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং সুলক্ষণযুক্ত সবর্ণের স্ত্রী বিবাহ করতে পারে। স্নান ও সমাবর্তন এই দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কিনা, সে বিষয়ে শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। বর্তমান নিবন্ধে সেই মতভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করবার প্রয়োজন নাই।

বেদাধ্যায়ন শেষ হবার পর বা ব্রহ্মচর্যব্রত সমাপ্ত হবার পর গুরুর অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মচারী আনুষ্ঠানিক স্নান সমাপন করবে এই ছিল বিধান। যে স্নান করেছে তাকে বলা হ'ত 'স্নাতক'। স্নাতক তিন রকমের—'বিদ্যাস্নাতক' অর্থাৎ যে বেদাধ্যায়ন সমাপ্ত করেছে কিন্তু সমস্ত ব্রত (ব্রহ্মচর্য) পালন করেনি; 'ব্রতস্নাতক' অর্থাৎ যে সমস্ত ব্রত পালন করেছে কিন্তু বেদাধ্যায়ন শেষ করেনি, এবং 'বিদ্যাব্রতস্নাতক' অর্থাৎ যে বেদাধ্যয়ন শেষ করেছে এবং সমস্ত ব্রত পালন করেছে। স্নাতকের এই শ্রেণীবিভাগ দেখে বোঝা যায় যে, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মচারী মাত্রেই যে বেদাধ্যায়ন শেষ করতে বা সমস্ত ব্রত পালন করতে পারত তা নয়। আনুষ্ঠানিক স্নান সমাপ্ত করবার পর থেকে বিবাহ করবার পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মচারীকে স্নাতক বলা হ'ত, বিবাহের পর সে গৃহস্থ হিসাবে পরিগণিত হ'ত। স্নাতক অবস্থা হয়ত অনেক সময় দীর্ঘ হ'ত। সমাবর্তন অনুষ্ঠান খুবই আড়ম্বরপূর্ণ ছিল, এবং স্নাতকের নানারকম আচার পালন করারও বিধান ছিল। মনে রাখা প্রয়োজন যে সমাবর্তনের পর স্বাধ্যায় বা সাধারণ ধর্ম পালন করা কোনটাই বন্ধ হ'ত না; সে কাজ জীবনের সমস্ত অবস্থাতেই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলত।

বৃত্তিশিক্ষা—আগেই বলা হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তা গুণ এবং কর্ম অনুসারে চারবর্ণের সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর ক্রমশ কর্ম ও বৃত্তি অনুসারে সমাজে শ্রমবিভাগ ব্যাপক হয়ে ওঠে অর্থাৎ বহু সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই সব বিভিন্ন বৃত্তিধারী শ্রেণীগুলির বিভিন্ন সামাজিক মর্যাদা ছিল এবং আপন আপন বৃত্তি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করবার জন্য নানারকম নিয়ম ও উপায় সৃষ্টি হয়েছিল।

পারিবারিক শিক্ষা ছাড়া বিশেষজ্ঞের কাছে শিক্ষানবীসি করার ব্যবস্থাও ছিল। শিক্ষানবীসকে থাকতে হ'ত তার গুরুর গৃহে। পূর্বেই গুরুর সঙ্গে গুরুগৃহবাসের কাল সম্বন্ধে একটা চুক্তি হ'ত। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যদি তার বিষয়টি শেখা সমাপ্ত হ'ত তাহলেও তাকে অঙ্গীকৃত কাল শিক্ষকের কাছেই থাকতে হ'ত। যদি না থাকত তাহলে সে কঠিন শাস্তি পেত। শিক্ষকই তার ভরণপোষণ করত। আয়ুর্বেদও একটি শিল্প হিসাবে পরিগণিত হ'ত এবং গুরুর কাছ থেকে সেই বিজ্ঞান শিখতে হ'ত[১]।

বর্ণনির্বিশেষে শিক্ষাগ্রহণ—ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারোর কাছ থেকে বেদাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা নেওয়া যায় কিনা এই প্রশ্নের জবাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে ওই রকম কাজ স্বভাবের বিপরীত সুতরাং নিষিদ্ধ[২]। তবে মনু বলেছেন যে উত্তম চণ্ডালদের কাছ থেকেও ধর্ম শিক্ষা করা উচিত[৩]। মহাভারতেও আছে যে হীন বর্ণ থেকে জ্ঞান আহরণ করা উচিত[৪]। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে যে ব্রাহ্মণ আরুণি ও তাহার পুত্র শ্বেতকেতু রাজা প্রবাহণ জৈবলির কাছে জ্ঞানার্জনের জন্য উপস্থিত হ'য়েছিলেন[৫]। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে মানুষকে সাধারণ শিক্ষা দেবার দায়িত্ব ছিল ব্রাহ্মণের, কিন্তু উপযুক্ত অব্রাহ্মণের কাছ থেকেও শিক্ষালাভ করার নিয়মও প্রচলিত ছিল।

---

১ মিতাক্ষরা, যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৮৪

২ "স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতৎ, যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ 'ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি'" বৃহ ২।১।১৫

৩ শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। মনু ২।২৩৮

৪ শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যাং হীনাদপি সমাপ্নুয়াৎ। মহাভারত শান্তিপর্ব ১৬৫।৩১, ৩১৮।৮৮

৫ বৃহ ৬।২।১-৭

স্ত্রীশিক্ষা—প্রাচীন ভারতে পুরুষের মতই নারীর শিক্ষালাভের অধিকার স্বীকৃত হয়ে ছিল। তবে একথা সত্য যে তা'রা পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা সব সময় পেত না। আর সমাজে তা'দের মর্যাদা বা অধিকার পুরুষের সমান মোটেই ছিল না। যদিও বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি পণ্ডিতা কন্যা লাভ করতে ইচ্ছা করেন তা'হলে তাঁকে একটা বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে[১], তবুও দেখা যায় যে ঋগ্বেদের সময় থেকেই স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে নানা অকরুণ মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে স্ত্রীলোকের সহিত বন্ধুত্ব করা মিথ্যা, তাদের হৃদয় নেকড়ে বাঘের মত[২]। আর এক স্থানে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রও বলেছেন নারীর মনে সংযম নেই, তার বুদ্ধি বা মানসিক শক্তি অতি অল্প[৩]। অর্থাৎ "Frailty, thy name is woman." শতপথ ব্রাহ্মণ, মহাভারত এবং ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নারী সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে, তা পড়লে বোঝা যায় যে নারীকে সমাজে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হ'ত না। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বিবাহ ছাড়া স্ত্রীলোকের কোন সংস্কারেই বেদমন্ত্র পাঠ করা চলবে না[৪]। জৈমিনী একটি সূত্রে বলেছেন যে, স্বামী স্ত্রী সমান নয়[৫]। শবর ওই সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে পুরুষ ও স্ত্রী সমান নয়; পুরুষ বিদ্যা, স্ত্রী অবিদ্যা[৬]।

এত প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও যে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় নারী বেদমন্ত্র ও নানা বিদ্যা শিক্ষা করেছে এবং বিদুষী হিসাবে

---

১ 'অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত' ইত্যাদি বৃহ ৬।৪।১৭

২ 'ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা,' ঋক্ ১০।৯৫।১৫

৩ 'ইন্দ্রশ্চিদ্ ঘা তদব্রবীত স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ উতো অহ ক্রতুং রঘুম্'। ঋক্ ৮।৩৩।১৭

৪ মনু ২।৬৬, যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৩ ৫ জৈমিনী ৬।১।২৪

৬ অতুল্যা হিস্ত্রীপুংসা! যজমান পুমান্ বিদ্বাংশ্চ পত্নী স্ত্রী চাবিদ্যা চ।

খ্যাতি লাভ করেছে সে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ঋগ্বেদে আছে যে স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করছে এবং এক সঙ্গে মন্ত্র আবৃত্তি করছে। বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা করেছিলেন। মৈত্রেয়ী এবং গার্গীর দার্শনিক পাণ্ডিত্য সর্বজন বিদিত। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায় যে, বহু ঋষি শিক্ষকের মধ্যে গার্গী বাচকনবী, বড়বা প্রাতিথেয়ী এবং সুলভা মৈত্রেয়ী এই তিনজন নারীও ছিলেন এবং এঁদের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ জল দান করা হ'ত[১]। নারী শিক্ষিকা যে প্রাচীনকালে ছিলেন তাঁর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পাণিনি সূত্র থেকে[২]। আচার্যা বা উপাধ্যায়া বলতে শুধু যে আচার্য বা উপাধ্যায়ের স্ত্রীকে বোঝাত তা নয়, নারী শিক্ষিকাকেও বোঝাত। পতঞ্জলি বলেছেন যে উপাধ্যায়ানী অর্থে উপাধ্যায়ের স্ত্রীকে বোঝায় এবং উপাধ্যায়ী বলতে যিনি নিজে শিক্ষা দেন এমন শিক্ষিকাকে বোঝায়। পতঞ্জলি আরও বলেছেন যে, যে ব্রাহ্মণী আপিশলির ব্যাকরণ পাঠ করে তাকে বলা হয় আপিশলা এবং যে কাশকৃৎস্নের মীমাংসা শাস্ত্র পড়ে তাকে বলা হয় কাশকৃৎস্না। ঔদমেঘ্যা নামে এক আচার্যার শিষ্যদের বলা হ'ত ঔদমেঘা এ কথাও তিনি বলেন। মহাভারতে পাওয়া যায় যে শিবা নামে এক নারী বেদপারগা ছিলেন। আচার্য বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী স্বামীর সমানশীলা ও পরম বিদুষী ছিলেন। সুলভা নামে আর এক নারী রাজা জনককে যোগ, সমাধি এবং মোক্ষ সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে দেখা যায় যে শকুন্তলা লিখতে জানতেন। মেঘদূতের নায়িকাও কবিতা রচনা করেছিলেন। রাজশেখর তাঁ'র কাব্য মীমাংসায় শীলভট্টারিকা ও বিকলনিতম্বার কবিতা এবং বিজয়াঙ্কা, বিজ্জিকা, পদ্মাবতী প্রভৃতির পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে গৃহিণীর প্রত্যহ পরিবারের আয়

১ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৩।৪।৪

২ পাণিনি ৪।১।৫৯ ও ৩।৩।২১ (কাশিকা)

ব্যয়ের হিসাব রাখা উচিত[১]। বাৎসায়ন তাঁর কামসূত্রে বলেছেন যে মেয়েদের পিতৃগৃহে ৬৪টি বিদ্যা (কলা) শেখা প্রয়োজন। নৃত্য, গীত, নাটক, কবিতা রচনা, ভাষা, পাশাখেলা, প্রহেলিকা (ধাঁধাঁ), ক্রীড়া প্রভৃতি সেই তালিকার অন্তর্গত। বাৎসায়নের মতে মেয়েদের শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ওঠে মেয়েদের উপনয়ন হ'ত কিনা বা তাদের যজ্ঞোপবীত ধারণ করবার নিয়ম ছিল কিনা। স্মৃতিচন্দ্রিকা এবং সংস্কার প্রকাশ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে দুই রকমের স্ত্রীলোক আছে— 'ব্রহ্মবাদিনী' এবং 'সদ্যবধূ'। ব্রহ্মবাদিনীদের পিতৃগৃহে উপনয়ন হ'ত। সেখানেই তাদের বেদপাঠ, ভিক্ষা, অগ্নিসংস্কার করতে হ'ত। সদ্যবধূ হচ্ছে তারা যাদের বিয়ের বয়স হলেই বিয়ে হয়ে যেত; তবে বিয়ের আগে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে উপনয়ন সংস্কার সেরে নেওয়া হ'ত। ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় যে পূর্বকালে মেয়েদের উপবীত ধারণ করতে হ'ত[২]। বাণভট্টের কাদম্বরীতে আছে যে ব্রহ্মসূত্র (যজ্ঞোপবীত) ধারণ করে মহাশ্বেতার দেহ পবিত্র হ'য়ে ছিল। মেয়েদের সমাবর্তনের কথাও ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে বয়ঃসন্ধির পূর্বেই তা সম্পন্ন করতে হ'ত। ক্রমশ মেয়েদের উপনয়ন বিধি অপ্রচলিত হ'য়ে যায়।

সহশিক্ষা (Co-education) সম্ভবত প্রচলিত ছিল না— অতি প্রাচীন কালেও না। তবে ভবভূতি তাঁর মালতী মাধব নাটকে এমন এক সমাজের কল্পনা করে ছিলেন যেখানে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে গুরুর পদতলে বসে শিক্ষালাভ করেছিল। যে সময় স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল সে সময় স্ত্রী-পুরুষ একত্রে শিক্ষালাভ করবে এটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

১ মনু ৫।১৫০, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৮৩

২ 'পুরাকল্পে কুমারীনাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে। অধ্যাপনংচ বেদানাং সাবিত্রীবাচনং তথা। পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েত্ পরঃ। স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্যা বিধীয়তে। বর্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেব চ'। সংস্কার প্রকাশ ৪০২-৪০৩ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন ভারতে রাজা এবং সমাজের ধনী ব্যক্তিরা শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে উদার হস্তে দান করতেন। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা ছিল সমাজের পোষ্য। তাদের ভরণ-পোষণ এবং নানাভাবে সম্মানিত করবার দায়িত্ব ছিল সমাজের। রাজশেখরের কাব্য মীমাংসায় বলা হয়েছে যে রাজার কর্তব্য কবি ও পণ্ডিতদের সভা আহ্বান করে তাঁদের পরীক্ষা করা এবং তাঁদের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া, যেমন করতেন পুরাকালের রাজারা। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে—উজ্জয়িনীতে কালিদাস, মেণ্ঠ, ভারবী, হরিচন্দ্র প্রভৃতি কবির পরীক্ষা হ'য়ে ছিল এবং পাটলীপুত্রতে পাণিনি, বররুচি, পতঞ্জলি, বর্ষ, পিঙ্গল প্রভৃতি শাস্ত্রকারদের পরীক্ষা হ'য়ে ছিল।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার উদ্দেশ্য চারটি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে—(ক) চরিত্র গঠন, (খ) ব্যক্তিত্বের উন্মেষসাধন, (গ) সামাজিক কর্মকুশলতা, (ঘ) সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ।

এই উদ্দেশ্যগুলো আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে এমন হুবহু মিলে যায় যে ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয়। একথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষার পরিবেশ উদ্দেশ্যগুলো সিদ্ধ হবার অনুকূল ছিল কিন্তু আজ বোধ হয় বহু অর্থ ব্যয় ব্যতীত সে পরিবেশ, সে অনুকূল অবস্থা শিক্ষার্থীর জোটা একরকম অসম্ভব। সেদিনের ছাত্র আজকের ছাত্রের চাইতে গৌরব বহন ক'রত অনেক বেশী, কারণ সে ছিল স্রষ্টা, নোতুন মানের, নোতুন আদর্শের, পুরনো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিল রেখে। আজকের ছাত্র হচ্ছে ভারবাহী শিক্ষার বলদ।

এখন ভেবে দেখা দরকার প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার কোন কোন জিনিষ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গ্রহণ কর্তে পারি। তপোবনের শান্ত পরিবেশ ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা হয় না রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব ভাষায় সে কথা প্রকাশ করেছেন, এবং তাঁর শান্তিনিকেতনে তা

বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। বিদ্যায়তন হবে বৃক্ষ-গুল্ম পরিবৃত আশ্রম, প্রকৃতির নগ্ন বুকে ; তা'হলেই আসবে সজীবতা, ভাবুকতা, উদ্ভাবনী শক্তি। মানুষ প্রাণরস টেনে নেবে প্রকৃতির বুক থেকে, বহু শিক্ষা পাবে গাছ, লতাপাতা, নদী, আকাশ বাতাস হ'তে।

একথা আজ সবাই মেনে নিয়েছে যে সহরের মাঝখানে শুধু ইট-কাঠের বাড়ীতে শিক্ষা মানে একটা মস্ত বড় পরিহাস বা রঙ্গ, তাই প্রকৃত শিক্ষার আলয়গুলো হচ্ছে সহরের বাইরে বৃক্ষরাজি পরিবৃত সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে—প্রকৃতির নগ্ন বুকে। ইংলণ্ডের ও আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত 'পাব্লিক স্কুল'গুলো এরকম পরিবেশেই অবস্থিত। আমাদের দেশেও যে কয়টি ভাল স্কুল আছে সবই প্রকৃতির স্পর্শে প্রাণবন্ত, সজীব।

চরিত্র বা মানুষ গঠনের জন্য আবাসিক শিক্ষার মত শিক্ষা কোথাও মিলে না। তাই ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলগুলোতে দেখতে পাই 'গৃহ প্রথা' বা House System. হাউস মাষ্টার ও তাঁহার পত্নী অধিকার করেছেন পুরনো দিনের গুরু ও গুরুপত্নীর স্থান ; তাঁদের দরদী দৃষ্টি ছেলেদের জীবনকে করে তোলে মধুময়, নানাকাজের ভেতর দিয়ে বাড়ে তা'দের কর্মকুশলতা, এক সঙ্গে বাস করে তারা শেখে সমবায় নীতি, সহযোগিতা ও সংহতি। তবে আগের দিনের আবাসিক প্রথা যেখানে গুরুগৃহে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র থাকতো আর আজকের দিনের আবাসিক প্রথা যেখানে ৬০।৭০টি ছাত্র থাকে একজন গুরুর বা হাউস মাষ্টারের তত্ত্বাবধানে—এ দু'য়ে অনেক তফাৎ। ভাল'র দিকটা যে প্রাচীন ব্যবস্থার মধ্যেই বেশী ঝুঁকে আছে সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। আমরাও আজ চাচ্ছি আবাসিক প্রথার প্রবর্তন করতে স্কুল-কলেজে কিন্তু অর্থের অভাবে তা হ'য়ে উঠছে না।

ব্রহ্মচর্য, সংযম, ধর্মভাব, জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে আস্থা সবই আজ আমাদের শিক্ষা থেকে অন্তর্হিত হয়েছে—খানিকটা

বিদেশী শাসনের ফলে খানিকটা আমাদের নিজ চরিত্রের শৈথিল্যে বা দৃঢ়তার অভাবে, খানিকটা পিতামাতা বা শিক্ষকের অবিবেচনায় বা শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণার অভাবে। ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করতে হোলে পুরনো দিনের সংযম, সাধনা ও ধর্মভাবকে আমাদের জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে, প্রত্যেকটি বিদ্যায়তনকে করতে হবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক একটি কেন্দ্র। তবেই আবার ফিরে আসবে ভারতের লুপ্ত গৌরব। কিছু চেষ্টা যে না হয়েছে এদিকে তা নয়। পাঞ্জাবের 'গুরুকুলে', রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে, রাঁচীর ব্রহ্মচর্য আশ্রমে, গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষায়, রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যায়তনগুলোতে ব্রহ্মচর্য, সামাজিক কর্ম-কুশলতা, ধর্মভাব ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থা ইত্যাদিকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিক শিক্ষা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করতে পারলে দেশ সত্যিকারের উন্নত হবে। জীবনের নানাক্ষেত্রে আজ দুর্নীতি যে তার উদ্ধত মস্তক তুলে ধর্মকে অবমাননা করছে সে কলঙ্ক মুছে যাবে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার আরেকটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধ। পিতার স্নেহে শিষ্যকে পালন করতেন গুরু, শিষ্যও গুরুকে রাখতেন পিতারই মত হৃদয়ের উচ্চ আসনে শ্রদ্ধায়, সম্মানে ও সম্ভ্রমে—বিদ্যাশেষে দিয়ে যেতেন গুরুদক্ষিণা যার যা সাধ্য তাই দিয়ে। আরুণি-উদ্দালক ও একলব্যের কাহিনী আমরা জানি। গুরুর প্রতি গভীর আস্থা ও ভক্তি ছিল বলেই সেদিনের ছাত্র বিদ্যাও আয়ত্ত করতে পারত সম্পূর্ণরূপে। কিন্তু আজ গুরু-ছাত্রের সে স্নেহমধুর ভাব নেই; ছাত্রের প্রতি সে প্রগাঢ় অনুরাগ নেই; গুরুর প্রতি সে সম্মান নেই। ফলে আমাদের শিক্ষাও থেকে যায় অসম্পূর্ণ—অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায় প্রহসন। একটি জিনিষ, অনেকের মতে

আধুনিক শিক্ষকের প্রতিকূলতা খানিকটা করে আসছে। প্রাচীন ভারতে গুরু নিজব্যয়ে ছাত্রকে গৃহে রাখতেন, কিন্তু আজকের ব্যবস্থা একেবারে উল্টো—ছাত্রকেই রাখতে হয় গুরুকে বেতন দিয়ে। কিন্তু ছাত্র বেতন দিয়ে পড়ে বলেই গুরুকে ভক্তি করেনা একথা একেবারেই অমূলক। খুব নগণ্য সংখ্যক ছাত্রের মনেই একথা উঁকি মারে যে গুরু বা শিক্ষক তা'দের বেতনভুক্।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত প্রয়োজন, অনুরক্তি ও আসক্তির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা হ'ত সত্যি, কিন্তু জোরটা বেশী দেওয়া হ'ত সামাজিকতার ওপর, সমাজের কল্যাণের ওপর। প্রাচীন ভারতে সমাজের স্থৈর্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল বলেই বহু বিদেশীর আগমন বা আক্রমণে ভারতের ঐতিহ্যের কাঠামো আজও বদলায়নি ; বিদেশীকেই হয়ে যেতে হয়েছে লীন ভারতীয় সংস্কৃতির উদার আবেষ্টনীতে, বর্দ্ধিত হয়েছে নানাধর্ম, নানাভাবকে নিজের ভেতরে গ্রহণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করবার ক্ষমতা। আধুনিক পাশ্চাত্যে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত অধিকারের ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছিল, বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে, কিন্তু তাতে লুপ্ত হ'তে বসেছিল, সমাজের ঐক্য ও সংহতি ; তাই আবার দেখতে পাই আজকের মার্কিন ও ইংরাজ শিক্ষাবিদ্ জোর দিচ্ছেন সামাজিকতার ওপর ; ব্যক্তি যে সমাজেরই অঙ্গ, তার বৃদ্ধিতেই যে সমাজের বৃদ্ধি সেই চির সত্যের ওপর। জন ডিউয়ির (John Dewey) মতে প্রত্যেকটি বিদ্যায়তন এক একটি ছোট্ট সমাজ যেখানে শিশু শিখবে তা'র ছোট্ট সমাজের প্রতি কর্তব্য, জাগবে তার সমাজবোধ, সৃষ্টি হবে একসঙ্গে কাজ করবার ক্ষমতা, কর্মকুশলতা[১]। পার্সি নান[২] (Percy Nunn) ব্যক্তিত্বকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করে তোলা হবে

১ John Dewey—The School and Society.

২ Percy Nunn—Education ; its data & first Principles.

যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের বহুমুখী সংস্কৃতিতে তার যা দেয় তা দান করে যেতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্যও আজ তার ভুল বুঝতে পেরেছে—ব্যক্তিত্ব ও সমাজবোধের মধ্যে একটা সমতা স্থাপন করতে চেষ্টা করছে, ব্যক্তিত্বসর্বস্ব শিক্ষাকে করে তুলছে সমাজমুখী। ভারতের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় না আছে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ, না আছে সমাজবোধকে জাগ্রত করবার প্রচেষ্টা। ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজ হয়ে উঠেছে স্বার্থলিপ্ত উদার দৃষ্টিবিহীন পরহিতবোধশূন্য। দৈনন্দিন জীবনের তাড়াহুড়োয় প্রাচীন ভারতের কথা কি একবারও আমাদের মনে পড়ে না ?

বৌদ্ধ শিক্ষা

হিন্দুঋষিদের মত বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ মনীষীদের কাছে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে সত্য প্রতিভাত হয়েছিল, সেই সত্যের আলোকে তাঁরা এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবেদ উদ্ভাবন করেন। সেই জীবনবেদকে ভিত্তি করে তাঁরাও রচনা করেন মানুষের জীবন যাত্রার উপায় এবং উপেয় সম্বন্ধে এক পরিকল্পনা। বৌদ্ধ শিক্ষার তত্ত্ব ও নীতি সেই জীবন পরিকল্পনা থেকে স্বাভাবিক ভাবে প্রসূত হয়ে, তাকেই আবার করেছে পুষ্ট এবং সমৃদ্ধ। সুতরাং বৌদ্ধ শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রথমেই প্রয়োজন জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কি সত্য বুদ্ধ উপলব্ধি করেছিলেন সে বিষয়ে একটা সাধারণ ধারণা থাকার।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির আগে বুদ্ধ দেখেছিলেন মানুষের জীবন কত দুঃখময়! মানুষ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, তারপর ক্রমশ

ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে হ'তে একদিন অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয় এবং আবার জন্মগ্রহণ করে। মানুষ জানেনা এ জন্ম, এ ক্ষয়, এ মৃত্যু, এ দুঃখ কেন ঘটে, বা কিভাবে তাদের কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। জগতের এই দুঃখের কারণ, এবং সে দুঃখের কবল থেকে পরিত্রাণের উপায় অনুসন্ধান করবার জন্যই তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তারপর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর সাধনা করবার পর তাঁ'র কাছে উদঘাটিত হয় বিশ্ব-সৃষ্টি ও জীবন রহস্য ; তিনি বুঝতে পারেন মানুষের দুঃখের কারণ কি, খুঁজে পান সেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় ; তিনি বোধি বা পরম জ্ঞান লাভ করেন, এবং বুদ্ধ হন।

সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধ বললেন--'সর্বম্ অনিত্যম্, সর্বম্ শূন্যম্' ; তাঁর কাছে প্রতিভাত হয় যে, এই জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। এখানে কোনো বস্তুই স্থির বা চিরস্থায়ী নয়। ব্রহ্ম, আত্মা প্রভৃতি কোনো কিছুর অস্তিত্বই বুদ্ধ স্বীকার করেননি ; এবং মানুষের এই সব ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক সেই কথাই তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। মিথ্যা বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে মানুষ নিয়ত পরিবর্তনশীল বস্তু বা বিষয়কে স্থির বা অবিনাশী গণ্য করে মিথ্যা জগতের রচনা করছে, মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করছে, এবং সেই মিথ্যাচারের জন্যই অশেষ দুঃখ ভোগ করছে।

সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে তাঁর এই মূল সিদ্ধান্তটিকে তিনি চারটি মহাসত্য (আর্যসত্য) হিসাবে বিবৃত করেন। চারটি সত্য হচ্ছে :

১। এ সংসার সমস্ত দুঃখের আধার ;

২। সে দুঃখোৎপত্তির কারণ আছে ;

৩। সে দুঃখের অবসান ঘটান সম্ভব ;

৪। অবসান ঘটানর একটা নির্দিষ্ট উপায় বা পথ আছে।

এই চারটি মহাসত্য সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতাই (অবিদ্যা) তা'র সমস্ত দুঃখের কারণ। কেননা এই অবিদ্যা কতকগুলি কারণ-কার্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে জড়জীবনের প্রতি মানুষের মনে এক দুরন্ত তৃষ্ণার সৃষ্টি করে, যার ফলে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্মের ফলেই

হয় জন্ম, এবং জন্ম হলেই ঘটে জরামরণ দুঃখ। তা'হলে, যদি জন্মকে নিরোধ করা যায় তাহলেই ঘটবে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি, হবে সমস্ত মুশ্‌কিলের আসান। আর মন থেকে যদি অবিদ্যার কুয়াশা কেটে যায় তাহলে আর জন্ম ঘটবে না, লাভ হবে চিরমুক্তি বা নির্বাণ।

বুদ্ধের এই দুঃখবাদ বৌদ্ধ শিক্ষাধারাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে সেটা এখন বোঝা দরকার।

হিন্দু শিক্ষা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, দুঃখবাদ প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার একটি মূল সুর। বৌদ্ধ চিন্তার মধ্যেও তা' ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় যে হিন্দু জীবন-দর্শনে সাধারণভাবে দুঃখবাদ ও মঙ্গলবাদের মধ্যে এক সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। হিন্দু ঋষিরা বলেছেন যে জীবন-ধারণের জন্য সমস্ত প্রাণীকে যেমন বাতাসের ওপর নির্ভর করতে হয়, তেমনি গৃহস্থাশ্রমকে অবলম্বন করেই অন্য আশ্রমগুলির অস্তিত্ব রক্ষা হতে পারে। গৃহস্থাশ্রমের এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাই তাঁরা গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে ঘোষণা করেছেন। আর একটা কথা। বেদ থেকে আরম্ভ করে, হিন্দু শাস্ত্রগুলির মধ্য দিয়ে প্রাচীন হিন্দুর সন্তান কামনা নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সন্তান উৎপাদন এক সামাজিক কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত হ'ত। আগেই বলা হয়েছে যে, হিন্দু শাস্ত্রকারদের মতে মানুষের জীবনের তিনটি ঋণের একটি হচ্ছে পিতৃঋণ।[১] গৃহস্থাশ্রমে সন্তান উৎপাদন করেই সেই ঋণ শোধ করতে হয়। আবার, শুধু সন্তান উৎপাদন নয়, নিয়মিতভাবে জ্ঞানার্জন ও যাগযজ্ঞাদি করাও গৃহস্থের কর্তব্য ছিল। সুতরাং যথার্থ গৃহী জীবন যাপন করেই মানুষ তার তিনটি ঋণ পরিশোধ করবার সুযোগ পেত। তাই দেখা যায় যে, যদিও জীবনের চারটি আশ্রমের কোনোটিকেই বাদ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, তবুও আপেক্ষিক বিচারে সাধারণভাবে গৃহীর জীবনই আদর্শ জীবন হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

[১] ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

বুদ্ধ কিন্তু জীবনের আদর্শ বিচারে, গৃহী জীবনের সঙ্গে কোনো রকম আপোষ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সৃষ্টিই হচ্ছে জীবের ধর্ম; কিন্তু তাঁর ধর্ম ছিল সৃষ্টির বিরোধী অর্থাৎ জীবধর্মের বিরোধী। একথা সত্য যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জীবনধারণের জন্য নির্ভর করতে হ'ত গৃহীদের ওপর। বহু রাজা, মহারাজা, শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের কৃপা লাভ করেছিলেন এবং বহু সংসারী বৌদ্ধ সাধনা পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন এ কথাও সত্য, কিন্তু তবুও বুদ্ধের মতে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীই হচ্ছে আদর্শ মানুষ; সাংসারিক সমস্ত বাসনা কামনা বর্জিত ভিক্ষু সন্ন্যাসীর জীবনই হচ্ছে আদর্শ জীবন। যথার্থ শ্রদ্ধা ও সাধনার দ্বারা গৃহী বড়জোর স্বর্গ লাভ করতে পারে, নির্বাণ নয়। নির্বাণ লাভ করা শুধু মাত্র সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব। গৃহীরা যাতে আদর্শ গৃহীর জীবন যাপন করতে পারে সে বিষয়ে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ আচার্যেরা বহু উপদেশ দিয়েছেন এবং ওই সমস্ত উপদেশ ও অনুশাসনগুলি নিয়ে রচিত হয়েছে 'সিগালবাদ' সূত্র, যাকে 'গৃহী-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের প্রকৃত দৃষ্টি ছিল মঠবাসী বা বিহারবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণদের দিকে—তাদের জীবন, তাদের শিক্ষা, তাদের সাধনা কিভাবে সার্থক হয়ে ওঠে সেই দিকে।

বৌদ্ধ শিক্ষা আলোচনায় বৌদ্ধ জীবন-বেদের এই স্বরূপটি জানা একান্ত প্রয়োজন; কেননা, সাধারণভাবে বলতে গেলে শ্রেষ্ঠ জীবন বা 'good life'-এর প্রতিষ্ঠাই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তা'হলে বুদ্ধের মতে সে শ্রেষ্ঠ জীবন বা 'good life' সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যেই সত্য করে তোলা সম্ভব ছিল। তাই দেখা যায় যে বৌদ্ধ শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে শ্রমণদের পরিচালনাধীন ছিল, এবং সাধারণত বৌদ্ধ বিহারের চৌহদ্দির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। আর একটা কথা। প্রাচীন হিন্দুদের আচার্যকুল ছিল আচার্যের গৃহ—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত সংসার। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ধর্মনিষ্ঠ গৃহী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণভাবে ছিল ধর্মীয় ভিক্ষু প্রতিষ্ঠান।

বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা কিন্তু চিরকাল অপরিবর্তিত থাকেনি। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে যে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়, সেই সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মৌল বিভেদ দেখা দেয় এবং মহাযান বৌদ্ধ মত ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মহাযানের উদ্ভবের পূর্বে যে বৌদ্ধ শিবিরে কোনো বিভেদ দেখা দেয়নি তা' নয়; প্রকৃত পক্ষে প্রথম তিনটি মহাসঙ্গীতি থেকে প্রমাণ হয় যে নানারকম মতবিরোধ ও নীতির বিভেদ ঘটেছিল। কিন্তু মহাযানের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সে বিভেদ আরও মৌল হয়ে দেখা দেয় এবং আরও জোরালো হয়ে ওঠে। এই বিভেদের সামাজিক তাৎপর্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহাযানবাদের উদার দৃষ্টিভংগী ও চূড়ান্ত পরার্থপরতা স্বভাবতই মানুষকে আকর্ষণ করে এবং তা' খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে হীনযানীদের প্রাধান্য কমে যায় এবং মহাযানবাদ শুধু সমস্ত ভারত নয়, সমস্ত এশিয়ায় প্রসার লাভ করে। মহাযান সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নোতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি বৌদ্ধ মহাবিহারগুলিকে কেন্দ্র করে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সমসাময়িক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাধারণত মহাযান সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য ছিল। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কি গুরুত্ব এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে সেগুলি কি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা' অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধ শিক্ষার যে তত্ত্ব ও নীতিগুলি উদ্ভাবন করা হ'য়েছিল সেগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হবে।

আর একটী কথা। বুদ্ধ নিজে কূটতত্ত্ব আলোচনা বা চুলচেরা দার্শনিক বিচার পছন্দ করতেন না। তিনি বলেছিলেন যে, আধিবিদ্যক সূক্ষ্মবিচারের দ্বারা সত্যজ্ঞান লাভ করা যায় না।

নির্বাণ লাভ করবার যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তাঁর শিষ্যবর্গকে তিনি যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণভাবে নৈতিক (ethical), জ্ঞানমার্গিক (intellectual) নয়। শিক্ষা ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার যে প্রধান সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধ শিক্ষা সে পথ অনুসরণ করেনি। কৌতূহলের বিষয় যে পরবর্তীকালে মহাযান বৌদ্ধ আচার্যদের দার্শনিক চিন্তা ও বিচার যে কত সূক্ষ্ম ও দুরূহ হয়ে উঠেছিল তা' নাগার্জুন, আর্যদেব, অসংগ, বসুবন্ধু, দিঙনাগ, চন্দ্রকীর্তি, শান্তিদেব প্রভৃতি বৌদ্ধ আচার্যদের লেখা গ্রন্থ পড়লেই বোঝা যায়।

বৌদ্ধ শিক্ষার আলোচনায় প্রথমেই ওঠে সংঘের কথা। প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাপ্রার্থী যারা তাদের শরণ নিতে হ'ত তিনটি রত্নের—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। সংঘ ছিল বৌদ্ধ জীবন সাধনার কেন্দ্র। সেখানেই হ'ত, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনা।

সংঘ—প্রথমে সম্ভবত সংঘ গঠন করার উদ্দেশ্য বুদ্ধের ছিল না। বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যবর্গ ভ্রাম্যমাণ ধর্মপ্রচারকের জীবনযাপন করতেন। প্রয়োজনমত আশ্রয় গ্রহণ করতেন পর্বতগুহায় বা নির্জন অরণ্যে। ভিক্ষাই ছিল তাঁদের জীবিকা এবং আবর্জনা স্তূপ থেকে সংগৃহীত ধূলিধূসরিত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডই ছিল তাদের দেহাবরণ। ক্রমশ রাজা মহারাজা ও ধনী শ্রেষ্ঠীরা বুদ্ধের শরণাগত হন এবং তাঁরা বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য বিহার নির্মাণ করে দেন। বিহারগুলি সাধারণত শহরের প্রান্তস্থিত নির্জন অরণ্যে বা পর্বতের মধ্যে অবস্থিত থাকত। সন্ন্যাসীরা শহরের পরিবেশকে এড়াতে চাইত বটে, কিন্তু শহরের কাছেই তাদের থাকতে হ'ত কেননা গৃহী ভক্তদের কাছ থেকে সংগৃহীত ভিক্ষাই ছিল তাদের সম্বল।

এই বিহারগুলিকে কেন্দ্র করেই কালক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় বৌদ্ধ সংঘ গড়ে ওঠে। বৌদ্ধ শ্রমণেরা ভিক্ষু নামে পরিচিত হলেও, বুদ্ধ কিন্তু কোনরকম আত্মনিগ্রহ বা কৃচ্ছ্রসাধনার

পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মধ্যমার্গে বিশ্বাসী অর্থাৎ পার্থিব ভোগবিলাস এবং কঠোর তপশ্চর্যা এই দুয়ের মধ্যবর্তী পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সন্ন্যাসী হলেও গৃহী ভক্তদের দ্বারা নির্মিত বিহারে বাস করতে বা তাদের প্রদত্ত অন্নবস্ত্র গ্রহণ করতে সন্ন্যাসীদের কোন বাধা ছিল না। তবে সংঘের সংগঠন যাতে সুদৃঢ় হয় এবং সন্ন্যাসীরা নিজেদের ভুল এবং দুর্বলতাবশত যাতে ধর্মভ্রষ্ট না হয় সেইজন্য কতকগুলি বিধিবদ্ধ অনুশাসন (প্রাতিমোক্ষ) ছিল। সংঘের প্রত্যেককে সেই অনুশাসন অনুযায়ী চলতে হ'ত।

দীক্ষা—হিন্দুদের উপনয়নের মত বৌদ্ধ ভিক্ষুজীবনে দীক্ষা গ্রহণ করতে হ'ত একটা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। দীক্ষা ছিল দুরকমের—প্রব্রজ্যা (প্রারম্ভিক বা নিম্নদীক্ষা) এবং উপসম্পদা (চূড়ান্ত বা উচ্চদীক্ষা)।

প্রব্রজ্যা শব্দের অর্থ 'নির্গত হওয়া' অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করবার জন্য গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়া। বুদ্ধ প্রথমে নিজেই তাঁর শিষ্যদের 'এস ভিক্ষু' (এহি ভিক্ষু) এই বলে দীক্ষিত করতেন। পরে তিনি দীক্ষাসংক্রান্ত কতকগুলি নিয়ম রচনা করেন এবং দীক্ষাকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁর শিষ্যদের ওপর। নিয়ম ছিল যে, মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত কেউ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারবে না। দীক্ষাপ্রার্থীর ন্যূনপক্ষে পনের বছর বয়স হওয়া প্রয়োজন ছিল। বুদ্ধ বর্ণবিচার করতেন না সুতরাং সমস্ত বর্ণের পক্ষেই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সংঘে যাতে কোন অনাচার বা অনিষ্ঠ প্রবেশ না করে সেজন্য রাজকর্মচারী, ক্রীতদাস, চোর, ডাকাত, মাতাপিতা বা অর্হৎ হত্যাকারী, সন্ন্যাসিনী ধর্ষণকারী, নপুংসক প্রভৃতিরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারত না।

তাছাড়াও কুষ্ঠ, গণ্ড (ফোঁড়া), কিলাস (চর্মরোগ), ক্ষয়রোগ ও অপস্মার (মৃগীরোগ) এই পাঁচ রকম রোগে আক্রান্ত মানুষদের

প্রব্রজ্যা দান করা হ'ত না। বিকলাঙ্গ মানুষও প্রব্রজ্যালাভের অনধিকারী ছিল[১]।

প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে একজন উপাধ্যায় বেছে নিতে হ'ত। তারপর তাকে গোঁফ দাড়ি ও মাথার চুল কামিয়ে হলুদ রংয়ের পোষাক পরতে হ'ত। উপাধ্যায় তখন তাকে সংঘের দশজন ভিক্ষু দ্বারা গঠিত একটি পরিষদের সামনে উপস্থিত করতেন। দশজন ভিক্ষু সর্বসম্মতিক্রমে তাকে প্রব্রজ্যা দান করতে সম্মত হলে, তাকে ত্রিশরণ (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি) গ্রহণ করতে হ'ত। তারপর তাকে দশটি অনুশাসন (দশশিক্ষা পদানি)[২] পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হ'ত। এই ভাবে সংঘে প্রাথমিক দীক্ষা লাভের পরে তা'র উপাধি হ'ত 'শ্রমণের'।

প্রব্রজিত হবার বা প্রাথমিক দীক্ষালাভের পর হ'ত উপসম্পদা বা চূড়ান্ত দীক্ষা। প্রব্রজিত হবার পর শ্রমণকে গুরুর তত্ত্বাবধানে থাকতে হ'ত। তারপর কুড়ি বছর বয়স হলে, যদি যে উপসম্পদা লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হ'ত, তাহলে তাকে উপসম্পদা প্রদান করা হ'ত। উপসম্পন্ন হবার পর তা'র উপাধি হ'ত ভিক্ষু—অর্থাৎ সে বৌদ্ধ সংঘের একজন পূর্ণ সভ্য হিসাবে পরিগণিত হ'ত, ও তাকে পালন করতে হ'ত বৌদ্ধ সংঘের অনুশাসনগুলি (প্রাতিমোক্ষ)। কখন কখন প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা একই সঙ্গে সম্পন্ন করা হ'ত[৩]।

পাঠ্য তালিকা—সংঘের পাঠ্যতালিকা ছিল সঙ্কীর্ণ। বৌদ্ধ ধর্মনীতি আলোচনা ও ধর্মশাস্ত্রগুলি অর্থাৎ ত্রিপিটক নিয়মিতভাবে

---

১ মহাবর্গ ১।৬৪, ১।৭১

২ হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথা, মদ্যপান, বৈকালিক আহার; নাচ, গান, বাজনা প্রভৃতি উপভোগ করা; মালা, অলঙ্কার, গন্ধ দ্রব্য, প্রলেপ প্রভৃতি ব্যবহার করা; উঁচু শয্যা ব্যবহার করা ও সোনা রূপা গ্রহণ করা, এই দশটি কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩ মহাবর্গ ১।৬।৩২

অধ্যয়ন করার মধ্যেই জ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মের গূঢ় ও সাধারণ তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তবে শিক্ষার বিভিন্ন মান ছিল এবং সেই মান অনুযায়ী ছাত্রের গুণ, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা বিচার করে ধর্মের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। পরীক্ষা গ্রহণ করার নিয়ম ছিল[১]। সংস্কৃত, যজ্ঞ, দৈব, জ্যোতিষ, যাদু, লোকায়ত দর্শন প্রভৃতি বিদ্যাগুলি নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে মহাযান শাখার উদ্ভবের পর অবশ্য পাঠ্যতালিকার বহুল পরিবর্তন হয়।

শিক্ষার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা। মনে রাখা দরকার সেই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা প্রচলিত ছিল। বিহারগুলিই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়ার দরুণ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ভিক্ষুরা এসে বাস করত বিহারগুলিতে। সুতরাং একই বিহারে বিভিন্ন ভাষাভাষী ভিক্ষুর সমাগম হ'ত। তাদের প্রত্যেকেই বিহারে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ দেওয়া হ'ত। সংস্কৃত ভাষাকে বুদ্ধ ধর্মচর্চা বা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হননি ; বুদ্ধের বাণী ভিক্ষুরা আপন মাতৃভাষায় শিক্ষা করত[২]।

পাঠ পদ্ধতি—সেই সময় লিপির প্রচলন থাকলেও বিহারগুলিতে শিক্ষাপদ্ধতি ছিল মৌখিক। সমস্ত ধর্মনীতি ও অনুশাসনগুলি মুখে মুখে শেখান ও শেখা হ'ত। এই হিসাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতি ছিল একই রকম। আলোচনা, উপকথা, উপদেশপূর্ণ ছোট ছোট গল্প প্রভৃতির সাহায্যে বুদ্ধ নিজে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেই পদ্ধতিই মোটামুটি ভাবে অনুসরণ করা হ'ত। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলিকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করেও নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হ'ত। আগেই বলা হ'য়েছে যে, বুদ্ধের মতে তর্কের দ্বারা ধর্ম শিক্ষা করা সম্ভব নয় এবং বুদ্ধ

---

১ চুলবর্গ ৮।৭।৪

২ চুলবর্গ ৫।৩৩।১

চুলচেরা বিচার অপছন্দ করতেন। তবে একথাও সত্য যে, বৌদ্ধ ধর্মের নীতিগুলিকে সত্য প্রমাণিত করবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুকে কূটতর্ক করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হ'ত।

শিষ্যের মানসিক উৎকর্ষ ও ঝোঁক অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম ছিল। বুদ্ধ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রত্যেক শিষ্যের প্রতি নজর রাখতেন। শিষ্যদের চরিত্র, প্রবণতা, দুর্বলতা, পক্ষানুরাগ প্রভৃতি বিচার করে বিভিন্ন শিষ্যের উপযোগী শিক্ষা ও উপদেশ দান করতেন।

সংঘের জীবনযাত্রা—বুদ্ধ কঠিন তপশ্চর্যা বা ভোগবিলাস কোনোটিরই পক্ষাপাতী ছিলেন না। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি ছিলেন মধ্যমার্গাবলম্বী। কিন্তু তবুও বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবন বেশ কঠিন ছিল।

ভিক্ষুদের তিনটি পোষাক (চীবর) পরিধান করবার নিয়ম ছিল—একটি উপরিবাস, একটি অধোবাস এবং ওই দুটির ওপরে একটি উত্তরীয়। পোষাকগুলি হলুদ রংয়ের হওয়ার বিধান ছিল। ভিক্ষা দ্বারা অন্নসংগ্রহ করাই ছিল সাধারণ নিয়ম, তবে গৃহী ভক্তদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বা তাদের প্রেরিত খাবার গ্রহণ করতে ভিক্ষুকের বাধা ছিল না। কিন্তু কোনো বিশেষ খাদ্যের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। ঘী, মাখন, তেল, মধু, গুড়, মাছ, মাংস, ক্ষীর, দই প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসাবে পরিগণিত হ'ত। সাধারণভাবে নীরোগ সন্ন্যাসীর জুতা পায়ে দেবার নিয়ম ছিল না; তবে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় চলবার জন্য জুতা পায়ে দেওয়া চলত।

ভোরে শয্যা ত্যাগ করা, গুরুকে নানাভাবে সেবা করা, বিহার ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা ও গুরুর কাছে নিয়মিতভাবে পাঠ গ্রহণ করা ছিল ভিক্ষুর প্রাত্যহিক কর্ম।

শিক্ষক—সংঘে দুই শ্রেণীর শিক্ষক থাকতেন—উপাধ্যায় ও আচার্য। পদমর্যাদায় সম্ভবত উপাধ্যায়ই ছিলেন শ্রেষ্ঠতর।

উপাধ্যায় ব্যতীত কারোর পক্ষে ভিক্ষু জীবনে দীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হ'ত না। গুরুর কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে শিষ্যের সর্বদা দৃষ্টি রাখার নিয়ম ছিল। শিষ্যের পক্ষে গুরুকে একান্তভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করা যেমন নিয়ম ছিল, তেমনি আদর্শ গুরুও হতেন শিষ্যগত প্রাণ। শিষ্যের পক্ষে যেমন গুরুর সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখা কর্তব্য ছিল, তেমনি শিষ্যকে শিক্ষিত করে তোলা, তাকে আদর্শ ভিক্ষু জীবনযাপন করতে সাহায্য করা ও নিঃস্বার্থভাবে তার প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি, যেমন বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করে দেওয়া ছিল গুরুর কর্তব্য। শিষ্য পীড়িত হলে তাকে অকুণ্ঠ চিত্তে সেবা করাও ছিল গুরুর কর্তব্য [১]।

গুরুকে হ'তে হ'ত আদর্শ ভিক্ষু; ধ্যানধারণা, শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার সমস্ত বিষয়েই তাঁকে হ'তে হ'ত আদর্শ গুরু। গুরুকে অবমাননা করা, তাঁর ত্রুটি সন্ধান করা, তাঁর কথায় বাধা দেওয়া প্রভৃতি শিষ্যের পক্ষে অপরাধ হিসাবে গণ্য হ'ত। কিন্তু এও সত্য যে গুরু যদি কোনো মানসিক সঙ্কট বা দ্বিধায় পড়েন বা কোনো ভুল নীতি শিক্ষা দেন, তখন শিষ্য গুরুর মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করত এবং তাঁর ভুলের প্রতিবাদ করতে পারত [২]।

নিয়ম ছিল গুরু যদি সংঘের আদর্শের বিরুদ্ধে যান বা কোনো অপরাধ করেন, তবে তাঁর শাস্তিবিধানের জন্য সংঘ যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে সে বিষয়ে শিষ্য তৎপর হবে; আবার গুরুও যদি দেখেন যে শিষ্য তাঁর উপযুক্ত নয় বা তাঁর প্রতি ও সংঘের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নয়, বা ধর্ম সম্বন্ধে আস্থাহীন, তখন তাকে সংঘ থেকে বিতাড়িত করতে পারেন।

বর্ষাবাস—নিয়ম ছিল বর্ষাকালে ভিক্ষুরা পরিভ্রমণ করতে পারবে না। বর্ষার সময় তাদের একটি নির্দিষ্ট আশ্রয়ে বাস

---

১ মহাবর্গ ১।২৬

২ মহাবর্গ ১।২৫

করতে হবে এবং ভিক্ষার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারস্থ হ'তে হবে, তবে সংঘের বা ধর্ম সংক্রান্ত বিশেষ জরুরী কোন কাজ পড়লে অল্প সময়ের জন্য ভ্রমণ করা যেতে পারত।

শাস্তি—বৌদ্ধ প্রাতিমোক্ষ পড়লে বৌদ্ধ ভিক্ষুজীবন যে কত কঠোর ছিল তা' বোঝা যায়। ভিক্ষুজীবনের চরম শাস্তি ছিল পারাজিক (ভিক্ষুত্বচ্যুতি)। ধর্ম এবং সংঘের নিয়ম লংঘন করলেই শাস্তি হ'ত। কখন কখন কোন সংঘের সমস্ত ভিক্ষুদের শাস্তি হ'ত। সংঘভিক্ষুরা যদি অনাচার করত বা ধর্ম ও সংঘের অবমাননা করত, তখন সেই সংঘকে উচ্ছেদ করা হ'ত। ভিক্ষুত্বচ্যুতি তাদের না ঘটলেও, যে স্থানে তারা অন্যায় কাজ করেছে সেস্থান থেকে তাদের বিদায় নিতে হ'ত [১]।

আমোদ-প্রমোদ—তবে সংঘজীবন একেবারে নীরস ছিল না, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। বল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা, তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা, রথচালনা প্রতিযোগিতা, ঘোড়া ও হাতীতে চড়া, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, তরোয়াল খেলা, কোন লোকের ভাবভংগী অনুকরণ করে ব্যঙ্গরস উপভোগ করা, ভেঁপু বাজান, পাশা খেলা ইত্যাদি নানারকম আমোদ-প্রমোদ খেলাধূলা ভিক্ষুরা করতে পারত এমন কি তারা গান গাইতে ও মেয়েদের সঙ্গে নাচতেও পারত [২]।

উপোসথ—'উপোসথ' হচ্ছে পাক্ষিক (Fortnightly) সভা। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনে উপোসথ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রতি পক্ষে প্রত্যেক নির্দিষ্ট এলাকার অধিবাসী শ্রমণদের আপন আপন পাক্ষিক সভায় মিলিত হ'তে হ'ত। সেখানে সংঘের প্রধান (সংঘথের বা সংঘপরিনায়ক) নির্বাচিত হতেন এবং ধর্ম ও বিনয়ের প্রবক্তা হিসাবে দুজনকে নির্বাচিত করা হ'ত। তারপর প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করে উপস্থিত শ্রমণদের জিজ্ঞাসা করা হ'ত যে কেউ সংঘের কোনো নিয়ম ভংগ করেছে কিনা। অপরাধ যদি

১ চুলবর্গ ১।১৩।৬
২ চুলবর্গ ১।১৩।২

সামান্য হ'ত তা'হলে সর্বসমক্ষে তা স্বীকার করলে, পাপমোচন হ'ত। কিন্তু অপরাধ গুরুতর হলে অপরাধীকে শাস্তি গ্রহণ করবার জন্য অপর একদিন কয়েকজন ভিক্ষু দ্বারা গঠিত একটি বিচার-সভার সামনে উপস্থিত হ'তে হ'ত। উপোসথের কাজ সমাপ্ত হলে উপস্থিত শ্রমণ ও উপাসক-উপাসিকাদের ধর্মোপদেশ দান করা হ'ত। অসুস্থতার দরুণ কোন শ্রমণ ব্যক্তিগতভাবে উপোসথে যোগ দিতে না পারলে, সে তার প্রতিনিধি পাঠাতে পারত।

স্ত্রীশিক্ষা—স্ত্রীজাতিকে বুদ্ধ বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না। অনেক পীড়াপীড়ি করবার পর অনিচ্ছার সংগেই বুদ্ধ, বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুনী হিসাবে স্ত্রীলোকদের স্থান দিয়েছিলেন। তবে সমস্ত বিষয়ে তাদের মেনে নিতে হ'ত ভিক্ষুদের প্রাধান্য। প্রতিমাসে ভিক্ষুনীদের দুবার শিক্ষা ও উপদেশ দেবার জন্য একজন ভিক্ষুকে সংঘ মনোনীত ক'রত। আর একজন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এই শিক্ষাকার্য চলত। ভিক্ষুনীদের জন্য ভিক্ষুনীপ্রাতিমোক্ষ নামে কতকগুলি অনুশাসন সৃষ্টি করা হ'য়েছিল। মোটামুটি-ভাবে ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের সংঘজীবন প্রায় একই রকম ছিল। অনেক ধনী পরিবারের কন্যা স্বেচ্ছায় বৌদ্ধ ধর্মসংঘে প্রবেশ করেন এবং ভিক্ষুনী হিসাবে, শিক্ষা, দীক্ষা ও ধর্মচর্চায় খুব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন নারীর নাম পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে থেরী ধর্মদিনার নাম সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তিনি ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শীতা লাভ করে ধর্মশিক্ষা দেবার যোগ্যতা লাভ করেন।

শিল্পশিক্ষা—বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ আচার্যদের মতে কায়িক পরিশ্রম করা বা কারিগরী ও শিল্পশিক্ষা করা গৌরবের বিষয় ছিল। সেই সময় ভারতে নানা শিল্পের প্রচলন ছিল। বুদ্ধ বিভিন্ন বৃত্তিধারী গৃহীদের সর্বদাই আপন আপন বৃত্তি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে উপদেশ দিতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও সংঘের মধ্যে সূতাকাটা, কাপড় বোনা, দর্জির কাজ প্রভৃতি কারিগরী বৃত্তিগুলি শিক্ষা

করবার সুযোগ পেত। বুদ্ধের সময় ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হ'য়েছিল, এবং বিখ্যাত চিকিৎসক জীবক ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক এবং তাঁ'র চিকিৎসক।

গৃহীজনসাধারণের শিক্ষা—বৌদ্ধশিক্ষা ছিল সংঘের শিক্ষা; তা' সীমাবদ্ধ ছিল বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুদের মধ্যে। আগেই বলা হয়েছে যে সন্ন্যাস জীবনই ছিল, বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ; কিন্তু তবুও গৃহীজনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের খুবই প্রসার হ'য়েছিল। বুদ্ধের অনুগামী পুরুষদের বলা হ'ত 'উপাসক' ও স্ত্রীলোকদের বলা হ'ত 'উপাসিকা'। তা'রা ত্রিশরণ গ্রহণ করে বৌদ্ধ ধর্ম পালন করতে পারত। বৌদ্ধ শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বিহারকেন্দ্রিক হওয়ার দরুণ, গৃহীজনসাধারণ সে শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পেত না। বুদ্ধের শরণাগত উপাসক ও উপাসিকাদের কর্তব্য ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিক্ষা দেওয়া ও নানাভাবে পরিচর্যা করা। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও তাদের বৌদ্ধ ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দান ক'রত। বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসনগুলি, এবং দান করা, সংজীবন যাপন করা, কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত থাকা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্বন্ধে গৃহীজন-সাধারণ ভিক্ষুদের নিকট থেকে শিক্ষা ও উপদেশ লাভ ক'রত। ধর্ম ও নীতি শিক্ষা ছাড়াও নিয়ম ছিল যে পিতা তাঁর পুত্রকে বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দান করবে। বংশগত বৃত্তি ও পেশা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ আচার্যেরা গৃহীজন-সাধারণকে উপদেশ দিতেন।

মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্মকে গৃহীজনসাধারণের ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। তাঁর সময়ে বৌদ্ধ সংঘের সঙ্গে গৃহীদের সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত না হলেও একথা সত্য যে তাঁর চেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বৌদ্ধ ধর্মের নীতিগুলিকে তিনি সাধারণের উপযোগী করে তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র শিলাগাত্র, স্তম্ভ প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ করে দেন। শিলালিপিগুলি যে জনশিক্ষার জন্যই সৃষ্টি করা

হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেগুলির অস্তিত্ব এও প্রমাণ করে যে সেই সময় ভারতের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার চর্চা ছিল। হিন্দুদের আচার্যকুল ও পিতৃগৃহ এবং বৌদ্ধদের সংঘ ছাড়াও সাধারণ শিক্ষার জন্য ছোট বড় বিদ্যালয়ও হয়ত গড়ে উঠেছিল। আর একটী কথা। বৌদ্ধধর্ম গণতান্ত্রিক হওয়ার ফলে, সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যেও ধর্মচর্চা ও জ্ঞানচর্চা প্রসারিত হয়েছিল।

ভারতীয় লিপি বিদ্যা—সব শেষে প্রাচীন ভারতীয় লিপি বিদ্যা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দু'চার কথা না বললে হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতবর্ষে সিন্ধুসভ্যতার লিপি ও অশোকের লিপির মধ্যবর্তী সময়ের কোনো লিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। সিন্ধুসভ্যতা যদি প্রাক্ বৈদিক হয় তাহলে কি বৈদিক যুগে কোনো লিপি ছিল না? পণ্ডিত বুলার বলেছিলেন যে ভারতীয় বণিকেরা পশ্চিম এশিয়া থেকে লিপি বিদ্যা শিখে খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক অষ্টম শতকে ভারতবর্ষে তা'র প্রচলন করে এবং তা'র থেকেই অশোকলিপির ব্রাহ্মী হরফের উদ্ভব হয়। সিন্ধুসভ্যতার লিপি আবিষ্কারের পর পণ্ডিতেরা মনে করেন যে সেই লিপি থেকেই ব্রাহ্মী হরফ সৃষ্টি হয়েছে। বেদ শিক্ষার নিয়ম ছিল মুখে মুখে, এবং শাস্ত্রকারদের মতে বেদ লিপিবদ্ধ করা ছিল মহাপাপ। তবে যদি মনে করা যায় যে বেদশিক্ষা ছাড়া সাধারণ দৈনন্দিন কাজে কর্মে অল্পস্বল্প লেখার ব্যবহার ছিল তাহলে খুব অসংগত হবে না। হয়ত ওই অল্পস্বল্প চর্চার মধ্য দিয়েই ক্রমশ লিপি বিদ্যা সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রসার লাভ করে। কিন্তু হিন্দুদের মত বৌদ্ধ শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল প্রধানত মৌখিক। কিন্তু বৌদ্ধেরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই লেখার চর্চা করত এবং বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রও লিপিবদ্ধ করা হ'ত। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার প্রথম অবস্থায় লেখার ওপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হ'ত না একথা সত্য। কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয় যে তখনকার ছাত্রেরা মুখস্থ করবার এবং মনে রাখবার কি অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিল!

অন্যান্য প্রাচ্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা

মিশরীয় শিক্ষা—প্রাচ্য দেশগুলোর মধ্যে মিশরেই একটি উঁচু দরের সংস্কৃতির সৃষ্টি হ'য়েছিল, কিন্তু এই সংস্কৃতি পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখানে যাজক বা পুরোহিতদল সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে বসেছিলেন এবং রাজা ছাড়া আর কাউকে কোন বিদ্যার রহস্য তা'রা জানতে দিতেন না। বংশগত ব্যবসায় ও কাজকর্ম করবার জন্য বা ধর্মে দীক্ষা নেবার জন্য যেটুকু লেখাপড়া শেখা দরকার সাধারণ লোক সেটুকুই শিখতো—তার বেশী নয়। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে মিশরের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে মিশরীয় চিত্রলিখন (hieroglyphic) পরবর্তীকালে এই চিত্রলিখন ফিনিশীয় বণিকদের হাতে রূপ বদলে ইউরোপীয় বর্ণমালায় পরিণত হয়েছিল।

পারসিক শিক্ষা—পারস্য দেশে ধর্মের প্রভাব মিশরের মত এত প্রবল ছিল না, এখানে বরং দেখতে পাই যুদ্ধপ্রিয়তা। সামরিক ইরাণে সাধারণ শিক্ষা দেবার একটা প্রচেষ্টা হ'য়েছিল কারণ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা না থাকলে সৈন্যদের কাজ সুশৃঙ্খল হয় না। শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব ইরাণের ধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ, তাই প্রত্যেক ইরাণবাসীর কর্তব্য ছিল অশুভকে পরাজিত করে নিজেকে ধর্মের হাতে সঁপে দেওয়া। সেজন্য দৈহিক ও নৈতিক চরম উৎকর্ষ লাভ করবার জন্য চলেছিল একটা বিরাট প্রচেষ্টা। পারসিকদের মিতাচার ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা গ্রীক গ্রন্থকার জেনোফনের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এবং তাঁর বিখ্যাত পুস্তক সাইরোপিডিয়ায় (The Cyropaedia) প্রাচীন পারসিকদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায়। পারসিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আর্চডিকন ফ্যারার (Farrar) বলেছেন "আমরা আমাদের শিক্ষাদর্শের কথা বলিয়া গর্ব অনুভব করি কিন্তু ইহা কি খ্রীষ্ট জন্মের বহু পূর্বে কয়েকটি অখ্রীষ্টীয় জাতির শিক্ষাদর্শের মত সমোন্নত?

প্রাচীন পারসিকেরা সূর্য ও অগ্নির উপাসক ছিল; তাদের সন্তান-সন্ততিরা হয়ত শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হ'তে পারবে না কিন্তু পারস্যের শিক্ষাদর্শ আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চোদ্দ বৎসর বয়সে আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা স্কুল থেকে জগতের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ঠেলে বার করে দিই কিন্তু পারসিকেরা তাদের কিশোর কিশোরীদের এই বয়সে চারিটি সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা দিয়ে থাকে—জ্ঞান, ন্যায়বিচার, মিতাচার ও সাহস।" পারসিক কিশোর কিশোরী চোদ্দ বছর বয়সে সাধারণ লেখাপড়া শেষ করে জ্ঞানী কি করে হওয়া যায়, ন্যায়বিচার কি করে কর যায়, দেহ মনে মিতাচারী ও সাহসী কি করে হওয়া যায় শুধু তাই শিক্ষা করে তিন চার বছর ধরে। এ জিনিষ আজও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নাই কিন্তু হওয়া যে একান্ত বাঞ্ছনীয় তা' না বললেও চলে।

য়ীহুদীদের শিক্ষা—ফরাসী শিক্ষা ঐতিহাসিক দিত্[১] বলেছেন "যদি কোনও জাতি শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচয় দিয়ে থাকে তা'হলে বলতে হয় য়ীহুদীরাই সে পরিচয় দিয়েছে।" কথাটার মধ্যে অতিরঞ্জন নিশ্চয়ই বেশ কিছু আছে কিন্তু তা'হলেও বলতে হয় এর মধ্যে সত্যের অংশও যথেষ্ট রয়েছে। যখন আমরা ভেবে দেখি কি করে এই উৎপাটিত জাতি ছন্নছাড়া, সর্বহারা হয়ে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেদের সম্মান, প্রতিপত্তি, যশ গড়ে তুলেছে, নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্ম বজায় রেখেছে, তখন সত্যই বিস্ময়াভিভূত না হয়ে থাকতে পারি না। য়ীহুদীদের অদ্ভুত জীবনীশক্তি ও ধীশক্তির উৎস হয়ত খানিকটা জাতিগত কিন্তু খানিকটা যে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্ভূত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

---

১ Dittes :—Historie de l'education et de l'instruction translated by Ridolfi 1880, p. 49.

নাই। জাতিগত ও ধর্মীয় শিক্ষা য়ীহুদীদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে।

য়ীহুদীদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার (খ্রীষ্টজন্মের আগে) প্রধান বিশেষত্ব হোল বৈদিক যুগের মত গৃহশিক্ষা। বাইবেলের যুগের সমস্ত সময়ের মধ্যেও আমরা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য কোন সাধারণ স্কুলের কথা শুনিনা। প্রত্যেক পরিবারই এক একটি সংস্কৃতিকেন্দ্র, রাষ্ট্র বলে কিছু নেই। আছেন শুধু ঈশ্বর—পরিবারের রক্ষাকর্তা ও অধিপতি।

প্রত্যেক শিশুকে জেহোভার (ঈশ্বরের) সেবক হ'তে হবে এজন্য তা'র বিদ্বান হবার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে শুধু ভাষাশিক্ষা ও পিতামাতার দৃষ্টান্ত সামনে রেখে জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক আদর্শ অন্তরে গ্রহণ করার। সাইমন (একজন ফরাসী য়ীহুদী অধ্যাপক)[১] যথার্থই বলেছেন,—"পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই শিক্ষাব্যবস্থার কি লক্ষ্য হবে তা' নির্ভর করে আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ মানব সম্বন্ধে জাতি কি ধারণা পোষণ করে তা'র ওপর। রোমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ ছিল নিয়মানুবর্তী, কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী সেনানী* ; গ্রীকদের মধ্যে আদর্শ মানব ছিলেন তিনি যিনি দৈহিক ও নৈতিক উৎকর্ষের চরম সামঞ্জস্য নিজ জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন ; য়ীহুদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া তিনিই পরিগণিত হতেন যিনি ন্যায়নিষ্ঠ ধার্মিক জেহোভার মতই পবিত্র কারণ স্বয়ং ভগবান বাইবেলে (পুরাতন সুসমাচারে) বলেছিলেন "তোমরা পবিত্র হবে কারণ আমি তোমাদের ঈশ্বর নিজে পবিত্র", য়ীহুদীদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল

---

১ J. Simon :—L'education et instruction chez les ancients Juifs Paris, 1879 p. 16.

* রোমক প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের পরবর্তী আদর্শ ছিল—বাগ্মিতা ও বিতর্কে পারদর্শী নাগরিকের—গ্রন্থকার।

ন্যায়নিষ্ঠ ধার্মিক পবিত্র মানব গড়ে তোলবার এবং তাতে তাঁরা সফলকামও হয়েছিলেন।

বাইবেলের অনেক উক্তি থেকেই বোঝা যায় সে সময়ে কঠোর শাস্তি দেবার প্রথা ছিল। ১৩ নম্বর প্রবাদে আছে "যে পিতা যষ্ঠির সাহায্যে শাস্তি দিতে পরাঙ্মুখ, সে পুত্রকে ভালবাসে না, ঘৃণা করে কিন্তু যে সন্তানকে ভালবাসে সে তাহাকে অল্প বয়স হইতেই শাস্তি দেয়।" ১৯ ও ২৩ নম্বর প্রবাদে আছে "শিশুকে শাস্তি দেওয়া হইতে বিরত হইও না কারণ তাহাকে প্রহার করিলে সে মরিয়া যাইবে না। তাহাকে বেত দিয়া মারিবে এবং নরক হইতে তাহার আত্মাকে ত্রাণ করিবে।" আবার "সময় থাকিতে তোমার সন্তানকে শাস্তি দাও; সে কাঁদিবে বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়ো না।" আজকের দিনে অবশ্য এই কঠোর দৈহিক শাস্তিবিধান আমরা অনুমোদন করি না।

যতদূর জানা যায় তা' থেকে মনে হয় শুধু বালকদেরই লেখাপড়া শেখানো হ'ত, বালিকাদের শিখতে হ'ত সূতো কাটা, বোনা, রান্না ও অন্যান্য গৃহস্থালীর কাজ আবার সেই সংগে নৃত্য ও সংগীত। জীবনে আনন্দ সঞ্চার করা ছাড়াও নৃত্যে ও সংগীতে ভগবানের আরাধনা হ'ত।

সংক্ষেপে বলা চলে যে প্রাচীন য়ীহুদীদের মধ্যে মানসিক শিক্ষার চাইতে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাই অধিকতর কাম্য ছিল—আরো একটি জিনিষ তারা শেখাতো সেটি হচ্ছে দেশের ইতিহাস ও দেশপ্রেম। পিতা সন্তানকে জাতীয় ইতিহাসের মুখ্য ঘটনাগুলো শোনাতো, শোনাতো পূর্বপুরুষের যশ ও বীরত্ব-গাথা এবং কি করে ভগবান তাঁর মনোনীত ও প্রিয় জাতিকে নানা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন সর্ব-অবস্থায়।

খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের পর য়ীহুদীদের প্রাচীন গৃহশিক্ষা আস্তে আস্তে সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষায় পর্যবসিত হ'ল। কালক্রমে বোঝা গেল শুধু নৈতিক আদর্শ ও সদভ্যাসই যথেষ্ট নয়, মানসিক

শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে য়ীহুদীরা আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ—সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা—প্রায় বাস্তবে পরিণত করে ফেলে।

৬৪ খ্রীষ্টাব্দে য়ীহুদীদের প্রধান ধর্মযাজক যশুয়া বেন গামালা (Joshua Ben Gamala) প্রত্যেকটি সহরের ওপর একটি করে বিদ্যালয় চালাবার ভার অর্পণ করলেন, না চালালে ভগবানের অভিশাপগ্রস্ত হয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে এই আদেশ দিলেন। আদেশ দিলেন যদি সহরের ভেতর দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং পুল না থাকে, তা'হলে নদীর দু-তীরেই দুটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হবে; স্কুলে যদি পঁচিশ জনের বেশী ছাত্র না থাকে, তাহলে একজন শিক্ষক স্কুল চালাবেন; যদি পঁচিশ জনের বেশী হয়, তাহলে সহরের কর্তৃপক্ষ একজন সহকারী দেবেন; কিন্তু ছাত্রসংখ্যা যদি চল্লিশের উপর হয় তাহলে দুজন পুরো শিক্ষক থাকবেন। ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা সম্বন্ধে টালমুডের (The Talmud) এই অনুশাসন বিংশ শতাব্দীর জন-শিক্ষায় আজও আমরা পালন করতে পারিনি। সত্য কথা বলতে গেলে আজও আমরা এ আদর্শ থেকে বহুদূরে পড়ে আছি।

সেদিনের শিক্ষায় যেমন শিক্ষকের কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা করা হ'ত, মানুষ পেতোও অনেক, তাঁকে প্রকৃত সম্মানও দেওয়া হ'ত "সহরের রক্ষাকর্তা" বলে অভিনন্দিত ক'রে। য়ীহুদীরা সত্যিই বিশ্বাস করতো একমাত্র শিক্ষকই তাদের রক্ষা করতে পারেন—শিক্ষকও সে বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে, স্নেহ ভালবাসা দিয়ে। য়ীহুদী ধর্ম ও আইনজ্ঞ র‍্যাবিরা বিধান দিয়েছিলেন শিক্ষককে বিবাহিত হ'তে হবে কারণ তাঁদের ধারণা ছিল যে শিক্ষক পরিবারের কর্তা নন, তাঁর শিক্ষকতার কার্য সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে না। তাঁরা সুন্দর উপমা দিয়ে শিক্ষকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছেন "যে শিক্ষার্থী অল্পবয়স্ক শিক্ষকের কাছে শিক্ষা পায় সে, যে লোক কাঁচা আঙ্গুর

খায় বা সন্থ প্রস্তুত মন্থ পান করে তাহারই সামিল; কিন্তু যে শিক্ষার্থী বয়স্ক ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে শিক্ষা পায় সে, যে ব্যক্তি রসাল পাকা আঙ্গুর খায় বা পুরাতন সুস্বাদু মন্থ পান করে তাহারই মত।" বিনয়নম্র ব্যবহার, ধৈর্য ও নিঃস্বার্থতা এই তিনটি শিক্ষকের প্রধান গুণ বলে তাঁরা অনুমোদন করেছেন। আবার টালমুডে বলা হয়েছে "তোমার শিক্ষক এবং তোমার পিতা তুইজনেই যদি তোমার সাহায্য চাহেন, তবে আগে শিক্ষককে সাহায্য করিয়া পরে পিতাকে সাহায্য করিয়ো কারণ পিতা তোমাকে শুধু ইহলোকের জীবন দিয়াছেন, শিক্ষক দিয়াছেন তোমায় পরলোকের অনন্ত জীবন।" একবার বিশ্ববিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার বলেছিলেন তিনি তাঁর শিক্ষক অ্যারিষ্টটলের কাছে যতটা ঋণী তাঁর পিতা ফিলিপের কাছেও ততটা নন।

ছয় বৎসর বয়সে শিশু স্কুলে আসতো, তার আগে তাকে নেওয়া হ'ত না। টালমুডে বলা হয়েছে "ছয় বৎসর বয়সের পর শিশুকে ভর্তি কর এবং বলদের উপর যেমন জিনিষ চাপান হয়, শিশুর স্কন্ধেও তেমনি জ্ঞানের বোঝা চাপাইয়া দাও।" কিন্তু এই সময়েরই আরো দূরদর্শী ও সুবিবেচক য়ীহুদী পণ্ডিতেরা এই কোমল বয়সে পরিমিত অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অত্যধিক মানসিক শ্রমের মোটেই অনুমোদন করেননি। তাঁরা বলেছেন "শিশু ও বয়স্কদের যার যার নিজ শক্তি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত" এ বিষয়ে তাঁরা বহু পূর্বেই বিংশ-শতাব্দীর শিশু মনোবিজ্ঞান বা অষ্টাদশ শতাব্দীর মহামতি রুসোর মতবাদের সূচনা করে গেছেন।

য়ীহুদী স্কুলগুলোতে পড়া ও লেখার সংগে অল্পবিস্তর প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং যথেষ্ট পরিমাণে জ্যামিতি ও জোতিষ্ক-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বাইবেলই শিশুদের প্রথম পুস্তক ছিল, শিক্ষক নৈতিক উপদেশ পঠন-পাঠনের সংগে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতেন। পড়া ও লেখা শেখাবার প্রণালীও ছিল প্রাচ্যের নিজস্ব শ্রুতিনীতি।

ফরাসী লেখক রেণান (Renan) তাঁর যীশুখ্রীষ্টের জীবনীতে (Vie de Jesus) লিখেছেন "যীশু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন প্রাচ্যের নিজস্ব প্রণালীতে; এই প্রণালী অনুসারে শিশুর হাতে একখানি বই দেওয়া হইত এবং মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত সে তাহার সমপাঠীদের সঙ্গে বারবার ইহা আবৃত্তি করিতে থাকিত।" শিক্ষক বিশুদ্ধ উচ্চারণ শোনাবার জন্য খুবই ব্যগ্র থাকতেন এবং কোন জিনিষ ছাত্র একবারে না বুঝতে পারলে, বারবার এমন কি দরকার হলে চারশ' বারও বুঝিয়ে দিতেন। শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী চিত্তাকর্ষক ও ইংগিতমূলক ছিল; পাঠকে অকারণে ব্যাখ্যা-ভারাক্রান্ত করা হ'ত না। শাস্তি বিধানও অনেকটা নরম হয়ে এসেছিল; যীশুখ্রীষ্টের মানবতা ও শিশুর প্রতি ভালবাসা য়ীহুদীদের ওপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই দেখি টালমুডে বলা হয়েছে "এক হাত দিয়া যদি শিশুদের শাস্তি দেওয়া হয়, দুই হাত দিয়া তাহাদের আদর করিবে।" কোথায় গেল প্রাচীনকালের য়ীহুদীদের সেই কঠোরতা! শুধু এগারোত্তীর্ণ বালকদের জন্যই দৈহিক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ছিল; অবাধ্যতার জন্য অনেক সময় খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা হ'ত, এবং প্রয়োজন হলে চামড়ার লাঠি দিয়ে দু-এক ঘা দেওয়া হ'ত। শিক্ষাপ্রণালী ও শাস্তি বিধান বিষয়ে য়ীহুদীরা আস্তে আস্তে আধুনিক কালকে অনেকটা ইংগিত করেছিল।

বিদেশী লেখকদের প্রচারে জগতে একটা ধারণা আছে য়ীহুদীরা ছিল বড় সংকীর্ণচেতা ও অন্য সংস্কৃতিতে আস্থাহীন। নিজেদের গোষ্ঠী ছাড়া তারা সেজন্য চলতো না। তারা ভারতীয় বা গ্রীক বিজ্ঞান থেকে যতটা আহরণ করতে পারতো তা' করেনি। তাদের উগ্র দেশপ্রেম তাদের জ্ঞানের দ্বার কতকটা রুদ্ধ করে রেখেছিল একথা সত্য। তাদের রাষ্ট্রিক অবস্থাও অবশ্য এজন্য খানিকটা দায়ী। র‍্যাবিরা গ্রীক বিজ্ঞান অধ্যয়নকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখতেন।

এসব বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও য়ীহুদীদের অনেকে প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থ সযত্নে পড়তো এবং কথিত আছে বিখ্যাত পণ্ডিত গ্যামালিয়েলের (Gamaliel) ছাত্রদের মধ্যে পাঁচ শত ছাত্র গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিল। সম্ভ্রান্ত য়ীহুদী পরিবারের মেয়েরা গ্রীকভাষায় কথা বলতে শিখতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে য়ীহুদীদের যতটা সংকীর্ণচেতা বলা হয় তারা ঠিক ততটা ছিল না। হবেই বা কি করে ? তাহলে দেশে দেশে তারা প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও জীবনের নানাক্ষেত্রে সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ব্যবসায়ে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে পারতো কি ?

চীনদেশের শিক্ষাব্যবস্থা—স্মরণাতীত কাল থেকে চৈনিক সভ্যতা চলে আসছে ফল্গু নদীর মত—বাইরে কোন আক্ষেপ নেই; উত্তেজনা নেই, ফেনিল তরঙ্গ নেই কিন্তু ভেতরে চলেছে স্রোতস্বিনী, ধীরে অবিশ্রান্ত গতিতে কূলকে শস্যশ্যামল করে, তা'র প্রিয় মানুষকে সঞ্জীবনী শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত করে। জগতের আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল চীন ঘুমিয়ে আছে শান্ত শিশুর মত, অচৈতন্য জড়ের মত হাজার বছর ধরে—তার জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্য নেই, প্রাণের চাঞ্চল্য নেই, আছে শুধু এক ঘেয়ে একটানা সমতা। কিন্তু এই সমতা, এই অপরির্তনশীলতার আবরণে যে তেজ লুকিয়ে ছিল তা' প্রকাশ পেয়েছিল জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় ঐতিহ্য ও নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে বর্জন না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় শত প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও—আজ তার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে বলদৃপ্ত রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, চারুকলায়। কাজেই বিদেশী লেখকদের দৃষ্টিভংগীতে লেখা চৈনিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস বহুলাংশেই আজ পরিত্যাজ্য। তাঁদের মতে চৈনিক শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণরূপে ঐতিহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; তাতে স্বাধীনতা ছিল না, প্রাণের স্পন্দন ছিল না। শুধু বাইরের শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা পালন করে কলের পুতুলের মত চৈনিকেরা জীবনের ভেতর দিয়ে চলে যেত ;

নৈতিক আদর্শগুলো তাদের অন্তরকে করতো না স্পর্শ—অর্থাৎ শিক্ষা ছিল একটা প্রাণহীন যান্ত্রিক ব্যাপার। লেখাপড়া শেখানো সম্বন্ধে তাঁদের মতে একই মন্তব্য খাটতো—শিক্ষকের কাজ ছিল কোনমতে পড়তে শিখিয়ে দেওয়া, বোঝাবুঝির ধার তিনি ধারতেন না, কিছু আবৃত্তি করা, কিছু নামতা মুখস্থ করা, আর শেখা কিছু বাইরের আচার-ব্যবহার—যেন সবটাই একটা রুটিন। এমন কি এসব বিদেশী লোক বলতে শুরু করলেন চৈনিক চিত্রকলাও নাকি একটা বাঁধাধরা নিয়মে মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করতো, তাতে ভাবাবেগ, গভীর অনুভূতি এসব কিছুই ছিল না।

কিন্তু এসব মত মেনে নেওয়া অসম্ভব বিশেষ করে চীন সম্বন্ধে, যে দেশে লাওৎসে ও কনফিউসিয়াসের মত দু'জন বড় শিক্ষক ও সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে এই দুই মহাত্মার আবির্ভাব হয়। লাওৎসে ছিলেন প্রগতি, স্বাধীনতা ও আদর্শবাদের জীবন্ত মূর্তি এবং রুটিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক; কনফিউসিয়াস চেয়েছিলেন রাষ্ট্র, পরিবার ও ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য এবং যে রকম নৈতিক আদর্শ কাজে লাগতে পারে সেইরকম রীতিনীতি। জয় হোল কনফিউসিয়াসেরই (তাঁর তিন হাজারেরও ওপর শিষ্য ছিল)। লাওৎসের কথা চীন ভুলতে পারেনি, শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর প্রভাবও কোনদিন একেবারে লুপ্ত হয়নি।

লাওৎসে বলেছেন "দুষ্ট শাসকদের মতে মানুষের অন্তঃকরণকে শূন্য রাখিয়া পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া ভাল; তাহার ইচ্ছা-শক্তিকে সতেজ করা অপেক্ষা তাহার দেহকে বলশালী করা অনেক সুবিধাজনক; জনগণকে চিরদিন অজ্ঞ রাখা নিরাপদ কারণ তাহা হইলে তাহাদের দাবীদাওয়া কমিয়া যাইবে। জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন প্রজাকে শাসন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ।"

"এই সব মতবাদ মানবতার পরিপন্থী; জনগণকে লেখাপড়া শিখাইয়া সাহায্য করা শাসনকর্তাদের উচিত; তাহাদের উপর

অত্যাচার না করিয়া সর্বপ্রকারে তাহাদের উপকার করা উচিত।”

লাওৎসের মতে জনগণকে শিক্ষিত এবং নানাপ্রকারে তাদের সাহায্য না করলে শাসন করবার অধিকার মানুষের জন্মায় না।

লাওৎসের এ উপদেশ বৃথা হয়নি। চৈনিকেরা তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রথম থেকেই সর্বজনীন করতে চেষ্টা করেছে। হুক (Huc) নামে একজন চৈনিক মিশনারী গর্বের সহিত দাবী করেছেন যে চীনদেশের মত এত ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা আর কোনও দেশে ছড়িয়ে পড়ে নাই। একজন জার্মান পণ্ডিত এই দাবী সমর্থন করে বলেছেন যে চীনে এমন গ্রাম নেই যেখানে স্কুল নেই। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ যেখানে এত প্রবল সেখানে শুধু প্রাণহীন শিক্ষা হবে এ বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। একথা ঠিক চৈনিক সভ্যতায় শিষ্টাচারের ওপর খুব বেশী জোর দেওয়া হয়েছে এবং কোন ভাবাবেগ প্রকাশ করা রীতিবিরুদ্ধ। পুরণো দিনে এমন নিয়ম ছিল ভৃত্যকে অপরাধের জন্য বরখাস্ত করতে হলেও রাগ না দেখিয়ে মনিবকে বলতে হ'ত যে তাঁর অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে, যদিও তাঁর প্রাণ কাঁদছে তা'কে জবাব দিতে, তবু বাধ্য হয়ে তাকে জবাব দিতে হচ্ছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভৃত্যও যথোচিত ব্যবহার করে ও বহু দুঃখ প্রকাশ করে বিদায় নিত। মোলায়েম বা মিষ্টি ব্যবহার চৈনিক সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন অংগ, এ শুধু বাইরের দেখানো জিনিষ নয়। এতে শিক্ষাদর্শ ব্যাহত না হয়ে আরো উন্নত ও সুন্দর হয়েছে।

কিন্তু অদ্ভুত, গেব্রিয়েল কম্পেয়ারের* মত শিক্ষা ঐতিহাসিক বলেছেন “মোটামুটি একথা বলা যায় যে প্রাচ্যের শিক্ষা ইতিহাস হইতে আমরা নিতে পারি এ রকম জিনিষ খুবই কম আছে।” এ মতবাদ যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আজকের দিনে সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

---

* Gabriel Compayre—Histoire de Pedagogie p. 15. Paris 1890,

যে কোন সত্যানুসন্ধিৎসু একথা স্বীকার করবেন প্রাচীন প্রাচ্যের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নেবার আমাদের অনেক আছে। প্রাচীন ভারতের প্রকৃতির নগ্ন বুকে অবৈতনিক আশ্রমিক বা আবাসিক শিক্ষা, সংযম ও ব্রহ্মচর্য কর্ম-কুশলতা, কায়িক পরিশ্রম, প্রাণায়াম, ব্যক্তিত্বগঠন, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে আস্থা, শিক্ষক ছাত্রের স্নেহমধুর বন্ধন এ সবই আজকের শিক্ষায় আমাদের অনুকরণীয়। ইস্রায়েলের শ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ, ভগবদ্ভক্তি, দেশপ্রেম ও সর্বজনীন শিক্ষা, চীনদের সর্বসাধারণের শিক্ষা, পারসিকদের বিচার ও নৈতিক শিক্ষা এ সব থেকে পেতে পারি আমরা অফুরন্ত উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা। সবটা গ্রহণ করবার আমাদের ক্ষমতা আছে কিনা জানি না কিন্তু আমাদের কিছু শেখবার নেই বা নেবার নেই একথা বলা যান্ত্রিক সভ্যতার মিথ্যা মায়ায় নিজেদের ভুলিয়ে রাখার সামিলই হবে।

গ্রীক শিক্ষা

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা বিশ্বসংস্কৃতিতে আর্যগণের একটি মস্ত বড় অবদান; পরবর্তীকালে আর্যগণের অন্যান্য শাখার আরো দু'টি কীর্তি হচ্ছে—গ্রীক ও রোমক সভ্যতা। এখানেও আর্যেরা উত্তর হ'তে এসে স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের আক্রমণ ক'রে তাদের দেশ দখল করেন এবং বিজেতা ও বিজিতদের সংমিশ্রণে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তা' জগতে অবিস্মরণীয়।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লেকি[১] (Lecky) সত্যই বলেছেন ইউরোপীয় সভ্যতার মূল উৎস হচ্ছে গ্রীক ধীশক্তি; আইনপণ্ডিত অধ্যাপক মেন[২] (Maine) বলেছেন প্রকৃতির আলো বাতাস ছাড়া

[১] Lecky—England in the 19th Century (i) p. 8.
[২] Maine—Village Communities (3rd Edition) p. 288.

পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার মূলে গ্রীক সভ্যতার বীজ নেই। এই শেষোক্ত উক্তিতে অতিরঞ্জন থাকতে পারে কিন্তু আমরা যে গ্রীক সভ্যতার নিকট নানাভাবে ঋণী তাতে সন্দেহ নেই।

বুদ্ধদেব যখন তাঁর নবপ্রবর্তিত ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচার করছেন সে সময়ে আমরা দেখি গ্রীক জাতি, বিশেষ করে এথেন্স ও স্পার্টা পারসিক সাম্রাজ্যের সংগে এক জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তারপর ম্যারাথন (খ্রীঃ পূঃ ৪৯০), স্যালামিস (খ্রীঃ পূঃ ৪৮০), থার্মোপিলি (খ্রীঃ পূঃ ৪৮০) ও প্ল্যাটির (খ্রীঃ পূঃ ৪৭৯) যুদ্ধে বিশ্ববিজয়ী পারস্যকে হটতে হোল নব্যশক্তি গ্রীসের কাছে। বছর কুড়ি বাদে মহামতি পেরিক্লিস হলেন এথেন্স রাষ্ট্রের কর্ণধার (খ্রীঃ পূঃ ৪৬১) আর সেই সংগে এল জাতীয় জীবনে জোয়ার আর শুরু হোল গ্রীসের স্বর্ণযুগ যা চলল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি শিক্ষা ইত্যাদি জীবনের নানা ক্ষেত্রকে এমনভাবেই সমৃদ্ধ করেছে গ্রীক বা এথেন্সের সংস্কৃতি যে আজ তাকে আমরা মানবের শাশ্বত উত্তরাধিকার হিসেবেই গ্রহণ করে থাকি।

অধ্যাপক গিলবার্ট মারে[১] (Gilbert Murray) একটি কথা বলেছেন তা' আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। গ্রীক বিজেতারা এসে মোটামুটি শত্রুর মধ্যেই বাস করতে লাগলেন এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের নগরকে প্রাচীর বেষ্টিত করলেন। গ্রীক ও বিজিতদের মধ্যে কোথাও কিছু বেশী, কোথাও কিছু কম সংমিশ্রণ হোল ; এথেন্সে হোল বেশী, আর স্পার্টায় হোল নামমাত্র। এ মিশ্রণের ফলেই এথেন্সে উঠল গড়ে একটা মস্ত বড় সংস্কৃতি। কিন্তু এথেন্সবাসীই হোক, আর স্পার্টাবাসীই হোক, বা করিন্থবাসীই হোক, সবাই এই প্রাচীর বেষ্টিত নগর-রাষ্ট্রকেই (City-state) জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে পূজো করতে

১ Gilbert Murray—The Rise of the Greek Epic p. 11 Pp 78-79.

শিখলেন—অধিষ্ঠাত্রী দেবী যাঁর কৃপায় তাঁরা শুধু বেঁচে থাকতেই সক্ষম হ'লেন না, মানুষ হিসেবে মহিমময় জীবনযাপন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হোল—যা কিছু সুন্দর, শুভ ও পবিত্র তারই প্রতীক হয়ে এ নগর-রাষ্ট্র তাঁদের শত্রুপরিবৃত জীবনে হৃদয় অধিকার করে বসল। অধ্যাপক মারে সত্যই বলেছেন "যত জ্ঞানগরিমার আলোই তাঁরা দিন না কেন, যত সৌন্দর্য সৃষ্টিই করুন না কেন, সুদূরপ্রসারী কল্পনায় যতই অবগাহন করুন না কেন, যখনই ডাক আসতো তাঁদের ছোট রাষ্ট্র বিপন্ন, তখনই ঘৃণিত বর্শা ও ঢাল তুলে নিতে এক মুহূর্ত দেরী হ'ত না।"

তাই দেখি খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্যেক এথেনীয় যুবককে দেবমন্দিরে গিয়ে শপথ গ্রহণ করতে হ'ত "আমি আমার অস্ত্র-শস্ত্রের অবমাননা করিব না বা আমার সংগীদের ফেলিয়া পলায়ন করিব না। আমি ধর্মসম্বন্ধীয় বা রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় ব্যাপারে যুদ্ধ করিতে সদাই উন্মুখ থাকিব, সে আমি একাই হই, বা দলবদ্ধই থাকি। আমি আমার পিতৃভূমি ও নগর-রাষ্ট্রকে বৃহত্তর ও মহত্তর করিয়া আমার পশ্চাদ্বর্তীদের হাতে দিয়া যাইব। আমি শাসন-কর্তাদের কথা শুনিয়া চলিব এবং রাষ্ট্রে যে সব আইনকানুন প্রচলিত আছে বা যে সব আইনকানুন পরে সমগ্র জনতা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে তাহা পালন করিব। রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র যে কেহ অমান্য বা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে, একাই থাকি বা দলবদ্ধই থাকি আমি তাহাকে এ দুষ্কার্যে বাধা দিব। আমার পূর্বপুরুষেরা যে ধর্ম ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহার আমি সম্মান করিব।"

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় গ্রীসে যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান কিছু কম তা' নয়, তবে এখানে পুরোহিতের প্রভাবের চেয়ে সেনানী, রাজনীতিজ্ঞ ও চারণ কবির প্রভাবই বেশী ছিল বলা চলে। গ্রীসের অন্ধকার যুগে এই চারণ কবিরাই বিজেতার রাজপ্রাসাদে তাঁদের সংগীত ও কবিতার মধ্য দিয়ে মানবতা ও সংস্কৃতির আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

গ্রীক শিশুকে শত্রু-পরিবেষ্টিত নগর-রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে কি করে তৈরী করা যায় এ প্রশ্ন উঠবেই এবং উঠেও ছিল বিজেতাদের দেশ অধিকার করার অল্প পরেই। তবে অবস্থা অনুসারে গ্রীসে দুরকম শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। তার ইতিহাস সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা প্রয়োজন। গ্রীক জাতির ভেতর তিনটি শাখা ছিল—এয়োলিয়ান (The Aeolians), আয়োনিয়ান (The Ionians) এবং ডোরিয়ান (The Dorians)। এয়োলিয়ানদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না, তবে আয়োনিয়ান ও ডোরিয়ান শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে এথেন্স ও স্পার্টার ইতিহাস থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পাই। এটা আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে কারণ গ্রীক জাতির এ দুটো শাখাই সব চেয়ে বিখ্যাত। এথেনীয়েরা ছিল আয়োনিয়ান এবং স্পার্টানরা ডোরিয়ান। যখন আমরা গ্রীক আর্ট, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলি, তখন এথেন্সের আর্ট, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যই বোঝায় কারণ পূর্বেই বলেছি এখানে বিজেতা ও বিজিতদের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এথেন্সে নিরাপত্তার ভাব বেশী ছিল এবং হয়ত আয়োনিয়ানদের প্রকৃতিগত শ্রেষ্ঠত্বও কিছু ছিল। কিন্তু স্পার্টায় দেখি অন্যরূপ, ডোরিয়ানদের বিজিতদের সংগে সংমিশ্রণ হয়নি এবং তারা নগরের মধ্যেই শত্রু-পরিবেষ্টিত হয়ে ভয়ে ভয়ে চিরকাল বাস করত। তাই স্পার্টানরা যদিও থার্মোপিলির গিরিসঙ্কটে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল এবং নির্ভীক, কষ্টসহিষ্ণু ও স্বল্পভাষী বলে বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল, তবু গ্রীক সংস্কৃতি গঠনে তাদের অবদান বিশেষ কিছু নেই। তবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের আধুনিক শিক্ষাদর্শের সংগে না মিললেও সুপরিকল্পিত ছিল এবং তাদের জীবনের চাহিদা সুষ্ঠুরূপে মিটিয়েছিল। এথেন্সের সংস্কৃতিমুখী বাঁধাধরা-নিয়মহীন স্বাধীন শিক্ষার বিপরীত দিকটা আমরা দেখি স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থায়, তবু এথেন্স ও

স্পার্টার উভয়ের শিক্ষাব্যবস্থাতেই কতগুলো জিনিষের যথেষ্ট মিলও আছে। আরো দু-একটি কারণে স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে যখন এথেন্সের দুর্দিন উপস্থিত হয় তখন দার্শনিক, শিক্ষাবিজ্ঞানী মহামতি প্লেটো তাঁর স্বপ্নরাজ্যের শৃঙ্খলাসম্পন্ন নগর-রাষ্ট্র গঠন করবার পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন স্পার্টাকেই আদর্শ করে। পরবর্তী কালে ফরাসী রুশো ও মন্টেনও (Rousseau & Montaigne) যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন স্পার্টান শিক্ষাব্যবস্থার। স্পার্টার শারীরিক শিক্ষা ও ইংল্যাণ্ডের পাব্লিক স্কুলগুলোর শারীরিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে এবং ব্রতীবালকদের (Boy Scouts) সংঘের মাধ্যমে এই দৈহিক শিক্ষা গণতান্ত্রিক রূপ নিয়ে বিশ্বের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

স্পার্টান শিক্ষাকে নিয়মানুবর্তিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, অদম্য তেজ ও সাহসিকতার দীক্ষা বললে বোধ হয় এর রূপ ঠিক ধরা যাবে। বহু সংখ্যক হেলট (দাস) ও অনাগরিক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকত স্পার্টানরা এবং হেলটদের বিদ্রোহ লেগেই ছিল; কাজেই তাঁদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কর্তব্য ছিল এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোকে দাবিয়ে রাখা। স্পার্টানরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মত নীচ কাজে হাত দিতেন না, পেরিয়েসি নামে এক অনাগরিক সম্প্রদায়ের হাতে সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের দরকারও বিশেষ ছিল না কারণ হেলট কর্তৃক কর্ষিত জমি-জমা থেকেই তাঁদের যথেষ্ট আয় হ'ত। যুদ্ধের গান ছাড়া, স্পার্টা অধিবাসী সাহিত্য, আর্ট বা দর্শন সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন; পড়া ও লেখা কেউ বা যদি জানতেন, সেটা একটা নিয়মের ব্যত্যয় হিসেবেই দেখা হ'ত। তাঁর সমস্ত জীবন অতিবাহিত হ'ত সেনানীর শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অপরকে সেই শিক্ষা দিয়ে; তাঁর আদর্শ ছিল স্নায়ু ও মাংসপেশীর বজ্রগঠন। স্পার্টাবাসীদের নগর ছিল না, তাঁরা বাস করতেন কতগুলো কাছাকাছি অবস্থিত গ্রামে, তাঁদের প্রাচীরও

ছিল না। (কিন্তু প্রত্যেক স্পার্টাবাসী নরনারী কিশোর-কিশোরীর সাহসী হৃদয়ই ছিল সে প্রাচীর যা আনতো নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও শান্তি।) সামরিক যোগ্যতার যূপকাষ্ঠে সব কিছুই বলি দেওয়া হ'ত; শিশু যদি দুর্বল ক্ষীণজীবী হ'ত তাহলে তাকে অরণ্যসংকুল পর্বত উপত্যকায় পরিত্যাগ করে আসা হ'ত; ছেলেদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব শিক্ষা দেওয়া হ'ত অসমসাহসিক অপহরণের কার্য শিখিয়ে, গ্রামের মধ্যে ছেলেদের পাঠানো হ'ত হেলটদের ওপর নজর রাখবার জন্যে এবং প্রায়ই দেখা যেতো এসব অভিযানের পরে হেলটদের মোড়লেরা আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছে। মেয়েরা যাতে স্বাস্থ্যবান সন্তান প্রসব করতে পারে সেজন্য ছেলেদের সংগেই তাদের ব্যায়াম করতে হ'ত। গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক বলেন নারীসুলভ লজ্জা যাতে বিদূরিত হয় সেজন্য উৎসব অনুষ্ঠানে নগ্ন দেহে তাদের নাচতে হ'ত। স্পার্টান মা'য়েরা যুদ্ধে সন্তানের জয়-পরাজয় বা জীবন-মরণের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে কোন ভাবাবেগই প্রকাশ করতেন না। এই স্থৈর্য ও গাম্ভীর্যের জন্য হয়েছেন তাঁরা জগদ্বিখ্যাত। দেহের চরম উৎকর্ষ সাধন ছিল স্পার্টান নারীর বিশেষত্ব, সমগ্র গ্রীসে এমন অঙ্গসৌষ্ঠব দেখা যেতনা। ধাত্রী বা নার্স হিসেবে তাদের চাহিদাও ছিল যথেষ্ট।

স্পার্টান ছেলেদের শিক্ষা ঠিক সাত বছর বয়সে নিয়মিতরূপে আরম্ভ হ'ত। এই সময়ে তাদের গৃহ থেকে নিয়ে গিয়ে সামরিক ড্রিলের জন্য দলবদ্ধ করা হ'ত। তাদের খালি গায়ে থাকতে হ'ত, শুতে হ'ত বেতের শয্যায় এবং মধ্যে মধ্যে তাদের চাবুকও মারা হ'ত। কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ, ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি, জিমনাষ্টিক বা শারীরিক কসরৎ, শিকার এবং সম্ভবতঃ অশ্বারোহণ ও সন্তরণ এ সবই শিক্ষা করতো এরা। সমস্ত শিক্ষাটাই দেওয়া হ'ত শরীরটাকে লোহার মত মজবুত করা এবং সাহস ও চরম সহ্য-শক্তি গঠন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। চারুকলার ছোঁয়াচ যা লাগতো তা' সামান্যই—শুধু ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে বা নাটকে গায়ক ও নর্তক দলের

সাক্ষাৎ আমরা পাই। প্লেটো, রুশো বা মন্টেন যাই বলুন না কেন, স্পার্টার শিক্ষা বড়ই সংকীর্ণ, অনুদার ও অসুন্দর ছিল (যদিও তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হয়েছিল)। অ্যারিষ্টটল যথার্থ বলেছেন যে, এ ব্যবস্থায় শুধু 'পশুর মত' ছাত্রছাত্রীরই উদ্ভব হয়েছিল। যতদিন স্পার্টানরা এই শিক্ষা একচেটিয়া করে রেখেছিল ততদিন যুদ্ধে তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না; কিন্তু অন্যেরাও যখন এ ধরনের শিক্ষা দিতে শুরু করল তখন স্পার্টান প্রাধান্য আর থাকলো না। স্পার্টান শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দেখা দিল তাদের রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি, লোকের সংগে মানিয়ে চলা ও মানসিক ক্ষিপ্রতার অভাবে। বিদেশে যখন তাদের দায়িত্বসম্পন্ন কাজ দেওয়া হয়েছে তখন তারা অকর্মণ্য ও ঘুষখোর বলেই কুখ্যাতি অর্জন করেছে। স্পার্টান শিক্ষাব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের এত নজরবন্দী করে রাখা হ'ত, এত বেশী তত্ত্বাবধান ছিল যে নিজেদের কর্মকুশলতা, নোতুন কিছু করার আগ্রহ বা নৈতিক স্বাবলম্বন ও অন্যের সংগে চলবার ক্ষমতা মোটেই গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রে, বিশেষ করে এথেন্সে শিক্ষা অনেক বেশী উদার, সুন্দর ও স্বাধীন ছিল। গ্রীসের স্বর্ণযুগে এথেন্সের মত রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কাছ থেকে স্পার্টার চাইতে অনেক বেশী প্রত্যাশা করবে এটা স্বাভাবিক। পারস্যের পরাজয়ের পর এথেন্সের আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গেল, দৃষ্টিও হ'ল সুদূরপ্রসারী। তাই শিক্ষা তাদের কাছে হোল মানুষের প্রকৃতিতে যা কিছু সুন্দর ও মহৎ তারই সর্বাংগীণ বিকাশ—শুধু সাহসে নয়, সহ্য শক্তিতে নয়, কিন্তু জীবনের সমস্ত আচরণে একটা ঐক্যের, সামঞ্জস্যের ও সংস্কৃতির ছাপ। এথেনীয় নাগরিকের সাহস হবে অবিমৃষ্যকারীর সাহস নয়, সে সাহস হবে চিন্তাশীল ব্যক্তির সাহস; এথেন্সবাসীর মিতাচার শুধু কৃচ্ছ্র সাধন বা সুখদুঃখের প্রতি ঔদাসীন্যই নয়, তা' হবে অন্তরের গভীরতর অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রকাশ—এথেন্স-

বাসীর মন হবে এমন যে, সে সহজেই ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতার মর্ম অনুভব করতে পারবে এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার ইচ্ছাও হবে প্রবল। এথেন্সবাসীর কাছে ধর্ম মানে এই ছিল যে সামঞ্জস্য সূত্রে গাঁথা মানুষের সমস্ত দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তি উৎসর্গীকৃত হবে রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য; তাঁর কাছে ধর্ম ও সৌন্দর্যের মধ্যে কোন প্রভেদই ছিল না—দুইই এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজকের আমাদের জটিল জীবনযাত্রায় যেখানে কর্ম হয়ত নিরর্থক বা প্রায়ই সৌন্দর্যবিরোধী ও পরিপন্থী সেখানে ধর্ম ও সৌন্দর্য এক এ মতবাদ হয়ত অবিশ্বাস্য ও হাস্যকর বলে বোধ হবে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য এথেন্সবাসীরা ধর্ম ও সৌন্দর্যের একত্বের ভিত্তিতেই তাঁদের স্বর্ণযুগের সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন এবং এর তুলনা হয়ত পৃথিবীতে খুব কমই আছে। তবে একথাও বলা প্রয়োজন এথেন্সের যে গৌরব তা' কিয়দংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে কারণ তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি হয়েছিল অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে অন্যায় বা অবিচার বরদাস্ত করতে আধুনিক সমাজ মোটেই প্রস্তুত নয়। এথেন্সের সমাজে দাস-অধিকারী অভিজাত সম্প্রদায়ের সভ্যতা, সংস্কৃতি বা শিক্ষার আলো থেকে দাসেরা চিরদিনের মতই বঞ্চিত ছিল, এমন কি এথেন্সের স্বাধীন অথচ দরিদ্র নাগরিকদের কপালেও সুখ ছিল না। কাজেই জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য শুধু সমাজের উর্ধ্বস্তরগুলির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, জনসাধারণ তার বিশেষ কিছু আস্বাদ গ্রহণ করতে পারেনি। এথেন্সের অভিজাত সম্প্রদায় বা ভদ্রমণ্ডলী ব্যবসা-বাণিজ্য বা জমিদারী দেখার কাজ নিজেরা করতেন না; জীবনের সৌন্দর্য বজায় রেখে ও নিজেদের সম্মান বাঁচিয়ে যতটুকু দেখাশোনা করা যায় তাই করতেন। তাঁদের কাজ ছিল এথেন্সের পার্লামেন্ট বা বিধানসভায় যোগদান করা, কাছারিতে জুরি হ'য়ে বসা, বা নৌ-বিভাগে বা সৈন্যবিভাগে নির্দেশিত অংশ গ্রহণ করা—ছোট কাজ করে তাঁরা হাত কালো করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্সেও গ্রীক শিক্ষার অর্ধেকটা ছিল শারীরিক শিক্ষা—পুরানো দিনের যুদ্ধ-প্রস্তুতিশিক্ষাসম্ভূত বটে কিন্তু অনেকটা উদার ও উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত। গ্রীকদের কাছে দৈহিক সৌন্দর্যের মূল্য অনেক বেশী ছিল আজকের দিনের তুলনায়; হেরোডোটাস, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীক মনীষীরা সুখের যে যে উপাদান নির্দেশ করেছেন তা'র মধ্যে স্বাস্থ্য ও দৈহিক সৌন্দর্য হচ্ছে অন্যতম; গ্রীকদের সমবেত বা কোরাস সংগীতগুলো থেকেও এই ধারণাই হয়। কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, শরীরের নানা রকম কসরত, দৌড়ান, লাফান, বর্শা ও ডিস্‌কাস্‌ ছোঁড়া, সাঁতার কাটা ইত্যাদি এথেন্সের প্রত্যেক ছেলেকে শেখান হ'ত যাতে যৌবনে অন্তঃরাষ্ট্র খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করতে পারে বা দৈহিক শক্তি ও কর্মকুশলতা অর্জন করতে পারে শুধু এজন্য নয়, যাতে দেহের সৌন্দর্য ও মর্যাদা এবং মনের সজাগ ভাব, বিচার বুদ্ধি ও সংযম বৃদ্ধি পায় সেজন্যও বটে। এথেনীয় বালক যে জিমনাষ্টিক স্কুলে এসব শিখতো তা'র নাম ছিল প্যালেষ্ট্রা (Palaestra) বা মল্লযুদ্ধ বিদ্যালয়। দৈহিক ব্যায়ামের সংগে বাঁশী বাজানো হ'ত ব্যায়ামোপযোগী নানা সুরে এবং অপেক্ষাকৃত ছোটদের বাজনার সংগে সংগে ড্রিল এবং কি করে সুন্দর ছন্দময় গতিতে সপ্রতিভভাবে চলতে হয় সেই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বড় হলে প্যালেষ্ট্রা থেকে জিমনাসিয়ামে (যুবক ও বয়স্কদের শরীর-চর্চালয়) যেত। এথেনীয় রাষ্ট্র জিমনাসিয়ামের ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং জিমনাসিয়ামের অধিকর্তা বা ডিরেক্টর নাগরিক সভায় মনোনীত হ'তেন।

দৈহিক শিক্ষার বিরুদ্ধে যে মতবাদ ছিল না তা' নয়। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই এর সমালোচনা হয়েছে। জেনোফেনিস (Xenophanes) নামে একজন দার্শনিক কবি বলেছেন "জ্ঞানের চেয়ে দৈহিক শক্তিকে অধিক সম্মান দেওয়া অন্যায়। ভাল মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি বা দৌড়ের ক্ষিপ্রতা (সকল বড় প্রতিযোগিতায় যাকে

শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়) এই সব দ্বারা নগর সুশাসিত হবে না। অলিম্পিয়ার বিজয় হইতে খুব কম আনন্দ বা সৌভাগ্যই আসবে", কিন্তু দৈহিক শক্তি ও সৌন্দর্য এত আনন্দ দান করতো এবং সৈন্য ও নৌবিভাগের প্রয়োজনে আসতো যে গ্রীক সভ্যতা যতদিন ছিল ততদিন দৈহিক শক্তির চাহিদা অটুট ছিল। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষা যে রূপ নিয়েছিল খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগের দিক থেকে তাতে দৈহিক শিক্ষার চাইতে মানসিক শিক্ষাই বেশী কাম্য হ'য়েছিল।

এ দৈহিক বা সেনানী শিক্ষার সংগে সংগে চলতো সাংস্কৃতিক শিক্ষা; আগেই বলেছি সাংস্কৃতিক শিক্ষার উপর এথেন্স জোর দিত অনেক বেশী। সাংস্কৃতিক শিক্ষার স্থান ছিল 'ব্যাকরণ বিদ্যালয়' ও 'সংগীত বিদ্যালয়'। কিন্তু এগুলোর ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করতো না। এথেনীয়দের কাছে সংগীত ও সংস্কৃতি প্রায় সমার্থক হয়ে দাড়িয়েছিল এবং প্লেটো (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) তা'র অমূল্য পুস্তকে* কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি 'সংগীতের' অন্তর্ভুক্ত করেছেন; তাই তিনি গ্রীক শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে বলেছেন 'দেহের জন্য জিমনাষ্টিক, আত্মার জন্য সংগীত'। যাহোক সাত বছর বয়সে এথেনীয় শিশু একবার প্যালেষ্ট্রা, একবার ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে পালা করে যেতো তার দাস-অভিভাবক বা পেডাগগের † সংগে। কিছু পরে অর্থাৎ ব্যাকরণ ও শরীরচর্চা আয়ত্ত হলে তারা যেতো সংগীত বিদ্যালয়ে। শিক্ষক বা বৈয়াকরণ কোন ধরাবাঁধা নিয়মে স্কুল চালাতেন না। কোন দিন শিক্ষা দিতেন উন্মুক্ত আকাশের তলে, কোন দিন রাস্তায়, কোন দিন বা পার্কে। শিশুরা তাঁর কাছে শিখতো লিখন, পঠন ও সামান্য ব্যাকরণ আর শুনতো তন্ময় হয়ে দেবদেবীর কাহিনী। শিশু মুখস্থ করতো হোমারের

---

* Plato—The Republic.

† সেদিনের পেডাগগ মোটেই শিক্ষক ছিল না, ছিল মাত্র দাস-তদারক। এথেনীয় নাগরিকদের মধ্যে যাঁদের অবস্থা ভাল ছিল তাঁরা এদের রাখতে সমর্থ হতেন। সুন্দর শিশুদের পথে বিপদের সম্ভাবনা ছিল সেজন্য এ ব্যবস্থা করা হ'ত।

ইলিয়াড ও অডেসী মহাকাব্যের সুন্দর সুন্দর বাছাই অংশ। বালক বয়সে সে আবৃত্তি করতো বীণার ঝঙ্কারের সংগে সেই অপূর্ব কবিতা। সংগীত শিক্ষক বা বাঁশী ও বীণাবাদক প্রথম ছেলেদের গান গাইতে শেখাতেন, তারপর শেখাতেন বাঁশী, বীণা ও গীটার বাজানো। প্লেটো ও তাঁর শিষ্য অ্যারিষ্টটল (দু'জনেই এথেনীয়) এ বিষয়ে একমত যে সংগীত ও বাদ্যের ছন্দ, তান, লয় ও মাধুর্য মানুষের আত্মাকে দেয় ঐক্যের, সামঞ্জস্যের ও সৌন্দর্যের সন্ধান, তার উগ্র কামনা বাসনাকে করে শান্ত, মনকে করে উন্নত ও উদ্দীপিত অর্থাৎ মানুষের চরিত্রগঠনের প্রকৃত উপায় হচ্ছে সংগীত। একথা ভুললেও চলবে না গ্রীক জাতীয় জীবনে সংগীতের ব্যবহার ও প্রভাব ছিল খুবই বেশী। আইনকানুন সংগীতের মাধ্যমে প্রচারিত হ'ত। ধর্মসম্বন্ধায় কর্তব্য সম্পাদন করতে হ'লে গান গাওয়ার প্রয়োজন হ'ত! এমন কি থেমিষ্টোক্লিসের মত রাজনীতিজ্ঞ দেশপ্রেমিক বীর সম্বন্ধেও বলা হ'ত তাঁর শিক্ষা অসম্পূর্ণ রয়েছে কারণ সংগীতবিদ্যা তাঁর জানা ছিল না। সংগীতের প্রভাব সম্বন্ধে প্লেটো এমন অদ্ভুত কথাও বলেছেন* "অজানা ধরনের সংগীতের প্রবর্তনে সমস্ত রাষ্ট্রের ভিত্তি টুটিয়া যাইতে পারে কিন্তু ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করা যাইতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রাণ না বদলাইয়া সংগীতের ধরন বদলান যায় না।" কোন্ ধরনের সংগীত ও কবিতা সাহসিকতা ও মিতাচারকে সাহায্য করবে, পুরুষোচিত প্রকৃতিকে অবনমিত করবে না এবং কোন ধরনের সুর চারণের ওপর, সবচেয়ে বেশী নৈতিক প্রভাব বিস্তার করবে এ প্রশ্ন সর্বদা তাঁদের মনে জাগতো। আবার দেখি সংগীতের সুর গম্ভীর (Dorian) হবে না করুণ হবে (Lydian), বীণায় একটা তার বেশী থাকবে, বা দুটো বেশী থাকবে, বাঁশী নৈতিক ভাব আনে না নৈতিক অবনতি ঘটায় এসব প্রশ্নের সংগে চরিত্র গঠনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এথেনীয়েরা

* Plato—The Republic. 424-C.

দেখতে পেতেন। তবে আমরা এসব সম্যকভাবে বুঝি আর নাই বুঝি (গ্রীক স্বরগ্রামের অভাবে) একথা ঠিক যে প্রাচীন ভারতে ও চীনে সংগীতের স্থান ছিল খুবই উচ্চে। বেদ ও বুদ্ধের ধর্মপদ গীত হ'ত, ছাত্রেরাও গুরুর কাছে তাই শিখিতো। চৈনিকদের বিশ্বাস ছিল সংগীতবিদ্যা না জানলে শাসন করবার ক্ষমতা জন্মায় না অর্থাৎ শাসনকর্তার চরিত্রে যে-সব গুণ থাকা প্রয়োজন তার উদ্ভব হয় না। রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংল্যাণ্ডে সংগীত চর্চার কিছু স্থান ছিল কিন্তু পরবর্তী কালে তা' লোপ পেয়ে যায়—যেমন পেয়ে যায় ভারতবর্ষে। নেপোলিয়ান সংগীতের শিক্ষাদান গুণে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি একবার বলেছিলেন "নৈতিক কণ্ঠসংগীত বা যন্ত্রসংগীত মানুষের ভাবাবেগ ও চরিত্রের উপর মস্ত বড় একটা প্রভাব বিস্তার করে এবং এর প্রভাব ভাল একখানা পুস্তকের চাইতেও বেশী কারণ পুস্তকটি আমাদের যুক্তিকে হয়ত জয় করিতে পারে কিন্তু আমাদের অভ্যাস বা চরিত্রকে বদলাইতে পারে না।" একথাও মনে রাখা প্রয়োজন গ্রীক সংগীত খুব সাদাসিদে ধরনের ছিল এবং সুরগুলোও কসরতবর্জিত সোজা ছিল; কাজেই মনের ওপর এর প্রভাব হ'ত খুব বেশী। বর্তমান ভারতে সংগীত সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি কেটে গেছে বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে যেখানে আজ ঘরে ঘরে ঋষি বংকিমের উদাত্ত সঞ্জীবনী মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্', রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সংগীত বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উদ্দীপনাময় দেশপ্রেমের সংগীত গীত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে সংগীত ও নৃত্যের স্থান আবশ্যিক বিষয়গুলোর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে। তবে দেশে এ চেতনা আনা প্রয়োজন আরও ব্যাপকভাবে যে সংগীতের সংগে চরিত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং দ্বিতীয়া শিক্ষায়ও যাতে সংগীতকে সম্মানিত স্থান দেওয়া হয় সে বিষয়ে শিক্ষা-সংস্কারকগণের দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

আরেকটি বিশেষ জিনিষ ছিল গ্রীক শিক্ষায়—সেটি হচ্ছে নৃত্য—এ জিমনাষ্টিক ও সংগীতের চেয়েও পুরানো এবং চারুকলার

সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি। মানুষের মনে যখন প্রথম জেগেছিল আনন্দ বা বিস্ময়, নৃত্যের ভংগীতেই তা' পেয়েছিল প্রকাশ। এখানে নিওলিথিক মানুষের সংগে এথেনীয় নাগরিকের যথেষ্ট যোগ রয়েছে কারণ প্রত্যেক প্রাচীন ধর্মে নৃত্যের মাধ্যমেই দেবদেবীর কাহিনী ও পূজো অভিনীত হয়েছে এবং, নৃত্য থেকেই পরে উদ্ধৃত হয়েছে গ্রীক নাটক।

এথেনিউস (Athenaeus) নামে একজন গ্রীক লেখক প্রায় ৭০০ বৎসর পর (দ্বিতীয়-তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর পুস্তকে পুরানো গ্রীকনৃত্যের একটা তালিকা দিয়ে গেছেন। এ থেকে দেখা যায় ধর্মীয় উৎসবানুষ্ঠান ছাড়াও দৈনন্দিন প্রায় প্রতি ব্যাপারেই নৃত্যের অবকাশ ছিল এবং নানারকম নৃত্যের চলন ছিল। যুদ্ধ নৃত্য, করুণ নৃত্য, ভোজের নৃত্য, গাম্ভীর্যপূর্ণ নৃত্য, আনন্দের নৃত্য, বসন্ত নৃত্য, আঙ্গুর আহরণ নৃত্য, ডায়োনিসাস্ নৃত্য, ইত্যাদি। স্পার্টায় পাঁচ বছরের ওপরে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই যুদ্ধ নৃত্য নাচতে হ'ত। এই নৃত্যের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে অংগভংগী ও অভিনয়ও চলতো এবং রংগমঞ্চ থেকে এখানে অভিনয়ের অবকাশও বেশী ছিল।

যে ছেলে আঙ্গুরের দেবতা ডায়োনিসাস্‌কে (Dionysus) সম্মান প্রদর্শনার্থ নাচতো সে নিজের অংগভংগীর ভেতরেই দেবতার কাহিনীটি প্রকট করতে গিয়ে নিজেই দেবতার মধ্যে লীন হ'য়ে যেতো। দ্রাক্ষালতা রহস্যময়ভাবে পৃথিবীর বুক থেকে উঠে দুদিনের জন্য রৌদ্র বৃষ্টিতে তার মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতো, তারপর আসতো দুঃখ, তাকে পিষে ফেলত দ্রাক্ষারসের জন্য কিন্তু বিজয়ের মুহূর্তও আবার আসতো তার জীবনে যখন নবজীবনের রসে সে দ্রাক্ষালতা উঠতো আবার সোনালী রোদে মাথা উঁচিয়ে। এখানে অভিনয়ের ও নীতি উপদেশের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। তারপর সে ডায়োনিসাসের জীবনের দুঃখের অংশটুকু নৃত্যে দেখাতো—নগর থেকে নগরে তাড়িত হচ্ছে, শত্রু পিছু পিছু আসছে, তারপর এল তাঁর চরম বিজয়। এই দুঃখ, ভয় ও

বিজয়ের আনন্দ নৃত্যের ভংগীতে, মুখের অভিব্যক্তিতে ও অন্তরের ভাবাবেগে মূর্ত হ'য়ে উঠতো বালকের নৃত্যে এবং প্রাণ ঢেলে নাচার জন্যই—এ নৃত্যটি হ'য়ে উঠল বালকের পক্ষে একটি ধর্মীয় অভিজ্ঞতা। কাজেই গ্রীক বালক নৃত্যের মাধ্যমে অনেক কিছু শিক্ষা পেতো—ছন্দময় লীলায়িত গতি, ভাবের অভিব্যক্তি, অভিনয়, আনন্দ ও ধর্মভাব। আধুনিক শিক্ষায় নৃত্যের প্রবর্তন এখনও ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি, তবে বৈদিক ভারতের গোষ্ঠীগত স্ত্রী-পুরুষের নৃত্যগীতের প্রথা আজ বাংলাদেশে খানিকটা চালু হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন গ্রীকদের কাছে নৃত্য, সংগীত ও কবিতা খানিকটা এক জিনিষ ছিল এবং সেজন্য বালকদের কাছে, এর একটা বিশেষ আবেদন ছিল। কিন্তু আজ আমরা কবিতা ও সংগীতকে পৃথক্ করেছি এবং এদের দু'টিকেই আবার দূরে সরিয়ে নিয়েছি নৃত্য থেকে, ফলে এক একটি জিনিষের মান নিশ্চয়ই উচ্চতর হয়েছে কিন্তু যে অপূর্ব আনন্দ পাওয়া যেতো প্রাচীন গ্রীসে এদের সহজ সমবায়ে তা' থেকে আজ আমরা বঞ্চিত। মঁসিয়ে ডালক্রোজ (M. Dalcroze) বর্তমান কালে ব্রুসেল্‌সে (Brussels) নৃত্য, কবিতা ও সংগীতের এ সমবায় পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁর স্কুলে কিন্তু তিনি নৃত্য ও কবিতাকে বড় স্থান না দিয়ে দিয়েছেন কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতকে—অর্থাৎ ব্যবস্থা হয়েছে উল্টো, কাজেই ফলও আশানুরূপ হয়নি।

আমরা যে শিক্ষার কথা এতক্ষণ বলেছি সেটা হচ্ছে প্রায় সাত বছর থেকে প্রায় ১৪ বৎসর পর্যন্ত এথেনীয় বালক ও কিশোরের প্রাথমিক শিক্ষা। এই ব্যাকরণ, জিমনাষ্টিক ও সংগীতের শিক্ষা এথেন্সের নেতৃত্বে পারস্য পরাজয়ের পর গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোতে বিশেষ করে এথেন্সে আরও সমৃদ্ধতর জ্ঞানের দিক থেকে হোল গ্রীসের স্বর্ণযুগে। এই নবজাগরণের সময় শুধু ট্রাজেডি, কমেডি ও গীতিকাব্যেরই সৃষ্টি হয়নি। জ্যামিতি,

জ্যোতিষ্কবিদ্যা, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি ও গ্রীসের চারিপাশের জগৎ সম্বন্ধে অনেক নোতুন তথ্য গ্রীক জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছিল। নব্য এথেন্স যা কিছু নোতুন জানবার তা' না জেনে সন্তুষ্ট বা শান্ত হ'তে পারছিল না। কাজেই স্কুলগুলোতে পুরনো বিষয়বস্তুর সংগে নোতুন বিষয়বস্তু বা তথ্যেরও কিছু হ'ল যোগ। গ্রীক বালক তখনও বীণার ঝঙ্কারের সংগে হোমার থেকে আবৃত্তি করতো কিন্তু কৈশোরে তাকে আরও কবিতা, বিশেষ করে আধুনিক কবিতা পড়তে হ'ত এবং এই কবিতার ভালমন্দ বিচার করবার সুযোগও সে পেত। সে কিছু গণিত, বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষা করতো এবং বক্তৃতা ও বিতর্কেও যোগদান করতো। বইয়ের ব্যবহার আস্তে আস্তে বাড়ছিল কিন্তু যুগের প্রাণ ছিল লেখায় নয় বা পুস্তকেও নয়—প্রধানত কথায় ও বক্তৃতায়। সে যুগের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হ'ত আলোচনা এবং বাগ্মিতা দ্বারা, পুস্তিকা, সংবাদপত্র বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের দ্বারা নয়। প্রত্যেক কিশোর ও যুবক স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বাগ্মিতা ও বিতর্কের শিক্ষা গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়ে থাকত।

খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে সোফিষ্ট (Sophist) নামে ভ্রাম্যমাণ লেক্‌চারার বা শিক্ষকদলের উদ্ভবের সংগে সংগে তার সুযোগও উপস্থিত হোল যথেষ্ট। কারণ ১৮ বৎসরের আগে রাষ্ট্রপরিচালিত আবশ্যিক সামরিক শিক্ষা শুরু হ'তনা। ১৪ বছর থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ চার বছর এথেনীয় পিতা পুত্রকে আপন খুশিমত যা প্রয়োজন তা' শিক্ষা দিতে পারতেন। সাধারণ এথেনীয় কিশোর এ সময়টা জিমনাষ্টিক বা অশ্বারোহণ বা রথচালনা ইত্যাদি শিখত কিন্তু যাদের কিছুমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তারাই যেত এই ভ্রাম্যমাণ সোফিষ্ট শিক্ষকদের কাছে। সোফিষ্ট কথাটার মানে হচ্ছে জ্ঞানদাতা। এরা শিক্ষা দিতেন সাহিত্য, বাগ্মিতা, রাজনীতি নব আবিষ্কৃত তথ্যাদি ও মতবাদ, অর্থাৎ আলোচনা, বিতর্ক ও বাগ্মিতায় যাতে সফলতা অর্জন

করতে পারে এমন শিক্ষা। এঁদের শিক্ষা দেবার কোন স্থান ঠিক ছিল না। কোন সময় কোন বাড়ীর আংগিনায়, কোন সময় জিমনাসিয়ামের মাঠে, কখনো বা মন্দিরে। অনেক সোফিষ্ট খুব পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং মৌলিক চিন্তারও পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু কেউ কেউ আবার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বা হাইড পার্ক বক্তার বেশী উপরের স্তরের ছিলেন না। অভিজাত বংশের ছাত্রেরা অনেক সময় এঁদের সন্দেহের চক্ষে দেখতেন কারণ শ্রোতার ভিড় না জমাতে পারলে এঁদের জীবিকানির্বাহ সম্ভব হ'ত না কিন্তু এঁরা গ্রীক জাতিকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। অবশ্য সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি এথেনীয় দার্শনিকদের সম্মান অনেক বেশী ছিল। তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পর্যায়ে ফেলা যায়। সোফিষ্টদের বদনাম যেটুকু হয়েছিল তার কারণ হচ্ছে বিতর্কের সময় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে তাঁরা যেমন দক্ষতার সহিত যুক্তি দিতেন আবার সমান দক্ষতার সংগেই অসত্য ও অবিচারের সমর্থন করতেন; কাজেই অনেকেই তাঁদের কোন স্থির বিশ্বাস নেই বলে দোষ দিতেন।

এ ধরনের শিক্ষার বিপদ আছে অনেক—জ্ঞানকে সস্তা ক'রে দেওয়া। কথার জন্য কথা বলা বা জেতবার জন্য তর্ক করা, সব কিছুতেই ঠোকর মারা অথচ কোনটার মধ্যেই ভাল ক'রে প্রবেশ না করার যে বিপদ তা' এ শিক্ষায় আছে। তবে শিক্ষার প্রসারের সংগে কতগুলো ধারণা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে বোধ হয় এ মূল্য দিতেই হবে। যে শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা যায় না সে শিক্ষাব্যবস্থা কোন ধারণা চারদিকে ছড়াতে পেরেছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে অর্থাৎ সে তা'র উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভই করেনি। তবে গ্রীস নিজেই তা'র সমালোচক সৃষ্টি করেছে। সক্রেটিস ও প্লেটোর মধ্যে—একজন প্রত্যেকটি শব্দের ও ভাবের তাৎপর্য নিক্তির ওজনে মেপে ঠিক করেছেন, আরেকজন আপাত দৃশ্যমান আবরণ ভেদ ক'রে জীবনের সত্যের সম্মুখে

মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন—সে সত্য হোল একটি মাত্র বিজ্ঞান—জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের বিজ্ঞান।

এথেনীয় যুবকের শিক্ষার আর এক ধাপ মাত্র বাকী রইল। ১৮ বৎসর বয়সে নগরের সভ্য হিসাবে তার নাম রেজেষ্ট্রিকৃত হোল, এবং মন্দিরে গিয়ে আমরা দেখেছি তাকে শপথ গ্রহণ করতে হ'ল···"আমি আমার দেশকে বৃহত্তর ও মহত্তর করে আমার পশ্চাদবর্তীদের হাতে দিয়ে যাব।···" সে এখন একজন এফিবস (Ephebos) বা সেনানী। একবছর তাকে সামরিক ড্রিল ও অন্যান্য ব্যায়াম করতে হবে এবং এথেন্সের সমুদ্র বন্দর পিরিউসের কাছে পড়বে তাদের ছাউনি। এর পরে তারা সমবেত নাগরিকমণ্ডলীর সম্মুখে শেষ প্যারেড করে তাদের বর্শা ও ঢাল গ্রহণ করবে। এর পরে আবার এক বৎসরের জন্য সীমান্তের দুর্গগুলোতে গিয়ে থাকা ও ঘুরে ফিরে দেখার কাজে ব্যাপৃত থাকতে হ'ত তাদের। ২০ বৎসর পূর্ণ হলে তবে তারা হ'ত পাকা ও পূর্ণ নাগরিক। গ্রীক শিক্ষার মোটামুটি ছবি এই। একথা বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না যে ইংল্যাণ্ডের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় ও পাব্লিক স্কুল ব্যতীত স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ও অংগসৌষ্ঠবে এমন গ্রীক দেবতার মত মানুষ আর কোথাও তৈরী হয়নি। তাই ঐতিহাসিক থুসিডিডিস্ (Thucydides) বলেছিলেন এথেন্সের পূর্ণ শিক্ষার ফলে মানুষ মেয়েলী না হয়েও জীবন সম্বন্ধে উদার মনোভাব পোষণ করতে পারতো।

এবার গ্রীক শিক্ষার অনুজ্জ্বল দিকটা দেখা প্রয়োজন। দরিদ্র নাগরিকেরা সম্পূর্ণ শিক্ষার সুযোগ পেতনা; সোলনের (Solon) ইচ্ছা থেকে মনে হয় তারা শুধু পড়তো, সাঁতার কাটতো ও একটি বৃত্তি শিখতো। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা ছিল স্ত্রী-শিক্ষার এবং এ বিষয়ে এথেন্স স্পার্টা থেকে অনেক পেছিয়ে ছিল। এথেন্সের মেয়েরা প্রায় কোন শিক্ষাই পেত না —শুধু কাপড়-চোপড়ের বাক্স গোছান, সূতো কাটার জন্য দাসদের তুলো বণ্টন করা ইত্যাদি গৃহস্থালী কাজে যা শিক্ষা

হয় তাই তাদের হ'ত। যদি কোন মেয়ে লেখাপড়া কিছু শিখতো সেটা ছিল নিয়মের ব্যত্যয়। সাধারণ এথেনীয় পুরুষের নিকট নারী ছিল মাত্র গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক ও সন্তানের গর্ভধারিণী, জীবনের সংগী নয়। পেরিক্লিস বলেছিলেন—"সেই নারীই ধন্য যাঁর কথা পুরুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায় না, সে ভালোর জন্যই হোক বা মন্দের জন্যই হোক।" নারী সম্বন্ধে এথেনীয়েরা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির তুলনায় অনেক পেছিয়ে ছিলেন। এ বিষয়ে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও প্লেটোর আদর্শ অবশ্য তাঁর দেশবাসীর আদর্শ থেকে একেবারেই ভিন্ন ছিল।* জেনোফনও তাঁর Economics নামক গ্রন্থে এথেনীয় রমণীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা করবার উপদেশ ও পরিকল্পনা দিয়েছেন।

আমরা যে পাঠ্যসূচীর বিবরণ দিয়েছি তাতে দরকারী বা প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর একান্ত অভাব। বিজ্ঞান বিশেষ স্থান পায়নি, পাটীগণিত অতি সামান্যই শেখান হ'ত; কোনমতে বেচা-কেনা ও ক্যালেণ্ডার গণনার কাজটা চলে গেলেই হ'ল। হোমারের কাব্যকে ইতিহাস না বললে ইতিহাসও স্থান পায়নি, ড্রয়িং শেখান শুরু হোল এথেনীয় গৌরব লোপ পাবার পর। কোন ব্যবসা বা বৃত্তির জন্যও কোন প্রস্তুতি ছিল না। শেষোক্ত জিনিষটি এথেনীয় মর্যাদায় বাধতো কারণ এঁদের আদর্শ ছিল জিমনাষ্টিক ও সংগীতের মাধ্যমে পূর্ণ নাগরিক দেহ ও মনের সামঞ্জস্যের প্রতীক পূর্ণ মানব তৈরী করা। হোমার এঁদের চোখের কাছে তুলে ধরেছিলেন বীরের জীবনের আদর্শ এবং সে হিসেবে তিনি গ্রীকদের চোখে ছিলেন সবচেয়ে বড় শিক্ষক নৈতিক জ্ঞানের। Mēden Agan—nothing in excess—সব জিনিষেই মিতাচার—এই ছিল শুধু এথেনীয় কেন, সমগ্র গ্রীক জীবনের মূলমন্ত্র। ভাবোন্মাদ, বিদ্যার গর্ব, বিরক্তিজনক ব্যবহার ও নৈতিক শুচিবায়ু সবই এদের কাছে ছিল ভগবানের অভিশাপের মত।

* Plato—The Republic.

অবশ্য একথা ঠিক আজকের দিনের বিচিত্র ও জটিল সমস্যা, জীবনের চাহিদা মেটাতে প্রাচীন গ্রীক শিক্ষা একেবারেই অপারগ কিন্তু তাহলেও এর যে শুধু একটা ঐতিহাসিক আবেদনই আছে তা' নয়। আপন গণ্ডী বা সীমার ভেতরে গ্রীক শিক্ষা একটা জীবন্ত পূর্ণ শিক্ষার বাস্তবের ছবি যে ছবিকে বর্ণসুষমায় উজ্জল করেছে এদের আদর্শগুলো—'সুন্দর দেহে সুন্দর মন' বা আনন্দের পর্যাপ্ত অবকাশ শুধু অবিমিশ্র পরিশ্রম নয়। একথা সত্য আজকের কৃষাণ-মজদুরদের স্থান হয়ত হয়নি সে শিক্ষায় কিন্তু তাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্লেটো অ্যারিষ্টটলের ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ভাষায় প্রকাশ পায়। একথাও সত্য শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে প্লেটো অ্যারিষ্টটল যা বলেছেন তার চাইতে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই বেশী কিছু বলতে পারেননি। প্লেটো বলেছেন—"শিক্ষা হোল শ্রেষ্ঠ মানবের সর্বপ্রথম ও সুন্দরতম সম্পত্তি বা ঐশ্বর্য; ভাল শিক্ষা তাকেই বলা যায় যে শিক্ষায় দেহ ও আত্মাকে যতটা সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ দেওয়া যায় তাই দেওয়া হয়।" আবার অন্যদিক থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে প্লেটো বলেছেন—"শিক্ষাকে আমি সেই গুণই বলিব, যে গুণ শিশুদের চরিত্রে প্রকট হয় যখন তাহাদের মনের আনন্দ, দুঃখ, ভালবাসা, ঘৃণা এই ভাবাবেগগুলি একটা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।" অ্যারিষ্টটল শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন—"সম্পদে অলংকার, বিপদে আশ্রয়"। প্লেটো, অ্যারিষ্টটল বা জেনোফনের মধ্যে তাঁদের শিক্ষাপরিকল্পনা সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকনা কেন তাঁরা একটা বিষয়ে একমত যে, শিক্ষা রাষ্ট্রের ভিত্তি। প্লেটোর Republic বা অ্যারিষ্টটলের Politics প্রধানত রাষ্ট্রপরিচালনার শিক্ষা সম্বন্ধে পুঁথি, যেমন জেনোফনের Cyropoedia পারসিকদের রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষার একটি আদর্শ ছবি। লাইকারগাস্ স্পার্টাকে যে শাসনতন্ত্র দিয়েছিলেন তা' জীবনব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এথেন্সে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলিত ছিল তা' অবশ্য এসব লেখকদের পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা হতে বিভিন্ন কারণ এথেন্সে রাষ্ট্রের হাত শিক্ষায় খুব কমই ছিল এক জিমনাসিয়াম পরিচালনা ব্যাপার ছাড়া। এ'কশ বছর আগে ইংল্যাণ্ডে বা ভারতবর্ষে শিক্ষায় রাষ্ট্র যেমন খুবই কম অংশ গ্রহণ করত, এথেন্সেও প্রায় সেরূপ ব্যবস্থাই ছিল। এথেন্স রাষ্ট্রে শিক্ষকদের পরীক্ষা করেও নিত না বা তাঁদের বেতনও দিত না, স্কুলগৃহও সরকারের তহবিল থেকে নির্মিত হ'ত না বা উপস্থিতি কর্মচারিগণও ঘুরে ঘুরে দেখতেন না ছাত্রেরা স্কুলে উপস্থিত আছে কিনা। ফল, এতে অবশ্য খুব শুভ হয়নি কারণ শিক্ষার মান উঁচু হয়নি বা শিক্ষাকাল সব সময় সমান হয়নি। শিক্ষকের মর্যাদাও ছিল কম—স্কুল মাষ্টারি করা যেন এথেন্সে একটা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একটি গ্রীক জলপাত্র আছে, তার গাত্রছবি থেকে দেখা যায় ছাত্রেরা স্কুলে তাদের পোষা কুকুর, বেড়াল ও চিতাবাঘ নিয়ে আসত এবং এসব থেকে মনে হয় শিক্ষককে খুব কমই শ্রদ্ধা করতো তারা। তবে এর অন্য একটা দিকও আছে। এই বাঁধাধরা নিয়মহীন শিক্ষার ভেতরেও শিক্ষা এত ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তা' দেখে মনে হয় শিক্ষার গুরুত্ব বা মূল্য সম্বন্ধে আস্থার অভাব ছিল না। হাস্যরসের নাট্যকার অ্যারিষ্টফেনিসের (Aristophanes) কমেডিতে দেখতে পাই শূকর মাংসবিক্রেতা পর্যন্ত নিরক্ষর ছিল না। এ কথা নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সাধারণ এথেনীয় নাগরিক লেখাপড়ায় ৫০ বছর আগেকার ইংল্যাণ্ডের নাগরিকের সমকক্ষই ছিল তবে বুদ্ধি ও সংস্কৃতিতে সে ছিল তার অনেক ওপরে কারণ তা'র অভিজ্ঞতা ছিল বহুমুখী। একদিকে পার্লামেণ্টে বা বিধানসভায় নিজে ব'সে (প্রতিনিধির মারফতে নয়) রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনা ও সমস্যা সমাধানে অংশ গ্রহণ করতো এবং আইনকানুন প্রণয়নে সাহায্য করতো বা কাছারিতে জুরি হয়ে ব'সে বিচারকার্য শিখতো আবার অন্যদিকে সুরম্য হর্ম ও

দেবমন্দিরের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে, বা কাব্য ও নাটকের রসাস্বাদন করে তারা সুরুচিসম্পন্ন না হয়ে পারতো না। আমরা যদি শুধু একবার ভেবে দেখি যে দিনের পর দিন এথেন্সের ধনী ও দরিদ্র ত্রিশ হাজার নাগরিক এক সংগে ব'সে জীবনের গভীর সমস্যাগুলো নিয়ে লেখা ট্রাজেডি অভিনীত হ'তে দেখেছে এবং কোন নাটকটি বছরের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করবে তারও বিচার করেছে, এবং সে বিচার আজও আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করছে, আবার যখন এও ভাবি এ সব ট্রাজেডিতে বিশেষ ক'রে তা'দের কোরাস গীতি কবিতায় ব্রাউনিং বা শ্রীঅরবিন্দের কবিতার মত দুরূহ ভাবসম্পদও আছে, তখন নির্বাক বিস্ময়ে স্মরণ করতে হয় এথেনীয় শিক্ষা ও জীবন-ব্যবস্থার কথা।

এ কথা ঠিক বহুকে বাদ দিয়ে শুধু অল্পসংখ্যকের জন্যই এ শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়েছিল এবং এথেন্সের স্বর্ণযুগে কুড়ি হাজার নাগরিকের জন্য চার লক্ষ দাস শ্রম করেছে যাতে তারা এ শিক্ষা ও সংস্কৃতি উপভোগ করবার অবকাশ পায়। কিন্তু আজকের দিনে আমরা চাই এই অল্পসংখ্যকের জন্য যে উঁচুদরের সংস্কৃতি ও শিক্ষাদর্শের উদ্ভব হয়েছিল তা' বহুর জীবনের মধ্যে রূপায়িত করতে।

রোমক শিক্ষা

গ্রীকদের মত রোমকদের মানসিক ক্ষিপ্রতা ছিল না, তাঁদের মত ভাবপ্রবণতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও কৌতূহলও তাঁদের ছিল না। খ্রীঃ পূঃ ২৭ অব্দে রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর মানুষের মন নোতুন আবিষ্কার নিয়ে আর ব্যস্ত থাকতে চাইল না, গেল অন্য পথে; ভুলে গেল প্লেটোর স্বপ্নের কথা, জীবনে বিজ্ঞানের আধিপত্যের কথা—সৌন্দর্য ও বিজ্ঞানের অধীশ্বরত্ব।

রোমকেরা তাদের ছেলেদের এথেন্সে শিক্ষার জন্য পাঠাত একথা ঠিক কিন্তু জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল বিভিন্ন; তারা অন্তরে কোনদিনই গ্রীক হয়নি বা এথেন্সের সংস্কৃতির প্রাণের ভেতর প্রবেশ করেনি; তাদের দৃষ্টি ছিল বিশ্বপ্রসারী, তারা হয়েও পড়েছিল খানিকটা বিশ্বনাগরিক। মনের স্বাধীন প্রবাহ, অবাধ চিন্তা ও গবেষণার আনন্দ, আর্টের মত জীবনের সর্বাংগসুন্দর প্রকাশ এসব রোমক মনের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। রোমকেরা ছিল সর্বোপরি কর্মকুশল ও যাথার্থ্যবাদী —ডাইনে বাঁ'য়ে তাদের দৃষ্টি যেত না, শুধু যেটুকু দরকার তা'র ওপরেই থাকত নিবদ্ধ তাদের দৃষ্টি। তারা জীবনকে কোনদিনই সমগ্রভাবে দেখতে শেখেনি, তারা শুধু রাষ্ট্রে নিজেদের নির্দিষ্ট স্থান নিয়েই থাকত ব্যাপৃত; তারা চরম উৎকর্ষ চাইত না, চাইত কর্মকুশলতা ও সাফল্য। গ্রীকদের তুলনায় তাদের ধারণা ছিল সংকীর্ণ যা সহজে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়। তারা দিনের কাজ করতো নিয়মিতভাবে সাহস ও গাম্ভীর্যের সংগে, বিপদের সম্মুখীন হ'ত নির্ভিক চিত্তে; তাই জয় করেছিল তারা পৃথিবী। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার করবার ইচ্ছা বা নৈপুণ্য তাদের ছিল না, তর্ক-শাস্ত্রের বাইরে তারা বড় একটা যেতে চাইত না, তারা চাইত শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা; তাই তারা দিতে পেরেছিল ইউরোপকে তা'র আইনকানুন। তাদের শিক্ষাদর্শ ছিল 'স্বাস্থ্যদীপ্ত দেহে স্বাস্থ্যবান মন', গ্রীসের 'সুন্দর দেহে সুন্দর মন' নয়।

এ রকম একটা জাতি তার দীর্ঘ ইতিহাসের বিবর্তনে কি রকম শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করবে তা' সহজেই অনুমেয়। জীবনের প্রথম দিকটায় তারা হবে যোদ্ধা, কষ্টসহিষ্ণু, বিজয়ী সেনানী, তারপর যখন থেকে তা'রা আসবে এথেন্সের সংস্কৃতির আওতায়, তখন থেকে বদলে যাবে তাদের শিক্ষাদর্শ। রিপাব্লিকের সময় থেকে গ্রীক বিজয় পর্যন্ত (১৪৬ খ্রীঃ পূঃ) তারা স্পার্টান আদর্শ অনুসরণ করেছে শিক্ষাবিষয়ে, কিন্তু তারপর থেকে এথেনীয় শিক্ষাব্যবস্থাই অনুসৃত

হয়েছে বেশীর ভাগ, বিশেষ করে সাহিত্য ও বাগ্মিতাকে দেওয়া হয়েছিল সর্বপ্রথম স্থান। রোমক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনের চাহিদা মেটান, ধৈর্যশীল কষ্টসহিষ্ণু দেশপ্রেমিকের যা' কর্তব্য তাই সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেওয়া ; কাজেই তাতে আধ্যাত্মিক জীবনের সৌন্দর্য, চারুকলার আবেশ, অবকাশের সাংস্কৃতিক ব্যবহার—এসব কিছুই ছিল না, জীবনের কঠোর প্রয়োজনে যা' দরকার তাই সে শিক্ষা জুগিয়েছে। জনগণসমক্ষে কোথায় ইসকিলাস বা ইউরিপিডিসের নাটক অভিনয় আর রোমক জনগণসমক্ষে কোথায় সিংহের সংগে মরণাত্মক যুদ্ধ—দু'টো সাংস্কৃতিতে কত তফাৎ! আমরা দেখেছি প্রয়োজনের স্বরূপ হয়ত বদলেছে রোমক শিক্ষায় বিভিন্ন সময়ে কিন্তু শিক্ষা যে প্রয়োজনের তাগিদে সে ধারণায় কোন পরিবর্তন হয়নি কোন সময়েই। সেজন্য অনেকে রোমক শিক্ষাকে 'শিক্ষা' আখ্যা দিতে অনিচ্ছুক। এথেনীয় শিক্ষায় মনের দিকটা, সাংস্কৃতিক দিকটা, অ-প্রয়োজনের শিক্ষাটা ছিল বড়।

রিপাব্লিকের প্রারম্ভে প্রাচীন রোমক শিক্ষা ছিল শুধু দৈহিক ও ধর্মীয় শিক্ষা। বালক সাঁতার কাটতে, ঘোড়ায় চড়তে, যুদ্ধ করতে ও কৃষিকাজ করতে শিখতো আর শিখতো অসংখ্য দেবদেবীর পূজো করতে কারণ রোমকেরা খুবই ধর্মনিষ্ঠ ছিল। পূর্বপুরুষদের আচার-ব্যবহার অনুসরণ করাও ছিল তাদের শিক্ষার অন্যতম কর্তব্য। আদর্শ রোমক ছিল গম্ভীর, সংযত ও কঠোর প্রকৃতির। তার কর্তব্য ছিল গৃহ সুষ্ঠুভাবে চালান, এবং নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা (যদি তা'র কর্তব্যের মধ্যে সেটা পড়ত)। রাষ্ট্রের আইনকানুন জানা অতীব আবশ্যক ছিল সুতরাং আইনকানুন (The Laws of the Twelve Tables) যখন গৃহীত ও খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে প্রকাশিত হোল, তখনই তাই হোল ছাত্রের অধ্যয়নের প্রধান বিষয় বস্তু ও প্রথম রীডার। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ল্যাটিনে আর কিছু পড়বার মত ছিল না।

খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষে রোমে প্রথম স্কুল খোলা হয়, সুতরাং সে পর্যন্ত রোমক বালক বালিকাদের পিতামাতা ও প্রকৃতি ব্যতীত আর কোন শিক্ষক ছিল না। বালক লিখন, পঠন, গণনা বা আইনকানুন যা' কিছু শিখত তা' পিতার কাছেই শিখত যেমন তা'র বোন শিখত সুতো কাটা, কাপড় বোনা তার মায়ের কাছে। তবে রোমক বালক লেখাপড়া বেশী শিখুক আর নাই শিখুক, তার ভবিষ্যত জীবনের করণীয় কাজ সম্বন্ধে তার বেশ একটা ব্যবহারিক জ্ঞান জন্মাত পিতার সাহচর্যে। পিতার সংগে যারা আইনকানুন বা জমিজমা সম্বন্ধে সকালবেলা পরামর্শ করতে আসত তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতো বালক আবার পিতা যখন পূর্বপুরুষদের বীরত্ব কাহিনী স্মরণ করবার জন্য উৎসব করতেন বা নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন স্বীয় স্বার্থের জন্য (গ্রীক পূজো অনেক রহস্যময় ও আধ্যাত্মিক ছিল), তখনো সে তাতে একটা সক্রিয় অংশ শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করতো। পিতা সেনেটের সভ্য হলে সেই বিজ্ঞজন সভায় পিতার সংগে সে যেতো ও সেখানে বিতর্কাদি শুনে রাজ্য শাসন এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে তার একটা ধারণা জন্মাত।

রোমক পিতা ছিলেন সন্তানের সর্বময় কর্তা, শুধু জন্মদাতা বা গৃহের অধিপতি নন, পরিবারের পুরোহিতও; এমনকি সন্তানকে যে জীবন তিনি দিয়েছিলেন তা' বিনষ্ট করবার অধিকারও তাঁর ছিল। কার্থেজ জয় (১৪৯ খ্রীঃ পূঃ) করা পর্যন্ত রোমক শিক্ষার এই ছিল রূপ। কিন্তু গ্রীসের প্রভাব শতাধিক বৎসর আগে থেকেই চলেছিল রোমের জাতীয় জীবনে এবং করিন্থ বিজয়ের (১৪৬ খ্রীঃ পূঃ) পর থেকেই, Horace-এর কথায়, 'বিজিত গ্রীস বিজেতা রোমকে তার ক্রীতদাস করে ফেলল'। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার রূপ না বদলালেও, আমরা যাকে আজ দ্বিতীয়া শিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষা বলি তার রূপ গেল একেবারে বদলে আদিম যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে একজন গ্রীক

ক্রীতদাস কর্তৃক হোমারের অডেসী ল্যাটিনে অনূদিত হয়েছিল, এর পরে হয়েছিল গ্রীক কবিতা ও নাটক; কাজেই নব প্রতিষ্ঠিত রোমক স্কুলগুলোতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর অভাব রইলনা। সাহিত্য, অলংকার ও ব্যাকরণের দিকে ঝোঁক আসার সংগে সংগে পুরনো দিনের কঠোর শিক্ষাব্যবস্থা আস্তে আস্তে লোপ পেতে লাগলো। তবে একথা বলা যায় নোতুন শিক্ষাব্যবস্থায়ই হোক আর পুরনো শিক্ষাব্যবস্থায়ই হোক, রোমক শিক্ষা ছিল প্রাণহীন, তা' কর্মোৎসাহের উৎসকে বা মানুষের আত্মাকে করতো না মুক্ত— শুধু কতগুলো নির্ধারিত কাজ যন্ত্রের মত করে যাবার ক্ষমতা মুক্ত হয়ে যোগাত। পিতাও সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব থেকে ধনী গ্রীক পিতার মত পেডাগগের হাতে তাকে সঁপে দিতেন। প্লুটার্কের মতে যে সব রোমক ক্রীতদাস একেবারে অকর্মণ্য, মাতাল বা পেটুক ছিল তাদেরই এই তদারকের কাজে দেওয়া হ'ত; এ বিষয়ে গ্রীসের পেডাগগ্ সময় সময় সামান্য মাতলামো করলেও অনেক বেশী কর্মপটু ও দায়িত্বসম্পন্ন ছিল।

গ্রীস বিজয়ের এ'কশ বছর পর রোমের বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক বাগ্মী কিকিরোর (Cicero) সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ১০৬—৪৩) গ্রীক প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। গ্রীকরা তখন অবশ্য বিশ্বের নেতা আর ছিলেন না কিন্তু হয়ে পড়লেন জগতের শিক্ষাদাতা। শিক্ষিত রোমক যুবক তখন ল্যাটিন ও গ্রীক দুইই শিখতেন এবং এ দু'ভাষাতেই গ্রীক দর্শন, সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্র আয়ত্ত করতেন। গ্রীক ভাবসম্পদ ল্যাটিনে রূপান্তরিত করবার কালে কিকিরোর নিজের দানও কিছু কম নয়।

রোমক শিক্ষার ওপর গ্রীসের প্রভাবের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। শিক্ষিত গ্রীক যুবকের কাছে কাম্য ছিল জ্ঞান, নোতুনত্ব ও সৌন্দর্য; শিক্ষিত রোমক যুবক চাইতেন শক্তি বা ক্ষমতা। পৃথিবী শাসন করবার কাজ ছিল রোমকদের—ক্ষমতার প্রয়োজন; কাজেই এই ক্ষমতা বা শক্তি স্কুলের আওতায় কি করে আনা যায় এই হোল

সমস্যা। এক হচ্ছে যুদ্ধবিদ্যা—সে ব্যাপারে নোতুন শিক্ষা পুরনো শিক্ষাকে হার মানাতে পারে না, আর হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যসম্ভূত আর্থিক ক্ষমতা কিন্তু সে তো স্কুলের জীবনের পরে ছাড়া আগে হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বাকী রইল বিতর্ক ও বাগ্মিতার পথ। এ পথে চললে যশের দ্বার কত ভাবেই না উন্মুক্ত হতে পারে, শক্তিশালী রিপাব্লিক বা সাম্রাজ্যের কোন্ উচ্চ শিখরেই না আরোহণ করতে পারে সপ্রতিভ যুবক! পুরনো দিনের সেনেটের ছোট ছোট বক্তৃতা আজ আর কাজে আসে না—শ্রোতার সংখ্যা গেছে বেড়ে; জটিলতর হয়েছে রাষ্ট্রের সমস্যা এবং অনেকে বেশ ভাল বলতে-কইতে শিখেছে—সুতরাং আমার পুত্রকেও দিতে হবে এই শিক্ষা স্থির করলেন রোমক পিতা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বক্তা ও কথোপকথনকুশলী একমাত্র গ্রীকরাই পারবে এ পথ দেখাতে।

ধনী রোমক পিতার পুত্র এল এথেন্সে বাগ্মিতা, যুক্তি, তর্ক, সাহিত্য, অলংকার, টীকা বা ভাষ্য এ সব নোতুন শাস্ত্র শিখবার জন্যে, আর গ্রীক স্কুল খোলা হোল রোমে ও ইতালীর অন্যান্য জায়গায় যারা এথেন্সে যেতে পারবেনা তাদের জন্য। রোমকদের দৃষ্টিতে শব্দের তাৎপর্য ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা ও বাগ্মিতার ক্ষমতা অর্জন করা হোল শিক্ষার সাফল্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কারণ এই পরিবর্তিত দিনে যিনি জনসভায়, সেনেটে বা আদালতে বক্তৃতার মাধ্যমে সকলকে নিজের মতানুবর্তী করতে সক্ষম হবেন তিনিই হবেন রাষ্ট্রে উচ্চপদের যোগ্য অধিকারী। এমন কি বাগ্মিতা রণকুশলতার চাইতেও সম্মানের স্থান অধিকার করে বসল। কাজেই এই অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হোল যে যদিও গ্রীকদের শিক্ষাদর্শ প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের রাজনীতি ও নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকে আমরা পাই, বর্তমানকালের শিক্ষানীতি পাই মনস্তত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের ভেতর, রোমক শিক্ষাবাদ পাই আমরা কিকিরো, টাসিটাস্ বা আইনজ্ঞ-শিক্ষক কুইন্টিলিয়ানের বাগ্মিতা সম্বন্ধে পুস্তকাবলীতে।

কিকিরোর বাগ্মিতা সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত হোল খ্রীঃ পূঃ ৫৫ অব্দে কিন্তু গ্রীক-রোমক শিক্ষার পূর্ণরূপ আমরা দেখতে পাই প্রায় দেড়'শ বছর পরে কুইন্টিলিয়ানের বিখ্যাত 'বাগ্মিতার সংক্ষিপ্তসার' বা Institutes of Oratory, নামক পুস্তকে। কুইন্টিলিয়ান স্পেন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সম্রাট ডমিশিয়ানের (Domitian ৮১-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) সময় তাঁর নাতিদের শিক্ষার জন্য রোমে আহূত হয়েছিলেন এবং সেখানে একটি স্কুলও খুলেছিলেন। সুতরাং তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল দু'রকমের—গৃহশিক্ষকের ও সাধারণ শিক্ষকের, তাই তাঁর পুস্তকে শিশুশিক্ষায় সাহায্য হবে এমন অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। সম্ভবত তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

কিকিরোর জন্মের সময় গ্রীক প্রভাব বেশ ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রোমক শিক্ষায়। এখন দেখা যাক সে সময় হ'তে কুইন্টিলিয়ানের মৃত্যু পর্যন্ত—মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দু'শ বছরে রোমান বালকের দৈনন্দিন শিক্ষা বস্তুত কিভাবে চলতো এবং গ্রীক বালকের শিক্ষার সংগে কি প্রভেদ ছিল।

প্রায় সাত বছর বয়সে শিক্ষা শুরু হ'ত; রোমক বালক গ্রীক বালকেরই মত পেডাগগের সংগে সূর্যোদয়ের আগেই স্কুল অভিমুখে রওনা হ'ত। প্রাথমিক স্কুলগৃহগুলো ছিল অত্যন্ত দীন ধরনের, রাস্তার ওপরে ছাউনি করা দোকান বা ষ্টলের মত; গ্রীক স্কুলের মতই আসবাবপত্র ছিল খুবই সাধারণ, টুলে বসতে হ'ত, লিখবার ডেস্ক ছিল না, শিক্ষকের বেতন ও পদমর্যাদা গ্রীসের মতই ছিল স্বল্প কিন্তু দৈহিক শাস্তির বিধান ছিল এখানে কঠোরতর। গ্রীক বালকের মত রোমক বালকের শিক্ষারও একমাত্র উপকরণ ছিল মোমের আবরণ দেওয়া কাঠের ছোট্ট বোর্ড, সে হাঁটুর ওপরে রেখে লেখা, পড়া বা শ্রুতলিপির জন্য শ্লেটের মত ব্যবহার করতো এই ছোট্ট বোর্ডকে। এক বিষয়ে রোমান বালক তার গ্রীক

ভাইয়ের চেয়ে ভাগ্যবান ছিল—অন্তত রোমক সম্রাটদের সময় সে তার পাঠ্য পুস্তকখানা ক্রয় করতে পারতো (এই পাঠ্য পুস্তক শিক্ষিত ক্রীতদাসের হাতে লেখা ছিল) এবং শুধু শিক্ষকদত্ত পাঠের ওপর নির্ভর করতে হ'ত না। গ্রীসের মতই শূন্যের এবং সন্তোষজনক সংখ্যা ব্যবস্থার অভাবে পাটীগণিতের কাজে অসুবিধে হোলেও যেটুকু করান হ'ত তা' বেশ ভালভাবেই হ'ত এবং চারটি সরল নিয়ম ব্যতীতও গণনা-বোর্ডের সাহায্যে ভগ্নাংশের কাজ করান হ'ত। হাত বা আঙ্গুল গুণেও অঙ্ক কষা হ'ত, আজ পর্যন্ত ইতালীয়রা এ বিষয়ে খুবই পারদর্শী।

রোমান বালক যখন প্রাথমিক স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্কুলে যেত—তাকে গ্রীক সাহিত্যের মত উঁচুদরের সাহিত্যের অভাবে অসুবিধায় পড়তে হ'ত সে কথা আগেই বলেছি ; তবে অডেসীর ল্যাটিন অনুবাদ দিয়ে এক রকমে কাজ চলে যেত। আইনের দ্বাদশ অধ্যায় (The Twelve Tables) মুখস্থ করতে হ'ত যেমন কিকিরো করেছিলেন তাঁর স্কুল জীবনে বা রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের ব্রিটিশ বালককে কাটেকিজম্ (যীশুখ্রীষ্টের জীবনসংক্রান্ত প্রশ্ন ও তা'র উত্তর) মুখস্থ করতে হ'ত। কিকিরোর পরবর্তী সময়ে রোমক বালকের সাহিত্যের রসাস্বাদন করবার সুযোগ এল ভার্জিল, হরেস্ ও লিভির গ্রন্থাবলীর ভেতর দিয়ে এবং অনেক মেধাবী ছাত্র ল্যাটিন ও গ্রীক দুই শিখত, আবার কেউ বা কুইন্টিলিয়ানের অনুমোদিত ব্যবস্থায় ল্যাটিনের আগে গ্রীক শিখত, যেমন ইংল্যাণ্ডের পাব্লিক স্কুলে এক সময়ে ইংরেজী ভাষার (মাতৃ-ভাষার) আগে ল্যাটিন শেখান হ'ত। শিক্ষক ও বৈয়াকরণ ছাত্রের কণ্ঠস্বর ঠিকমত ওঠানামা করে কিনা এবং মাতৃভাষা ল্যাটিনও যাতে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু বিদ্যা জাহির করবার প্রলোভনও শিক্ষক সংবরণ করতে পারতেন না —নানারকম নীতি উপদেশ, আয়াসপ্রসূত ব্যাখা, ব্যাকরণ ও অলংকারের কসরত, সমার্থক কাব্যাংশ ইত্যাদি সাহিত্য পাঠকে

ভারাক্রান্ত করে তুলতো, আনন্দ বা রসবোধ যে'ত উবে। এ বিদ্যার বোঝা চাপাবার মধ্যে ভাল যে কিছু ছিল না তা' নয়—কিছু জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, পৌরাণিক কাহিনী ও প্রকৃতি বিজ্ঞান এই ফাঁকে শেখা হয়ে যেত। কিছু জ্যামিতি ও সংগীততত্ত্বও শেখান হ'ত। কিন্তু সংগীত নৃত্য বা দেহচর্চা প্রয়োজনানুরক্ত রোমকের কাছে সৌন্দর্য, শ্রী বা আনন্দবোধের শিক্ষারূপে মোটেই গণ্য হোত না। শারীরিক ব্যায়াম অবশ্য যথেষ্ট ছিল কিন্তু সে ছিল সৈন্য তৈরী করবার জন্য। কর্ণেলিয়াস নেপস বলেছেন "পদস্থ লোকের পক্ষে সংগীত লজ্জাজনক ব্যাপার; নৃত্য পাপ"। এমন কি কিকিরোর মত লোকও বলেছেন যে সুরামত্ত বা উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যতীত কেউ নাচতে পারে না। দ্বিতীয়া শিক্ষা পূর্ণ হ'লে উচ্চাভিলাষী যুবক বাগ্মিতা ও অলংকার শাস্ত্রের টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি হ'ত বা অর্থে কুলোলে এথেন্স বা রোড্‌সে গিয়ে গ্রীক দার্শনিক ও আলংকারিকদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতো। একটা বিষয়ে রোমক শিক্ষা এথেনীয় শিক্ষাব্যবস্থা হ'তে উচ্চাদর্শ রেখে গেছে—স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাদের মনোভাবে। মাতার প্রভাব শিশুর জীবনে ছিল যথেষ্ট; কোরিওলেনাস্, গ্র্যাকাই ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য বিখ্যাত সন্তানের মাতারা ইতিহাসে স্থান পেয়েছিলেন। মেয়েরা অনেক সময় ছেলেদের মতই শিক্ষা পেয়েছে এবং রোমক কবি মার্শালের কথা যদি মেনে নেওয়া যায়, তা'হলে হয়ত একই স্কুলে শিক্ষা পেয়েছে। রোমক জনসাধারণের শিক্ষা অবশ্য প্রাথমিক স্তরের ওপরে বেশী উঠত না এবং রাষ্ট্র শিক্ষায় কোন হস্তক্ষেপ করতো না। স্কুলে বাধ্যতামূলক উপস্থিতি, পরিদর্শন, অর্থ-সাহায্য বা শিক্ষকের বেতন এসব কোন বিষয়েই রাষ্ট্র কোন অংশ গ্রহণ করেনি। কিকিরো বলেছেন রাষ্ট্র পরিচালিত একই ছাঁদের শিক্ষা রোমকেরা পছন্দ করতেন না, সেজন্য রোমে প্রত্যেক শিক্ষকই তাঁর নিজস্ব প্রণালীতে পড়াতেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা কতদূর কার্যকরী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

নোতুন যুগের উপযোগী রোমক যুবকের শিক্ষা কি উপায়ে সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে কুইন্টিলিয়ান সে বিষয়ে তাঁর পুস্তকে মতবাদ বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে কর্মকুশল আদর্শ মানুষ বাগ্মী না হয়েই পারে না এবং তার শিক্ষা হাতে নিতে হবে একেবারে মাতৃক্রোড় থেকে। কুইন্টিলিয়ানের মতে বাগ্মিতার সংগে প্রকৃত জ্ঞান ও সদাচরণের সংগে শুধু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই আছে তা' নয়, ওদুটি প্রায় একই জিনিষ। ভাল লোক ও ভাল বক্তা কুইন্টিলিয়ান ও রোমকদের কাছে সমার্থক। বড় কেটো (Cato the Elder) বাগ্মীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন বাগ্মী হলেন সেই সৎব্যক্তি যিনি বক্তৃতায়ও পারদর্শী। কুইন্টিলিয়ান বাগ্মিতার স্বরূপ সম্বন্ধে বলেন "এই সম্বন্ধে যে প্রধান মতভেদ আছে তা' হইতেছে যে কোন কোন পণ্ডিতেরা মনে করেন যে খারাপ বা নীচপ্রকৃতির লোককেও বাগ্মী বলা যাইতে পারে কিন্তু আবার অনেকে মনে করেন—এবং আমিও তাদের সংগে একমত, যে বাগ্মী এই আখ্যা শুধু সৎলোকদেরই দেওয়া যায়" এ যুক্তিতে অনেক গলদ আছে নিশ্চয়ই কিন্তু কুইন্টিলিয়ান যে আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের সংগে এ মতবাদ প্রচার করেছিলেন তাতে রোমক শিক্ষাব্যবস্থায় এর একটা গভীর ছাপ থেকে যাবে তা' আর আশ্চর্য কি ?

প্লেটো বলেছিলেন * "যতদিন পর্যন্ত না দার্শনিকরা রাজা হবেন বা রাজারা দার্শনিকভাবাপন্ন হবেন, ততদিন রাষ্ট্র বা মানব সমাজ অশুভের হাত হ'তে রক্ষা পাবে না।" কুইন্টিলিয়ানও তাঁর বাগ্মীকে শুধু জ্ঞানী গুণী কর্মকুশল রোমক নাগরিক করেই সন্তুষ্ট রইলেন না, তাঁকে শেষ পর্যন্ত দার্শনিক করবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারলেন না। প্লেটোর প্রভাব এড়ানো দায়। কুইন্টিলিয়ান লিখছেন "বাগ্মী দার্শনিক হউন আমি বিশেষ ইচ্ছা করি না কারণ দার্শনিক তাঁহার জীবন-

* Plato—The Republic, V. 473

যাত্রা নির্বাহ করেন সমাজের সকল কর্ম হইতে দূরে সরিয়া গিয়া। কিন্তু আমি যে বাগ্মী গড়িতে চাহিতেছি তিনি হবেন একজন জ্ঞানী রোমক যিনি রাজনীতিতে নিজেকে বিশেষ পারদর্শী করিয়া তুলবেন। সমাজ হইতে দূরে সরিয়া নয়, নিভৃতে বসিয়া আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া নয়, নিজ অভিজ্ঞতা ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার ভিতর দিয়া। আমি কামনা করি এমন এক দিন আসুক যেদিন বাগ্মী আমাদের ইচ্ছানুসারে মানবশ্রেষ্ঠ হইয়া দর্শন অধ্যয়নের উপকারিতা বুঝিতে পারবেন এবং যেন অনেকটা পুনর্বিজয় করিয়া ইহাকে বাগ্মিতার আওতায় আনবেন।"

বাগ্মীকে মানবশ্রেষ্ঠ ক'রে যে শিক্ষাদর্শ রচিত তার গোড়ায় রয়েছে অসত্য এবং যখন এই বাগ্মিতা আস্তে আস্তে বিলাসিতার সংগে যুক্ত হয়ে পুরনো দিনের সাদাসিদে সাহসী জীবনের স্মৃতি মুছে ফেলে তখন রাষ্ট্রের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। পরবর্তী কালে হোলও তাই বর্বরদের আক্রমণে।

রোমক শিক্ষাদর্শের চেয়ে কুইন্টিলিয়ানে কতগুলো মতবাদ আছে যা আমাদের আজকের শিক্ষাদর্শের সংগে মেলে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সংগে সংগে শিক্ষা, ধাত্রীর সংযত শুদ্ধ কথাবার্তা, শিশুর প্রতি করুণা ও স্নেহ, দৈহিক শাস্তিব্যবস্থার অন্যায়, বালকের পাঠ্য বিষয়ক কাজ শুদ্ধ করবার সময় অত্যধিক কঠোরতার পরিবর্তে উৎসাহ দান, পাঠ্যসূচীতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যামিতি, সংগীত দর্শন প্রভৃতি কতগুলো বিষয়ের স্থান (শুধু প্রয়োজনের তাগিদে নয়, সাংস্কৃতিক তাগিদেও বটে), অত্যধিক মানসিক চাপ দেওয়া ভুল, স্মৃতি ও অনুকরণশক্তি বর্ধিত করবার প্রণালী, গৃহ শিক্ষার পরিবর্তে স্কুলের শিক্ষা ইত্যাদি নানাবিষয়ে তাঁর মতবাদ মনস্তাত্ত্বিক এবং আজো আমাদের কাজে লাগে।

পড়তে শেখার আগে হাতীর দাঁতের অক্ষর সমষ্টি নিয়ে লেখা শুরু হোক এই তাঁর মত কারণ এগুলো দেখতে ধরতে ও নামকরণ

করতে শিশুদের খুব ভাল লাগে। "তাহাদের হস্তীদন্তের অক্ষর, ছোট ছোট পারিতোষিক বা অন্য যাহা কিছু শিশুর মনোরঞ্জন করে তাহা দিয়া সাহায্য করা হউক।"

শিশুর শিক্ষা তাড়াতাড়ি আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন "শিশুর প্রথম বয়সটি কাজে লাগাও কারণ এই সময় শিখিবার কাজে স্মৃতি-শক্তির প্রয়োজনই বেশী এবং শিশুর স্মরণ শক্তি খুবই প্রখর কিন্তু খেলাচ্ছলে শিক্ষা দিতে হবে, চাপ বেশী দেওয়া চলবে না।" পড়া যেন তাহার কাছে খেলার সামিল হয়; তাহাকে প্রশ্ন করিবে এবং যখন সদুত্তর দিবে, তখন প্রশংসা করিবে এবং নোতুন জ্ঞান আহরণ বা আয়ত্ত করিয়াছে বলিয়া যে আনন্দ তাহার প্রাপ্য তাহাও কখন কখন তাহাকে উপভোগ করিতে দিও" আবার "বেশী তাড়াতাড়ি করিলে পঠনে অগ্রগতি কিভাবে ব্যাহত হয় তাহা আমাদের পক্ষে সচরাচর বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে।"

প্রচলিত দৈহিক শাস্তিবিধান ও শিশুদের প্রতি এর অপব্যবহার সম্বন্ধে প্রতিবাদ করে বলেছেন "যাহারা এত দুর্বল এবং দৈহিক অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে এত অক্ষম তাহাদের উপর কোন মানুষকেই অত্যধিক ক্ষমতা দেওয়া উচিত নয়।"

পাঠ্যবিষয়ক কাজ সংশোধন বিষয়ে লিখেছেন "শিক্ষককে সর্বোপরি পিতার স্নেহ ও মনোভাব দিতে হইবে ছাত্রগণকে।··· সংশোধন কাজের সময় তিনি যেন কঠোর ও ভৎর্সনাপরায়ণ না হন। কোন কোন শিক্ষক এমন ভৎর্সনা করেন যেন তিনি ছাত্রকে ঘৃণা করেন; ইহা তাহাকে কাজে ও অধ্যয়নে বীতশ্রদ্ধ করে।" "সংশোধন বিষয়ে অত্যধিক কঠোরতার ফলে বালকদের ধীশক্তি আস্তে আস্তে লোপ পায়; কারণ তাহারা নিরুৎসাহ ও দুঃখিত হইয়া পড়ে এবং নিজেদের কাজ বা সৃষ্টিকে শেষ পর্যন্ত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। সব জিনিষেই তাহাদের ভয় ভয় করে, ফলে তাহারা কিছু করিবার উৎসাহ একেবারে হারাইয়া ফেলে।" "কোন বালকের রচনা যদি এত খারাপ

হয় যে তাহা শুদ্ধ করা যায় না তখন আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া পুনরায় লিখিতে বলিয়াছি এবং সে আরও ভাল করিতে পারিবে বলিয়া উৎসাহ দিয়াছি। ইহাতে দেখিয়াছি সে অনেক উপকৃত হইয়াছে। কারণ পড়াশুনার কাজ আশা ও উৎসাহ দ্বারা যতটা উদ্দীপিত হয় ততটা আর কিছু দ্বারাই হয় না।" আমাদের আধুনিক শিক্ষকেরা এ উপদেশ স্মরণ করে কাজ করলে শিক্ষার অনেক উন্নতি হবে কোন সন্দেহ নাই। তিনি শিক্ষককে আবার নির্দেশ দিচ্ছেন "শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য হইবে শিশুর মন ও প্রকৃতি যথাসাধ্য নির্ণয় করা।" এ উপদেশ আজ আস্তে আস্তে সমস্ত শিক্ষা জগতে গ্রাহ্য হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে উচ্চশিক্ষা

(বিশ্ববিদ্যালয়)

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন তখন প্রাচীন ভারতে উচ্চশিক্ষার দীপ অনির্বাণ শিখায় চারদিক আলোকিত করছিল। গৃহে, এবং গুরুগৃহে শিক্ষার বন্দোবস্ত ত ছিলই ; তা'ছাড়া 'পরিষদে' ও যজ্ঞসভায় ধর্ম, দর্শন ও আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্বজ্জনের সম্মুখে আলোচনা করতেন এবং নানা বিষয়ে নির্দেশ দিতেন—এসব আলোচনা ও বিতর্ক উচ্চাংগের হ'ত। ভ্রাম্যমাণ বিদ্বৎমণ্ডলীও পরবর্তীকালে গ্রীক সোফিষ্টদের মত ঘুরে ঘুরে শিক্ষা দিতেন এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের সংগে বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন। তা'ছাড়া রাজসভায় পণ্ডিতদের আলোচনা হ'ত এবং শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা শ্রদ্ধার্ঘ ও বহু পুরস্কার লাভ করতেন। রামায়ণের জনকরাজ এবং পরে অজাতশত্রু ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নাম এ বিষয়ে বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের সর্বত্রই বিদ্যার গৌরবের জন্য একটা বিরাট সম্মান দেওয়া হ'ত। তা'হলেই দেখা যাচ্ছে প্রাচীন ভারতে উচ্চাংগের আলাপ-আলোচনায় শিক্ষিত সমাজ ব্যাপৃত থাকতেন এবং মানষিক উৎকর্ষের চরম শিখরে উপনীত হয়েছিলেন। এঁদের অনেকেই ব্রাহ্মণ্য যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তক্ষশীলা (গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের 'টাকিসলা') বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত ছিল প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার লীলাভূমি ; তাই প্রথমে কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম এবং পরে তক্ষশীলা উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

তক্ষশীলা ঃ—তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতের অক্ষয় কীর্তি, খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভথেকে শুরু করে পাঁচশত বৎসর

পর্যন্ত (খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী অবধি) বহু শিক্ষার্থীকে আপন ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়েছে।* মহাভারতে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ সম্পর্কে তক্ষশীলার উল্লেখ আছে। প্রাচীন তক্ষশীলার অবস্থিতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। তবে মোটামুটি একথা বলা যায় বর্তমান রাওলপিণ্ডির ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গান্ধার রাজ্যে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কতগুলো জাতকে বারাণসী হ'তে তক্ষশীলা ১০০ মাইল দূরে একথা বলা হয়েছে। তক্ষশীলা গান্ধার রাজ্যের রাজধানী বলে উল্লিখিত হয়েছে বৌদ্ধ সাহিত্যে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার ক'রে পুরুকে সাহায্য না করায় চিরদিনের মত মস্তকে কলংক বহন করছেন। রাজধানী পাটলিপুত্র বাদ দিলে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সবচেয়ে তিনটি বড় সহর ছিল তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী এবং কৌশাম্বী। অশোকের সময় তক্ষশীলা ছিল উত্তরাপথের রাজধানী। কাজেই তক্ষশীলার গৌরব বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল, তবে মৌর্যদের পতনের পর খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বক্ত্রিয়ার গ্রীকদের করতলগত হয়। উপনিষদের যুগে (৮০০—৫০০ খ্রীঃ পূঃ) গান্ধার রাজ্যের যশ এতটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সাধারণ লোকের ধারণা হয়েছিল গান্ধার রাজ্যে উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করলেই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করা যায়।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য, পাঠ্যসূচী, ছাত্রজীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোক সম্পাত করেছে।

---

* একথা ঠিক তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচশত বৎসরের জীবনের মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্তই অর্থাৎ অশোকের সময় পর্যন্ত এর গৌরবময় যুগ; তারপর এর যশের জোয়ারে ভাঁটা পড়ে এবং খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর পর আর এর বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তক্ষশীলার অধ্যাপকদের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় রাজ-রাজড়ারা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও বণিকসম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাঁদের সন্তানসন্ততি এবং সত্যিকার মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত করতে তক্ষশীলায় প্রেরণ করতে শুরু করলেন। এইভাবে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হোল। রাজন্য শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য রাজারা বহু অর্থ দান করলেন। স্থানীয় ব্যক্তিরাও মধ্যে মধ্যে অর্থসাহায্য করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি ক্রমশ আবাসিক হয়ে দাঁড়াল ; যদিও বাইরে থেকেও কিছু ছাত্র আসতো। জীবক (ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক), অর্থশাস্ত্র প্রণেতা চাণক্য (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমসাময়িক) এবং গান্ধারবাসী প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি (বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন)। জাতক থেকে জানা যায় যে ষোল বৎসর বা ততোধিক বয়সে ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার আগে তার সমগ্র শিক্ষার জন্য ১০০০ মুদ্রা অগ্রিম দিতে হ'ত।* কিন্তু একথাও এই সংগে বলা প্রয়োজন গরীব ছাত্রকে কিছুই দিতে হ'ত না ; তা'রা দিবাভাগে গুরুদের সেবা করতো এবং রাত্রিতে তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করতো। তক্ষশীলায় যে রাত্রিতেও শিক্ষার কাজ চলতো তার প্রমাণ জাতক থেকে পাওয়া যায়। জাতকে উল্লেখ আছে যে শিক্ষাসমাপনান্তে শিষ্য বা ছাত্র ভিক্ষালব্ধ কয়েক ভরি (সাতনিখা) সোনা দিয়ে গুরুদক্ষিণা দিতো কিন্তু পাণিনি বলেছেন স্বল্প মূল্যের গুরু দক্ষিণাতেই গুরু যথেষ্ট সন্তুষ্ট হতেন—যথা একটি গাভীদান, ইত্যাদি।

---

* Ancient Indian Education—R. K. Mookerjee (Macmillan) P. 479. এ মুদ্রা খুব বেশী নয় বরং কমই কারণ এ থেকে ৫।৭ বৎসরের খাওয়া-দাওয়া-থাকা ও শিক্ষার খরচ চলতো এবং যারা বিনা পয়সায় পড়তো তাঁদের খরচও চলতো।

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব পশ্চিমে সুদূর পারস্য, উত্তরে বক্ত্রিয়া, কুরু এবং শিবিরাজ্য, পূর্বে 'প্রাচ্য' এবং দক্ষিণে মধ্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। পাণিনির মতে 'যোজন শতিক' এই সংজ্ঞাটি এমন গুরুকেই বোঝাত যাঁর পদপ্রান্তে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে ছাত্রমণ্ডলী শিক্ষালাভ করতেন।* জাতক থেকেও পাণিনির মত সমর্থিত হয় যে বারাণসী, রাজগৃহ, উজ্জয়িনী, কোশল, মিথিলা ও অন্যান্য দূর দূর প্রদেশ থেকে এখানে ছাত্র সমাবেশ হ'ত। দূর দূর দেশ হ'তে সমাগত ছাত্রদের পিতামাতা সোৎসুকে চেয়ে থাকতেন এদের বিদ্যা সমাপনের জন্য যেমন আজ চেয়ে থাকেন অভিভাবকরা বিদেশগত ছাত্রের পাঠ সমাপনের জন্য। চাণক্য ও পাণিনির মতে এখানে তিন বর্ণের ছাত্র ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য। দু'একজন উদারচিত্ত অধ্যাপক ধীবর জাতীয় ছাত্রও নিজ গৃহে গ্রহণ করতেন। জাতকের একটি গল্পে উল্লেখ আছে যে উজ্জয়িনী থেকে দু'জন চণ্ডাল যুবক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এখানে আইন অধ্যয়ন করে গেছে। দর্জির ছেলেও এখানে পড়েছে, এসব দেখে-শুনে মনে হয় এক চণ্ডাল ব্যতীত সকলেরই এখানে প্রবেশাধিকার ছিল। পাঠ্যসূচীতেও সকল বর্ণের বৃত্তি শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ বর্ণের ছাত্ররা তাদের চিরাচরিত জীবনের বৃত্তি বা উপযোগী বিষয়গুলোই শিখতেন তা' নয়, ব্রাহ্মণের ছেলে ইচ্ছে হ'লে শিকারবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, বিজ্ঞান, যাদুবিদ্যা সবই শিখতে পারতেন। এক কথায় বলা যেতে পারে পাঠ্য বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে ছাত্রদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। আগেই বলেছি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা আসতো শিক্ষা সমাপ্ত করতে, তবে উপনয়ন অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে

---

* তক্ষশীলার পরেই শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে নাম ছিল বারাণসীর, এখানে তক্ষশীলার প্রাক্তন ছাত্ররা অধ্যাপক হয়ে বসেছিলেন।

ছাত্রেরা ধর্মশাস্ত্র, ‘শিপ্প’ (শিল্প), বৃত্তি ও অন্যান্য মানবসম্বন্ধীয় (Humanities) বিষয় অধ্যয়ন করতে পারতো না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী ছিল ব্যাপক ও বিরাট। এখানে আধ্যাত্মিক ও সাধারণ বিষয় নিয়ে নানা বিভাগে পাঠ্য বিষয়গুলো বিভক্ত ছিল। শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটাও অবহেলিত হ’ত না। এক একটি বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে থাকতেন এক একজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক। জাতকে তিনটি বেদ (ঋক, সাম, যজুঃ) এবং অষ্টাদশ শিল্প ও বৃত্তিতে শিক্ষা সমাপ্ত করতে ছাত্ররা তক্ষশীলায় আসতেন একথা বার বার উল্লিখিত হয়েছে। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে এসব ছাড়াও অথর্ব বেদ ও ইতিহাস-পুরাণ, দর্শনশাস্ত্র (সাংখ্য, যোগ, লোকায়ত) এবং নানা বৃত্তি পাঠ্যসূচীতে স্থান পেয়েছে। মিলিন্দ তালিকায় একটি বেশী অর্থাৎ উনিশটি শিল্প ও বৃত্তির উল্লেখ আছে। চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন এবং সামরিক বিদ্যা শিক্ষার জন্য তক্ষশীলার মহাবিদ্যালয়টি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। সাত বৎসর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের পর জীবক এমন কৃতিত্ব লাভ করলেন যে নানা স্থানে তাঁর অস্ত্রোপচার দেখে লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। নানা ওষধি ও বৃক্ষলতাগুল্মের বিদ্যাও প্রকৃতির বুক থেকে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্ররা আহরণ করতেন। আইন ও সামরিক মহাবিদ্যালয়েও দূর দূর দেশ থেকে ছাত্র আসতেন। এক সময় এমন হ’ল ভারতবর্ষের সে সময়কার সকল নৃপতিই রাজপুত্রদের এই সামরিক মহাবিদ্যালয়ে পাঠালেন এবং তাঁদের সংখ্যা হয়ে পড়ল ১০৩। ধনুর্বিদ্যা শিক্ষাও এখানে খুব ভাল হ’ত। যাহোক একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ধর্ম, বেদ, দর্শন ইত্যাদি ছাড়াও বহু বিষয় এখানে শিক্ষা দেওয়া হ’ত, যথা—রাজনীতি, হিসাবরক্ষা, নৌকা বা জাহাজ নির্মাণবিদ্যা, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভাস্কর্য, গৃহনির্মাণ, দারুশিল্প, চিত্রাংকন, মূর্তিগড়া এবং আরও নানা হস্তশিল্প। প্রত্যেকটি বিভাগ এক একজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের অধীনে ছিল।

শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটার ওপরও বিশেষ দৃষ্টি ছিল—যে বিদ্যাই অর্জিত হ'ত তা' প্রয়োগ করতে ছাত্র সক্ষম হয়েছেন কিনা তা' পরখ বা পরীক্ষা করে দেখা হ'ত দুটি উপায়ে—কতগুলো শাস্ত্রে যেমন চিকিৎসাবিদ্যা, ভাস্কর্য ইত্যাদিতে অস্ত্রোপচার বা মূর্তি গড়া ছাত্রাবস্থাকালীনই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে হ'ত আবার কতগুলো বিষয়ের প্রয়োগ ছাত্রেরা করতেন যখন পাঠ্যাবস্থাশেষে তারা বিদেশ ভ্রমণে বের হ'তেন। এ বিদেশ ভ্রমণ শিক্ষার একটি বিশেষ অংগ ছিল (অবশ্য যাঁর যাঁর দেশে ফিরে যেতেও ভ্রমণের প্রয়োজন হ'ত) এই ভ্রমণ সময়ে ছাত্ররা তাঁদের অধীত বিদ্যা প্রয়োগ করতেন নানাস্থানে এবং স্থানীয় আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে তাদের ভাবরাজ্যকে আরও বিস্তৃততর বা উদারতর করে তুলতেন। জাতকের গল্পে আছে তক্ষশীলার এক ব্রাহ্মণ ছাত্র ধনুর্বিদ্যায় কুশলী হয়ে সুদূর অন্ধ্ররাজ্যে গিয়ে তাঁর বিদ্যার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং মগধের রাজপুত্র এখানে শিক্ষাসমাপনান্তে স্থানীয় আচার-ব্যবহার শিক্ষার জন্য নানাদেশে ঘুরেছিলেন।

বেদ অবশ্য গুরুর মুখ থেকে শুনে আবৃত্তি ক'রে শিখতে হ'ত, তবে 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী' এই নীতি অনুসৃত হ'ত কিনা সন্দেহ ; না বুঝে শুধু আবৃত্তি করা হ'ত একথা ঠিক নয়। বারবার আবৃত্তি করে ছাত্র নিজের চেষ্টায়ই জিনিষটা বুঝতে চেষ্টা করতো এবং বারবার আবৃত্তির সংগে জিনিষটা অনেকটা বোধগম্যও হ'য়ে আসতো। বরং এ নীতিতে ছাত্র স্বাবলম্বী বেশী হ'ত। কিন্তু যখন কোন বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন হ'ত গুরু বা অধ্যাপক সমবেত ছাত্রমণ্ডলীকে একসংগে বুঝিয়ে দিতেন (আমাদের লেকচার পদ্ধতি)। ছাত্রের সংগে প্রয়োজন মত ব্যক্তিগতভাবেও অধ্যাপক আলোচনা করতেন। বিতর্ক ও আলোচনা শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ অংগ ছিল, কাজেই না বুঝে মুখস্থ করার প্রশ্ন ওঠেনা—ছাত্ররা শিক্ষায় সর্বদাই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতো।

এবং তাতেই তাঁদের বিচারবুদ্ধি এবং ধীশক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত। পুস্তকের ব্যবহার হ'ত না বললে ভুল হবে; প্রমাণ আছে হস্তলিখিত পুস্তকের চল ছিল।

পরীক্ষা পদ্ধতি সহজ সরল ছিল। মুখে পরীক্ষার পর ছাত্রদের কৃতিত্বের ক্রম নির্ধারিত হ'ত, তবে পরবর্তীকালে দ্বার পণ্ডিতদের পরীক্ষার মত তক্ষশীলায় মুখে পরীক্ষা অত কঠিন ছিল না। ব্যবহারিক পরীক্ষার ওপরেও খুব জোর দেওয়া হ'ত। জীবক শুধু তক্ষশীলাতেই অস্ত্রোপচারে কৃতিত্বের পরিচয় দেননি, অধ্যয়ন শেষে নানাস্থানে ঘুরে অর্জিত বিদ্যার সাহায্যে বহু লোকের কষ্ট নিবারণ করেছিলেন; এ ছাড়া তক্ষশীলার ১৫ মাইলের ভেতর যে-সব উদ্ভিজ্জ, লতা, গুল্ম ইত্যাদি পাওয়া যেত তাদের মধ্যে কোনগুলো ওষধি হিসেবে ব্যবহৃত হ'তে পারে সে সম্বন্ধে অধ্যাপকের কাছে জীবককে বিবৃতি দিতে হয়েছিল। চারদিন পরীক্ষার পর জীবক এই অভিমত দিয়েছিলেন যে এখানকার প্রায় প্রত্যেকটি উদ্ভিদই ওষধি হিসেবে ব্যবহৃত হ'তে পারে। অন্যান্য আয়ত্তীকৃত বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও পরীক্ষার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

সাধারণত এক একজন আচার্য বা অধ্যাপক পাঁচশত ছাত্র তাঁর অধীনে নিতেন, এর বেশী নেওয়া সম্ভবও হ'তনা, নিয়মও ছিল না। অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় বিষয় অনুসারে গুরুর নানারকম সংজ্ঞা ছিল—'শিষ্ঠ', 'দণ্ডনীতিক', 'বর্তক', 'পুরোহিত', ইত্যাদি। শিষ্ঠরা ধর্ম ও দর্শন, দণ্ডনীতিকরা রাজনীতি, বর্তকরা নানা বৃত্তি এবং পুরোহিতরা ধর্ম ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। এক একজন গুরুর পক্ষে সব সময় ৫০০ ছাত্র শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হ'ত না; সেজন্য প্রধান ছাত্র বা শিষ্যদের অনেক সময় সাহায্য করতে হ'ত গুরুকে—তাঁদের বলা হ'ত সহকারী শিক্ষক। সহকারী শিক্ষকের কাজ করতে করতে তাঁরা অধ্যাপক হবার সুযোগ পেতেন। এ্যাণ্ড্রু বেল সাহেব উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশ থেকে 'মনিটর' প্রথা

আবিষ্কার করে তাঁর দেশে নিয়ে গেছলেন—এর গোড়াপত্তন হয়েছিল প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে ও তক্ষশীলায়।

'ডিসিপ্লিন' কঠোর ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকেই জ্বালানি কাঠ আহরণ করতে বনে যেতে হ'ত। একা থাকবার স্বাধীনতা খুব কম ছিল; স্নানের সময় নদীতে একজন শিক্ষকের সংগে যেতে হ'ত। প্রত্যূষে মোরগের ডাকে ঘুম থেকে উঠে গুরুসেবা ও অধ্যয়নের কাজে ব্যাপৃত হ'তে হ'ত। খাওয়া-দাওয়া খুব সাধারণ ধরনের ছিল, প্রাতরাশের জন্য গুরুগৃহের দাসী অনেক সময় শুধু ফেন দিত। নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে ইক্ষু, দই, গুড় এবং দুধ দেওয়া হ'ত। ধনী গৃহস্থরা ৫০০ করে ছাত্রদের পালা করে নৈশ ভোজে নিমন্ত্রণ করতেন।

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতগুলো বিশেষত্ব ছিল। অধ্যাপকদের সামরিক বিদ্যা ও শান্তির ললিত কলা সমান আয়ত্ত ছিল। সামরিক বিদ্যা ও নানাবৃত্তি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেদ, ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য সাধারণ বিষয় শিক্ষার্থীদের সংখ্যার প্রায় সমান সমান ছিল। আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক, বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ, দিবাভাগে ও রাত্রে শিক্ষা এবং শিক্ষক ও ছাত্রের স্নেহবন্ধন ছাড়াও আর দুটি বিশেষত্ব ছিল এর গণতান্ত্রিক আবহাওয়া এবং শিক্ষার অংগ হিসেবে ভ্রমণ। এক চণ্ডাল ব্যতীত সর্বশ্রেণীর সর্বজাতির সর্ব সামাজিক স্তরের ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করতো; রাজপুত্র, ধনাঢ্য, বণিক, দর্জি, ধীবর, দরিদ্র ছাত্র—সকলেই একসংগে গুরুর নিকট শিক্ষালাভ ক'রে, আলাপ-আলোচনা, আমোদে-প্রমোদে একাত্ম হ'য়ে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠা করেছিলো দরিদ্র ছাত্রদের বেতনের পরিবর্তে নানারূপ কায়িক শ্রম করতে হ'ত কিন্তু শ্রমের মর্যাদা বিশেষভাবে গ্রাহ্য ছিল বলে সম্ভ্রান্ত-বংশীয়দের সংগে কোন সামাজিক ব্যবধান ছিল না। আজকের দিনে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংগে তক্ষশীলার এ বিষয়ে খানিকটা সাদৃশ্য আছে; কারণ ছুটির ভেতর ছাত্ররা সেখানে

শিক্ষার ব্যয় কতকাংশে অর্জন করে কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম দ্বারা। জাতকের গল্পে আছে বারাণসীর রাজা রাজপুত্রকে তক্ষশীলায় পাঠালেন 'এক জোড়া স্যাণ্ডাল (পাদুকা), পাতার ছাতা এবং হাজার মুদ্রা' দিয়ে। এই হাজার মুদ্রা সমস্ত শিক্ষার ব্যয় হিসেবে দেয়, সুতরাং রাজপুত্রের নিজের এক কপর্দকও রাখবার ক্ষমতা ছিল না। হাতখরচ হিসেবেও রাজপুত্র এক পয়সাও পেতেন না। কাজেই রাজপুত্রকেও দরিদ্র ছাত্রের মতই সমস্ত সৌখিনতা বর্জন ক'রে অধ্যয়ন করতে হ'ত। রাজপুত্ররা অপরাধ করলে সমান শাস্তি পেতেন। অধ্যয়ন সমাপনান্তে ভ্রমণের সময়ও কপর্দকহীন অবস্থায়ই বেরিয়ে পড়তে হ'ত। ভারতীয় নৃপতিরা ইচ্ছে করেই এ রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন; যাতে রাজপুত্ররা বিলাসী বা অহংকারী না হয়ে কষ্ট সহ্য করতে শিখে, সকলের সংগে সমানে মিলেমিশে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক করতে পারে। এ ব্যবস্থা দেশীয় রাজন্যবর্গের দূর দৃষ্টিরই পরিচায়ক এবং অতীব প্রশংসার্হ। সেদিনের ধনাঢ্যেরা তাঁদের সন্তানদের জন্য একই ব্যবস্থা করতেন, আজকের ধনাঢ্যদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া প্রয়োজন। ভ্রমণ ব্যতীত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, রেনেসাঁসের পর ইউরোপে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ঐ ধারণা জন্মে কারণ তাতে সঙ্কীর্ণতা কেটে গিয়ে মানবমনের পরিসর বেড়ে যায়, দৃষ্টি যায় বদলে আর জন্মায় স্বাবলম্বন ও গণতান্ত্রিকভাব। রেনেসাঁসের দু' হাজার বছর আগে তক্ষশীলায় অধ্যয়ন সমাপনান্তে ভ্রমণ-ব্যবস্থা শিক্ষার অপরিহার্য অংগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বর্তমান ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যদিও তক্ষশীলা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল, তবু যুগধর্মের পরিবর্তনের ছাপ এর ভেতরে খানিক পরিমাণে যে না পড়েছিল তা' নয়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখতে পাই অষ্টাদশ শিল্প বা শিল্প-কলার ভেতর; এই শিল্পশিক্ষাই পরবর্তীকালে বৌদ্ধবিহারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। আরেকটি কথা বলেই

তক্ষশীলার কাহিনী শেষ ক'রব। ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে এমন একটা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব ছিল যে, এ শান্তিপূর্ণ মধুর আবহাওয়ায় শিক্ষার পবিত্রতা ও পরিপূর্ণতা রক্ষা করা সম্ভব হ'ত। কালের পরিবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের এ দিকটা কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একেবারেই অবহেলিত হবে?

একথা ঠিক তক্ষশীলার প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে অনেকে সংসার ত্যাগ ক'রে তপোবনের শান্ত পরিবেশে শিক্ষার কেন্দ্র খুলতেন যেমন অনেকে আবার নিযুক্ত হতেন জীবনের নানা কর্মক্ষেত্রে। এসব তপোবন-আশ্রমে উচ্চাংগের দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং এক একজন খ্যাতনামা সন্ন্যাসী বা গুরু ৫০০ করে ছাত্র নিতেন। এই সব আধ্যাত্মিক বিদ্যাগৃহে সময় সময় আরো বেশী ভিড় হ'ত এবং শাখা-আশ্রম স্থাপিত হ'ত। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় আধ্যাত্মিক চর্চার যে প্রবণতা আজও ভারতীয়দের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে তার শিকড় রয়েছে প্রাচীন ভারতের ধর্ম জীবনে।

আস্তে আস্তে সভ্যতার ঢেউ উত্তর-পশ্চিম ভারত ছাড়িয়ে পূবে ও দক্ষিণে অগ্রসর হ'তে লাগল এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সংগে সংগে বহু বিহার বা সংঘ স্থাপিত হ'তে লাগল। বনানী বা কুঞ্জের ভেতর এই বিহার বা সংঘগুলোই হয়ে দাঁড়াল এক একটি শিক্ষার কেন্দ্র। সে হিসেবে তপোবন-উৎস থেকে যে শিক্ষাধারা প্রবাহিত হয়েছিল স্মরণাতীত কাল থেকে তা' অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল। পরবর্তী কালে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বস্তুত সেদিনে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণেরাই গৃহে ও গৃহের বাইরে শিক্ষার দীপ অনির্বাণ রেখেছিলেন। যেখানেই অধিক সংখ্যক সুপণ্ডিত বৌদ্ধভিক্ষু সমবেত হতেন, সেখানেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতো এবং তার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো। এ সব বিহারে একজন কুলপতি অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করতেন।

এ সব বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্বন্ধে আমরা জানতে পাই চীনদেশ থেকে যে সব বৌদ্ধ ছাত্র ও পণ্ডিত এসে-ছিলেন শারীরিক কষ্ট ও বিপদ অগ্রাহ্য ক'রে ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে এবং বিনয়, ত্রিপিটক ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি চৈনিক বিহারে নিয়ে যেতে তাঁরা চাক্ষুষ যা দেখে গেছেন সেই সব বিবরণ থেকে। প্রায় এক হাজার বছর ধরে (কনিষ্কের সময় থেকে ধর্মপালের সময় পর্যন্ত) বহু চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও ছাত্র ভারতে এসেছেন তীর্থ যাত্রায় ও জ্ঞানান্বেষণে এবং তাঁদের মধ্যে অতি অমূল্য বিবরণ রেখে গেছেন ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ খ্রীঃ অঃ), হিউয়েন সাঙ (৬২৯-৬৪৫ খ্রীঃ অঃ) এবং ইৎসিঙ (৬৭৩-৬৮৭ খ্রীঃ অঃ)। তক্ষশীলার তথ্য ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য থেকে সংকলন করতে হয় কিন্তু চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীর শিক্ষার কাহিনী আমরা চাক্ষুষ বিবরণ থেকে পাই। তবে সময় সময় এ সব বিবরণ একটা দোষে দুষ্ট—চৈনিক পরিব্রাজকরা শুধু বৌদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোরই বিবরণ রেখে গেছেন, অন্য প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কোন বিবরণ এতে পাওয়া যায় না।

ফা-হিয়েন ঃ— পুরুষপুর (পেশোয়ার), কান্যকুব্জ, শ্রাবস্তী, কুশীনগর (বুদ্ধের মৃত্যুস্থান), বৈশালী, পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, সারনাথ, কৌশাম্বী, চম্পা, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি নানা উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে পূর্ণোদ্যমে কাজ চলেছে ফা-হিয়েন দেখতে পান। ফা-হিয়েন নালন্দা বিহারেও গিয়ে ছিলেন কিন্তু তখন সেখানে বেশী ভিক্ষু ছিলেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজও শুরু হয়নি। ফা-হিয়েন তক্ষশীলার উল্লেখ করেন নাই, হয়তো ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্র বলে সেখানে তিনি যাননি।

ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে পাটলীপুত্রই তখনকার দিনের সব চেয়ে বড় শিক্ষাকেন্দ্র ছিল বলে মনে হয়। এখানে তিনি মৌর্য সম্রাটদের প্রাসাদাবলী দেখতে পান 'যেমন সেগুলি ছিল পুরনো দিনে'। এখানে দু'টি বিহার ছিল একটি মহাযান ও

অপরটি হীনযান; মহাযান বিহারটি ছিল অতীব সুন্দর এবং বিরাট। এ দু'টি বিহারে ভিক্ষু বা শ্রমণ-সংখ্যা ছিল চারশ' থেকে সাতশ'। এখানকার পড়াশুনোর বন্দোবস্ত এবং আচরণ নিয়মাবলী প্রণিধানযোগ্য ছিল। একান্ত সত্যনিষ্ঠ বহু ভিক্ষু এবং সত্যান্বেষী বহু ছাত্র নানা স্থান হ'তে এখানে সমবেত হয়ে 'রাধাসামী' ও 'মঞ্জুশ্রী' নামক মহাযান দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে অধ্যয়ন করতেন। পাটলীপুত্রের বিহারে ফা-হিয়েন তিন বছর থে'কে সংস্কৃত লেখা ও কথা বলা শিখেছিলেন এবং 'বিনয়' নিয়মাবলী লিখে ফেলেছিলেন চৈনিক সংঘের জন্য। ফা-হিয়েন বলেছেন অন্যান্য সংঘেও সংস্কৃত চর্চা চলছিল।

হিউয়েন সাঙ:—হিউয়েন সাঙ (৬২৯-৬৪৫ খ্রীঃ অঃ) যখন এদেশে আসেন তখন শ্রীহর্ষ (৬০৬-৬৪৮ খ্রীঃ অঃ) উত্তর ভারতের সার্বভৌম রাজা; এ সময়ে সংস্কৃত শিক্ষা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব যে ফা-হিয়েনের সময় থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল তাঁর বিবরণ থেকে তা' স্পষ্ট বোঝা যায়। গুপ্তসম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন প্রত্যেক বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে মহাযান ও হীনযান মতবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুই শুধু বাস করতেন না, সেখানে তাঁরা অনেক 'দেবমন্দিরে' নানা মতাবলম্বী ব্রাহ্মণদের সংগে বিদ্যাচর্চায় ব্যাপৃত থাকতেন। এ থেকে মনে হয় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রাদি ও মতবাদের সংমিশ্রণ হয়ত বেশ ভালভাবেই চলছিল এবং এ সব বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির কোন স্থান ছিল না। সত্য স্বাধীনতার সামগ্রী—এ বিশ্বাস তাঁদের ছিল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার গৌরবময় ঐতিহ্য—তপোবনের শান্ত পরিবেশে বিদ্যাভ্যাস ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী হয়ে বিদ্যাবিতরণ, শিক্ষায় জীবনোৎসর্গ, ব্যক্তিগত শিক্ষা, বেদে ব্যুৎপত্তি, শিক্ষকের সম্মান, শিক্ষক-ছাত্রের মধুর সম্বন্ধ সবই তখনো অক্ষুণ্ণভাবে চলছিল। হিউয়েন সাঙ তক্ষশীলায় গিয়ে এই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের

ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান, শুধু কয়েকজন মহাযান মতবাদী ভিক্ষু তখন সেখানে বাস করছিলেন।

যাহোক হিউয়েন সাঙ সমস্ত ভারত (উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ) ও সিংহল ভ্রমণ ক'রে বহু বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের উল্লেখ করেছেন। এক একটি কেন্দ্রে বিশিষ্ট মতবাদী ভিক্ষুদের (হিউয়েন সাঙ বলেন মহাযান ও হীনযান ছাড়াও আরও আঠারটি মতবাদ ছিল) ছাত্র হিসেবে সমাগম হ'ত কিন্তু বিভিন্ন মতাবলম্বী ভিক্ষু এবং ব্রাহ্মণদেরও বহু কেন্দ্রে ছাত্র হিসেবে নেওয়া হ'ত—এ থেকে এ সময়ের শিক্ষার সর্বজনীনত্ব ও উদারত্ব স্পষ্টভাবে প্রকট হয়। এ বিষয়ে মধ্যযুগীয় ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর তুলনায় ভারতের উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর উদারত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রমাণিত হয়। যে সব কেন্দ্র বা বিহারগুলোতে শিক্ষার কাজ ভালভাবে চলছিল তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার এবং ভিক্ষু ও বিদ্যার্থীর সংখ্যা ছিল ২,১২,১৩০ (সিংহলের ২০ হাজার ধ'রে)। বহু শিক্ষাকেন্দ্রে বিখ্যাত অধ্যাপক ও পাঠাগার থাকায় বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ও চিন্তানায়কদের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল সারা ভারতবর্ষময়।

হিউয়েন সাঙ একটি সুন্দর প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়ে গেছেন উচ্চ শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে। এ প্রাথমিক (ও মাধ্যমিক) শিক্ষা সমাপ্ত হলে উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রে বিদ্যার্থীকে গ্রহণ করা হ'ত কুড়ি বৎসর বয়সে। এ বিষয়ে তক্ষশীলার ব্যবস্থা থেকে কিছু বৈষম্য লক্ষিত হয় উন্নত মানের দিকে; কারণ তক্ষশীলায় ছাত্ররা আসতো ষোল বৎসর বয়সে। শিশু বা বালককে প্রথমে 'সিদ্ধিরস্তু'—'তোমার সাফল্য বা সিদ্ধিলাভ হউক'—নামক দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত সংস্কৃত অক্ষর পরিচয় এবং স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগে গঠিত শব্দাবলীর একখানা পুস্তক দেওয়া হ'ত। সে বইখানি আয়ত্ত হ'লে বালককে সাত বৎসর বয়সে পাঁচটি বিজ্ঞান শাস্ত্রের সংগে পরিচয় করান হ'ত—(১) ব্যাকরণ, (২)

শিল্পস্থান বিদ্যা, (৩) চিকিৎসাবিদ্যা, (৪) হেতুবিদ্যা (logic) (৫) অধ্যাত্মবিদ্যা। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যাঁরা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতেন, তাঁদের শাস্ত্রাদি ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বাদির সংগে নানা শিল্প ও চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জন করতে হ'ত যাতে বুনিয়াদটা দৃঢ় হয় এবং জনসেবার কার্যও সুচারুরূপে চলতে পারে। এ শিক্ষা ধর্মীয় নেতা বা সামাজিক নেতা উভয়ের পক্ষেই সমান প্রযোজ্য ছিল।

নালন্দা ঃ—উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (৪৫০—১১৯৯ খ্রীঃ অঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ ; এর খ্যাতি শুধু ভারতবর্ষে নয়,সমস্ত এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। চীন, তিব্বত, মংগোলিয়া, সিংহল, সুমাত্রা, কোরিয়া, বর্মা, মিশর ইত্যাদি এশিয়ার নানা দেশ হ'তে ভিক্ষু ও বিদ্যার্থী নালন্দায় এসে সমাগত হ'তেন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে বুৎপত্তিলাভ করতে ; তা'ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হ'তে বয়ে আসতো ছাত্রাধারা নালন্দায় অদম্য জ্ঞান-পিপাসায়। জাতিধর্মনির্বিশেষে শিক্ষার্থিগণ সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় আনতশিরে দিনের পর দিন ১২ বৎসর ধরে বিদ্যাভ্যাস করে গেছেন —কবির স্বপ্ন নালন্দায় সেদিন সফল হয়েছিল ; আবার হয়ত হবে বিশ্বভারতীতে—

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শকহুণদল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

* * * * *

হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

ভারতের এক প্রান্তে এই নালন্দা। তার বক্ষের ওপর কতশত জনপদেরই ধূলি গ্রহণ করেছে, তার অন্তরের রূপ, বিরাটত্ব ও উদার শিক্ষাব্যবস্থা এবং স্বাধীন শৃঙ্খলা বহু দূর হ'তে বিদ্যার্থীকে

আকৃষ্ট করে সকলকে এক দেহে লীন করে জাতিধর্মনির্বিশেষে শিক্ষা দিয়েছে।

হিউয়েন সাঙ বলেছেন নালন্দায় ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০,০০০; তিনি নিজে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর বাস করেছেন, কাজেই তাঁর কথা বিশ্বাসযোগ্য। নালন্দা প্রাচীন রাজগৃহ (রাজগির) থেকে মাত্র সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল এবং ফলে রাজগৃহের সংগে এর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল গভীর। নালন্দা ভগবান বুদ্ধের জীবনে ও ধর্মপ্রচারের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কাজেই এর ইতিহাস চলে আসছে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বহু আগে থেকে; তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের মতে সম্রাট অশোকের সময় থেকেই এর গৌরবময় যুগের শুরু হয় এবং সম্রাট অশোক বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য সরিপুত্তের দেহ যেখানে ভস্মীভূত হয়েছিল সেই চৈত্যে একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। সে হিসেবে অবশ্য সম্রাট অশোকই নালন্দা বিহারের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।* কিন্তু তীর্থ হিসেবে এর প্রসিদ্ধি থাকলেও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আগে শিক্ষাক্ষেত্রে এর খ্যাতিলাভ হয়নি। † সম্রাট কনিষ্কের সময় চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিতে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তনের সংগে সংগে নালন্দা মহাযান মতবাদীদের একটি বড় শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে উঠল। হয়ত এর পূর্বেও অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ স্থবির-বাদীদের শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দায় গড়ে উঠেছিল; তিব্বতীয় কিংবদন্তী হ'তে এরূপ অনুমান করা অসংগত হবে না। যাহোক, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে যে নালন্দা উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ তাঁর 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' (আঃ ১৫০০ খ্রীঃ অঃ) নামক পুস্তকে বলেছেন যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর বিশিষ্ট পণ্ডিত নাগার্জুন ও তার শিষ্য আর্যদেব দাক্ষিণাত্য

* Tāraāth—History of Budhism p. 72.

† R. K. Mookerjee—Ancient Indian Education pp 557-58.

থেকে এসে নালন্দায় জীবনের বহুদিন কাটিয়ে গেছেন—কাজেই সুদূর দক্ষিণ দেশ থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের যখন নালন্দা আকৃষ্ট করতে পেরেছিল তখন এথেকে নিশ্চয় অনুমান করা যেতে পারে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে নালন্দার খ্যাতি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তারনাথ একথাও লিখেছেন যে, সুবিষ্ণু নামে নাগার্জুনের একজন সমসাময়িক ব্রাহ্মণ নালন্দায় একশ' আটটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন মহাযান অভিধর্মের সুপ্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য। খ্রীষ্টীয় চা'র শতকে বা পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙনাগের নালন্দায় আগমন এবং ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িক সুদুর্জয় ও তীর্থ নৈয়ায়িকদের পরাজিত করার কাহিনী থেকে এ সপ্রমাণ হয় যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও নালন্দা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও তির্থিকদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এ জন্যও হয়ত ফা-হিয়েন নালন্দা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করেননি। অনেকের মতে ফা-হিয়েন নালন্দায় মোটেই যাননি, তিনি সরিপুত্তের জন্ম ও তিরোধানের স্থান 'নালের' উল্লেখ করেছেন। 'নাল', 'নালক', 'নলেন্দ্র' ইত্যাদি স্থানসমূহ নালন্দার অংশ বিশেষ ছিল বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন।

তবে নালন্দা বিহার তখনও পরবর্তী কালের মত এত বিরাট হয়ে পড়েনি; খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে গুপ্ত সম্রাট কুমার গুপ্তের (৪১৫—৫৫ খ্রীঃ অঃ) রাজত্বকালে মহাবিহারের নির্মাণ কার্য সম্ভবত শুরু হয়; এই সময়ে শক্রাদিত্য নামে একজন রাজাও নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করেন। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ, শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় ও সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেদেরও নালন্দার গৌরব সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁরা নালন্দায় বিহার, মন্দির, স্তূপ নির্মাণ করে, ভূমিদান করে বা অর্থ সাহায্য করে পুণ্যার্জন ও উচ্চ শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা একই সংগে করতেন। ভূমিদান হ'তে নালন্দা মহাবিহার দুশ' গ্রামের ভূম্যধিকারী হয়ে পড়েছিল। হিউয়েন সাঙ মধ্যদেশীয়

একজন রাজার বিহার নির্মাণ ও অর্থ সাহায্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, এঁকে শ্রীহর্ষ বলে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে ; কারণ হর্ষবর্ধন নালন্দায় একটি পিতলের বিহার এবং একটি সংঘারাম নির্মাণ করেছিলেন ; এছাড়া তিনি একশ' গ্রামের রাজস্ব মহাবিহারের জন্য দান করেছিলেন এবং চল্লিশ জন ভিক্ষুকে প্রতিদিন খাওয়াবার বন্দোবস্তও করেছিলেন। পরবর্তী কালে বাংলার পাল সম্রাটগণের দানেও নালন্দা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সুবর্ণদ্বীপের (সুমাত্রা) রাজা নালন্দায় বিহার নির্মাণ করে এবং পাঁচখানি গ্রাম দান করার ব্যবস্থা করে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র বলে নালন্দার খ্যাতি আরও চারদিকে বিস্তার করেছিলেন। বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ নরপতি এবং জনসাধারণের দানে পরিপুষ্ট হয়ে অগণিত পণ্ডিতের বিদ্যার গৌরবে সমুজ্জ্বল হয়ে অবৈতনিক উচ্চ শিক্ষার দীপ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জ্বালিয়ে রেখে এ মহা মিলনতীর্থ বিদেশীর নির্মম আক্রমণে (১১৯৯ খ্রীঃ অঃ) হঠাৎ একদিন তার দীর্ঘ দীপ্তিময় ইতিহাসের ওপর অশ্রুভারাক্রান্ত যবনিকা টেনে দিল। কালের অনাদরে মহিমময় বিশ্ববিদ্যালয় মাথায় শাশ্বত গৌরব বহন করে আস্তে আস্তে ভূগর্ভে প্রোথিত হ'ল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধাবলী ও পারিপার্শ্বিকের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন হিউয়েন সাঙ। গম্বুজশোভিত বিরাট দ্বিতল ত্রিতল চৌতল হর্মাবলী অপূর্ব সৌন্দর্যে ঝলমল করছে, তাদের ছোট ছোট গম্বুজগুলো যেন স্বপ্নরাজ্যের গিরিশিখরের মত মাথা উঁচিয়ে আছে, মানমন্দিরগুলো প্রভাতবেলার অস্পষ্ট কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন ; ওপরের ঘরগুলো মেঘের রাজ্যের ওপরে উঠে গেছে, গবাক্ষ পথে মেঘ ও বাতাসের খেলায় কত নবনবরূপ পরিগ্রহ চলেছে, আকাশচুম্বী ছাদ থেকে সূর্যাস্ত ও চাঁদনী রাতের অপরূপ সৌন্দর্যে মন মাতোয়ারা হয়ে উঠে। হিউয়েন সাঙের এ বর্ণনা সমর্থিত হচ্ছে কনৌজের রাজা যশোবর্মনের (আঃ ৭২৫—৭৫২ খ্রীঃ অঃ) অষ্টম শতাব্দীর দান শিলালিপি থেকে—তাতে আছে 'বিহারবলী শিখর-

শ্রেণী অম্বুধারা (clouds) অবলেহী'। নীচে ছায়াশীতল আম্রকুঞ্জের মাঝে মাঝে সরোবরে নীলপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে, তারপর পাশে রক্তরাগ কনক পুষ্প—সে এক অপূর্ব শোভা। ভিক্ষুদের চৌতলা আবাস গৃহগুলো থেকে অদ্ভুত জন্তুজানোয়ারের মুখ বেরিয়ে আছে, স্তম্ভগুলো প্রবালরক্তরাগে সমুজ্জ্বল, নানা শিল্পকার্য-খচিত সুদৃশ্য বারান্দা, ছাদের টালি নানা বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

বিশ্ববিদ্যালয়ে আটটি বড় হলঘর এবং ৩০০ ঘর বক্তৃতা ও অধ্যয়নাদির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মহাবিদ্যালয় বা হল ঘরগুলোর পর চওড়া রাস্তা তারপর মুখোমুখী করে সুদৃশ্য মন্দির শ্রেণী—শিক্ষা ও ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় দেখে আজও হৃদয় উদ্বেলিত হয়। হিউয়েন সাঙ বলেছেন "ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র সংঘারাম আছে কিন্তু উচ্চতায় ও সৌন্দর্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। বহু নৃপতির দানে পুষ্ট এই মহাবিহারের ভাস্কর্য একেবারে নিখুঁত এবং সত্যই অতীব সুন্দর।" এই উক্তির সত্যতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় খুঁড়ে যেসব হর্মাদি, মন্দির, স্তূপ, মূর্তি, অলংকার বের হয়েছে তা' থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে। কানিংহাম সাহেবের মতে নালন্দার ভাস্কর্য ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিদর্শন। নালন্দার স্থাপত্য দেখে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় আজও গর্বে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। নালন্দার ধ্যানগম্ভীর মূর্তি—তার বাইরের রূপ—দ্বাদশ শতাব্দীর বিদেশী আক্রমণের হাত হ'তে নিজকে খনিকাংশে রক্ষা করতে পেরেছে, তাই তার নিজস্ব মহিমায় আজো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নালন্দার গৌরব অশেষ ও অফুরন্ত, তার মধ্যে যেটা বিশেষ করে উল্লেখ করা চলে সেটা হচ্ছে আট-দশ হাজার বিদ্যার্থীকে ছাত্রজীবনের অত্যাবশ্যক চারটি জিনিষ বিনা অর্থে বিতরণ—খাদ্য, বস্ত্র, শয্যা এবং চিকিৎসা (ঔষধ)। হিউয়েন সাঙের সময় বিদ্যার্থীদের সংখ্যা ছিল সর্বসাকল্যে দশহাজার। ভিক্ষুদের সম্মান

ও মর্যাদা অনুসারে খাদ্য বোধ হয় বিভিন্ন হ'ত। হিউয়েন সাঙের খাদ্যতালিকা হ'তে দেখা যায় যে তাঁকে রাজরাজরার ভোগ্য মগধের সুগন্ধি মহাশালি চাল (চাউল) সাত ছটাক দৈনিক দেওয়া হ'ত, তা'ছাড়া ১২০টি বাতাবী লেবু, বিশটি বাদাম, বিশটি জায়ফল, এক আউন্স কর্পূর এবং দুধ, মাখন, ঘী, ইত্যাদি প্রয়োজনাতিরিক্ত তাঁকে প্রতিদিন দেওয়া হ'ত। তবে সকল বিদ্যার্থীকেই যে প্রচুর খাদ্য দেওয়া হ'ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইৎসিঙ বলেছেন (হিউয়েন সাঙের প্রায় ৪০ বছর পরে) নালন্দায় ৩০০০ ওপর বিদ্যার্থীকে খাদ্যাদি দান করা হ'ত—হঠাৎ ছাত্রসংখ্যা এত কমে যাবার কোন সংগত কারণ পাওয়া যায় না ; ইৎসিঙ খুব সম্ভব চীন, মিশর ও মধ্য এশিয়ার বিদেশী ছাত্রদের কথাই বলেছেন।

খাওয়া-পরার ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিদ্যার্থীরা একাগ্রচিত্তে বিদ্যা সাধনা করতেন এবং এজন্যই সর্বশাস্ত্রে তাঁদের এত পারদর্শিতা লাভ সম্ভব হ'ত।

কিন্তু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার অত্যন্ত কঠিন ছিল কারণ এ ছিল উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ ধাপ। তাই দেখে মানুষের মন যেসব সন্দেহ ও সমস্যায় উদ্বেলিত হ'ত সে-সব সমাধান করা, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হওয়া এবং বাগ্মিতা ও বিতর্কে পারদর্শিতা লাভ করার জন্যই এখানে পরিণত বয়স্ক (কুড়ির কমে নয়) বিদ্যার্থীদের জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমাগম হ'ত ভারত ও ভারতের বাইরে থেকে। হিউয়েন সাঙ বলেছেন প্রবেশাকাঙ্ক্ষী ছাত্রকে বৃহৎ ফটকের কাছে দ্বার-পণ্ডিতের সম্মুখীন হ'তে হ'ত, তিনি বেশ কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতেন, যে বিদ্যার্থী তার সদুত্তর দিতে পারতেন শুধু তাঁকেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হ'ত—দশজনের ভেতর সাতআট জনই বিফলকাম হতেন অর্থাৎ শতকরা সত্তর আশীজন বিদ্যার্থী দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যেতেন।' নির্বাচন প্রণালী এত শক্ত ছিল বলেই নালন্দার মনস্বিতা ও পাণ্ডিত্যের মান এত উঁচু ছিল এবং সমস্ত এশিয়ায় এখানকার শিক্ষায় শিক্ষিত মহাপণ্ডিতগণের খ্যাতি

ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃহৎ ফটকের কাছে ধর্মশালা ছিল, যাঁরা রাত্রিতে ফটক বন্ধ হবার পর নালন্দায় উপনীত হতেন তাঁরা ধর্মশালায় রাত্রি যাপন করতেন।

নালন্দায় জাতিধর্মনির্বিশেষে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তাতে ভারতের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার (বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য) উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং এই বিষয়গুলো পাঠ্যসূচীতে স্থান লাভ করেছিল :—(১) মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার মহাসাত্ত্বিক, থেরবাদী ইত্যাদি তত্ত্বনিচয়, (২) হীনযান ধর্মশাস্ত্র, (৩) চতুর্বেদ, (৪) হেতুবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র (Logic), (৫) শব্দবিদ্যা বা ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান, (৬) রসায়নশাস্ত্র, (৭) চিকিৎসাবিদ্যা, (৮) যাদুবিদ্যা, (৯) সাংখ্য বা যোগশাস্ত্র, (১০) জ্যোতিষবিদ্যা, (১১) শিল্পস্থানবিদ্যা, (১২) ধাতু-বিদ্যা, (১৩) ব্যবহারিকশাস্ত্র, (১৪) তান্ত্রিক বৌদ্ধ শাস্ত্র, (১৫) বিবিধ যথা—জাতকাদি। হিউয়েন সাঙ নিজে নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ যোগশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত বাঙালী শীলভদ্রের নিকট প্রথমে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে পরে হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যাকরণ (পাণিনি) ইত্যাদি আয়ত্ত করেন।

এখানে দশহাজার ভিক্ষু ও অন্যান্য বিদ্যার্থীর (গৃহী বৌদ্ধ বা অবৌদ্ধ) মধ্যে ১৫১০ জন ছিলেন অধ্যাপক বা শিক্ষক। এখানে প্রতিদিন একশত বক্তৃতা দেওয়া হ'ত প্রায় একশ' বিষয়ে এবং নিদ্রার সময় ব্যতীত সব সময়েই মহাবিদ্যায়তনে অধ্যাপনার কাজ চলত। বিভিন্ন বিষয়ের বিদ্যার্থীরা এক মিনিটের জন্যও উপস্থিতি বিষয়ে শৈথিল্য করতেন না। তপোবনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা নালন্দায় সমষ্টিগত বা শ্রেণী শিক্ষায় পর্যবসিত হওয়ায় বক্তৃতা পদ্ধতির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তা' স্পষ্ট বোঝা যায়।

অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর জীবনের যে পরিচয় হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে আমরা পাই তাকে আদর্শ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি বলেছেন শিক্ষক ও ছাত্রের প্রশ্নোত্তর ও আলাপ আলোচনার পক্ষে সমস্ত গোটা দিনটাও যথেষ্ট ছিল না। প্রভাত

থেকে রাত্রি পর্যন্ত আলাপ আলোচনাই চলত। আবৃত্তির ওপর তক্ষশীলার ন্যায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়ত জোর দেওয়া হ'ত, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্কের বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষণীয় বিষয়ের তাৎপর্যের ওপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপিত হ'ত বলে মনে হয়। কাজেই বক্তৃতা পদ্ধতির সংগে আজ যাকে আমরা 'টিউটোরিয়াল' পদ্ধতি বলি তা' নালন্দায় পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদের হস্তলিখিত পুঁথির অনুলিপি করতেও কিছু সময় অতিবাহিত হ'ত।

নালন্দার ধর্ম ও নৈতিক জীবনও অতি উচ্চাংগের ছিল। হিউয়েন সাঙ বলেছেন ভিক্ষু ও বিদ্যার্থীদের জীবন পবিত্র ও নিষ্কলংক ছিল, নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত কঠোর নৈতিক অনুশাসন তাঁরা মেনে চলতেন এবং হিউয়েন সাঙ বলেন সাতশ' বছরের মধ্যেও নৈতিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে কোন বিদ্যার্থী বিদ্রোহী হয়েছেন বলে জানা যায়নি। এর চাইতে বড় প্রশংসা পত্র বোধ হয় জগতের ইতিহাসে কোন দিন লিখিত হয়নি। আর সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে নৈতিক শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব ছিল বিদ্যার্থীদের, তাঁদের গণতান্ত্রিক সভায়ই দোষ-ত্রুটির আলোচনা ও প্রয়োজন হ'লে 'বয়কট' প্রণালীতে শাস্তি বিধান হ'ত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি পূর্বেই বলেছি এর মহাপণ্ডিত অধ্যাপকগণের জন্য। এঁদের মধ্যে হিউয়েন সাঙ যাঁদের নাম বিশেষভাবে করেছেন তাঁরা হলেন (১) কাঞ্চিদেশের ধর্মপাল (শীলভদ্রের পূর্বে ইনি সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন), (২) সমতটনিবাসী 'সদ্ধর্মমণি' মহাপণ্ডিত শীলভদ্র (ইনি রাজবংশসম্ভূত ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন), (৩) চন্দ্রপাল, (৪) গুণমতি, (৫) স্থিরমতি, (৬) প্রভামিত্র, (৭) জিনমিত্র, (৮) জ্ঞানচন্দ্র। হিউয়েন সাঙ নালন্দায় শিক্ষালাভ করে মহাযান শাস্ত্রে নিজেও একজন বড় পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং হর্ষবর্ধন ও আসামের রাজা কুমার (ভাস্করবর্মন) দু'জনেই তাঁর মহাযান শাস্ত্রে

পারদর্শিতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এঁদের নাম ছাড়াও ইৎসিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমদিককার বিখ্যাত অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁদের নাম করেছেন তাঁরা হচ্ছেন (১) নাগার্জুন, (২) দেব, (৩) অশ্বঘোষ, (৪) বসুবন্ধু, (৫) দিঙনাগ, (৬) কমলশীল। যেসব বিদেশী পণ্ডিত ও বিদ্যার্থী নালন্দায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে চীনদেশীয় হিউয়েন সাঙ, হিউয়েন চাও, ইৎসিঙ, সেংচি, উহিং, আত্তিং লুইতা প্রভৃতি পণ্ডিত, তিব্বত-রাজমন্ত্রী থাও-মি, কোরিয়ার ভিক্ষু আর্যবর্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীন, তিব্বত, কোরিয়া, মংগোলিয়া, সুমাত্রা—এককথায় সমস্ত এশিয়া নালন্দার জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল এ কথা মনে করতেও গর্ব বোধ হয়।

বয়স ও পাণ্ডিত্য অনুসারে অধ্যাপক ও ভিক্ষুদের নানা শ্রেণী বা স্তরে বিভক্ত করা হ'ত, যথা—বহুশ্রুত, স্থবির, ক্ষুদ্রভিক্ষু, শ্রমণ ইত্যাদি। স্থবির হলেই উপাধ্যায় পদ পাওয়া যেত। এদের মধ্যে যাঁরা বড় বড় মহাবিদ্যালয়ের কর্ণধার হতেন তাঁদের 'কুলপতি' এই উপাধি দেওয়া হ'ত, এই স্তরের পরের উপাধি ছিল 'পণ্ডিত'। জ্ঞানের পরিধি অনুসারে এই সব উপাধি দেওয়া হ'ত, প্রতি বৎসর পদমর্যাদা অনুসারে আবাসগৃহ ও অন্যান্য সুবিধেও এঁদের দেওয়া হ'ত সকল ভিক্ষুর সাধারণ সভায়। সর্বাধ্যক্ষ বা কুলপতি বা কোন একজন অধ্যাপক এ বিলিবণ্টন করতেন না, গণতান্ত্রিকভাবে সাধারণ সভায় এ ব্যবস্থা হ'ত।

ভিক্ষুদের বহিঃপরিচ্ছদ ছিল কৃষ্ণবর্ণের ঢিলা জামা; অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের বিদ্যার্থীদের কাল 'গাউন' হয়ত নালন্দার অনুকরণে মনোনীত হয়েছিল—এ অবশ্য গবেষণার বিষয়। তক্ষশীলার মত নালন্দায়ও মুখে পরীক্ষার পর 'স্নাতককে' উপাধি দেওয়া হ'ত, তবে পরীক্ষণীয় বিষয়সমূহের সংখ্যা এখানে অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নালন্দার জীবনে সময়তালিকা অনুসারে ঘণ্টা বা দামামা বাজিয়ে ঠিক ঠিক সময়ে স্নান খাওয়া-দাওয়া, অধ্যয়ন, বিশ্রামের

ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন অতিবাহিত হ'ত ; এত বিদ্যার্থী সমাগম যেখানে, সেখানে অপরিহার্য নিয়ম শৃঙ্খলা না থাকলে কোন কাজ চলতে পারেনা এ সহজেই বোঝা যায়।

নালন্দার পাঠাগার সেদিনের ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পাঠাগার ছিল। তিব্বতীয় তালিকা হ'তে আমরা জানতে পাই যে নালন্দা মহাবিহারের নিকটে 'ধর্মগঞ্জ' নামক গ্রামে 'রত্নসাগর', 'রত্নরঞ্জক' ও 'রত্নদধি' নামে তিনটি সুদৃশ্য ও বিরাট সৌধে তিনটি বড় পাঠাগার ছিল। 'রত্নসাগরের' নয়তলা প্রাসাদে ধর্মশাস্ত্র, প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রাবলী ও তান্ত্রিক গ্রন্থাবলী থাকতো এবং সেটিই ছিল সবচেয়ে বৃহৎ পাঠাগার। মুসলমানদের আক্রমণে ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে এই বৃহৎ পাঠাগারগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন আজও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়। এই পাঠাগার ধ্বংসের ফলে মানবসভ্যতার যে কী অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে (যেমন হয়েছে আলেকজাণ্ড্রিয়ার পাঠাগার ধ্বংসের ফলে) তা' সহজেই অনুমেয়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিকভাবে ঘর ইত্যাদি বণ্টন এবং নিয়মশৃঙ্খলা সংরক্ষণের ভার বিদ্যার্থীদের ওপর ন্যস্ত ছিল পূর্বেই বলেছি—এ অতি আধুনিক প্রগতিশীল পরিচালনার পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিণত বয়স্ক অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণ নিজেদের সুখসুবিধার ব্যবস্থা অল্পবয়স্ক বিদ্যার্থীদের হাতে ছেড়ে দিতেন—এটা তাঁদের উদারতা ও অমায়িকতারই পরিচয় এবং তাতেই নালন্দায় একটা অন্তরংগ ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ মধুময় হয়ে উঠেছিল। তাই হিউয়েন সাঙ বলেছিলেন সাতশ' বছরের মধ্যে কোন বিদ্রোহ বা উষ্মার সৃষ্টি হয়ে এই বিরাট শিক্ষক ও বিদ্যার্থীর সম্মেলনের ভেতর একদিনও মনোমালিন্য ঘটেনি। অবশ্য অধ্যয়ন বিষয়সংক্রান্ত ও নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা অধ্যাপক ও কর্ণধারদের হস্তেই ছিল—কাজেই নালন্দায় গণতন্ত্র ও কর্তা-তন্ত্রের শুভ মিলন

হয়েছিল। এই মধুময় প্রীতির সম্পর্ক আরও আশ্চর্য বলে মনে হয় এই ভেবে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী ভিক্ষু, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, অ-ভিক্ষু, জৈন প্রভৃতির সমাবেশ হ'ত এবং বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শ্রেণীর মতান্তর ছাড়াও বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষে নালন্দার শান্ত পরিস্থিতি অনায়াসে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারতো। এখানে নাস্তিক ও জড়বাদীদেরও প্রবেশাধিকার ছিল এবং আমরা দেখেছি সমস্ত দিন ধরে আলাপ-আলোচনায়ও বিতর্কের শেষ হ'ত না। নালন্দা সমস্ত ভারতের বিতর্কসভা ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না কারণ এখানে ভারতের পণ্ডিত ব্যক্তিরা সমাগত হয়ে যাঁর যাঁর মত বিতর্ক সভায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতেন এবং যে মত বিজয়ী বা প্রতিষ্ঠিত হ'ত সমস্ত ভারতবর্ষে সে মতের একটা মর্যাদা বেড়ে যেত ও প্রসার হ'ত। এ জন্যও বিদেশী পণ্ডিতগণ নালন্দায় দূর দূর দেশ থেকে আসতেন। তবে এত বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার ভেতরও এই সম্প্রীতি ও মধুর ভাব অক্ষুণ্ণ রইল কি করে? তা'র একমাত্র উত্তর হচ্ছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত স্বাধীনতানীতি। এখানে মত, বিশ্বাস, ধর্ম, আলোচনা ইত্যাদি সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল বলেই নালন্দার শান্তি কখনও ব্যাহত হয়নি। পাশ্চাত্যের একজন বড় পণ্ডিত বলেছেন,—"শিক্ষায় স্বাধীনতার নীতি নালন্দায় পরীক্ষিত হয়েছে।"* অবশ্য ব্রাহ্মণ্য যুগের শিক্ষায়ও যে এই ঔদার্য ও স্বাধীনতা ছিল তা' আমরা দেখেছি এবং ধারাবাহিকভাবে নালন্দায় হয়তো এর পূর্ণতর বিকাশ হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এই স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিকভাব থেকে জন্ম নেয় সমাজসেবার স্পৃহা কারণ একের চেয়ে দু'য়ের চেয়ে সঙ্ঘ বড়, সঙ্ঘের চাইতে সমাজ বড় এবং সমাজ সেবাই হ'ল সকল বিদ্যার্থীর কাম্য। সমাজ সেবার এই অনুপ্রেরণাতেই বিদ্যার্জন, সত্য উপলব্ধি করবার প্রয়াস, শুধু

* Hibbert Journal—Vol. XIII p. 165.

কৃপণের ধনের মত সঞ্চয়ের অভিলাষে নয়। আর সব ছাপিয়ে উঠত বিদ্যার্থীর দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' এর ধারণা জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য ও সুখ বর্জন করে। বুদ্ধের শান্ত করুণাময় মূর্তি যিনি জীবের দুঃখ দূর করতে ও জগতের কল্যাণের জন্য সত্যের সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং সত্য, স্বাধীনতা ও সমাজ সেবার এ অনুপ্রেরণা ছিল বলেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় জগতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পেরেছিল। আমার স্থির বিশ্বাস পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যেও এই মত সমর্থিত হবে।

বল্লভী ঃ—ভারতের পশ্চিম প্রান্তে নালন্দার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বল্লভী বিশ্ববিদ্যালয়। বল্লভী বিশ্ববিদ্যালয়ও নালন্দারই মত রাজন্যবর্গের দানে পুষ্ট। হিউয়েন সাঙ এখানে প্রায় একশ'টি সংঘারামে ৬০০০ ভিক্ষু দেখেছিলেন। ইৎসিঙ বলেছেন নালন্দা এবং বল্লভী এ দু'বিশ্ববিদ্যালয়েই পণ্ডিতরা দু'তিন বৎসর অধ্যয়ন করে তাঁদের পাঠ সমাপন করতেন। বল্লভীতেও নালন্দারই মত ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে বিদ্যার্থীরা সমাগত হয়ে সম্ভব অসম্ভব সকল রকম মতবাদই আলোচনা করতেন এবং বল্লভীর অধ্যাপকদের কাছে তাঁদের মতের সমর্থন পেয়ে সমস্ত ভারতে যশস্বী হ'তেন। হিউয়েন সাঙ বলেছেন স্থিরমতি ও গুণমতি একসময়ে বল্লভীতে অধ্যাপনা করেছিলেন। এখানকার পাঠাগারটিও খুব বড় ছিল এবং পুঁথি ইত্যাদি সংগ্রহ করবার জন্য রাজকোষ হ'তে অর্থ পেত। নালন্দার ছাত্রদের মত বল্লভীর ছাত্ররাও স্নাতকোত্তর অবস্থায় দেশীয় রাজন্যবর্গের সভায় উপস্থিত হয়ে নানা আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিতেন এবং ইৎসিঙ বলেছেন যাতে রাজকার্যে নিযুক্ত হ'তে পারেন, সেজন্য শাসনকার্যে দক্ষতার প্রমাণও দিতেন। এ থেকে বোঝা যায় বল্লভীতে সাধারণ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ পাঠ্য বিষয় ছাড়াও অন্য বিষয় পাঠ্যসূচীতে স্থান পেয়েছিল। বল্লভী আরেক বিষয়েও নালন্দার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—

হিউয়েন সাঙ বলেছেন বল্লভীতে বেশীর ভাগ ভিক্ষুই হীনযান ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন ; বল্লভীর খ্যাতি ছিল হীনযান মতবাদে, নালন্দার ছিল মহাযান ধর্মমতে।

ধান্যকটক :—দক্ষিণ দেশে একটি শিক্ষাকেন্দ্রের কথা হিউয়েন সাঙ বিশেষ করে বলেছেন সেটি হচ্ছে কৃষ্ণা নদীর তীরে বেরারের অমরাবতীর নিকটে শ্রীধান্যকটক বিহার। কোন কোন পণ্ডিতের মতে আধুনিক বেজওডা (Bezwada) হ'ল সেদিনের ধান্যকটক। যাহোক, এটি ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় শিক্ষারই কেন্দ্র ছিল। নাগার্জুনের সময় এর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। হিউয়েন সাঙ এখানে কয়েক মাস বাস করে মহাসংঘিকা ব্যবস্থার অভিধর্ম গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং অনেকগুলো ধ্বংসোন্মুখী বিহারের মধ্যে কুড়িটিকে ভাল অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। এই কুড়িটি বিহারে এক হাজার ভিক্ষুদের মধ্যে বেশীর ভাগই মহাসংঘিকা ধর্মমতাবলম্বী ছিলেন।

রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বতীয় বিবরণ অনুসারে বলেন যে তিব্বতের দাপঙ বিহার শ্রীধান্যকটক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। দাপঙের বিহারে কয়েকটি মহাবিদ্যালয় ছিল এবং আট হাজার ভিক্ষু বিদ্যার্থী ও অধ্যাপক সেখানে বিদ্যাচর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন।

ওদন্তপুরী :—পালবংশের প্রথম রাজা গোপাল আনুমানিক ৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি নালন্দার প্রায় ষাট মাইল উত্তরে ওদন্তপুরীতে (বিহারে) একটি মস্ত বিহার নির্মাণ করেন। পাল রাজাদের দানে ওদন্তপুরী বিহার পুষ্ট হয়েছিল এবং তাঁদের অর্থসাহায্যে এখানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর একটি বৃহৎ পাঠাগার গড়ে ওঠে। ওদন্তপুরী সম্বন্ধে খুব বেশী তথ্য আমাদের জানা নেই, তবে এই বিহারের আদর্শে প্রথম তিব্বতীয় বৌদ্ধ বিহার ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে ওদন্তপুরীতে এক হাজার ভিক্ষু বিদ্যার্থী ছিলেন

একথা আমরা নিশ্চিত জানি। ওদন্তপুরীর প্রভাকর পণ্ডিতের নাম বিখ্যাত। মুসলমান আক্রমণে নালন্দা, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী বোধ হয় একই সময়ে বিধ্বস্ত হয়।

বিক্রমশীলা :—এ সময়ের আরেকটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল বিক্রমশীলা। নালন্দা ও বল্লভীর মত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ও রাজন্যবর্গের দানে পুষ্ট। তিব্বতীয় মত অনুসরণ ক'রে দু'একজন ঐতিহাসিক বলেন বিক্রমশীলা উত্তর বিহার ভাগলপুরের (প্রাচীন চম্পা) নিকট গংগাতীরে রাজমহল গিরিশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। তবে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে বিক্রমশীলা বর্তমান ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জে অবস্থিত ছিল। বিক্রমশীলার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত না হওয়ায় এবিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের মতে সম্রাট ধর্মপাল একটি অতীব মনোরম স্থানে—গংগাতীরে ছোট্ট একটি পাহাড়ের ওপর—এই শ্রীবিক্রমশীলা 'দেব বিহার'টি স্থাপিত করেছিলেন নবম শতাব্দীতে। তখন পাল সম্রাটগণ মগধ অধিকার ক'রে প্রবল পরাক্রমশালী হয়েছেন—মনে হয় ধর্মপাল নিজ যশ বিস্তারের জন্যই নোতুন একটি মহাবিহার স্থাপিত করলেন। বিক্রমশীলার ইতিহাসের জন্য আমাদের তিব্বতীয় তথ্যাদির ওপরেই বিশেষ নির্ভর করতে হয় কারণ এ সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা তিব্বতে প্রবাহিত হয়েছিল এবং বিক্রমশীলার দীপংকর অতীশ প্রমুখ পণ্ডিতগণ তিব্বতে গিয়ে তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনুবাদে বিশেষ সাহায্য করে এবং মহাযান মতবাদ ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা ক'রে ভারতের সাংস্কৃতিক দান তিব্বতীদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। অনূদিত গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা ত্রয়োদশ শতকে তিব্বতে সংকলিত হয়েছিল, এর নাম 'তেঙ্গুর'। তারনাথের বিবরণী ও সুমপা রচিত 'পাগ্-সাম-জোন্ জান' গ্রন্থখানি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রচুর আলোকসম্পাত করেছে।

সম্রাট ধর্মপাল এ মহা বা 'দেব বিহার' নির্মাণ করেছিলেন একটি সুন্দর পরিকল্পনা অনুসারে। নালন্দার মতই বিক্রমশীলা 'দেব বিহার'টিও একটি সুদৃঢ় প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল; বিহারের মধ্যস্থলে ছিল মহাবোধি মূর্তি সমন্বিত প্রধান মন্দির, তা'ছাড়া আরও ১০৮টি মন্দির ছিল। তিনি অধ্যাপনার জন্য ১০৮ জন অধ্যাপক এবং অন্যান্য কাজের জন্য ছয়জন ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেছিলেন যথা—যজ্ঞকাষ্ঠের আচার্য, দীক্ষার আচার্য, হোমাগ্নির আচার্য, পূর্তবিভাগীয় কর্মসচিব, কপোতরক্ষক, এবং মন্দির-দাসদাসী সংগ্রাহক। মূল বিহারকে কেন্দ্র ক'রে একটি বিরাট আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠল। বিশ্ববিদ্যালয়টির পূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ ক'রল ছয়টি কলেজ বা মহাবিদ্যালয়ে এবং প্রত্যেকটি মহাবিদ্যালয়ে ১০৮টি ক'রে অধ্যাপক শিক্ষকতার কাজ চালাতেন। প্রত্যেকটি মহাবিদ্যালয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিল একটি উন্নত প্রণালীর গবেষণাগার, অবৈতনিক ছাত্রাবাস, বিদেশীয় ছাত্রদের জন্য পৃথক্ ছাত্রাবাস এবং বৃহৎ সম্মেলনগৃহ। একটি কেন্দ্রীয় সম্মেলনগৃহ বা 'হল' ছিল, তার নাম ছিল 'বিজ্ঞানাবাস'। এই 'বিজ্ঞানাবাস' থেকে ছয়টি ফটক দিয়ে ছয়টি মহাবিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তা'ছাড়া একটি বৃহৎ উন্মুক্ত প্রাঙ্গন ছিল; সেখানে ৮০০০ লোক সমবেত হ'তে পারত। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়টির বাইরের প্রাকারের প্রধান ফটকটির ডান পাশে ছিল নাগার্জুনের (তিনি এক সময়ে নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন) চিত্র এবং বাঁ পাশে ছিল দীপংকর অতীশের চিত্র—এ ছাড়া সমস্ত প্রাকারটিই চিত্রকলার সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ ছিল।*বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালগুলোতে বিখ্যাত পণ্ডিতদের তৈলচিত্রও ছিল। নালন্দার মত এখানেও প্রাকারের বাইরে প্রধান ফটকের পাশে ধর্মশালা ছিল, সন্ধ্যার পর যাঁরা এসে পৌঁছুতেন তাঁদের জন্য।

পালবংশীয় রাজাদের ও ভিক্ষু-সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ধনী

* S. C. Das—Indian Pandits in Tibet, J. B. T. S. i, 1-11.

সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় দীর্ঘ চারি শত বৎসর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ খুব সাফল্যের সংগেই চলেছিল। সম্রাট ধর্মপাল বহু অর্থ ও ভূমিদান করেছিলেন এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদের বৃত্তি নির্ধারিত ক'রে দিয়েছিলেন। কাজেই এখানেও নালন্দারই মত বিদ্যার্থীরা অর্থচিন্তার হাত হ'তে মুক্তি পেয়ে বিদ্যানুশীলনেই নিমগ্ন থাকতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি ফটকে ছয়টি মহাবিদ্যালয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট ছয়জন 'দ্বারপণ্ডিত' অধিষ্ঠিত থাকতেন যাতে মন্দধী প্রবেশাধিকার লাভ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নীচু না করতে পারে। এই মহাপণ্ডিতদের বিতর্কে সন্তুষ্ট করতে পারলেই বিদ্যার্থীকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হ'ত। দশম শতকের শেষাংকে, সম্ভবত মহারাজ প্রথম মহীপালের সময় (৯৯২-১০৪০ খ্রীঃ অঃ) আমরা এই ছয়জন বড় নৈয়ায়িকের নাম 'দ্বারপণ্ডিত' হিসেবে দেখতে পাই; হয়ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষই 'দ্বারপণ্ডিতের' কাজ করতেন :—

১। রত্নাকর শান্তি—পূর্ব ফটক
২। বারাণসীর ভগীশ্বর কীর্তি—পশ্চিম ফটক
৩। নরোপা—উত্তর ফটক
৪। প্রজ্ঞাকরমতি—দক্ষিণ ফটক
৫। কাশ্মীরের রত্নবজ্র—প্রথম কেন্দ্রীয় ফটক
৬। গৌড়ের জ্ঞানশ্রী মিত্র—দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় ফটক

মহাবিহারের সর্বাধ্যক্ষ বা প্রধান কর্মসচিব তাঁর পাণ্ডিত্যের ও ধর্মশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাঁর উপদেশ অনুসারে ছয়জন সভ্য দ্বারা গঠিত একটি কর্মপরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করতেন; সর্বাধ্যক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কর্মপরিষদের কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ব'লে গৃহীত হ'ত না। দেশের রাজার সংগে মহাবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় যোগসূত্র সর্বদাই রক্ষিত হ'ত।

শিক্ষা ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা একটি পণ্ডিত সংসদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। কথিত আছে বিক্রমশীলার এই পণ্ডিত সংসদ

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থাও করতেন। বিশ্ববিদ্যালয় দু'টির শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা একটি সংসদের হাতে আসা সম্ভবপর বলেই মনে হয় কারণ সম্রাট ধর্মপাল এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেইজন্যই হয়ত আমরা দেখি এই দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধ্যাপক বিনিময় চলতো এবং দীপংকর (৯৮০-১০৫৩ খ্রীঃ অঃ) ও অভয়াংকরের (১১১৪ খ্রীঃ অঃ) মত মহাপণ্ডিতগণ এ দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনা করতেন।

তিব্বতরাজ চানচুব অতীশ দীপংকরকে তিব্বতে আমন্ত্রণের জন্য তিব্বতী ভিক্ষু নাগশোকে (Nag-tsho) বিক্রমশীলায় পাঠিয়েছিলেন। নাগশোর বিবরণ থেকে বিক্রমশীলার জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এক রাত্রি ধর্মশালায় কাটিয়ে নাগশো তিব্বতী ছাত্রাবাসে এসে বাস করেন। আমাদের আজকালকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের মত বিক্রমশীলায় একটি বিরাট সম্মেলনে নাগশো উপস্থিত ছিলেন। স্থবির শ্রেষ্ঠ 'বিদ্যা কোকিল' (সম্মানজনক উপাধি) এই সম্মেলনে পৌরহিত্য করেন। শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের জন্য সম্মানিত স্থান এবং বিক্রমশীলার মহারাজার জন্য উচ্চাসন নির্দিষ্ট ক'রে রাখা হয়েছিল। নাগশোর বিবরণ থেকে জানতে পাই এ রকম সম্মেলনে মগধের রাজা (বিক্রমশীলার মহারাজা) অপেক্ষাও পণ্ডিতবর বীরবজ্র ও দীপংকর অতীশ প্রমুখ পণ্ডিতগণ অধিকতর সম্মান পেতেন কারণ যখন মহারাজা সম্মেলনমণ্ডপে প্রবেশ করেন তখন কোন ভিক্ষুই দণ্ডায়মান হয়ে মহারাজকে সম্মান প্রদর্শন করেননি কিন্তু যখন বীরবজ্র, দীপংকর অতীশ প্রমুখ পণ্ডিতবর প্রবেশ করলেন, তখন সকল ভিক্ষুই দণ্ডায়-মান হয়ে তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করলেন। অতীশের কটিদেশ থেকে এক গুচ্ছ চাবির তাড়া ঝুলছিল কারণ তিনি বিহার বা ছাত্রাবাস ও বিভাগীয় কার্য পরিচালনার দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এখানেও বিশ বৎসর বয়ঃক্রমের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ হ'ত না, তবে বিক্রমশীলার পাঠ্যসূচী নালন্দার মত

অত ব্যাপক ছিল না। বৌদ্ধ হীনযান ও মহাযান ধর্মগ্রন্থাদি, শব্দ-বিদ্যা (ব্যাকরণ), হেতুবিদ্যা (ন্যায়শাস্ত্র) পাঠ্যতালিকায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করলেও, তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রাধান্য ও অধ্যয়ন এ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল গুহ্য মন্ত্রবলে অলৌকিক কার্য সম্পাদনের আশায়। (পরে সহজিয়া ধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনা একাকার হয়ে ধর্মজগতে বীভৎসতার সৃষ্টি করেছিল)। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। যোগশাস্ত্র, যাদুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা এবং শিল্পবিদ্যাও পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল।

বিক্রমশীলার শিক্ষা পদ্ধতিতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত দু'রকম পদ্ধতিরই চলন ছিল, তবে তান্ত্রিক শিক্ষা প্রচলনের ফলে গুরুর নিকট দীক্ষালাভের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে ব্যক্তিগত শিক্ষা ও গুরু শিষ্যের নিকটতম সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়ে গেল। শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় অধ্যাপক ও ছাত্র সমান অংশ গ্রহণ করতেন এবং শিক্ষক, ছাত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মেলনে শিক্ষা সমস্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা ও বিতর্ক হ'ত। শিক্ষাপদ্ধতি ছিল মনোবৃত্তি-বিকাশ ও চরিত্র গঠনের প্রধান পরিপোষক। নালন্দার মত এখানকারও পরীক্ষাপদ্ধতি ছিল মৌখিক; শিক্ষা সমাপ্তির পর যোগ্য ছাত্রগণ রাজার নিকট হ'তে উপাধি লাভ করতেন।

নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক ও পরিবাহক হিসেবে যাঁরা ভারত ও ভারতের বাইরে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিক্রমশীলার বুদ্ধজ্ঞানপদ, জিনমিত্র, জেতারি, অতীশ দীপংকর, রত্নাকর শান্তি, ভগীশ্বরকীর্তি নরোপা, প্রজ্ঞাকরমতি, রত্নবজ্র, জ্ঞানশ্রীমিত্র এবং অতীশোত্তর যুগে রত্নকীর্তি, অভয়াংকর গুপ্ত ও শাক্যশ্রীভদ্র, প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাপকের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এঁদের প্রত্যেকেই মহাযান, দর্শন, সূত্র ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং মৌলিক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এঁদের

মধ্যে অনেকে ছিলেন বাঙালী যেমন বরেন্দ্রের জেতারি (রত্নাকর শান্তি ও অতীশের শিক্ষক) ও নরোপা, গৌড়ের অতীশ দীপংকর, জ্ঞানশ্রীমিত্র ও অভয়াংকর গুপ্ত। এঁদের প্রায় সকলেই তিব্বতী ভাষা শিখেছিলেন এবং সংস্কৃত থেকে নানা গ্রন্থাদি তিব্বতীতে অনুবাদ করেছিলেন। বিক্রমশীলার অধ্যাপকদের মধ্যে অতীশ দীপংকরই সমধিক খ্যাত। তিনি ছিলেন বিক্রমশীলার 'শীলভদ্র'—বৌদ্ধজগত তাঁর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং তিব্বত তাঁর উপস্থিতিতে ধন্য হয়েছিল। মহারাজ প্রথম মহীপাল দীপংকর অতীশকে বিক্রমশীলায় আমন্ত্রণ করেন এবং মহারাজ নয়পালের সময় (আঃ ১০৪০-১০৫৪ খ্রীঃ অঃ) তিনি বিক্রমশীলার সর্বাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১০৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বা ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন তিব্বতী রাজা চানচুরের আমন্ত্রণে কয়েকজন তিব্বতীয় ও বিক্রমশীলা পণ্ডিতের সমভিব্যাহারে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত (১০৫৩ খ্রীঃ অঃ) তিব্বতে ধর্মপ্রচার ও গ্রন্থাদি প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন। তিব্বতীয় ধর্মজীবনে তাঁর প্রভাব চিরস্থায়ী এবং তিনিই তিব্বতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মকে সিংহাসনচ্যুত করে সংস্কৃত তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

এই কষ্টবহুল বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে চীন ও তিব্বতে জ্ঞানালোক বিতরণ এ যুগের ভারতীয় পণ্ডিতগণের অপূর্ব ত্যাগস্বীকারের ভাস্বর ইতিহাস। প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু ভারতীয় পণ্ডিত এবং নালন্দা ও বিক্রমশীলার অধ্যাপক বহু কষ্ট স্বীকার ও জীবন বিপন্ন করে জ্ঞান ও ধর্মের আলোক চীন ও তিব্বতে বিস্তার করেন এবং এশিয়া ও জগতের শিক্ষাগুরু হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করেন।* কী অপূর্ব ত্যাগ স্বীকার, কী অদ্ভুত জ্ঞানালোক ও ধর্ম বিস্তারের স্পৃহা, কী

* R. K. Mookerjee—Ancient Indian Education. pp. 601-610.

অচিন্ত্য সাধনা ও নিষ্ঠা। বিদেশী আক্রমণ ও পরাধীনতার ফলে ভারতের সে গৌরব প্রায় আটশ' বছরের জন্য লুপ্ত হয়ে গেছল কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয় জীবনে যে জোয়ার আসে তা'র ফলে এবং বিশেষ করে আজ স্বাধীনতার ফলে ভারতীয় পণ্ডিতগণের আবার আহ্বান এসেছে বিশ্বের দরবার থেকে ভারতের কৃষ্টি, ভারতের ঐতিহ্য ও ভারতীয় ধর্মের মূল সূত্র দিয়ে জগতকে ধ্বংসের হাত হ'তে রক্ষা করে সঞ্জীবিত করতে, নোতুন প্রভাতের আলোকে সমুজ্জ্বল করতে।

তবকাৎ-ই-নাসিরির মুসলমান ঐতিহাসিকের বিবরণে বোঝা যায় ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বক্তি্য়ার ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস করেন এবং সম্ভবতঃ ঐ বৎসরই মুসলমান আক্রমণে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হোল, পণ্ডিত ও ভিক্ষুগণ প্রায় সব নিহত হলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজিও ভস্মীভূত হোল। কাশ্মীরের নৈয়ায়িক শাক্যশ্রীভদ্র এ সময় বিক্রমশীলার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে এই শোচনীয় ভয়াবহ ঘটনা দেখে ছিলেন। বিক্রমশীলা মহাবিহার ধ্বংসের পর শ্রীভদ্র বরেন্দ্রভূমির (উত্তরবংগ) জগদ্দল বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন এবং সেখান থেকে তিনি অনেক ভিক্ষু সংগে নিয়ে তিব্বতে এলেন এবং সেখানেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করলেন। কি ভ্রান্ত প্রেরণার ফলে মানুষ মানুষের চিন্তার শ্রেষ্ঠ শতদলগুলো ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে পারে তা দুর্বোধ্য!

জগদ্দল:—উত্তরবংগের জগদ্দল বিশ্ববিদ্যালয় বংগ ও মগধের অধিপতি রামপালের (১০৮৪-১১৩০ খ্রীঃ অঃ) কীর্তি। দুঃখের বিষয় এ'র জীবন একশ' বছরের মধ্যেই নির্বাপিত হয়। কিন্তু এই অল্প সময়ের ভেতরেই বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, শুভকর, মশাকর গুপ্ত প্রমুখ মহাপণ্ডিত অধ্যাপকগণের ধর্ম ও ন্যায় বিষয়ক রচিত গ্রন্থাদির জন্য জগদ্দলের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১২০৩ সনে মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়।

এর পরে যে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র ভারতবর্ষে জ্ঞানের প্রদীপ বহুদিন পর্যন্ত জ্বালিয়ে রেখেছিল সে দুটি হচ্ছে মিথিলা (উত্তর বিহার) এবং পশ্চিমবংগের নবদ্বীপ বা নদীয়া।

মিথিলা :—জনকরাজার কাহিনী থেকে আমরা জানি মিথিলা বা বিদেহ রামায়ণের যুগ হ'তেই একটি উচ্চ শিক্ষা, আলোচনা ও বিতর্কের কেন্দ্র ছিল ; বৌদ্ধ যুগেও এর গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। পরবর্তী রাজাদের আমলে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এর খ্যাতি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেল ; এখানকার পণ্ডিতদের জ্ঞানগরিমায় আকৃষ্ট হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে বিদ্যার্থীরা আসতেন ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করতে যেমন আসতেন একদিন বিদ্যার্থীরা নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। নালন্দা বা বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এখানে দ্বারপণ্ডিতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করতে হতনা সত্যি, কিন্তু এখানকার শেষ পরীক্ষা কঠিন ছিল। এর নাম 'শলাকা পরীক্ষা' ; যাঁরা শিক্ষা সমাপ্ত করে স্নাতক হবেন তাঁদের কাছে হস্তলিখিত পুঁথির যে কোন পৃষ্ঠা ছোট একটি ছুঁচ দ্বারা বিদ্ধ করে উপস্থাপিত করা হ'ত সরলার্থ করে দেবার জন্য। এ থেকে অধীত পুস্তকাদি সম্পুর্ণরূপে আয়ত্তীকৃত হয়েছে কিনা বোঝা যেত। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দেওয়া হ'ত।

মিথিলার পণ্ডিতগণের মধ্যে সাহিত্যে মহাপণ্ডিত জগদ্ধর ও পদাবলী রচয়িতা বিদ্যাপতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; ন্যায়শাস্ত্রে "তত্বচিন্তামণি" প্রণেতা নব্যন্যায়ের প্রবর্তক গংগেশ উপাধ্যায়, তাঁর পুত্র বর্ধমান (১২৫০ খ্রীঃ অঃ), পক্ষধর মিশ্র (১২৭৫ খ্রীঃ অঃ) ও মহেশ ঠক্কুর (ঠাকুর) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সর্ব ভারতীয় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মহেশ ঠাকুরের একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শিষ্য রঘুনন্দনদাসরাজ সম্রাট আকবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে বিদ্বৎসমাজে দিগ্বিজয়ে বের হয়েছিলেন। সম্রাট তুষ্ট হয়ে তাঁকে সমস্ত মৈথিলী দেশ জায়গীর স্বরূপ দান করেন। রঘুনন্দনদাসও

গুরুভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মহেশ ঠাকুরকে মিথিলা রাজ্য দিয়ে গুরুদক্ষিণা দেন। এইভাবেই মহেশ ঠাকুর দারভাঙ্গা মহারাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতেও ভারতের সনাতন গুরুভক্তি ও গুরুশিষ্য সম্বন্ধ এভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল ভাবতেও আনন্দ হয়।

নবদ্বীপ :—নবদ্বীপ বা নদীয়া একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতেই উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল, গৌড়ের লক্ষণসেন (১১১৯-১১৯৯ খ্রীঃ অঃ) রাজা হয়ে নবদ্বীপে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। সেই সময় বহু পণ্ডিত সমাগমে নবদ্বীপ উচ্চ শিক্ষার একটি খুব বড় কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ ন্যায়, আইন ও ধর্মশাস্ত্রে বিখ্যাত গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী প্রভৃতি বিখ্যাত কবি তাঁর সভার অলংকারস্বরূপ ছিলেন। আইন বিশারদ ছিলেন শূলপানি, তিনি 'স্মৃতি বিবেক' নামক গ্রন্থ রচনা করে যশস্বী হয়েছিলেন। মুসলমান আক্রমণে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষণসেন পূর্ববংগে প্রস্থান করার পরও নবদ্বীপের গৌরব মুসলমান আমলে (১১৯৯-১৭৫৭ খ্রীঃ) শুধু অক্ষুণ্ণই ছিল না ; বরং বৃদ্ধিই পেয়ে ছিল—এ বাংলার মুসলমান সুলতান ও নবাবদের উদারতা ও বিদ্যোৎসাহিতারই পরিচায়ক।

নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠবার দুটি প্রধান কারণ ছিল ; নালন্দা ও বিক্রমশীলার বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের পর নবদ্বীপের নোতুন বুনিয়াদে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রাদির বিশেষ চর্চার আবার সুযোগ ঘটল কারণ মুসলমান সুলতানেরা দেশের সংস্কৃতিতে কোন বাধা দেন নাই। দ্বিতীয়ত, মিথিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা বিদ্যার্থী হিসেবে যেতেন তাঁরা শিক্ষা সমাপনান্তে কোন পুঁথির অনুলিপি বা অধ্যাপকের বক্তৃতার বা নিজের লিখিত কোন নোট কিছুই আনতে পারতেন না—এই ছিল মিথিলার উদ্ধত সঙ্কীর্ণ নিয়ম। কাজেই ন্যায়শাস্ত্রে মিথিলার পাণ্ডিত্য খানিকটা মিথিলার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। বাংলার বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি কি করে ষোড়শ শতাব্দীতে মিথিলার

একাধিপত্য খর্ব করে নবদ্বীপে ন্যায়ের অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত করেন সে কাহিনী উল্লেখ না করলে এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁকে মিথিলায় পাঠিয়েছিলেন নদীয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম (আঃ ১৪৫০-১৫২৫ খ্রীঃ অঃ) মিথিলা থেকে উপাধি দেবার সনন্দ আদায় করতে। বাসুদেব নিজে মিথিলায় শিক্ষালাভ করে এবং শলাকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নদীয়ায় নব্য ন্যায়ের মহাবিদ্যালয় খুলেছিলেন। কিছু লিখে আনবার অনুমতি না থাকায় তিনি "তত্বচিন্তামণি" ও "কুসুমাঞ্জলি" নামক গ্রন্থের ছন্দোবদ্ধাংশ মুখস্থ করে এসে নদীয়ায় সে বই দু'খানি লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর প্রথম ছাত্র পরবর্তীকালের বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি। গুরু কর্তৃক মিথিলায় প্রেরিত হয়ে রঘুনাথ সেখানে তাঁর মৈথিলী অধ্যাপককে বিতর্কে পরাস্ত করেন, এতে নদীয়ার যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নদীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ নীতির একটু বিশেষত্ব ছিল। শুধু মৌখিক গবেষণাই অধ্যাপক পদের জন্য যথেষ্ট ছিল না, অধ্যাপকের শিক্ষা কৌশল জানা থাকা এবং বিদ্বৎসভায় বিপক্ষকে বিতর্কে পরাস্ত করবার ক্ষমতা থাকা অত্যাবশ্যক ছিল। রঘুনাথ ন্যায়ের যে মহাবিদ্যালয় এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা' থেকে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রথিতযশা নৈয়ায়িকগণ কুশাগ্রবুদ্ধি ও চুলচেরা বিশ্লেষণ শক্তির গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে এনেছেন—ভারতের অন্য সব শিক্ষা কেন্দ্রে জ্ঞানের দীপ যখন স্তিমিত হয়ে এসেছিল বা নির্বাপিত হয়ে গেছল, তখন একমাত্র নদীয়াই আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিল। একি কম গৌরবের কথা?

ন্যায় ব্যতীত স্মৃতি বা আইন চর্চাও নদীয়ার বিশেষত্ব ছিল, ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আইনবিশারদ রঘুনন্দন স্মৃতির প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর পরবর্তীকালে নদীয়ার বহু বিখ্যাত স্মার্ত বা আইনবিশারদ আইনের চর্চা ও গ্রন্থাদি প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। নদীয়া তান্ত্রিক শাস্ত্রাদি আলোচনারও একটি প্রধান

কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে রামরুদ্র বিদ্যানিধি জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। জ্যোতিষ-মহাবিদ্যালয়ের কাজ ছিল মুর্শিদাবাদের নবাব ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিচারপতি ও শাসনকর্তাদের জন্য পঞ্জিকা প্রস্তুত করা। তবে মনে হয় পলাশীর যুদ্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব কিছু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

'Calcutta Monthly' নামক পত্রিকার ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যায় নদীয়া বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। তা' থেকে আমরা জানতে পাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি প্রধান কেন্দ্র ছিল—নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও গোপালপাড়া; তিনটি কেন্দ্রেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নদীয়ার মহারাজা। নবদ্বীপে তখন ১১০০ বিদ্যার্থী এবং ১৫০ জন অধ্যাপক ছিলেন। রাজা রুদ্রের সময় (১৬৮০ খ্রীঃ অঃ) বিদ্যার্থীর সংখ্যা ছিল ৪০০০ এবং অধ্যাপকের সংখ্যা ৬০০। কোন কোন বিদ্যার্থী এইসব পোষ্টগ্রাজুয়েট বা স্নাতকোত্তর বিভাগে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত অতিবাহিত করতেন। যেসব পুঁথি তাঁরা অধ্যয়ন করতেন তা' কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। বিতর্ক ও আলোচনার ভেতর দিয়ে শিক্ষা হ'ত—পদ্ধতির একটু বিশেষত্ব ছিল, দু'জন অধ্যাপক কোন সূক্ষ্ম বিষয়ে বিতর্ক শুরু করতেন, বিদ্যার্থীরা তা' মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং নিজেদের যেসব প্রশ্ন বা সন্দেহ থাকত তা' প্রশ্ন করে সমাধান করে নিতেন। প্রকাশ্য সভায় বিতর্কের ভেতর দিয়ে জ্ঞানের অগ্রগতি বা অগ্রসর ভারতবর্ষের সনাতন পদ্ধতি এবং নদীয়ায় তা' হয়ত আরো উচ্চতর মান গ্রহণ করেছিল। নদীয়ার গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ করে এ কথা বলবার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন যে ইংরেজী মতে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত না হ'লেও বাংলা দেশের বা ভারতবর্ষের জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার কোন অন্তরায় থাকতো না, অন্ততঃ যে চারিত্রিক ও ভাসাজ্ঞানের দুর্বলতায় আমরা আজ ভুগছি তা' থেকে হয়ত আমরা নিষ্কৃতি পেতাম।

খ্রীষ্টধর্ম ও মধ্যযুগের শিক্ষা

কুইন্টিলিয়ানের সময়েই বিলাসিতা ও শিথিলতার বিষ ঢুকেছিল রোমক সমাজে, তিনি সে বিষয়ে রোমক পিতাকে সাবধান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক টাসিটাস প্রথম খ্রীষ্টাব্দের শেষে তাঁর বিখ্যাত 'জারমানিয়া' (Germania) নামক পুস্তকে বর্বর জার্মান জাতিগুলোর সারল্য, সাদাসিদে ভাব, দৈহিক শক্তি ও ব্যক্তিগত রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা, কর্মপ্রণোদনা ও ধর্মবিশ্বাসের গভীরতার অপূর্ব চিত্র রোমক সাম্রাজ্যের বিলাসিতা, আরাম-প্রিয়তা, নষ্টব্যক্তিস্বাধীনতা, লুপ্তপ্রায় কর্মপ্রেরণা ও আচারবহুল প্রাণহীন ধর্মের পটভূমিকায় দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন কিন্তু ধ্বংসের বীজ একবার উপ্ত হ'লে জাতি ও সাম্রাজ্যের প্রাণশক্তি আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসে এবং একটা প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হ'লে একেবারে নিভে যায়। রোমক সাম্রাজ্যেও হ'ল তাই ; একদিকে গথ, লম্বার্ড, ফ্রাংক, ভ্যাণ্ডাল ইত্যাদি জার্মানীয় অসভ্য বর্বরদের শতাব্দব্যাপী পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও অপর দিকে মধ্য এশিয়ার হূণদের অতর্কিত আচম্বিতে আক্রমণ—এ দুয়ের মাঝে পড়ে রোমক সাম্রাজ্য চতুর্থ ও পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে ভেংগে চুরমার হয়ে গেল, বর্বরেরা রাজাসনে বসল,—সংগে সংগে অখ্রীষ্টীয় (Pagan) স্কুলগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সমস্ত ইউরোপের ওপর রাত্রির একটা কালো অন্ধকার যেন চেপে বসল। চূর্ণীকৃত রোমক সাম্রাজ্য দিয়ে গেল চার্চের হাতে পুরাতন সংস্কৃতির আলো জ্বালিয়ে রাখবার ভার বর্বর পৃথিবীতে। একমাত্র যাঁরা জ্ঞানের আলো হয়তো জ্বালিয়ে রাখতে পারতেন ব্যাপকভাবে বিদ্যালয়গুলো পুনঃ প্রতিষ্ঠা ক'রে, তাঁরাও সে কাজে বিশেষ আগ্রহের সংগে এগুলেন না, কাজেই প্রায় দশ শতাব্দী ধরে ইউরোপে আলোকবর্তিকা উজ্জ্বল শিখায় আর জ্বললো না, গ্রীস ও রোমের সংস্কৃতির কথা মানুষ ভুলে গেল—

অতীত যেন একদিনে মুছে গেল, মানুষকে আবার নোতুন করে শিক্ষার কাজ শুরু করতে হ'ল। তবে এ অন্ধকারের ভেতর যেটুকু আলোর বিকিরণ হয়েছিল তা' হয়েছিল চার্চের সাহায্যেই।

য়ীহুদীদের বা ইস্রায়েলের শিক্ষা সেন্টপল্ (যদিও তিনি নিজে য়ীহুদী বালকের শিক্ষাই পেয়েছিলেন) প্রথম খ্রীষ্টাব্দেই পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি যীশুর জীবনের শিক্ষা আরো অনেক উন্নততর এবং সংস্কৃত বলে মনে করতেন এবং খ্রীষ্টানদের জন্য সে শিক্ষাই তিনি অনুমোদন করেন।

যীশুখ্রীষ্টের ধর্মে ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানুষের সমান অধিকার, অনাড়ম্বর সাদাসিদে জীবন, জীবে দয়া, একেশ্বরবাদ এসব সুন্দর কথা প্রচারিত হয়েছিল, কাজেই খ্রীষ্টানরা ইচ্ছে করলে হয়ত জ্ঞানের আলো চারদিকে ছড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু কতগুলো কারণে তা' সম্ভব হয়নি। প্রথম শতাব্দীতে নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের জন্য রোমক সাম্রাজ্য দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে পর্বতগুহা বা নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছিলেন খ্রীষ্টানরা, কাজেই জীবনের আদর্শ তাঁরা করে ফেললেন দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন ও পাপ গ্রীক রোমক জীবন ত্যাগে আত্মার মুক্তি। স্বধর্ম প্রতিষ্ঠান কল্পে রোমক সাম্রাজ্যের সংগে যুঝতে হ'ল তাঁদের এবং সংগে সংগে গ্রীক রোমক সাহিত্য ও অখ্রীষ্টীয় ধর্মও তাঁদের কাছে হয়ে উঠল একান্তভাবে বর্জনীয়। যাদের নৈতিক অবনতি ও ভুল ধর্মবিশ্বাস তাঁরা শোধরাতে চাচ্ছেন তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য কি করে গ্রহণ করবেন তাঁরা? তাই দেখি সেন্ট অগাষ্টিনের (৩৪৫-৪৩০ খ্রীঃ অঃ) মত লোক যিনি চোখের জল না ফেলে কবি ভার্জিলের ইনিডের (The Ænid) চতুর্থ অধ্যায় পড়তে পারতেন না বা যিনি গ্রীক কাব্য ও বাগ্মিতার ছিলেন একজন প্রধান ভক্ত, তিনিও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর তাঁর সাহিত্যিক রুচি করলেন একেবারে বনর্জ। চরম প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেক খ্রীষ্টানরা (সেন্ট অগাষ্টিন ও পোপ

গ্রেগরীও)* মনে করলেন অজ্ঞতার সারল্যের সহিত পবিত্রতার বুঝি একটা সম্বন্ধ আছে। অপরদিকে বর্বরেরা লেখাপড়ার প্রতি বিমুখও ছিল, তারা নেহাৎ 'প্র্যাকটিকাল' বা ফলমুখী শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই পছন্দ করতো না। যাহোক প্রথম দিকের খ্রীষ্টধর্মে বিশারদ বহু পণ্ডিতের কাছে দর্শনের অনুসন্ধিৎসা, কৌতূহল বা সাহিত্যানুরক্তি পাপ বলেই গণ্য হ'ত। অবশ্যি আবার অনেকে ছিলেন যাঁরা তাঁদের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপন করতে চাইতেন। ইউরোপের মানসিক অবনতির আর একটা বড় কারণ তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক সাহিত্য ও ভাষার নির্বাসন পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যে, কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই সময় রোমক খ্রীষ্টানরা তাঁদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে গ্রীক ভাষা ব্যবহার পরিত্যাগ করলেন, ফলে হোমার ও ইস্কিলাস্ (Æschylus) পড়া বন্ধ হয়ে গেল এবং পুরনো সংস্কৃতির সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান গ্রীকভাষা পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করলো না।

তাই দেখি পঞ্চম শতাব্দীতে ঐতিহাসিক আপোলিনারিস্ সিডোনিয়াস্ (Apollinaris Sidonius) বলেছেন, "ছোটরা আজকাল আর পড়াশুনা করে না, শিক্ষকদের ছাত্র নাই, শিক্ষা মৃতপ্রায়।"

নবম শতাব্দীতে চার্লস দি বলডের (Charles the Bald) প্রিয়পাত্র লুপুস (Lupus of Ferrie`res) লিখেছেন যে লেখাপড়ার কাজ এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে; তাঁকে নিজে রোমে পোপের কাছে লিখে তবে এক কপি কিকিরোর বই আনান সম্ভব হ'ল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিশপ এডালবেরিক (Adalberic) বলেছেন—"এমন একাধিক বিশপ আছেন যাঁহারা আঙ্গুল গুণিয়া বর্ণপরিচয়ের অক্ষরগুলির সংখ্যা বলিতে পারেন না।" ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট গল নামক মঠ বা কনভেন্টের সন্ন্যাসীরা কেহই লেখাপড়া জানতেন না। বইপত্রের অভাবও ছিল বিস্তর; আইন-

*পোপ প্রথম গ্রেগরী (৫৯০-৬০৪ খ্রীঃ অঃ)

কানুনের কাজ করেন এমন লোক পাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। অনেক সময় সেজন্য আইন প্রণয়ন মুখের কথায় হ'ত। সামন্তেরা (Barons) তাদের অজ্ঞতায় গর্ব অনুভব করতো। সাধারণ লোক বিদ্যার ধারে কাছেও যেত না। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রচেষ্টার পরও লেখাপড়া সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে রয়ে গেল, শুধু চার্চ বা মঠের কাজে যাঁরা নিযুক্ত হবেন তাঁদের জন্য বা মধ্যযুগের দ্বিতীয় অর্ধাংশে (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে) যাঁরা নাইট হবেন তাদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ল। নাইটের শিক্ষা আলাদা, সে কথা পরে বলব।

চার্চস্কুল :—চার্চের দু'ধরনের স্কুল ছিল, কতগুলো বিশপের প্রাসাদের সংলগ্ন (Cathedral Schools) আর কতগুলো মঠের সংলগ্ন (Monastic Schools) এবং পরে চার্চের আওতায় গ্রামে স্কুল খোলার প্রচেষ্টা চলেছিল। কিন্তু শিক্ষা অতি সামান্য ধরনের দেওয়া হ'ত, তবে যাজকেরা মানসিক পরিশ্রমের সংগে দৈহিক পরিশ্রমের ব্যবস্থা করেছিলেন। পড়তে শেখান হ'ত যাতে ছেলে বাইবেল পড়তে পারে ও চার্চে ধর্মযাজকের অনুষ্ঠানাদি বুঝতে পারে। লিখতে শেখান হ'ত যাতে বাইবেল ও ভগবদ্ভক্তি-মূলক গানগুলোর কপি করতে পারে এবং গির্জায় প্রার্থনার সময় যাতে গান করতে পারে সেজন্য সংগীত শেখান হ'ত। পাটীগণিত সামান্য শেখান হ'ত যাতে ইষ্টার ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয় উৎসবের দিন গণনা করার সুবিধে হ'ত। ক্যাথিড্রাল স্কুলে প্রায় একই রকম শিক্ষা হ'ত, তবে ধর্মযাজকের কাজ শিক্ষার্থীকে শিখিয়ে দেওয়া হ'ত।

শার্লেমেন :—প্রথম শক্তিমান পুরুষ যিনি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তিনি হোলেন ফ্রাঙ্কদের রাজা সম্রাট শার্লেমেন (Charlemagne)। তিনি ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কদের রাজা হ'য়ে বর্বর প্রজাদের জন্য শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেষ্টা করলেন এবং ধর্মযাজকদের সাহায্য চাইলেন। কিন্তু চার্চের শৈথিল্যে তাঁর

সে প্রচেষ্টা সার্থক হ'লনা—সীমাবদ্ধ রইল তা তাঁর আমন্ত্রণে নবাগত পণ্ডিত অ্যাল্‌সিউনের (Alcuin) ভ্রাম্যমাণ রাজ-বিদ্যালয়ে যেখানে শার্লেমেনের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা হ'ত এবং শার্লেমেন নিজেও শিখতেন। সাহিত্য শিক্ষার সংগে খ্রীষ্টান ধর্মের সমন্বয় করবার প্রচেষ্টার জন্য অ্যাল্‌সিউন বিখ্যাত। তিনিই সর্ব-প্রথম এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। সম্রাট শার্লেমেনের পরবর্তী ফ্রান্সের রাজারা তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে শিক্ষার দিকে না গিয়ে স্বৈরাচারের ওপরেই নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। তাঁদের কেউ এই সময়ের ইংল্যাণ্ডের রাজা অ্যালফ্রেডের (৮৪৯-৯০১ খ্রীঃ) মত বিদ্যানুরাগী বা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন না।

উদারশিক্ষা :—চার্চ স্কুলের অত্যন্ত সংকীর্ণ শিক্ষার চাইতে একটু উদারতর শিক্ষা যে না ছিল মধ্যযুগে তা' নয় ; কনভেন্টের সে শিক্ষাকে মধ্যযুগের দ্বিতীয়া শিক্ষা ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে। কুইন্টিলিয়ান নিজে সাতটি উদার পাঠ্যবিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন তাঁর পুস্তকে ; বাইবেলে বর্ণিত জ্ঞানহর্মের সাতটি স্তম্ভ (Wisdom has builded her house, she hath hewn out her Seven pillars—)* মানুষের মনে গেঁথে দিয়েছিল মোটামুটি এই ধারণা যে সাতটি বিষয় অবিস্মরণীয় কাল থেকে বালকদের শিক্ষায় চলে আসছে। এই সাতটি বিষয়কেই পরে তিনটি ও চারটি বিষয়ে ভাগ করা হ'ল—ট্রিভিয়াম (The Trivium)—ব্যাকরণ, বাগ্মিতা (rhetoric), তর্কশাস্ত্র (logic or dialectic) এবং কোয়াড্রিভিয়াম (The Quadrivium)—সংগীত, পাটীগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা। কুইন্টিলিয়ানের সময়েও প্রথম তিনটি বিষয়ই শিক্ষার সত্যিকারের উপাদান ছিল এবং ভবিষ্যতের আইনজীবী ও বাগ্মী তৈরী করবার মোটামুটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা এতে হয়েছিল। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও ভবিষ্যৎ ধর্মযাজকের প্রস্তুতিকরণে বাইবেল ছাড়া এই একই ঐতিহ্য অনুসৃত হ'তে

* The Old Testament—*The Book of Proverbs.*

লাগল। সংগীত, জ্যামিতি, গণিত, ইত্যাদি শেখার মান অত্যন্ত নীচু ছিল ; ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় কাছাকাছি এল্ডহেল্ম (Aldhelm) নামে একজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী (Monk) লিখছেন, "অক্লান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের পর ভগবানের দয়ায় অবশেষে সব চেয়ে কঠিন জিনিষ ভগ্নাংশের কিছু ধারণা হইল।"

রোমকদের বেলায়ও যেমন, খ্রীষ্টীয় জগতেও তেমনি হাজার বছর ধ'রে ট্রিভিয়াম বা তিন বিষয়ক শিক্ষাই সাধারণ শিক্ষার প্রধান অংগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য ট্রিভিয়ামের ভেতরে বিষয়গুলো মুখ্য গৌণ হিসেবে কিছু ওলট পালট হয়েছে। ব্যাকরণ (ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য) পড়াতেই হ'ত তবে পরিমাণ আরও কমে গেল, কারণ ল্যাটিন মাতৃভাষা ছিল না অনেকের। আল্পসের দক্ষিণে ইতালী ইত্যাদি অঞ্চলে বাগ্মিতা ও অলংকার শাস্ত্র পড়ানো হ'ত এবং অল্প কিছু রোমক আইন, কিন্তু উত্তর ইউরোপে তর্কশাস্ত্র শেখবার দিকেই ছিল বেশী ঝোঁক। আমরা পূর্বেই দেখেছি গ্রীকরা এ বিদ্যা আয়ত্ত করতেন কোন বিশেষ কারণে নয়—শুধু নিজেদের ধীশক্তি স্ফুরণের জন্য, কিন্তু রোমকেরা করতেন বাগ্মিতার সুবিধের জন্য। যুক্তিতর্কের ক্ষমতা উত্তর ইউরোপের কাছে খুবই বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে হ'ল এবং তর্কশাস্ত্রের যেটুকুন টিকে ছিল তাই সে আঁকড়ে ধরল। হয়ত আজো যেমন, সেদিনও তেমনি উত্তর ইউরোপে জার্মান মনের চুলচেরা বিচার ও দর্শনের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক বা অনুরক্তি ছিল।

পাঠ্যপুস্তক :—খ্রীষ্টান ও অ-খ্রীষ্টানলিখিত কয়েকখানা নির্ভরযোগ্য স্কুলপাঠ্য বই যথা—পৃথিবীর ইতিহাস, ব্যাকরণ, বিশ্বকোষ ইত্যাদি রোমক সভ্যতা ধ্বংসের সময় স্কুলে প্রচলিত হ'ল এবং হাজার বছর ধ'রে কায়েম হ'য়ে রইল। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পরেও ছাপাখানায় অরোসিয়াসের "পৃথিবীর ইতিহাস" (আঃ ৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত) ছাপা হচ্ছিল। জ্ঞানী ও বিদ্বান বেটিয়াস (Boëthius c 475-524 A. D.) প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলেরা যে-সমস্ত গ্রন্থ

ভাষ্যসমেত অনুবাদ করতে পেরেছিলেন তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হ'ত সেকালের উচ্চ শিক্ষা; বহু শতাব্দী পর্যন্ত বেটিয়াসের অনূদিত গ্রন্থাবলীই জ্ঞানের চরম উৎস ব'লে পরিগণিত হয়েছে এবং অ্যারিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর প্রণীত টীকা ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই মনের অর্গল খুলে দিয়েছে এবং নেহাৎ নিরেটের মাথায়ও তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে কতগুলো দরকারী নিয়মাবলী ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে।

নোতুন উদ্দীপনা :—মনের খোরাক এ যুগে খুব কমই ছিল, তবু জীবনের কিছু পরিচয় যে না পাওয়া যায় তাও নয়। গ্রীস-রোমের সাহিত্য পড়া বন্ধ হ'য়ে গেছল সত্য, কিন্তু কিছু নোতুন সাহিত্যের আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল এখানে সেখানে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর অ্যাম্ব্রোজ (Ambrose), যেরোম (Jerome), অগাষ্টিন (Augustine) প্রমুখ ল্যাটিন পণ্ডিতদের কথা ছেড়ে দিলেও এ যুগের আরও খ্রীষ্টান লেখকদের কথা আজ আমরা জানি। তাঁদের কেউ যীশুর জীবনী ল্যাটিন কবিতায় লিখেছেন, ভার্জিলের অনুকরণে কেউবা বাইবেলের বাণী তর্জমা করেছেন ভার্জিলের অনুষ্টুপ ছন্দে, কেউ বাইবেল-বিষয়ক কবিতা লিখেছেন আবার কেউবা গদ্যে খ্রীষ্টীয় দর্শন রচনা করেছেন। তাঁরা পুরনো ছন্দের কবিতা নিয়ে শুরু ক'রে শেষ পর্যন্ত নোতুন এক আশ্চর্য জিনিষ আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লেন—কবিতার মিল। কতগুলো ল্যাটিন কবিতাকে মধ্য যুগের ও আধুনিক ব্যালাড ও এলেজির অগ্রদূত বলা যেতে পারে। পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত কবিতা নোতুন মাধুর্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং পঙক্তির মিলের সংগে সংগে ভাবের ঐশ্বর্য যে বেড়ে গেল তাতে কোন সন্দেহ নেই। নবম শতাব্দীর শেষে—যে নবম শতাব্দীকে অন্ধকার যুগের সব চেয়ে তমসাবৃত অংশ ব'লে বলা হয়—দেখা গেল সংগীতেও একটা নোতুন ধারা আসছে। গ্রীক, রোমক ও তৎপূর্ববর্তী সংগীতে শুধু প্রতি লাইনে মাধুর্যের স্থান ছিল, কিন্তু

এ সময়ে আবিষ্কৃত হ'ল মানুষের চেষ্টায় ও ইচ্ছায় আট লাইন বাদে বাদে সমবেত সংগীত—সংগীতের জগতে এ একটা অভিনব দান।[১] এইবার চারুকলার অন্য একটা দিক নেওয়া যাক—চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য। এখানেও দেখা যায় খ্রীষ্টানদের নিজস্ব প্রতিভার যা দেবার ছিল তা তাঁরা দিয়েছেন ইউরোপ, ইংল্যাণ্ড ও পূর্ব গ্রীক সাম্রাজ্য বাইজান্টিয়ামে।[২]

পাঠ্যবিষয়ের বাইরে তাই দেখি নোতুন জীবনের পরিচয় এবং এরই অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় আরও পূর্ণতররূপে একাদশ শতাব্দীতে। অন্ধকারে এবং ইতিহাসের অজ্ঞাতে সভ্যতার শিকড় পুরনো সংস্কৃতির রসে সঞ্জীবিত হয়ে আস্তে আস্তে বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল এবং একাদশ শতাব্দীতে এই শিশু বৃক্ষ পত্রপুষ্পে শোভিত হয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছে। সমস্ত ইউরোপে একটা দ্রুত পরিবর্তনের চিহ্ন সূচিত হ'ল এবং তারই সংগে শিক্ষায়ও হ'ল নোতুন প্রাণের সঞ্চার। সংখ্যায় বেড়ে গেল স্কুল এবং ভাল স্কুলও কিছু দেখা দিল; অধিক সংখ্যায় পুস্তক লেখা শুরু হ'ল, পুরনো বিষয়ের আলোচনায় যোগ দিল কত নোতুন লোক।

পরবর্তী বা দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখি এ পরিবর্তন চলছে আরো দ্রুত তালে। প্রত্যেকটি পাঠ্যবিষয়, সে সাংস্কৃতিক হোক আর বৈজ্ঞানিকই হোক, নোতুন উৎসাহের সংগে অধীত হচ্ছে। ইতালী হ'ল ল্যাটিন সাহিত্য (ল্যাটিন সাহিত্যের ঐতিহ্য ইতালীতে কোনদিনই একেবারে অদৃশ্য হয়নি) ও বিজ্ঞানের কেন্দ্র, কিন্তু ইতালী ছাড়াও ল্যাটিন সাহিত্য ন্যূনপক্ষে ফ্রান্সের একটি ভাল স্কুলে—শার্ত ক্যাথিড্রাল স্কুলে (Cathedral School, Chartres) পঞ্চাশ বছর ধ'রে নোতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

---

[১] Stanford and Forsyth : *History of Music.* pp. 87-88 and 120-122

[২] Clive Bell : *Art* pp. 126-132.

স্কলাষ্টিসিজম্ :—কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তর ইউরোপে নোতুন ক'রে জেগে উঠল তর্কশাস্ত্রের (Dialectics) জন্য আকুল পিপাসা ; ফলে আমরাদেখি প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্বৎমণ্ডলীই তর্কশাস্ত্র, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক সূক্ষ্ম বিচার নিয়ে যেন মেতে উঠলেন।

বিচারের বিষয়বস্তু নোতুন নয়,—প্লেটোই আবার এঁদের সমস্ত মানসিক শক্তি অধিকার ক'রে বসলেন খৃষ্টধর্ম্মের পটভূমিকায়। প্লেটো যে সমস্যা উত্থাপন করেছিলেন তা' মোটামুটি এই—পাঁচটি টেবিল বা পাঁচটি মানুষ পাঁচ রকমের। তা'হলে এই দৃশ্যমান টেবিল বা মানুষের পেছনে টেবিলত্ব বা মনুষ্যত্ব এই ধারণাটির স্বরূপ কি, কি হ'লে একটা কাঠের জিনিষকে আমরা টেবিল বলতে পারি বা একটা দ্বিপদ জন্তুকে মানুষ বলতে পারি অথবা এক কথায় বলতে গেলে দৃশ্যমান রূপের পেছনে ধারণাটি (the Idea as opposed to the Form) কি তাই নির্ণয় করা নিয়েই লাগে যত গোলযোগ। প্লেটো নিজেও খুব ভালভাবে জিনিযটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারেননি। যে কাঠের জিনিষটি টেবিল আখ্যাকাঙ্ক্ষী তাকে এক হলে কোন একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহণ করতে হবে অথবা সে রূপের 'অনুকরণ' বা 'কপি' করতে হবে। প্লেটো বেশীর ভাগই অনুকরণ বা কপির কথাই বলেছেন এবং তাতেই বিপদ হয়েছে বেশী। তাঁর মতে টেবিলের ধারণা টেবিলের প্রকৃত স্বরূপ হিসেবে স্বর্গে তোলা আছে এবং পৃথিবীতে আমরা যে-সব টেবিল দেখতে পাই সেগুলো টেবিলের ধারণা বা স্বরূপের অনুকরণ মাত্র এবং অনেক সময় অনুকরণের অনুকরণ বহুদূর চলে যায়।* পৃথিবীতে সাধারণ লোক অনুকরণ নিয়েই খুশী থাকে, স্বরূপ বা বাস্তব (the reality) দেখবার চোখ তাদের নেই কিন্তু প্লেটোর সমস্যা ছিল শিশুকে কি করে এমন শিক্ষা দেওয়া যায় যাতে আমাদের মনোনীত শাসন-কর্তারা বাস্তব বা স্বরূপের (reality) সংগে পরিচিত হতে

* J. A. Stewart : *Plato's Doctrine of Ideas* (passim).

পারেন—যাতে দার্শনিকরা রাজা বা নৃপতি হ'তে পারেন। এ জিনিষটি দর্শনের গোড়ার কথা এবং সমস্যা-সমাধান বহু বিবেচনা সাপেক্ষ। অ্যারিষ্টটল বিদ্বান্ ত ছিলেনই, তাঁর সাধারণ বুদ্ধিও বেশী ছিল। তাই প্লেটোর ভাষার সমালোচনা ক'রে তিনি বলেছিলেন, টেবিলত্ব বা স্বর্গাধিষ্ঠিত টেবিলটিকে আমাদের চোখের সামনে যে টেবিল আছে তা থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখা ভুল, টেবিলত্বের বা স্বর্গাধিষ্ঠিত টেবিলটির কোন আবয়বিক রূপ নেই।

গ্রীকদের সমস্যা থেকে মধ্যযুগের খ্রীষ্টানদের আরও বেশী সমস্যা ছিল এ বিষয়টি নিয়ে। তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের দরুণ একদল পণ্ডিত বলতেন টেবিলত্ব বা মানবত্বই যদি সত্যিকারের বাস্তব হয় এবং বিশেষ রূপগুলো শুধু আপাত প্রতীয়মান হয়, তা'হলে সত্যিকারের বাস্তবেরই বা কি হবে আর মানুষের আত্মার অবিনশ্বরত্বেরই বা কি হবে? স্বয়ং ভগবানেরই বা কি হবে? কোন জিনিষই কি সত্যিকারের বাস্তব হতে পারে যদি সমস্ত বিশ্বচরাচর তার ভেতরে প্রতিফলিত না হয়? এই বাস্তববাদ কি প্রকৃতিঈশ্বরবাদ বা প্যানথিইজম্ থেকে বিভিন্ন হতে পারে? আবার অপর পক্ষে আরেক দল পণ্ডিত বলতেন, যদি সার্বজনীনত্বটা একটা সংজ্ঞা বা নামই শুধু হয় এবং প্রত্যেকটি দৃশ্যমান বস্তুই সত্যিকারের বাস্তব হয় তবে এক ঈশ্বর তিন জনের মধ্যে রূপায়িত হন কি করে বা এক যীশুর দেহ একই সময়ে স্বর্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং গির্জার বেদীতে ওয়েফার রুটির মধ্যে অবস্থান করে কি করে?

দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক আলোচনা হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল তার মুখ্য প্রশ্নগুলো ছিল এইসব। স্কলাষ্টিসিজমের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন অধ্যাপক এ্যাবেলার্ড (Abelard, ১০৭৯-১১৪২ খ্রীঃ অঃ) যাঁর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে প্যারিসে বহু দেশ থেকে বিদ্যার্থী সমাগম হয়েছিল। প্রচণ্ড

মানসিক উত্তেজনার ভেতরই জন্ম নিয়েছিল প্যারিস, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ মধ্যযুগের এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর পুনরাবিষ্কারে এ আলোচনা শতগুণে আরো বেড়ে উঠল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিদ্বৎমণ্ডলীর মধ্যে। এতে প্রাচ্যের দানও যে ছিল খুব কম তা নয়। ইউরোপের অন্ধকার যুগে আরবরা তাদের অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানের বাতি পূর্ণভাবেই জ্বালিয়ে রেখেছিল এবং তাঁদের দান এলো উত্তর ইউরোপে স্পেনের মারফতে। এই বিদ্বৎসমাজের আধ্যাত্মিক বিতর্ক ও আলোচনায় (Scholasticism) যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তার তুলনা অনেক সময় দেওয়া হয় ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধের উদ্দীপনার সংগে। এতটা না হ'লেও যে খুব বেশী আগ্রহের ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সমস্ত ধীশক্তি অত্যধিক দার্শনিক আলোচনায় নিবদ্ধ থাকার বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিবাদ হয়নি তা' নয়। সলসবেরীর জন (John of Salisbury) গ্রীক রোমক সাহিত্য এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ডের রোজার বেকন (Roger Bacon) গণিত ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান অধ্যয়নের দাবী জানিয়েছিলেন। বেকন গ্রীক ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছিলেন অ্যারিষ্টটলের মূল গ্রন্থ পড়বার জন্য—অ্যারিষ্টটল তিন দফা অনুবাদের পর পড়তে হ'ত সে যুগে—গ্রীকের অনুবাদ সিরীয় ভাষায়, তার অনুবাদ আরবীতে, তার অনুবাদ ল্যাটিনে। কিন্তু স্কলাষ্টিশিজমের ঢেউ প্রতিরোধ করতে পারে সে সময় এমন কিছুই ছিল না। স্কলাষ্টিক বা পণ্ডিত যুগ ধীশক্তি অভিনিবেশত্বের ও মানসিক পরিশ্রমের চরম দৃষ্টান্ত—চিন্তাধারার অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার যে অপার আনন্দ তা এঁরা উপভোগ করেছিলেন, শব্দ ও শব্দার্থ নিয়ে চুলচেরা বিচারের আত্মগরিমাও এঁদের ছিল। কিন্তু প্রকৃতির রহস্য, প্রত্যক্ষ বস্তুজ্ঞান বা সাহিত্যের অপার্থিব আনন্দ এঁদের কাছে অনাস্বাদিতই রয়ে গেল কারণ এদের গুরুত্ব এঁরা উপলব্ধি করেননি।

নাইটের শিক্ষা ঃ—ধর্মযাজকের শিক্ষা যেমন চলেছিল এক ধারে মোটামুটি লেখাপড়ার ভেতর দিয়ে, আরেকটি বৃত্তি শিক্ষাও চলছিল মধ্যযুগে নাইট (Knight) তৈরী করবার জন্য তার উপরিস্তন প্রভুর কাছে ব্যবহারিক শিক্ষানবিশী করে। স্কলারের শিক্ষার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ ব্যবহারিক শিক্ষারও সেদিন প্রয়োজন ছিল। এতে চরিত্র ও দেহ দুই হ'ত গঠিত। রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর সমাজ আস্তে আস্তে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে লাগল জায়গীর প্রথার মাধ্যমে—দুর্বল চাইল নিরাপত্তা সবলের কাছে সেবার পরিবর্তে, তা সে সেবা অর্থ দিয়ে হোক, সৈন্য দিয়ে হোক, যুদ্ধ ক'রে হোক বা মনিবের জন্য গতর খাটিয়ে হোক—যে রূপই তা গ্রহণ করুক না কেন। প্রত্যেক প্রভুর দুর্গপ্রাসাদ সেদিনের অনুপাতে এক একটি সংস্কৃতিকেন্দ্রে পরিণত হ'ত; আস্তে আস্তে ছেলেদের এমন কি মেয়েদেরও উপরিস্তন প্রভু বা সমানপদস্থ প্রভুর দুর্গপ্রাসাদে পেজ (Page) বা মেড (Maid) হ'য়ে শিক্ষানবিশী করবার প্রথা দাঁড়িয়ে গেল। ছেলেরা প্রথমে পেজ, পরে স্কোয়ার (Squire) এবং শিক্ষার শেষে চৌদ্দ বছর পরে পূর্ণ নাইট হ'ত। নাইটের ছেলে যন্ত্রসংগীত, জিমনাষ্টিক, সাহসিকতা, যুদ্ধ, গান, ইত্যাদি শিখত যেমন শিখত সর্দারের ছেলেরা প্রাচীন গ্রীসে বা অন্য কোন যোদ্ধা জাতির ভেতরে। একাদশ শতাব্দীর শেষে নাইটের শিক্ষায়ও নব চেতনা এল শিভালরির যুগের সংগে সংগে (The Age of Chivalry)—দুর্বল ও স্ত্রীলোককে রক্ষা করা, নারীর প্রতি শিষ্টাচার, দলের মান রক্ষা, ইত্যাদি। মেয়েরা প্রভুপত্নী বা লেডীর সংগে থেকে গৃহস্থালী কাজ (রান্না, সীবন, বয়ন, ইত্যাদি), আদব-কায়দা, কিছু লেখাপড়া (ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ফ্রেঞ্চ ও ল্যাটিন খুব কমই), সংগীত, বিশেষ ক'রে চার্চের সংগীত শিক্ষা ক'রে জীবনের জন্য প্রস্তুত হ'ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ঃ—মধ্যযুগের সব চেয়ে বড় গৌরব হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভ্যুত্থান। প্রথম দিকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেউ প্রতিষ্ঠিত করেনি, ওরা যেন আপনা আপনিই হয়েছে। দক্ষিণ ইতালীতে গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান কোনদিনই একেবারে লুপ্ত হয়নি। তাই দেখি শিক্ষক ও ছাত্র স্যালার্ণোতে (Salerno) এসে জড় হয়েছেন—সেখানকার জলবায়ুও ভাল, অনেক খনিজ উৎসও আছে সেখানে। এখানে একটি মেডিকাল বিশ্ববিদ্যালয় না হ'লেও মেডিকাল স্কুল গড়ে উঠল। উত্তর ইতালীতে আবার রোমক সাম্রাজ্যের সময় হ'তেই আইনের একটা ঐতিহ্য চ'লে আসছিল যা এখন পরিপুষ্ট হ'তে লাগলো সহরগুলো ও জার্মান সম্রাটের বিবাদ বিসংবাদে। সম্রাটের অধীশ্বরত্বের দাবী প্রতিরোধ করতে সহরগুলো রোমক সম্রাটের আইন ও অনুশাসনের নজির বের করতে লাগল। রোমক আইন অধ্যয়ন অন্ধকার যুগেও কোনদিনই হয়ত একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি; তাই দেখি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত আইনবিশারদ আর্ণেরিয়াসের (Irnerius) বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ছাত্র বোলনায় (Bologna) এসে উপস্থিত হোল। প্যারিসে পাকাপাকি বিশ্ববিদ্যালয় না গড়ে উঠলেও এ্যাবেলার্ড (১০৭৯-১১৪২ খ্রীঃ) প্রমুখ শিক্ষকদের শিক্ষকতায় ধর্ম ও তর্ক-শাস্ত্রের হাজার হাজার ছাত্র এসে হাজির হ'ল প্যারিসে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারিসে বিদেশী ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজদেরই সংখ্যা ছিল খুব বেশী। কিন্তু দ্বিতীয় হেনরী ও বেকেটের ঝগড়ার জন্য এখন তারা দেশে ফিরে যাবার জন্য আদিষ্ট হ'য়ে অক্সফোর্ডে এসে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করলো—অক্সফোর্ডে বহুদিন ধরেই শিক্ষকতার কাজ পুরোদমে চলছিল।

পরবর্তী কালে সম্রাট, পোপ বা রাজারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন বা দানে সমৃদ্ধ করেছেন কিন্তু প্রথম দিকে আগেই বলেছি অনেকটা আপনা থেকেই সহজ স্বাভাবিকভাবে এদের উদ্ভব হয়েছে। কোনখানে কোন বিষয়ের একজন নামজাদা

শিক্ষক বা অধ্যাপক আছেন, তাঁর যশে ও বক্তৃতায় আকৃষ্ট হ'য়ে ছাত্রমণ্ডলী গড়ে উঠল; তারপর যদি তার অনুবর্তী শিক্ষকের সে-রকম খ্যাতি বা ধীশক্তি না থাকতো তা'হলে তারা অন্যস্থানে চলে যেতো—দেশে বা বিদেশে। জ্ঞানের তৃষ্ণায় তারা খানিকটা ভ্রাম্যমাণ ও বিশ্বজনীন হ'য়ে পড়তে বাধ্য হ'ত। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর নিজস্ব কোন বাড়ী ছিল না, শিক্ষার উপকরণ বা যন্ত্রাদিও কিছু ছিল না; সুতরাং ছাত্ররা যদি কোন কারণে সহরের লোক বা অধ্যাপকদের প্রতি বিরূপ হ'ত তা'হলে সমবেতভাবে তাদের মনোমত অন্য কোন স্থানে চলে যাওয়ায় কোন বাধা ছিল না। এই ধর্মঘট (Cessatio) করার শক্তি ছাত্রদের একটা খুব বড় অধিকার হিসেবে গণ্য হ'ত এবং স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনায় বা বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি বর্ধনে বিশেষ সহায়তা করতো। বোলনা ধর্মঘট ক'রে প্যাডুয়ায় (Padua) চলে গেল; আবার প্যাডুয়া ধর্মঘট ক'রে চলে গেল ভ্যারসেলিতে (Vercelli)। ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের ছাত্রদের সহরের লোকদের সংগে ঝগড়া হওয়ায়, বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী কেম্বি জে চলে গিয়ে সেখানকার ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রল।

ইউরোপে সমস্ত মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভেতর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ই (১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) সবচেয়ে বিখ্যাত; তবে বোলনার ইতিহাস আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে বেশী, তা'থেকে শেখবার জিনিষও আছে অনেক। এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে দু'শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় যার যার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গ'ড়ে উঠল। প্যারিস হোল থিওলজি ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নের কেন্দ্র, আর ইতালী হোল (পূর্বের ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রে) সাহিত্য, ব্যাকরণ, বাগ্মিতা ও আইনের। ইতালীতে শিক্ষা ছিল বেশীর ভাগ অযাজকীয় ছাত্রদের জন্য এবং অযাজকীয় আদর্শে পরিচালিত হ'ত অযাজকীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা। ডক্টর র‍্যাশড্যাল (Rashdall) বলেছেন, ইতালীতে অ-যাজকীয় প্রভাব যাজকীয় প্রভাব ছাড়িয়ে উঠেছে

এবং অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী মাত্রই যে যাজকীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন এমন কোন নীতির লেশমাত্র চিহ্ন এখানে দেখা যায় না।* নগর রাষ্ট্রগুলোতে অ-যাজকীয় শিক্ষিতের জন্য বহু উচ্চ পদের দ্বার উন্মুক্ত ছিল এবং লম্বার্ড অভিজাতবর্গ তাঁদের জাতভাই উত্তর দেশীয় সামন্ত ও নাইটদের মত বিদ্যাকে অসম্মানের চক্ষে দেখতেন না। অ-যাজকীয় প্রভাব এবং দরকারী বিষয়ে শিক্ষা ছাড়াও জীবনের প্রয়োজনে স্বাবলম্বন, আত্মপ্রত্যয় ইত্যাদি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও সুষ্ঠুতর ছিল বোলনা ও তার আদর্শানুবর্তী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। এগুলো ছিল এক হিসেবে ছাত্র-বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ছাত্ররা একটু বেশী বয়সে আইন ইত্যাদি অধ্যয়ন করতো এবং পাঠ্যবিষয় নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও অধ্যাপকদের ওপরেও তা'দের ক্ষমতা থাকতো। অনুপস্থিতির জন্য অধ্যাপকদের ছাত্রদের কাছে ছুটির আবেদন করা, ঠিক সময়ে ক্লাসে উপস্থিত না হওয়া বা লেক্‌চারে কঠিন বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অধ্যাপকদের জরিমানা করা,—সেদিনের এসব ব্যবস্থা হয়ত আমাদের কাছে আজ খুবই অদ্ভুত ঠেকে কিন্তু একথা ঠিক অলস শ্রমবিমুখ অধ্যাপকদের তাঁদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে এ প্রথা বেশ কার্যকরী হ'ত। আবার প্যারিসের আদর্শানুবর্তী শিক্ষক-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যাপকেরাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—সর্ব বিষয়েই তাঁদের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত।

ফেকাল্টির সংখ্যা ছিল চারটি—আর্টস্ (এ শেষ ক'রে তবে অপর তিনটিতে যাওয়া যেতো), থিওলজি, আইন ও চিকিৎসা-শাস্ত্র। তবে খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়েই পুরো চারটি ফেকাল্টি থাকতো। এমন কি প্যারিসে পর্যন্ত আইন পড়ানো বন্ধ হয়েছিল পোপ তৃতীয় অনোরিয়াসের (Honorius III) আদেশে। থিওলজি প্যারিস, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজেই বেশীর ভাগ পড়ানো হ'ত,

---

* Hastings Rashdall: *The Universities of Europe in the Middle Ages*—p. 92.

আইন বোলনায় এবং চিকিৎসা শাস্ত্র মণ্টপেলিয়ার, বোলনা এবং স্যালোর্ণোতে। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানবমনের স্বাধীন প্রবাহের প্রতিকূল অনেক বিষয় পড়ানো হ'ত সত্য কিন্তু ইউরোপের ধীশক্তিকে শাণিত ক'রে রাখার কাজে এদের দান অমূল্য। ইউরোপে নবজাগরণের পর 'নোতুন বিদ্যার' এরা পরিপন্থী হয়েছিল বটে অনেক ক্ষেত্রে, তবে একথাও ঠিক এসব বিদ্যাপীঠে যে শিক্ষা হিউম্যানিষ্টরা (Humanists) পেয়েছিলেন তাই হোল ভিত্তি নোতুন দিনে মানবমনের অবিস্মরণীয় অভিযানের।

আরবের দানঃ—আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ না ক'রলে এ সংক্ষিপ্ত বিবরণও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—এ সময়ে আরবদের দান জ্ঞানের ভাণ্ডারে। আমরা দেখেছি একদিকে কতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিতদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার নিয়ে তর্কবিতর্ক আলোচনা, অপরদিকে শিভালরির আদর্শ মানুষের ধীশক্তিকে বর্জন ক'রে বাইরের আদব-কায়দা ও বীরোচিত আচরণ নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের সাধনা কেউ করছে না। এখানেই আরবদের বিশেষত্ব। স্পেনের আরব কলেজগুলোতে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের চর্চা চলতো নিঃস্বার্থভাবে। দশম ও একাদশ শতাব্দীর অন্ধকারের মধ্যেও আরবরা অকার্যকরী রোমক সংখ্যা ত্যাগ করে হিন্দুদের সংখ্যাগুলো গ্রহণ করলেন এবং ত্রিকোণমিতি, জীববিদ্যা, অস্ত্রোপচার শাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ড্রেপার লিখেছেন, খ্রীষ্টীয় ইউরোপ পৃথিবী সমতল এ কথা যখন ধর্মবিশ্বাস হিসেবে প্রচার করছে, স্পেনের আরবরা তখন গ্লোবের সাহায্যে ভূগোল পড়াচ্ছিলেন তাঁদের কলেজগুলোতে।* খ্রীষ্টানরা যখন অবশেষে আরবদের পরাজিত

---

* Draper : *Intellectual development of Europe* ii. pp. 41-42
Amer Ali : *A History of the Saracens* (passim).

করলেন, তখন তাঁদের জ্যোতির্বিদ্যার উচ্চ পরিদর্শনমন্দিরগুলোকে (Observatories) আর কোন কাজে লাগাতে না পেরে শেষে ঘণ্টা বাজাবার স্থান বলে নির্দেশ করলেন। এ অগ্রগামী কলেজগুলো গোঁড়া মুসলমান মোল্লা ও উলেমাদের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পায়নি সত্য কিন্তু যেদিন এরা বিধ্বস্ত হ'ল, সেদিন খ্রীষ্টান ইউরোপকে বিজ্ঞান ও গ্রীকবিদ্যা, বিশেষ ক'রে অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর দানে, সমৃদ্ধ ক'রে গেল।

মুসলিম শিক্ষা

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের মত মুসলমান ধর্মও পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভিনব সংস্কৃতি প্রবাহ সৃষ্টি করে। ইসলামের উৎপত্তি হয় আরবীয় মরুভূমিতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে। তার পূর্বে আরবীয়রা বিছিন্ন অর্ধবর্বর যাযাবর জীবন যাপন করতো, বেতুইন আরবদের অস্থির দুঃসাহসিক জীবনে জ্ঞান চর্চার সুযোগ ছিল না। কিন্তু তারা ছিল কবিতাপ্রিয়; প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে রচনা করতো তারা কবিতা, আর সেই কবিতাই ছিল তাদের একমাত্র সাংস্কৃতিক সম্পদ।

ইসলাম আরবদের একটি সুসংবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে; এবং ইসলামের উদ্ভবের একশ' বছরের মধ্যে আরবরা রোমীয় সাম্রাজ্যের চেয়েও বড় এক মহাসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হ'য়ে বসে। কিন্তু তাদের গৌরব শুধু রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তারা সৃষ্টি করে আরও সুদূরপ্রসারী এক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য। আমরা পূর্ব অধ্যায়েই বলেছি অন্ধকার মধ্যযুগে কয়েক শত বৎসর ধ'রে আরবীয় ভাষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানই পৃথিবীকে আলোকিত ক'রে রেখেছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে আরবরাই প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখে ও সমৃদ্ধ করে, যার ফলে পরবর্তী কালে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবজাগরণ ঘটে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এক নোতুন যুগের সূত্রপাত হয়। মধ্যযুগে নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে আরবী ভাষায় জ্যোতিষ, ভূগোল, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস, প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে যত গ্রন্থ বের হয়, আর কোন ভাষায় তত হয়নি।

মুসলিম শিক্ষার প্রথম পর্যায়ঃ ইসলামের প্রবর্তনের পর আরবরা সভ্যতার এক নোতুন স্তরে উন্নীত হয়। সুন্নী বা গোঁড়া মুসলমানেরা যদিও ইস্‌লামের প্রবর্তক মহম্মদকে 'উম্মী' বা নিরক্ষর

হিসাবে বর্ণনা করেন, তবুও তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা থেকে প্রমাণ হয় যে তিনি নিজে লিখতে পড়তে জানতেন এবং আরবদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজে তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী উদ্যোক্তা। কথিত আছে, মহম্মদ নিজে একবার বলেছিলেন যে, পিতা পুত্রকে যা দান করেন তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হচ্ছে শিক্ষা[১]। ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে বদরের যুদ্ধে মক্কা-বাসীদের পরাজিত ও বন্দী করার পর মহম্মদ তাদের এই সর্তে মুক্তি দিতে রাজি হন যে তারা মদিনাবাসী বালকদের লিখতে শেখাবে। সেইসময় মক্কাবাসী মেয়েদের মধ্যেও লেখাপড়া একেবারে অপ্রচলিত ছিল না।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন মহম্মদ দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ঘোষণা করেন যে ইসলামের বাণী পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হোক। মহম্মদের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ইসলাম পারস্য, মিশর ও সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়, একশ' বছরের মধ্যেই পূর্বদিকে ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত ইসলামের অধিকার বিস্তৃত হয়। সামরিক শক্তির সাহায্যে তারা মধ্য প্রাচ্যের সমস্ত দেশ জয় করেছিল এবং সেখানে রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল সত্য, কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, বিজিত শত্রুর কাছেই তা'দের পরাভব স্বীকার করতে হয়েছিল। মিশর, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি জয় ক'রে তারা সেখান থেকেই আহরণ করে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব, পায় সভ্য জীবনের সন্ধান।

আর একটি কথা। আরবদের বিশ্ববিজয়ের ফলে বিজয়ী এবং বিজিতদের মধ্যকার ব্যবধানটি ধ্বসে পড়ে, ফলে তখন আরব বলতে শুধু আরবদেশের অধিবাসীদেরই মাত্র বোঝাত না, যে-সব

১ Encyclopædia of Religion and Ethics—vol. 5. 'Article on Muslim Education'—p. 198,

জাতি ইসলাম ও আরবী ভাষা গ্রহণ করেছিল তাদের সকলকেই বোঝাত। সুতরাং যখন বলা হয় আরবীয় দর্শন বা আরবীয় গণিত বা আরবীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান তখন আরবীয় ভাষায় লিখিত ওই তত্ত্বগুলিকে বোঝায়, তা' সে যে-দেশেই লিখিত হোক না কেন।

৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে খলিফা আলির মৃত্যুর পর খলিফা মুয়াইয়া উমায়া খলিফা বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। উমায়া বংশীয় খলিফাদের নেতৃত্বে ইসলামের অনুবর্তীরা নোতুনভাবে সংগঠিত হয়।

উমায়া বংশীয় খলিফাদের সময়েই (খ্রীঃ ৬৬১-৭৫০) আরবদের প্রকৃত সাংস্কৃতিক ইতিহাস শুরু হয়, যদিও নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তার দরুন আরব সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণ বিকাশ সে-সময় ঘটেনি কিন্তু তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উমায়া যুগেই আরবীয় মহাসংস্কৃতির বীজ রোপণ করা হয়েছিল। সে বীজ মহীরুহে পরিণত হয় আব্বাসীয় খলিফাদের যুগে এবং মধ্যযুগের ইতিহাসে আরবীয় সংস্কৃতির একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়।

উমায়াদের সময়ে অলবস্‌রা এবং অল্‌কুফা এই দু'টি শহর নবোদিত ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অলবস্‌রাতেই প্রথম আরবী ভাষার ব্যাকরণ লেখা শুরু হয়। এই সময় মুসলমানদের 'হদিস' রচনাও শুরু হয়। হদিস কথাটির অর্থ পরম্পরাগত মহম্মদের উপদেশাবলী ও কাহিনী। হদিসের কথা সব সময় নির্ভুল না হ'লেও তার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

আরবদেশে মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রচলন হয়। ছোট ছোট পাঠশালা (মক্তাব) গ'ড়ে ওঠে এবং সেখানে রীতিমত লেখা ও পড়া শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। পাঠশালার শিক্ষকদের বলা হ'ত 'মুয়ল্লিম'।

উমায়াদের সময়ে আরবীয় প্রাথমিক শিক্ষার রীতিমত প্রচলন হয়, মসজিদই ছিল বিদ্যাশিক্ষার স্থান, কোরান এবং হদিস ছিল পাঠ্য বিষয়। জানা যায় যে সেইসময় অল্‌কুফাতে একটি

অবৈতনিক পাঠশালা চ'লত। যে মাতৃভাষায় লিখতে ও পড়তে পারত এবং তীর চালনা ও সাঁতার কাটায় পারদর্শিতা লাভ ক'রত, জনসাধারণের কাছে সে শিক্ষিত হিসেবে পরিগণিত হ'ত। তাকে বলা হ'ত 'অল্‌কামিল' বা সর্বগুণান্বিত ব্যক্তি। পুরুষত্ব, সাহস, উদারতা, আতিথেয়তা, সহনশীলতা প্রভৃতি গুণগুলি লাভ করাই ছিল শিক্ষার আদর্শ।

উমায়াদের সময়ে রাজপুত্রদের শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর রাখা হ'ত। রাজদরবারে আচার্য বা গুরু (মুয়াদ্দিব) ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। পুত্রদের শিক্ষা সম্বন্ধে খলিফা তাদের আচার্যকে উপদেশ দিতেন, 'তাদের সাঁতার শেখাও এবং তাদের অল্প ঘুমাবার অভ্যাস করাও'[১]। ব্যাকরণের নিয়ম লংঘন করেছিল ব'লে খলিফা দ্বিতীয় উমর তাঁর পুত্রদের বিষম তিরস্কার করেন এবং শারীরিক শাস্তি দিতেও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমোদ-প্রমোদের প্রতি ছেলেরা বিরূপ হোক এই তিনি চাইতেন।

চিকিৎসাবিদ্যা ও কিমিয়া (alchemy) সম্বন্ধে আরবদের বিশেষ উৎসাহ ছিল। আরব বিজ্ঞান চর্চা প্রাচীন গ্রীক ও পারসিক বিজ্ঞান চর্চার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। উমায়াদের সময়ে সর্বপ্রথম গ্রীক ও কপটিক ভাষায় লিখিত কিমিয়া, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি অনূদিত হয়।

আব্বাসীয় যুগে আরবীয় শিক্ষা :—অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে (খ্রীঃ ৭৫০) আব্বাসীয় খলিফা বংশের অভ্যুদয়ের সংগে সংগে ইস্‌লামের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং সংগে সংগে সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নতি ঘটে। আব্বাসীয় যুগে আরবদের মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে বিস্ময়কর অভ্যুদয় ঘটে তা'হচ্ছে তাদের জীবনে বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাব। সেইসময় পারসিক, সংস্কৃত, সিরিয় ও গ্রীক

১ Hitti—History of the Arabs (4th Ed.) P. 253

ভাষায় লেখা দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদ করা শুরু হয়। ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে খলিফা অলমামুন কর্তৃক বাগদাদে 'বায়াত অল্ হিকমা' (জ্ঞানের আগার) নামে বিখ্যাত সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটি বিরাট পুস্তকাগার ছিল। বিদেশী শাস্ত্র অনুবাদ ও অনুশীলন করার এক বিরাট প্রতিষ্ঠান ছিল এটি। অনুবাদককারীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁর নাম হুনায়িন্-ইবন্ ইশাক। তাঁর মত সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ব্যক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মনে রাখা দরকার যে ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অন্ধকারময় মধ্যযুগে আরবীয় পণ্ডিতরাই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

আব্বাসীয় আমলে আরবদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার উন্নতির সংগে সংগে শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পাঠশালার যোগ্য ছাত্রকে বিদ্যালাভে নানাভাবে উৎসাহিত করা হ'ত। উটের পিঠে চড়িয়ে বাগদাদ শহরের পথে পথে তাকে ঘুরিয়ে সম্মানিত করা হ'ত। যে সব ছাত্র সমস্ত কোরানখানি কণ্ঠস্থ করতে পারত সমাজে তারা বিশেষ সম্মানের অধিকারী হ'ত।

পিতৃগৃহেই শিশুর শিক্ষা শুরু হ'ত। মুখে কথা ফুটলেই তাকে শেখান হ'ত অল কলিমা ঃ ল ইলাহ ইল্ল-ল্-লা (আল্লা ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নাই)। সাত বছর বয়সে শিশুকে শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করা হ'ত, শিক্ষক তাকে নিয়মিত কোরানের পাঠ দিতেন। ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা ছাড়াও শিশুকে লেখা, পড়া, অংক ও সাঁতার শিক্ষা দেবার নির্দেশ ছিল। শিশুকে অশ্বারোহণ ও তীর নিক্ষেপ করতে শেখান উচিত এই নির্দেশ মাতাপিতাকে দেওয়া হ'ত। ক্রমশ শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হ'ত ধর্ম প্রবর্তকদের কাহিনী, মহাপুরুষদের কবিতা। সুন্দর সুন্দর প্রবাদ বাক্য শিক্ষা দেবারও নির্দেশ ছিল। নৈতিক শিক্ষা সম্বলিত সুন্দর সুন্দর কবিতাই শিশুদের জন্য নির্বাচিত করা হ'ত। খ্রীষ্টান ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করা সম্ভবত নিষিদ্ধ ছিল।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা উচিত যে অতিরিক্ত কড়াকড়ির দরুন শিশুর সহজ শক্তিগুলি না পিষ্ট হয়, আবার অতিরিক্ত সদয় ব্যবহারের দরুন সে না অলস অপদার্থ হ'য়ে দাঁড়ায়। সদয় ও নরম ব্যবহারের দ্বারা যথাসম্ভব শিশুকে গ'ড়ে তোলা উচিত তবে প্রয়োজন হ'লে কঠিন শারীরিক শাস্তি দেওয়া উচিত। বেত বা লাঠি ছিল শিক্ষকের একটি প্রধান অস্ত্র এবং খলিফা তা'র ব্যবহার অনুমোদন করতেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের (মুয়ল্লিম) সামাজিক মর্যাদা ছিল কিন্তু অতি শোচনীয়। সমাজের সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর বৃত্তিগুলোর পর্যায়ে শিক্ষাবৃত্তিকে ফেলা হ'ত। 'আহাম্মক মিন্ মুয়াল্লিম কুত্তাব' অর্থাৎ শিক্ষকের চেয়ে নির্বোধ এই বাক্যটি আরবদের মধ্যে প্রবাদ বাক্য হ'য়ে দাঁড়ায়। আর একটি প্রবচনে বলা হয়েছে যে শিক্ষক, মেষপালক ও যারা মেয়ে মহলে বেশীক্ষণ কাটায় তাদের কাছ থেকে কোন পরামর্শ বা উপদেশ গ্রহণ করা উচিত নয়। হদিসে পাওয়া যায় যে মহম্মদ স্বয়ং বলেছিলেন যে শিক্ষক অসাধু উপায়ে জীবিকা উপার্জন করে তার কথা কপটতাপূর্ণ[১]। কোরানের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার অবশ্য বলেছেন যে পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে শিক্ষকই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ মানুষ।

ধর্মশিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন বলেই হয়ত শিক্ষকদের প্রতি এই রকম কটূক্তি করা হ'ত। তবে ধর্ম-শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষককে তার ভরণপোষণের জন্য যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া দরকার সে কথাও স্বীকৃত হয়েছিল। তবে এই মতই প্রকাশ করা হয়েছিল যে পারিশ্রমিকের জন্য শিক্ষকের দরদস্তুর করা উচিত নয়, ছাত্র স্ব ইচ্ছায় যা দেবে তাই হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করা উচিত। ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষককে বিবাহিত হ'তে হ'ত।

---

১ Encyclopædia of Religion and Ethics—vol. 5. 'Article on Muslim Education'—p. 202.

কি দরিদ্র কি ধনী সমস্ত ছাত্রকে সমদৃষ্টিতে দেখাই ছিল শিক্ষকের কর্তব্য। তা'ছাড়াও শিক্ষকের নিজের পারিবারিক কোন কাজে ছাত্রকে নিযুক্ত করা ছিল একেবারে নিষিদ্ধ। অবশ্য অভিভাবকের অনুমতি পেলে তা' করা যেতে পারত।

নিয়ম ছিল যে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার অধ্যয়নের দিন। ইদের পূর্বে ও পরে এক থেকে তিন দিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকত। ছাত্রদের মধ্যে কেউ সমস্ত কোরানখানি আয়ত্ত করতে পারলে ছুটি ঘোষণা করা হ'ত।

স্ত্রীশিক্ষা :—স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মহম্মদের নিজের মত ছিল যে স্ত্রীলোকদের লিখতে শেখানো অনুচিত; সূতো কাটাই তাদের উপযুক্ত কাজ। শিক্ষিত স্ত্রীলোক যে স্বামীর ধ্বংসের কারণ হয় এই ধারণাও প্রচলিত ছিল। কবিতা পাঠ বা আলোচনা করা মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি এই নীতি ছিল যে তাদের ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া উচিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দ্বারা তাদের বুদ্ধি শাণিত করার প্রয়োজন নেই। তবে বাধানিষেধ সত্ত্বেও মেয়েরা শিক্ষিত হ'ত। মেয়েরা যে হদিস রচনা করেছেন সে প্রমাণও আছে।

আগেই বলা হয়েছে যে আরবীয় সমাজে মস্‌জিদই ছিল প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। সমাজের শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তি সকলেই শিক্ষা-লাভের জন্য সেখানে উপস্থিত হ'ত। বয়স্কদের জন্য অনেক বড় বড় মসজিদে নিয়মিতভাবে সভা ডাকা হ'ত। সভায় মুসলমান ধর্মশাস্ত্র, হদিস, ভাষা ও কাব্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান ও আলোচনা চলতো। গ্রন্থাগার হিসেবেও মসজিদগুলির গুরুত্ব ছিল প্রচুর। ধর্মানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের বদান্যতায় সাধারণত গ্রন্থগুলি সংগৃহীত হ'ত। এমনিভাবে এক একটি মসজিদে অতি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্পেনে আরবীয় সংস্কৃতি :—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর একেবারে গোড়ারদিকে আরবেরা স্পেন অধিকার করে। এই বিজয়ের ফলে

স্পেন দেশে এক বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক উন্নতির সম্ভাবনার সূত্রপাত হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্পেনে আরব সংস্কৃতি প্রস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে।

দশম শতাব্দীতে আরবদের শাসনে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে কর্ডোভার খলিফা আবদাল রহমান (তৃতীয়) কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কাইরোর অল্ অজ্হর ও বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি এর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে ছাত্ররা এই কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতো শিক্ষাপ্রার্থী হয়ে। আবদাল রহমানের পুত্র অল হাক্‌ম-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট উন্নতি হয়। অল হাক্‌ম প্রাচ্যদেশ থেকে খ্যাতনামা অধ্যাপকদের নিয়ে যেতেন সেখানে। অল হাক্‌ম কর্ডোভাতে সাতাশটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন এবং পণ্ডিতদের বহু অর্থ দান করেন। কর্ডোভার গ্রন্থাগারটিও ছিল সমসাময়িক পৃথিবীর একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার। কথিত আছে সেখানে চার লক্ষ গ্রন্থ ছিল।

কর্ডোভা ছাড়া সেভিল, মলগা এবং গ্রানাডা সহরে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা, আইন, ঈশ্বরতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়নের জন্য বিভাগীয় বন্দোবস্ত ছিল। গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়েও ঈশ্বরতত্ত্ব, আইনতত্ত্ব, দর্শন, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হ'ত।

অল হাক্‌মের শাসনে স্পেনের যে উন্নতি হয়, তা দেখে বিদেশীয় পণ্ডিতেরা মন্তব্য করেন যে সেখানে সকলেই লিখতে ও পড়তে জানত। আরবদের মধ্যে যখন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার এই বিস্ময়কর উন্নতি ঘটে তখন ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতে জ্ঞানের শিখা অতি ক্ষীণভাবে জ্বলতে থাকে। জ্ঞানচর্চা প্রধানত খ্রীষ্টান পাদ্রী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ভারতবর্ষে মুসলিম শিক্ষা[১] :—ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের ফলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারা এক নোতুন খাতে প্রবাহিত হয়। ভারতবর্ষে মুসলমান প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান মামুদ। কিন্তু তাঁর রাজধানী ছিল গজনী এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগের সমস্ত নিদর্শন গজনীতেই মেলে, ভারতে নয়। সুতরাং ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর নাম উল্লেখ করা খুব যুক্তিসংগত নয়। তবুও ভারতের সংগে তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল গভীর, এবং তা'ছাড়া তিনি একজন দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা, এইটুকুই তাঁর সমস্ত পরিচয় নয়। তাঁর অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে বিদ্যোৎসাহিতা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় তা' সত্যই বিস্ময়কর। সুতরাং মুসলিম রাজনৈতিক ইতিহাসের মত, মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেছেন যে সুলতান মামুদের মত 'কোন নরপতির দরবারে কখনও এত পণ্ডিত ব্যক্তির সমাগম হয়নি।'

জানা যায় যে সুলতান মামুদ কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের বছরে চা'র লক্ষ দিনার দান করতেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসারের জন্য তিনি গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁরই উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় অল্পদিনের মধ্যে গজনী বিখ্যাত কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিদের এক বিরাট মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। অমর কবি ফিরদৌসীর তিনি ছিলেন একজন বিশেষ গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক। বিখ্যাত আরবীয় ঐতিহাসিক অল উট্‌বি এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক অল বিরুনী তাঁর দরবার আলোকিত করেছিলেন।

সুলতানী আমল :—মহম্মদ ঘুরীই ভারতে প্রকৃত মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে দাসবংশীয় সুলতানদের

[১] Promotion of Learning in India during Mahammadan Rule—N. N. Law

পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে মুসলমান শিক্ষার কিছু প্রসার হয়। দাসবংশীয় নরপতিরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এঁদের মধ্যে সুলতান নাসিরুদ্দিন ও সুলতান বলবনের পুত্র মহম্মদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা দু'জনেই মুসলমান শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। মহম্মদ ও তাঁর ভাই বোঘরা খাঁ-এর উদ্যোগে দিল্লীতে কতকগুলি সাহিত্য গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। সুবিখ্যাত কবি ও গায়ক আমীর খুসরু ছিলেন সেই সময় দিল্লীর শিক্ষিত সমাজের মধ্যমণি। দাসবংশীয়দের শাসনকালে ভারতবর্ষে মুসলিম শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হয় এবং দিল্লীও জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের একটি আসর ও সংস্কৃতি চর্চার একটি কেন্দ্র হিসেবে ক্রমশ প্রতিষ্ঠালাভ করতে থাকে।

দাসবংশের পর খলজীবংশীয় সুলতানের আমলে মুসলমান শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন না। বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দিন নিজে ছিলেন নিরক্ষর এবং তাঁর নৃশংস সামরিক রাজনীতি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলমান শাসন ও সংস্কৃতি ভারতের মাটিতে স্থায়ী আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে, ফলে ভারতবর্ষে সেই সময় মুসলমান পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির অভাব ছিল না এবং সুলতান আলাউদ্দিনের স্বেচ্ছাচারিতা ও শিক্ষাবিস্তারের প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা সত্ত্বেও দিল্লী একটি বিরাট সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

খলজীবংশীয় শাসনের অবসানের পর সম্ভবত দিল্লীর সাংস্কৃতিক জীবনে সাময়িকভাবে ভাঁটা পড়ে। তুঘলকবংশীয় সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলক নিজে ছিলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ ও কাব্যানুরাগী। দিল্লীর সমস্ত নরপতির মধ্যে তাঁর চেয়ে বুৎপন্ন বোধ হয় আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি যে মানসিক বৈকল্যের পরিচয় দেন তার ফলে তাঁর বিরাট ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্যের

এক কণাও তাঁর প্রজাদের জীবন আলোকিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়নি। অপরপক্ষে তাঁর রাজনীতি প্রজাদের জীবনে ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল। রাজধানী পরিবর্তনের জন্য তিনি দিল্লী শহরকে মরুভূমিতে পরিণত করেন। দিল্লীর নিম্ন উচ্চ সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

মহম্মদ বিন্ তুঘলকের পর ফিরোজ শা তুঘলকের সময় সুলতানী সাম্রাজ্যে আবার সুদিন ফিরে আসে, ফিরোজ শা নিজে ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল। শিক্ষা বিস্তারে দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রণী। পণ্ডিত ও ধার্মিকদের তিনি ছত্রিশ লক্ষ টাকা দান করেন। ফিরোজ শা'র রাজত্বকালে রাজধানী দিল্লী ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশে সবশুদ্ধ এক লক্ষ আশি হাজার ক্রীতদাস ছিল। তাদের শিক্ষিত করে তোলবার জন্য সুলতান বিশেষ বন্দোবস্ত করেন[১]। শাস্ত্র ছাড়াও তাদের নানা বৃত্তি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও সুলতান করেছিলেন। তিনি নির্দেশনামা জারি করে ঘোষণা করেন যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যে-সব পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করেন তাঁদের উৎসাহ দান করা হচ্ছে তাঁর সরকারের একটি প্রধান নীতি। প্রজাসাধারণের হিতের জন্য তিনি মক্তাব (প্রাথমিক বিদ্যালয়) ও মাদ্রাসা (উচ্চ শিক্ষায়তন) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কতগুলি মাদ্রাসা নির্মাণ করান সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন ৩০, কেউ ৪০, কেউ বা বলেন ৫০। সুলতান আলতামাস বা ইলতুৎমিসের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটির তিনি সংস্কার করান এবং সুলতান আলাউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার অন্তরস্থিত মসজিদটিকে মেরামত করান। মাদ্রাসা ও মসজিদগুলির রক্ষণ ও ধারণের জন্য তিনি কতগুলি গ্রাম দান করেন।

---

১ Tarikh-i Firoz Shahi—Sham-i Siraj Afif (Elliot's translation) pp. 80-83

ফিরোজ শা নির্মিত মাদ্রাসাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল নোতুন রাজধানী ফিরোজাবাদে প্রতিষ্ঠিত ফিরোজশাহী মাদ্রাসা। মনোরম পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসাটিকে সবদিক দিয়া একটি আদর্শ শিক্ষায়তন হিসেবে গড়ে তুলতে ফিরোজ শা'র চেষ্টার অন্ত ছিল না। সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলানা জালানুদ্দিন রুমি এই মাদ্রাসার ইসলাম ধর্মতত্ত্ব ও আইনের অধ্যাপক ছিলেন। এই আবাসিক মাদ্রাসাটিতে বহু ছাত্র ও অধ্যাপক থাকতেন। অন্যান্য মাদ্রাসার মত এটির সংগেও একটি সুন্দর মসজিদ সংলগ্ন ছিল। মাদ্রাসাটি দেখতে দেশবিদেশ থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের অভ্যর্থনা করবার ও থাকার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল সেখানে। ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ছিল এবং মাদ্রাসার অধিবাসী প্রত্যেক ছাত্র অধ্যাপক ও অতিথিদের ভরণপোষণের জন্য দৈনিক ভাতা দেওয়া হ'ত। রাজকোষ থেকে এই সমস্ত খরচ বহন করা হ'ত।

ফিরোজ শা'র মৃত্যুর পর সুলতানী শাসনের দ্রুত পতন ঘটতে থাকে। তুঘলক বংশের অবসানের পর সৈয়দ ও লোদীবংশ ক্রমান্বয়ে সুলতানী অধিকার করে কিন্তু তাদের আমলে মুসলমান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উন্নতি কিছু ঘটেনি। লোদীবংশের দ্বিতীয় সুলতান সিকন্দার লোদী ছিলেন বিদ্যানুরাগী। তিনি দেশবিদেশ থেকে পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করতেন এবং মুক্ত হস্তে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সিকন্দার লোদীর সময় থেকে হিন্দুদের মধ্যে পারসিক ভাষা ও সাহিত্য চর্চার রীতিমত রেওয়াজ দেখা দেয় এবং এই সময় থেকেই উর্দু ভাষার প্রচলন হয়।[১]

ওই সময় ভারতবর্ষে ছোটখাট যে-সমস্ত মুসলমান রাষ্ট্র ছিল সেখানেও শিক্ষার অল্পবিস্তর প্রসার ঘটে। এই রাষ্ট্রগুলির অধিপতিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে যাঁরা সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন

১ Promotion of Learning in India during Mahammadan Rule—N. N. Law pp. 75-76.

তাঁদের মধ্যে বাহমনী রাজ্যের সুলতানদ্বয় মামুদ শা বাহমনী ও ফিরোজ শা বাহমনীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মামুদ শা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। দরিদ্র ও অনাথ শিশুদের জন্য তিনি তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন শহরে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ফিরোজ শাও শিক্ষা ও সংস্কৃতির গভীর অনুরাগী ছিলেন। বিদেশ থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আনবার জন্য তিনি জাহাজ পাঠাতেন। জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য তিনি একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বাহমনী রাজ্যের মন্ত্রী মামুদ গওয়ান শিক্ষার একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বিদরে একটি বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসার গ্রন্থাগারে ৩০০০ গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল।

এই সময় জৌনপুর রাজ্য সমসাময়িক ভারতের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। শূর বংশীয় সুলতান ফরিদ (শের শাহ) জৌনপুরে বিদ্যাশিক্ষা করেন। উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জৌনপুর মোগলদের সময়ও একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান হিসেবে পরিগণিত হ'ত।

মনে রাখা দরকার, সুলতানী আমলে মুসলমান শিক্ষা যে শুধু মক্তাব ও মাদ্রাসাতে সম্পন্ন হ'ত তা নয়, মুসলমান পণ্ডিতেরা আপন আপন গৃহেও অনেক সময় ছাত্রদের রেখে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। সাধারণ শিক্ষার সংগে সংগে সংগীত, বাদ্য, চিত্রকলা প্রভৃতি শেখবার জন্য ওস্তাদদের কাছে পাঠ নেবার বন্দোবস্ত ছিল। কারিগরী বিদ্যা লাভ করবার জন্য কারিগরদের কাছে শিক্ষানবীশ হ'য়ে থাকতে হ'ত।

মোগল যুগ :—সুলতানী শাসনের অবসানের পর মোগল শক্তির অভ্যুদয়ের ফলে ভারতে মুসলমান শিক্ষাক্ষেত্রে এক নোতুন জোয়ার দেখা দেয়। ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন বাবর। বাবর নিজে ছিলেন আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষায় সুপণ্ডিত। মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁর অধিকাংশ

সময় অতিবাহিত হলেও সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কাজে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। ভারতবর্ষের সমালোচক হিসেবে বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন যে হিন্দুস্থানের কোন মাদ্রাসা নেই। বাবরের এই মন্তব্য অবশ্য ঠিক নয়। বাবরের শাসনকালে সরকারী উদ্যোগে মক্তাব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা ছিল।

বাবরের পুত্র হুমায়ুনও পিতার মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বিজ্ঞান চর্চার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং তিনি পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রাজত্বকালে দেশের সাহিত্যিক ও গুণীদের তিনি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। হুমায়ুন এত গ্রন্থপ্রিয় ছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি বাছাই করা বই সংগে নিয়ে যেতেন। তিনি দিল্লীতে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং একদিন সন্ধ্যা বেলায় নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করার সময় সেই গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে প'ড়ে গিয়ে প্রাণ হারান। তাঁর সময় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কয়েকটি মক্তাব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

হুমায়ুনের পর মহামতি আকবরের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক নোতুন উদ্দীপনা দেখা দেয়। তবে সম্ভবত আকবর নিজে নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর পুত্র জাহাংগীর তাঁর সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা' খুবই কৌতূহলদ্দীপক। তিনি বলেছেন[১] যে যদিও তার পিতা ছিলেন নিরক্ষর (উম্মী) তবুও বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি ও সাহিত্য রসিকদের তাঁর সুমার্জিত ভাষায় আলাপ-আলোচনা শুনলে কেউ তাঁকে নিরক্ষর বলে সন্দেহ করতে পারবে না। আকবরের নিরক্ষরতা নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ[২] থাকলেও একথা মোটামুটিভাবে সত্য যে পিতা বা পিতামহের মত তিনি বুৎপন্ন ছিলেন না। কিন্তু তবুও যে

১ N. N. Law—Promotion of Learning in Mahammadan India—pp. 207-212

২ Memoirs of Jahangir—Susil Gupta Edition (1952) p.45

অক্লান্ত সত্যানুসন্ধিৎসা ও বিদ্যানুরাগিতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা' শুধু ভারতের নয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

আকবর সমস্ত ভারতবাসীকে এক অখণ্ড জাতিরূপে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন) তাই ধর্মনির্বিশেষে তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সম্পদের সমন্বয় করতে চেষ্টা করেন তাঁর স্বপ্ন ছিল শুধু এক বিরাট রাজনৈতিক সাম্রাজ্যই নয়, হিন্দু-মুসলমানের চেষ্টায় বিরাট এক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য গঠন। ইবাদত খানার আলাপ-আলোচনা শেষ পর্যন্ত দীন ইলাহীতে পর্যবসিত হয়, এই ধর্মই ছিল তার মনের মুকুর।

সম্রাটের আদেশে অথর্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত, রাজতরংগিণী ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়।

তাই দেখি নানাধর্মের পোষকতা করছেন তিনি। হিন্দু শাস্ত্র, ভাষ্য ও অন্যান্য গ্রন্থাদি অনূদিত হচ্ছে, এবং হিন্দুদের শাস্ত্রাদি পাঠের সুবন্দোবস্ত করছেন উচ্চশিক্ষায়তন বা মাদ্রাসাগুলিতে। কি রাজনীতি, কি ধর্ম বা কি শিক্ষাক্ষেত্রে একই উদারনীতির এমন অপূর্ব অভিব্যক্তি হয়েছিল বলেই সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল ইতিহাসে চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে।

(আকবর নানাস্থান থেকে বহুমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেন এবং অতি যত্নের সংগে সেগুলি নিজের গ্রন্থাগারে রেখে দেন; রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার পরিচায়ক। আকবরের সময়ে সংগীত ও চিত্রকলার যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় তা' সর্বজন বিদিত।

নিজের পুত্রদের শিক্ষার ভার আকবর ন্যস্ত করেছিলেন তাঁর সময়কার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের উপর। সাধারণের শিক্ষা ব্যাপারেও আকবর অনেক সংস্কার করেন। আকবর ছিলেন প্রকৃত জাতীয় শাসক, তাই তিনি হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের উন্নতির দিকে সমান দৃষ্টি দিতেন। তাঁরই সময় সর্বপ্রথম হিন্দু ও মুসলমান একই মক্তাব ও মাদ্রাসায় একসংগে পাঠ করতে আরম্ভ করে।

আকবর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময় ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা ও দিল্লী শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। আকবরের আনুকূল্য ও পোষকতায় এই সব স্থানে বড় বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত পণ্ডিতেরা সেখানে অধ্যাপনা করার ভার গ্রহণ করেন। বেসরকারী উদ্যোগে যে-সমস্ত বড় বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে আকবরের ধাত্রীমাতা মাহম প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর মাদ্রাসাটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল। মক্তাব ও মাদ্রাসার বিদ্যা সমাপ্ত করার পর উচ্চশিক্ষা প্রার্থী ছাত্ররা অনেক সময় কোন পণ্ডিতের গৃহে বাস করে তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করত, সংগীত, বাদ্য, চিত্র ও অন্যান্য শিল্প প্রভৃতি সাধারণত ওস্তাদদের গৃহেই শিখতে হ'ত।

আকবর শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করেন। নোতুন পদ্ধতি অনুযায়ী ছাত্রদের প্রথমে ফারসী অক্ষর, উচ্চারণ ও যতিচিহ্ন সন্নিবেশ শেখান হ'ত। দু'দিনের মধ্যে এগুলি শেখা হ'লে শেখান হ'ত যুক্ত অক্ষর। তারপর এক সপ্তাহ বাদে ধর্ম ও নীতি উপদেশ সম্বলিত ছোট ছোট কবিতা বা গদ্যাংশ তাদের পড়তে দেওয়া হ'ত। এইগুলির মধ্যে যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দগুলি থাকতো। স্বচেষ্টায় ছাত্রদের সেগুলি আয়ত্ত করতে হ'ত, প্রয়োজন হ'লে শিক্ষক মাঝে মাঝে সাহায্য করতেন। তারপর কিছুদিন শিক্ষক তাদের নোতুন নোতুন অর্ধশ্লোক শেখাতেন এবং ছাত্ররা এমনি করে অল্প সময়ের মধ্যেই অনর্গল টানা পড়বার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারতো। তরুণ ছাত্রদের প্রত্যহ বর্ণমালা, যুক্তবর্ণ, নোতুন অর্ধশ্লোক বা দ্বিচরণ শ্লোক শিক্ষা করতে হ'ত, এবং পুরাতন পাঠের পুনরাবৃত্তি করতে হ'ত। এই নোতুন পদ্ধতিতে কয়েক বছরের শিক্ষা কয়েক মাসে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। আকবর সুন্দর হস্তলিপির ওপর খুব জোর দিতেন এবং ইহাকে চিত্রাংকনের পর্যায়ে ফেলতেন। সুশ্রী হস্তলিপির জন্য বহু পারিতোষিকের তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন।

নিম্নলিখিত ক্রম অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল :—নীতিবিদ্যা, গণিত, হিসাব সংরক্ষণ, কৃষি, জ্যামিতি, দৈর্ঘ পরিমাপ বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূমিতে কোনো আকৃতি বা আঁচড় কেটে ভবিষ্যৎ গণনা করা ; অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পদার্থবিদ্যা, তর্কবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা ; শুদ্ধ গণিত ; ঈশ্বরতত্ব ও ইতিহাস। হিন্দুরা মাদ্রাসায় নিজেদের শাস্ত্র পাঠ করতে পারতো এবং ব্যাকরণ, বেদান্ত ও পতঞ্জলি শিক্ষাদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্রাট করেছিলেন। সম্রাটের ঔদার্যে শিক্ষায়তনে আপন আপন মত ও পথ অনুযায়ী বিদ্যাশিক্ষা লাভের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল এবং সেইজন্যই মক্তাব ও মাদ্রাসাগুলির প্রভূত উন্নতি হয়েছিল।

হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করবার জন্য আকবর তাঁদের রীতিমত পুরস্কার ও বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন,) এবং ধর্ম নিরপেক্ষভাবে তিনি জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার আনুকূল্য করতেন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে আকবরের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এক নোতুন চেতনা দেখা দেয় এবং তা' ভারতীয় জাতি গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

জাহাংগীর নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একটি নির্দেশ জারি করেন যে যদি কোনো ধনী ব্যক্তি বা পরিব্রাজক উত্তরাধিকারীহীন হয়ে মারা যায় তা'হলে তার সম্পত্তি মাদ্রাসা ও মঠ নির্মাণ ও সংস্কার করার কাজে ব্যয়িত হবে। তিনি পরিত্যক্ত মাদ্রাসাগুলির সংস্কার করান এবং সেগুলিকে আবার চালু করেন। জাহাংগীর বহু ব্যয় করে অনেক গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহ করেন। চিত্রাঙ্কন ও চিত্রকরদের তিনি বিশেষভাবে উৎসাহ দিতেন।

শাহজাহানও দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যথাসম্ভব আনুকূল্য করেন। দিল্লীর রাজকীয় মাদ্রাসা তাঁরই উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য মাদ্রাসা তিনি সংস্কার করান। তিনিও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন ও সংস্কৃতি চর্চার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ঔরংজীব নিজে সুপণ্ডিত হলেও ছিলেন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন। তাই তিনি হিন্দু শিক্ষায়তনগুলি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। কিন্তু মুসলমান শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক মক্তাব ও মাদ্রাসা নির্মাণ করান। সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য তিনি রাজকোষ থেকে বৃত্তি দেবার বন্দোবস্ত করেন। ঔরংজীবের সময় শিয়ালকোট জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঔরংজীবের পরবর্তী মোগল সম্রাটদের মধ্যে প্রথম বাহাদুর শা, মহম্মদ শা ও দ্বিতীয় শাহ আলম বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং নানা-ভাবে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছিলেন।

মুসলমান শাসনকালে স্ত্রীশিক্ষা :—মুসলমান সমাজে মেয়েদের কঠিন পর্দা প্রথা মানতে হ'ত। সেইজন্য তাদের মধ্যে শিক্ষার বিশেষ প্রচলন হয়নি, তবে অল্পবয়সী কুমারীদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। অন্তঃপুরবাসিনীদের শিক্ষার জন্যও অনেক সময় শিক্ষিকা রাখা হ'ত। মেয়েরা যে শিক্ষালাভের সুযোগ কিছু পেত তার প্রমাণ সুলতানা রাজিয়া। মোগল যুগেও বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম, হুমায়ুনের ভাগ্নী সেলিমা সুলতানা, আকবরের ধাত্রীমাতা মাহম, নূরজাহান, মমতাজমহল, শাহজাহানের কন্যা জাহানারা, ঔরংজীবের কন্যা হেরউন্নিসা বেগম প্রভৃতি রাজপরিবারের নারীরা উচ্চ শিক্ষিতা ও সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন।

ওরংজীবের মৃত্যুর পর মোগল রাজনৈতিক শক্তির দ্রুত অবনতি ঘট্‌তে থাকে ; ভারতবর্ষের মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় ভাঁটা পড়ে। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির সাহের আক্রমণে দিল্লী ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সংগে বাদশা পরিবারের অমূল্য গ্রন্থাগারটিরও অশেষ ক্ষতি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে মুসলমান শিক্ষার আলো অতি ক্ষীণ হয়ে আসে।

ইউরোপে নব জাগরণ

মধ্যযুগের স্বাধীন চিন্তাবিহীন, ব্যক্তিত্ব-পরিপন্থী ধর্মাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ শিক্ষার বিরুদ্ধে মাথা উঁচিয়ে উঠেছিল কতগুলো নতুন প্রেরণা, তাদের উদ্ভব হয়েছিল ইউরোপের 'নবজন্মের' প্রসূতি আগারে। এই নবজন্ম বা জাগরণের ফলে নানা দিক দিয়ে এল পরিবর্তন জাতীয় জীবনে—ধর্মে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, চিত্রে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, নবদেশ আবিষ্কারে, এক কথায় মানুষের নব দৃষ্টিভংগিতে, কিন্তু মধ্যযুগীয় ভাব সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠে আধুনিক যুগে উপনীত হ'তে ইউরোপের লাগল প্রায় তিনশ' বছর—চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

এ নব জন্ম কী, কী এর তাৎপর্য এই সম্বন্ধে বহু মনীষী বহু কথা বলেছেন, তবে খুব অল্প কথায় ফরাসী ঐতিহাসিক মিশলে (Michelet) বলেছেন, 'এ নবজন্ম হচ্ছে—পৃথিবী ও মানুষের পুনরাবিষ্কার'। এক হাজার বছর পর মানুষ হঠাৎ একদিন দেখতে পেল যে সে শুধু একটা যন্ত্র নয় বা সম্রাট, পোপ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান চালাবার সামান্য স্ক্রু বল্টু ও নয়, পরন্তু তার নিজের একটা স্বাধীন সত্ত্বা আছে, তার স্বাধীন ইচ্ছা ও বিচারশক্তি আছে, তার কর্মোদ্দীপনা আছে, সে এই সুন্দর ধরণীকে ভালবাসে, উপভোগ ক'রতে চায় তার বিপুল ঐশ্বর্যকে, আহরণ ক'রতে চায় প্রকৃতির সকল শক্তিকে, জানতে চায় অজানাকে। নরকের ভয় মুছে ফেলে সে দাবী করল, সে শুধু দেবত্বের অধিকারী নয়, সে নিজে দেবতা। মানুষের এই নিজকে ফিরে পাওয়ার, তার আত্মার মুক্তিসাধনের অবর্ণনীয় বিস্ময় ও আনন্দ শেক্সপিয়ার তাঁর অবিস্মরণীয় ভাষায় হ্যামলেটে প্রকাশ করেছেন—"How noble is man, how infinite in faculty, how godlike in reason."

মানুষ সম্বন্ধে এই ছিল ইউরোপের নবজন্মের বা রেণেসঁসের ধারণা, কাজেই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে লক্ষিত হ'ল একটা উদ্দীপনাময়

অগ্রগতি যা মানলো না কোন পুরনো বাধা, নিয়ে গেল বিচারের মধ্য দিয়ে, স্বাধীন চিন্তার ভেতর দিয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নোতুন পথে ; কাজেই মধ্য যুগের সর্বেন্দ্রিয়ব্যাবৃত্তার্থ স্থবিরত্বের পর একে সত্যকারের পুনর্জন্মই বলা যেতে পারে। এ পুনর্জন্মের নোতুন বাণী আনলেন ফরাসী মনস্তাত্বিক মহামতি ডেকার্ট (Descartes, ১৫৯৬-১৬৫০ খ্রীঃ অঃ) যাঁকে আধুনিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বা পিতাবলে অভিনন্দিত করা হয়। অন্ধকার ও মধ্য যুগের রীতি ছিল প্রথম কোন জিনিষে বিশ্বাস করা, সে ধর্মেই হোক, সাহিত্যেই হোক বা দর্শনেই হোক। তারপরে ভেবে দেখা কি বিশ্বাস করা হ'ল—Credo ut intelligam ; কিন্তু ডেকার্ট উচ্চারণ করলেন তাঁর স্বাধীন চিন্তার নোতুন মন্ত্র নবজন্মের প্রাণ হিসেবে "আমি চিন্তা করি তাই আমি মানুষ (Cogito ......), যাহা আমি সত্য বলে জানি না চিন্তার মাধ্যমে, তাহা আমি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না।" এই নোতুন মন্ত্র কর'ল কুঠারাঘাত যাজকীয় নিষ্পেষণের মূলে, মানুষের স্বাধীন চিন্তাগ্রাসের মূলে, মুক্ত ক'রে দিল মানুষের শৃঙ্খলিত বিচারবুদ্ধিকে, তার রিক্ত রুদ্ধ কল্পমানসকে যাতে আবার সৃজনীশক্তি আসে ফিরে, জীবনের নানাক্ষেত্রকে করে সমৃদ্ধ তার আপন সৃষ্টিতে।

ঠিক এ সময়ে ইউরোপের পুনর্জন্মের কারণ ছিল অনেকগুলো—তবে সবচেয়ে বড় কারণ হোল গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের বিশেষ ক'রে গ্রীক সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের পুনরাবিষ্কার। পূর্বে রোমক সাম্রাজ্য কন্‌ষ্টান্টিনোপলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সম্রাট কন্‌ষ্টান্টাইন ৩১২ খ্রীষ্টাব্দে, খানিকটা নিজের মহিমার জন্য, খানিকটা বর্বরদের হাত থেকে সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত রক্ষা করার জন্য ; কাজেই সে অবধি কন্‌ষ্টান্টিনোপলই হয়েছিল গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও খ্রীষ্টান ধর্মের কেন্দ্র। তারপর আবার পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার পর বিদ্বান্ ও পণ্ডিতেরা গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য দর্শনের পুঁথিপত্র নিয়ে কন্‌ষ্টান্টিনোপলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাজেই কনষ্টান্টিনোপলই হয়ে উঠল খ্রীষ্টান

ধর্ম ও গ্রীক সংস্কৃতির সযত্নরক্ষিত কন্দর। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন বিজয়ী তুর্কীরা কনষ্টান্টিনোপল দখল ক'রল তখন হাজার হাজার গ্রীক ও ল্যাটিন পুঁথি নিয়ে (এক কার্ডিনাল বেমারিয়নই ৮০০ শ'র ওপরে গ্রীক্ বাইবেল ও সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি এনেছিলেন) গ্রীক ও রোমকেরা অনেকেই ইতালীতে চলে আসেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই অনেক গ্রীক পণ্ডিত পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্য থেকে ইতালীতে আসতে শুরু করছিলেন। এই নবাবিষ্কৃত গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য ও দর্শন সদ্য প্রবর্তিত মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে শীঘ্রই সমস্ত ইতালীতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল এবং মানুষ তার ক্লৈব্যের দিন, তার মানসিক খর্বতা ও অগৌরবের দিন ভুলে গিয়ে সীমাহীন আশা ও সম্ভাবনা নিয়ে জীবনের সম্মুখীন হ'ল। এ ছাড়া আর যে কারণগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে ইউরোপের সিরিয়ার আরবদের বিরুদ্ধে ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ঊর্ধ্বগতি—এবং সংগে সংগে ইতালীর নগর-রাষ্ট্রগুলোর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিয়ৎপরিমাণে মানসিক অনুশীলন। ক্রুশেডের মারফৎ এলো নোতুন দেশের নোতুন লোকের খবর—তাদের আচার ব্যবহার সংস্কৃতির—অজানাকে জানবার ভয় গেল ভেঙে—সংগে সংগে গেল বেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, ধনাগমও হ'ল বেশী লোকের হাতে, মানুষ চোখ তুলে চারদিকে চাইতে শিখল, শুধু বেঁচে থাকার চাইতে আরো বড় কিছু চাইল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্কলাষ্টিসিজ্মের শুষ্ক চুলচেরা কচকচানির খেলাই ছিল বেশী একথা সত্য, কিন্তু মানসিক অনুশীলন যে এতে কিছু না হ'ত তা নয়। এ ছাড়া ল্যাটিন সাহিত্য, রোমক আইন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যয়ন খানিকটা আবাদ করে রেখেছিল মনের পতিত জমি গ্রীক সংস্কৃতির অপূর্ব ফসলের জন্য।

তবে সব চেয়ে আগে ইতালীতে কেন গ্রীক-রোমক সংস্কৃতির নবজন্ম বা রেণেসঁস্ এল তারও কারণ আছে। মধ্যযুগে অ্যাল্পের উত্তরে আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও রুটির মধ্যে যীশুর বাস্তব

উপস্থিতি আছে কিনা দর্শন ও ধর্মের এই সূক্ষ্ম বিচার নিয়ে মানুষের দিন কেটে যেত কিন্তু ইতালীতে দ্বাদশ শতাব্দীতে আলোচনা হ'ত পোপ ও সম্রাটের দ্বন্দ্বের কথা, ইতালীয় নগর রাষ্ট্রের স্বাধীনতার কথা, রোমক আইন ও বাগ্মিতা শাস্ত্রের সৌন্দর্যের কথা, কারণ সেখানে রিপাব্লিক ও রোমক সাম্রাজ্যের মহিমময় স্মৃতি লুপ্ত হয়নি; ইতালীয় নাগরিকেরা বিশেষ ক'রে সে গৌরবের দিনের উত্তরাধিকারী বর্বর বিজেতার সংগে সংমিশ্রণ সত্বেও সে কথা তারা কোনদিন ভুলতে পারেনি। তাদের সংস্কৃতিও রোমক ভাবসম্পদ (অর্থাৎ গ্রীক-রোমক ভাবসম্পদ) ও ঐতিহ্য হ'তে কোনদিনও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়নি। পুরানো দেবদেবীর কাহিনী, পুরানো কবিতা, পুরানো ইতিহাস দেশের আকাশে বাতাসে যেন মিশিয়ে ছিল। যে ল্যাটিন ব্যাকরণ, সাহিত্য ও বাগ্মিতা অন্ধকার যুগের ভেতরও আপন অস্তিত্ব কোনমতে বজায় রেখেছিল, তাও আজ অর্ধ ইতালীর মাতৃভাষার বাহন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানে মধ্য যুগেও আদর্শ ছিল যাজক তৈরী করা ততটা নয় যতটা একজন জ্ঞানী আইনজ্ঞ ব্যক্তি তৈরী করা—যে আদর্শ ছিল প্রথম খ্রীষ্টাব্দে কুইন্টিলিয়ানের। এ ছাড়া ইতালীয় নগর রাষ্ট্রের বৈচিত্রভরা জীবন, পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মোদ্দীপনা, নোতুন বণিক, নোতুন ধনীসম্প্রদায়, মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার অবসানে নোতুন গুণী নেতা ও সেনাপতির আবির্ভাবও ইতালীকেই সর্বপ্রথম রেণেসঁসের কেন্দ্র ক'রে তুলতে সাহায্য ক'রল। তাই দেখি উত্তর ইতালীয় মানব তার সংস্কৃতি ও জাতীয়তার টানে এই পুরাতন গ্রীক-রোমক সভ্যতা আবার যখন জীবনের মধ্যে পেল তখন তাকে সাদরে গ্রহণ ক'রল।

এ নব জন্মের অভিব্যক্তি হ'তে পারতো নানাভাবে অন্য সামাজিক পরিবেশে—বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসায়, ধর্ম-সংস্কারে, জাতীয় ঐক্যে বা নোতুন দেশ আবিষ্কারে, কিন্তু ইতালীতে এ পেল প্রকাশ প্রাচীন সভ্যতার প্রতি একটা অসীম দরদে—সাহিত্য,

শিক্ষা, বাগ্মিতা, স্থাপত্য ও চিত্রকলার মাধ্যমে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এর বিকাশ হ'ল প্রায় এক শতাব্দী পরে।

মধ্যযুগে যাজক বা নাইটের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা হয়েছিল সেদিনের শ্রেণী, পদ মর্যাদা ও সমাজ সংগঠনের উপযোগী ক'রে কিন্তু সেদিন স্বাধীন ব্যক্তিত্বের কোন প্রশ্ন ওঠেনি। ইতালী আবার ফিরিয়ে আনল সমাজে অযাজকীয় স্বাধীন ব্যক্তিত্বের ধারণাকে, প্রাচীন গ্রীক রোমক সভ্যতার বিশিষ্ট চরিত্রগুলোকে জীবনের আদর্শরূপে তুলে ধরে—বিদগ্ধ গণতান্ত্রিক নেতা, বাগ্মী, পাণ্ডিত্যসম্পন্ন উপদেষ্টা, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, জনতাজাত-সেনানায়ক। এমন কোন শিক্ষা কি সম্ভব নয় যাতে এ ধরনের বহু চরিত্রের উদ্ভব হয়? কুইন্টিলিয়ানের বিখ্যাত পুস্তক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই আবার পাওয়া গেল পূর্ণভাবে, তাঁর আদর্শ যেন হুবহু মিলে গেল দেশের চাহিদার সংগে।

তাই দেখি পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন শিক্ষক প্রথম শতাব্দীর কুইন্টিলিয়ানের আদর্শের সংগে যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম ও শিভালরির শ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণা মিশিয়ে এমন এক সুন্দরতম শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন যা পৃথিবীতে খুবই কম দেখা গেছে। কিন্তু ভিট্টোরিণো ডা ফেল্টারের (Vittorino da Feltra, 1378—1446) কথা বলবার আগে কবি পেট্রার্কের (১৩০৪—৭৪ খৃঃ অঃ) কথা বলা প্রয়োজন করে। তাঁর সময় থেকেই ইতালীর নব জন্মের শুরু হয়। পেট্রার্কের মধ্যে আমরা শুনতে পাই প্রকৃতির সৌন্দর্য, জীবনের আনন্দ ও প্রাচীন সাহিত্যের জয়গান, মানুষ যে আবার চোখ তুলে প্রকৃতির দিকে; জীবনের দিকে চাইলে তারই বাণী। কিন্তু পেট্রার্ক শত চেষ্টা করেও গ্রীক পুস্তকাদি পেলেন না অথচ গ্রীক সাহিত্য ছাড়া ইউরোপের নব জন্মের পূর্ণভাবে সার্থক হওয়া সম্ভব ছিল না। এ সুযোগ এল ম্যানুয়েল ক্রিসোলোরাস (Manuel Chrysoloras) নামে একজন গ্রীক পণ্ডিত যখন চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে কনষ্টান্টিনোপল থেকে এসে প্রথম ফ্লোরেন্স

ও পরে ইতালীর সহরগুলোতে এবং প্যারিস, লণ্ডনে পর্যন্ত গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে লাগলেন। ক্রিসোলোরাসের এক বিখ্যাত ছাত্রের কাছে আবার গ্রীক শিখলেন প্রথিতযশা উদারহৃদয় ছাত্রবৎসল ভিট্টোরিণো ডা ফেল্টার যিনি সর্বকালের সকল শিক্ষকের নমস্য।

ভেনিস ও প্যাডুয়ায় শিক্ষকতার কাজ করার পর ভিট্টোরিণো মাঞ্চুয়ার অধিপতি অন্‌জানা কর্তৃক ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমন্ত্রিত হলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের ভার নিতে। এ শিক্ষার কাজে ভিট্টোরিণো এলেন প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভিট্টোরিণোর কাজ ছিল প্রধানত মাঞ্চুয়াধিপতির ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া কিন্তু তাঁর অনুমতি নিয়ে তিনি অন্যান্য পরিবারের কিছু ছেলেমেয়ে এই ছেলেমেয়েদের সংগে মিশিয়ে দিলেন। সে সব ছেলেমেয়ে এল শুধু মাঞ্চুয়া থেকেই নয় ইতালীর উত্তরাঞ্চল ও মধ্যবর্তী সহরগুলো থেকেও। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্কুলে প্রায় ষাটটি ছেলেমেয়ে হ'ল সবশুদ্ধ। গুণ থাকলে দারিদ্র্যের জন্য কেউ আসতে পারবে না তিনি এমনটি হ'তে দিলেন না; তিনি তাঁর বা তাঁর বন্ধুদের জানিত দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের শুধু ভর্তিই করতেন না, তাদের খাইখরচ ও কাপড়-চোপড় নিজের খরচে সবই তিনি দিতেন দশ-বার বছর ধরে। এ বিষয়ে তিনি প্রাচীন ভারতের গুরুদের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। মাঞ্চুয়া অধিপতির কাছ থেকে শুধু একটি সর্ত তিনি করিয়ে নিলেন "আমি আপনার ছেলেদের শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি ততদিনই, যতদিন আপনি আমার কাছে এমন কিছু প্রত্যাশা করবেন না যাহাতে আপনার বা আমার মস্তক হেঁট হয়। যতদিন আপনি শ্রদ্ধাভাজন থাকবেন ততদিন আমিও আপনার চাকুরী করিব।" রেণেসঁস ইতালীর একজন স্বৈরাচারীর সংগে ব্যবহারে এরূপ শিক্ষকোচিত মর্যাদা ও গাম্ভীর্য পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই বিরল। মাঞ্চুয়াধিপতিও

ভিট্টোরিণোর কদর বুঝতেন, তাই দেখি মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৪৪৬ খ্রীঃ অঃ) ভিট্টোরিণো গঞ্জাগা পরিবারের শিক্ষক ও উপদেষ্টা হিসেবেই কাজ ক'রে গেছেন।

মধ্যযুগীয় স্কুল থেকে ভিট্টোরিণো পরিচালিত স্কুলের আকাশ পাতাল তফাৎ হ'ল। জেলখানার অরুন্তুদ পরিবেশ ছেড়ে এ বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হ'ল সুরম্য অট্টালিকায় বৃহৎ উদ্যানের ভেতর, নাম হ'ল তা'র 'Giocosa—the Joyous House' বা 'আনন্দ ধাম'। চারদিকে বড় বড় গাছ, ছায়াশীতল দীর্ঘ পথ, সবুজ সুন্দর ঘাসে ভরা মস্ত মাঠ, মাঠের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে কুলু কুলু স্বনে স্রোতস্বিনী। ভিট্টোরিণো অট্টালিকা থেকে ধনীর আসবাবপত্র সরিয়ে দিলেন, কারণ ধনীর ছেলেরাও সাদাসিদেভাবে থাকুক এবং অট্টালিকার ঔদার্য ও ইতালীর গ্রামাঞ্চলের প্রকৃতির সৌন্দর্য কিশোর মনের ওপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করুক এই ছিল তাঁর মনোগত ইচ্ছা। প্লেটোর মত তিনি চেয়েছিলেন যাতে ছেলেরা বিহগ কূজিত নির্ঝর-নদীমুখরিত প্রকৃতির নগ্ন বুকে বাস করে চক্ষু ও কর্ণকে এক মধুর হিল্লোলে ভরে রাখতে পারে এবং প্রকৃতির এই অপূর্ব সৌন্দর্য শিশুর আত্মাকে যুক্তি ও জ্ঞানের সৌন্দর্যের সংগে মিলিত করতে পারে। প্রকৃতির সৌন্দর্য যে মানুষের আত্মাকে নৈতিকভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে এ বিশ্বাস ভারতীয় ঋষিদের ও গ্রীক প্লেটোরও ছিল এবং পরবর্তীকালে কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টিতেও এ সত্য ধরা পড়েছিল।

দিনের বেশীর ভাগ সময়ই ছাত্রদল প্রকৃতির নগ্ন বুকে কাটাতো এবং খেলাধূলো, দৌড়ান, লাফানো, মাছধরা, অসিক্রীড়া, মল্লযুদ্ধ ও অন্যান্য নানারকম ব্যায়াম-ব্যবস্থা শরীরকে বলিষ্ঠ, সহনশীল ও সুন্দর করে তুলতো, চরিত্রের সংযমও বর্ধন করতো। এ বিষয়ে এথেন্সের নাগরিক বা মধ্যযুগীয় নাইটের শারীরিক শিক্ষার সংগে ভিট্টোরিণোর ব্যবস্থার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

ভিট্টোরিণোর চরিত্রের সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ; তাঁর শান্ত উদার প্রকৃতি, স্মিতহাস্যোজ্জ্বল মুখ, মিষ্ট অমায়িক ব্যবহার শিশু-বালক-বৃদ্ধ সবাইর হৃদয় হরণ করতো। তাই দেখি যে-সব প্রতিভাবান্ পণ্ডিতদের তাঁর সহকারী হিসেবে তিনি আনন্দধামে শিক্ষার কাজে নিয়েছিলেন, অন্যস্থানে তাঁদের বনিবনাও না হ'লেও ভিট্টোরিণোর সংগে তাঁরা সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পরম যত্নসহকারে শিক্ষকতার কাজ করেছেন। ভিট্টোরিণো নিজে সাত-আট ঘণ্টা পড়াতেন, কিছুটা শ্রেণীতে, কিছুটা ব্যক্তিগতভাবে এক একটি ছাত্র ধরে; শেষোক্ত এই 'টিউটোরিয়াল'-এর জন্যই ছড়িয়ে পড়েছিল 'আনন্দধামের' এত খ্যাতি। ডক্টর উড্ওয়ার্ড তাঁর 'Vittorino de Feltra' নামক পুস্তকে ভিট্টোরিণোর শিক্ষা দেবার একান্ত আগ্রহ সম্বন্ধে তাঁর একজন প্রাক্তন ছাত্রের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—"আমার বেশ মনে পড়ে বৃদ্ধ ভিট্টোরিণো শীতের প্রত্যূষে এক হাতে মোমবাতি অন্য হাতে বই নিয়া আসিয়া ঘুম হইতে বিশেষ প্রিয় ও মেধাবী ছাত্রকে আস্তে আস্তে উঠাইতেন; তাহাকে বস্ত্র পরিধান করিবার জন্য কিছু সময় দিয়া ধৈর্য সহকারে ছাত্র প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত নিজে অপেক্ষা করিতেন; তারপর তার হস্তে পুঁথি দিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিবার জন্য ভাবগম্ভীর আকুতির সহিত উৎসাহিত করিতেন।"* ভিট্টোরিণোর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল যে তিনি ছেলেদের মধ্যে অন্তরংগ হিসেবে বাস করতেন, ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রত্যেককে জানতেন এবং তাদের ক্ষমতা ও দৌর্বল্য সম্বন্ধেও একটা স্পষ্ট ধারণা তাঁর ছিল; এবং স্কুলের কাজ যাতে তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা মেটাতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

ছেলেদের পাঠ্য বিষয়ের প্রধান বা মুখ্য অংশই ছিল গ্রীক ও রোমক ভাষা ও সাহিত্য (কারণ সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের ভাণ্ডার শুধু এই দুই প্রাচীন ভাষার মাধ্যমেই

*Woodward: *Vittorino de Feltre*; p. 62.

সেদিন উন্মুক্ত হ'তে পারতো) এবং এ সব পড়াতেন সীমাহীন উৎসাহের সংগে এমন পণ্ডিতেরা যাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে এ প্রাচীন সাহিত্যের মাধ্যমে ইতালীর লুপ্ত গৌরব আবার ফিরে আসবে। দান্তে (১২৬৭-১৩২১) অবশ্য এ সময়ের একশ' বৎসর পূর্বেই তাঁর মহাকাব্য 'ডিভাইন কমেডি' লিখেছিলেন কিন্তু এ মহাকাব্য টাস্কানি প্রদেশের প্রচলিত ভাষায় লেখা ব'লে ইতালীর অন্য প্রদেশের লোকদের বুঝতে অসুবিধে হ'ত, কারণ তখনও দান্তের ভাষা ইতালীর সাহিত্যিক ভাষা ব'লে গ্রাহ্য হয়নি, তাই ভিট্টোরিণো দান্তেকে বাদ দিয়ে ল্যাটিন গ্রন্থকারদের ভেতরে কবি ভার্জিল, হোরেস, বাগ্মী কিকিরো ঐতিহাসিক লিভি (Livy) ইত্যাদিকে স্থান দিয়েছেন। আর এর সংগে যোগ করেছিলেন গ্রীক সাহিত্যের। ভিট্টোরিণো এ প্রাচীন সাহিত্য পড়াতেন মধ্যযুগীয় শিক্ষকের মত কূট তর্কের আধার হিসেবে নয় বা সুন্দর রচনাভংগীর জন্যও নয় যেমন করতেন পরবর্তী (ষোড়শ) শতাব্দীর কিকিরো-উন্মাদ শিক্ষকেরা; কিন্তু ভিট্টোরিণো এ প্রাচীন সাহিত্য পড়াতেন যাতে কিশোরেরা সুললিত ভাষার মাধ্যমে উন্নত ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে পরবর্তী কালে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করতে পারে, এক সুন্দরতর পৃথিবীর নাগরিক হ'তে পারে। একদিকে যেমন ভাবের অভিব্যক্তি ও প্রকাশভংগীর ওপর জোর দেওয়া হ'ত অপরদিকে আবার নৈতিক উদ্দীপনা, চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসাও ঠিক তেমনি ভাবে উৎসাহিত করা হ'ত। প্রাচীন সাহিত্য ছাড়াও আরো কতগুলো বিষয় পড়ান হ'ত—পাটীগণিত ও জ্যামিতি (ভিট্টোরিণো প্যাডুয়ায় এ দু'বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন), ড্রয়িং, জরিপকার্য ও মাপসংক্রান্ত গণনা, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীত, তর্কশাস্ত্র। সংগীতের স্থান গ্রীক শিক্ষাব্যবস্থায় যেরূপ ছিল ভিট্টোরিণোর কাছে তেমনই অব্যাহত রইল। তর্কশাস্ত্র পড়ান হ'ত কূট ও সূক্ষ্ম বিচারের বিলাসের জন্য নয়—যাতে সুচিন্তিত তথ্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় বা

সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় সেজন্য। এ বিষয়ে ভিট্টোরিণো কুইন্টিলিয়ানের চাইতেও অগ্রগামী ছিলেন।

'আনন্দধামে' কিশোরেরা বাইশ বছর পর্যন্ত শিক্ষালাভ করতে পারতো কারণ তখনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই 'নোতুন বিদ্যার' স্থান ভাল ক'রে হয়নি। ভিট্টোরিণোর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর বিদ্যায়তন নোতুন শিক্ষার শ্রেষ্ঠ নীড় ব'লে সমস্ত ইতালীতে গ্রাহ্য হয়েছিল।

মাঞ্চুয়া সহরে ভিট্টোরিণো দেবতাজ্ঞানে পূজিত হ'তেন। দরিদ্র, উৎপীড়িত ও চার্চের বন্ধু হিসেবে তিনি আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই সমান শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর অকৃপণ দান চলেছিল জীবন ভরে অবিশ্রান্তভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং তাঁর দৃষ্টি ছিল নির্নিমেষ যাতে মাঞ্চুরিয়াধিপতির রাজ্যে সুশাসন অপ্রতিহত থাকতে পারে। তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঞ্চুয়ায় এসেছিলেন—শাসকের চরিত্রগঠনে দেশবাসীর কল্যাণ—তা' কোনদিনই ভোলেননি। এ আদর্শ শিক্ষকের কাছে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করবে না এমন লোক বোধ হয় জগতে কেউ নেই।

ভিট্টোরিণো মহত্ব বা বৃহত্ব তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় যতটা না ছিল, ততটা ছিল তাঁর দৃষ্টিভংগীতে, তাঁর কার্যপ্রণালীতে। ছাত্রদের সংগে তাঁর শান্ত মধুর সম্বন্ধ, তাঁর নৈতিক উদ্দীপনা, ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও প্রতিভার সংগে শিক্ষার অচ্ছেদ্য যোগাযোগ, মানসিক শিক্ষার সংগে শারীরিক শিক্ষার অনুশীলন, শিক্ষায় সংগীত প্রভৃতির প্রভাব, ধনী দরিদ্রনির্বিশেষে শিক্ষা এ সকল বিষয়ে ভিট্টোরিণো আজকের শিক্ষা রীতিনীতির অগ্রদূত।[১]

ভিট্টোরিণো উপযুক্ত শিষ্যও অনেক তৈরী করেছিলেন। 'আনন্দধামের' একজন প্রাক্তন ছাত্র ফেডারিগো ডি মন্টফেল্টার (Federigo di Montfeltre) পরবর্তীকালে উর্বিনোর ডিউক (Duke of Urbino) হলেন। তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু সাহিত্য ও সৌন্দর্যই ছিল তাঁর প্রাণ। তিনি উর্বিনোর

১ Symond: The Renaissance in Italy, ii 209-216.

পর্বতমালার ভেতরে উদ্যানশোভিত নির্ঝর-নদীবিধৌত এমন একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করলেন যা সমগ্র ইতালীর ভেতরে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। সেখানে ধনীর আসবাবপত্র ত ছিলই—সোনারূপার ফুলদান, আতরদান, দামী রেশমী সোনার কাজ করা ভারী পর্দা, বড় বড় গদীআঁটা কৌচ ইত্যাদি ত ছিলই কিন্তু সত্যিকারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল প্রাসাদের অসংখ্য সুন্দর পাথর ও ব্রঞ্জের মূর্তি, তৈলচিত্র, হরেকরকমের বাদ্যযন্ত্র এবং পৃথিবীর যা কিছু দুর্লভ বস্তু তাই। কিন্তু মণ্টফেল্টার তাঁর সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য মনে করবেন তাঁর দুর্লভ গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু পুস্তকাদি যা' তিনি সোনা রূপো চামড়ায় বাঁধিয়ে রাখতেন। মণ্টফেল্টার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ডিউক হলেন, নব ডাচেস্ ছিলেন ভিট্টোরিণোর এক ছাত্রীর আত্মীয়া এবং নিজেও গ্রীক-ল্যাটিন সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা নিজের জীবনে অনুভব করেছিলেন। তাঁদের প্রাসাদে ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে মধ্যে বসতো সান্ধ্য আসর, ইতালীর বিখ্যাত পণ্ডিত ও প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা পরিবারের বন্ধু হিসেবে আমন্ত্রিত হ'য়ে এসে করতেন ভদ্রের বা প্রকৃত সভাসদ বা অভিজাতের শিক্ষার আলোচনা। বল্ডেসার ক্যাষ্টিগলিওনি (Baldesar Castiglione) এই আলোচনায় যোগদান করেছিলেন এবং প্লেটোর 'ডায়ালগ্' বা কথোপকথন প্রণালী অনুসরণ ক'রে 'ওমরাও' বা 'সভাসদ' 'Il Cortegiano (The Courtier)' নামক পুস্তকখানা লেখেন।[১] পরবর্তী (সপ্তদশ) শতাব্দীতে মিল্টন, লক্ প্রমুখ মনীষীরা 'ভদ্রের শিক্ষা' The Education of a Gentleman) সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন; ক্যাষ্টিগলিওনির ভাবধারার সংগে তাঁদের ভাবধারার অনেক সাদৃশ্য রয়েছে—ইংল্যাণ্ডের বিদ্বৎসমাজের ওপর 'The Courtier' পুস্তকখানার প্রভাব যথেষ্ট হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

---

১ পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং বহু ভাষায় অনূদিত হয়। ইংরেজী অনুবাদে এই পুস্তকের নামকরণ হয় *The Courtier.*

ক্যাষ্টিগলিওনি আদর্শ ওমরাও বা সভাসদের চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। আদর্শ ওমরাও প্রভুভক্ত যোদ্ধা ও সেনানায়ক ত হবেনই ; অশ্বচালনা, অশ্বপৃষ্ঠে বা অন্যান্য সাহসিক খেলাধূলোয় কুশলীও তাঁকে হ'তে হবে কিন্তু শুধু যোদ্ধা ও সাহসী হ'লে চলবে না। তাঁকে সুলেখক ও সুবক্তা হ'তে হবে অর্থাৎ ভাষা তাঁর এমন আয়ত্ত থাকবে যে শব্দগুলো পর পর ইচ্ছামত সাজিয়ে গেলে তাঁর মনোগত ভাব পূর্ণভাবে ত ব্যক্ত হবেই তা'ছাড়া ভাষার ঐশ্বর্য ও মর্যাদা প্রকট হবে উপযুক্ত আলোতে দেখানো সুরম্য চিত্রাবলীর মত। তাঁকে শুধু ল্যাটিনই নয়, গ্রীকও জানতে হবে নানা বিষয় আয়ত্ত করবার জন্য। নিজের মাতৃভাষায় এবং গ্রীক ও ল্যাটিনে গদ্য ও পদ্য এ দু'রকম রচনাতেই পারদর্শিতা লাভ করতে হবে তাঁকে।

তাঁকে সংগীত বিদ্যা বুঝতে হবে এবং স্বরলিপি পড়তে জানতে হবে। তাঁকে ছবি আঁকতে শিখতে হবে কারণ চিত্রবিদ্যার মত জিনিষ আর কোথাও মিলা ভার। ভগবানের রচিত পৃথিবীই একখানি অতি সুন্দর ছবির মত, তাকে যিনি অনুকরণ করতে পারেন তিনি সকলের নমস্য। চিত্রকর হ'তে গেলে বহু জিনিষ আয়ত্তও করতে হয়।

ওমরাও বা সভাসদ্ এসকল গুণের অধিকারী হবেন শুধু নিজের গৌরবের জন্য নয়, যাতে তিনি রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁর প্রভু বা প্রিন্সকে উপযুক্ত উপদেশ দিতে পারেন তাঁর প্রিয় সহচর হ'য়ে সেজন্য। প্রিন্স যদি শাসনকার্য ভাল না চালাতে পারেন তা'হলে মানুষের দুর্দশার সীমা থাকে না অথচ বহু প্রিন্স রাজ্যভার গ্রহণ করেন শাসনকার্য সম্বন্ধে কোন ধারণা না নিয়ে। কিন্তু উত্তম প্রিন্স বলে গণ্য হ'তে পারেন তিনিই যিনি তাঁর সুশিক্ষিত ওমরাওদের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে রাজ্যের ও প্রজার সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি বর্ধন করেন।

মহাভদ্রের বা প্রকৃত ওমরাওর চরিত্রের সকল দিকেই উর্বিনো প্রাসাদের এই বিদ্বৎসম্মিলনীতে সমস্ত রাত ধ'রে আলোচিত

হ'ল ; আলোচনা যখন শেষ হ'ল তখন রাতের তারা সব মিলিয়ে গেছে, শুধু ভোরের শুকতারা রক্তিমাভ আকাশের গায় পর্বত-শ্রেণীর ওপরে ঝিকমিক্ করছিল।

কিন্তু ইতালীর গৌরবের দিন ষোড়শ শতাব্দীতে আবার অন্তর্হিত হ'ল, উর্বিনো ও ফ্লোরেন্সের অধিপতিদের (ডিউকদের) প্রথম দিকের সাদাসিদে গণতান্ত্রিক ভাব দূর হ'য়ে বিলাসিতার জাঁকজমকে পর্যবসিত হ'ল, জীবনযাত্রা হ'ল অতি মাত্রায় বিদগ্ধ, সাহিত্য ও চারুকলা থেকে জীবন হ'ল বিচ্ছিন্ন ; আবার অন্য দিকে পোপ ও স্পেনের রাজাদের গোঁড়ামিতে ইতালীয় ভাবধারা গেল শুকিয়ে। গ্রীক-রোমক সাহিত্য অধ্যয়ন শুধু কিকিরোর ভাষাবিশ্লেষণে এসে দাঁড়াল, প্রকৃত শিক্ষা ব'লে আর কিছু থাকলো না, কাজেই ভিট্টোরিণোর 'আনন্দধাম' শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে বহু শতাব্দী ধ'রে ইতালীর চরম আদর্শ হ'য়ে রইল।

কিন্তু কালো মেঘের ধারে সোনালী রেখা যে না ছিল তা' নয়, ইতালীর গৌরবের দিন অন্তর্হিত হবার পূর্বেই ইতালী আলোকবর্তিকা উত্তর ইউরোপের হাতে তুলে দিয়েছিল। জার্মানীর রেউক্লিন (Reuchlin), হল্যাণ্ডের ইরাস্মাস (Erasmus) ফ্রান্সের বুদায়ু (Budaeus), ইংল্যাণ্ডের লিনাকার (Linacre) ইতালীতে এসে নোতুন বিদ্যার অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত হয়েছিলেন। রেউক্লিনকে থুসিডিডিস (Thucydides) পড়তে শুনে একজন গ্রীক পণ্ডিত বলেছিলেন, "গ্রীস আজ অ্যাল্পস পর্বত অতিক্রম ক'রে গেল।"

নোতুন বিদ্যায় অনুপ্রাণিত ইউরোপের বিদ্বৎমণ্ডলীর মধ্যে হল্যাণ্ডের ইরাসমাসই (১৪৬৬-১৫৩৬ খ্রীঃ) সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী। তাঁর জন্ম হয় রটারড্যামে এবং শিক্ষা হয় ডেভেন্টার ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি যে কী ধরনের একজন স্কলার ছিলেন তা' তাঁর এই উক্তিটি থেকেই বোঝা যাবে— "আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়া গ্রীক বিদ্যা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা

করিতেছি; কিছু টাকা আমার হস্তে আসিলেই আগে গ্রীক কেতাব কিনিব, তারপরে কিছু কাপড়-চোপড়।" নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে নোতুন বিদ্যা আয়ত্ত করবার এমন আগ্রহ ক'জন স্কলারের আছে? প্যারিসে তিনি নোতুন বিদ্যাশিক্ষার্থীদের পড়িয়ে নিজের খরচ চালাতেন, তাঁর এক ছাত্র হ'লেন লর্ড মাউণ্টজয় (Mountjoy); তাঁরই নিমন্ত্রণে ইরাসমাস ইংল্যাণ্ডে এসে জন কোলেট (John Colet) ও স্যার টমাস মোর (Sir Thomas More) প্রমুখ 'নব বিদ্যোৎসাহীদের' সংগে মিলিত হন। তিন বছর ইটালীতে কাটাবার পর আবার তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে কোলেটকে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত মাধ্যমিক পাব্লিক স্কুস 'সেণ্টপলস্ স্কুল' প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে লেক্চার দেন। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইউরোপে ফিরে যান এবং তাঁর পুস্তকাদি বাসেলে (Basel) ছাপাখানায় ছাপা হচ্ছিল ব'লে সেখানেই তাঁর শেষ জীবনের বেশীর ভাগ অতিবাহিত হয় (১৫৩৬ খ্রীঃ)।

খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা সব জিনিষকেই একটা রহস্যের আবরণে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করতেন যাতে সাধারণ লোক জ্ঞানের আলো না পায়—কাজেই নোতুন আলোর সন্ধানী ইরাসমাসের কাছে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ঘৃণ্য; এ বিষয়ে ও তাঁর বিদ্যা ও খ্যাতির ব্যাপকতায় তাঁকে তাঁর সময়ের ভল্‌টেয়ার (Voltaire) বলা যেতে পারে, কিন্তু প্রাণের অনুভূতিতে তাঁকে ভল্‌টেয়ারের পরবর্তী রেণানের (Renan) সংগে তুলনা করা যেতে পারে। যদিও ইরাসমাস নিজে বাঁধাধরা শিক্ষকতার কাজ করতেন না, তাহলেও শিক্ষাকে, বিশেষ ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন নানারকমে। একদিকে ছিল তাঁর গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সীমাহীন উৎসাহ এবং কোলেটদের মত শিক্ষাবিদ্‌দের মুক্তহস্তে সাহায্য দান এবং অপরদিকে ছিল তাঁর কতকগুলো দরকারী

পুস্তক প্রণয়ন। তাঁর শিক্ষাসম্বন্ধে পুস্তকগুলোর মধ্যে '*Of the First Liberal Education of Children* এবং *The Right Method of Instruction*' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক বিষয়েই কুইন্টিলিয়ানের মতবাদ গ্রহণ করেছেন, প্লুটার্কের সংগেও তাঁর শিক্ষাপ্রণালীর মিল আছে। তাঁর পুস্তকে তিনি শিশুর চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব বিশেষ ক'রে অনুধাবন করেছেন এবং কি ক'রে শিশুর প্রথম জীবন ভাল'র দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সে সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। শিক্ষাপ্রণালী আনন্দদায়ক হবে এবং বর্বরোচিত শারীরিক শাস্তি একেবারে বর্জিত হবে—এই হবে প্রধান নীতি। শিশুরা শিষ্টাচার প্রথম থেকেই শিখবে, কারণ শিষ্টাচার শুধু বাইরের জিনিষ নয়, পরিচ্ছন্ন মনের অভিব্যক্তি। তিনিও কুইন্টি-লিয়ানের মতই ছেলেদের প্রাথমিক স্কুলে ঢুকে প্রথম থেকে লেখাপড়ার কাজ শুরু করতে ঘৃণা বোধ করেননি। মেয়েদেরও তিনি সমান শিক্ষার অধিকার দিয়েছেন। তার দু'একটি শিক্ষানীতি এখানে উদ্ধৃত করলে অন্যায় হবে না: "আমরা যাহাদের ভালবাসি তাহাদের কাছেই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শিখি", "মাতাপিতা সন্তান মানুষ করিতে পারিবেন না যদি তাঁহারা শিশুর কাছে শুধু ভয়েরই পাত্র হন", "অনেক ছেলেমেয়ে আছে যাহারা কিল ঘুষি চাপড়ের চোটে ভাল হওয়ার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করে; মিষ্ট ও সদয় শাসনে তাহাদের না করানো যায় এমন কিছুই নাই"; "শিশুরা অনুকরণ ও অভ্যাসের মাধ্যমে মাতৃভাষায় কথা বলিতে শিখিবে"; "লিখা এবং পড়া শিখাইবার কার্য একটু বিরক্তিজনক; শিক্ষকের উচিত মনোহারী প্রণালীর দ্বারা শিক্ষার কষ্ট লাঘব করা।" গ্রামার শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলছেন, "শিশুর দেহকে প্রথম অবস্থায় যেমন কিছু সময় বাদে বাদে অল্প অল্প খাদ্য দিয়া পুষ্ট করা হয়, শিশুর মনকেও তেমনি ইহার দৌর্বল্যের দিকে নজর রাখিয়া অল্প অল্প করিয়া জ্ঞান দিয়া তাজা রাখিতে হইবে।" তাঁর '*Colloquies*' নামক ল্যাটিন কথোপকথনের

পুস্তকখানি এর উদার মতের জন্য ধর্মসংস্কারের (The Reformation) দিনে জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় প্রতি স্কুলে।

ইরাসমাসের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ছিল এই যে তিনি গ্রীক ও ল্যাটিনকেই একেবারে মুখ্য ক'রে তুলেছিলেন; ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান পড়ার প্রয়োজনীয়তা তাঁর কাছে ছিল শুধু এই যে, পরবর্তীকালে লেখক প্রকৃতি হ'তে তাঁর উপমা, তুলনা ও অন্যান্য অলংকার আহরণ করতে সমর্থ হবেন—অর্থাৎ শুধু সাহিত্যিক প্রয়োজনে বিজ্ঞানচর্চা। পরবর্তী (সপ্তদশ) শতাব্দীতে আমরা দেখব বেকনের (Francis Bacon) সময় দৃষ্টিভংগী একেবারে বদলে গেছে।

ফ্রান্স ইতালীর রেণেসঁসের সংস্পর্শে এসেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ইতালীর বিজয় অভিযানের সময় হ'তে। প্রথম ফ্রান্সিস্ (Francis I) ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন; তিনি ছিলেন নোতুন বিদ্যার একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। যেসব নোতুন বিদ্যার কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছিল সেগুলোর মধ্যে বোর্ডের কলেজ অফ গিয়েন (College de Guyenne, Bordeaux) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এখানে শিক্ষালাভ করেছিলেন ফরাসী শিক্ষাবিদ ও প্রবন্ধলেখক মণ্টেন (Montaigne); যাজকীয় প্রভাব মুক্ত হওয়ায় এখানে একটা উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যেত প্রথম দিকে কিন্তু পাঠ্যতালিকায় প্রচলিত ব্যবস্থা হ'তে বিশেষ কোন অগ্রগতি লক্ষিত হয়নি। গ্রীক শিক্ষার দিকে বিশেষ কোন নজর দেওয়া হ'ত না, বয়স্ক ছেলেদের স্কুলে ও খেলার মাঠে ল্যাটিনে কথা ব'লতে হ'ত, এবং উঁচু শ্রেণীগুলোতে অতি নামমাত্র পাটীগণিত ও জ্যামিতি শেখানো হ'ত।

জার্মান শিক্ষায় মেলাংকথনের (Melanchthon 1497-1560) নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—তাঁকে "জার্মাণীর শিক্ষাগুরু" নামে অভিনন্দিত করা হয়। প্রথম দিকের ইতালীয় হিউমানিষ্ট ও

আল্পসের উত্তরে প্রায় সকল হিউমানিষ্টদের মতই মেলাংকথন শিক্ষার নৈতিক দিকটার ওপর বেশী জোর দিলেন। তাঁর ইতালীয় সমসাময়িকদের কাছে গ্রীক ও রোমক বিদ্যাই ছিল চরম উদ্দেশ্য, চরিত্রের ওপর এর প্রভাব খুব কমই ছিল; কিন্তু উত্তর দেশের বিদ্বৎমণ্ডলী গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যকে শুধু সত্য ও জ্ঞানের উৎস হিসেবেই দেখতেন না, শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবেও এদের এঁরা দেখতেন। ইতালী-বাসীদের মত পুরানো দিনের রোমের জীবন ও ভাবধারা (যা অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে উঠেছিল) পুনরুজ্জীবিত করবার আলোচনা কোনদিনই তাঁদের হয়নি, কারণ রোমকে সাম্রাজ্যের মোহ তাঁদের ছিল না। তাঁরা চেয়েছিলেন নোতুন বিদ্যার মাধ্যমে মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সংসাধিত করতে। ইতালীয়দের সংগে তাঁদের আরেকটি বড় তফাৎ ছিল; রেণেসঁসের ইতালীয়রা ছিলেন স্বার্থবাদী, ব্যক্তিবাদী; কিন্তু তাঁরা ছিলেন সমাজবাদী। তাই মেলাংকথন ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'নারেমবার্গ হাইস্কুল' উদ্ঘাটন উপলক্ষে বলেছিলেন, "আমাদের লক্ষ্য ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, জাতীয় স্বার্থই হইতেছে আমার লক্ষ্য।·· সুতরাং অল্পবয়স্কদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হইবে পিতা ও সমাজকে।"

তিনটি কারণে মেলাংকথনের নাম জার্মাণ শিক্ষায় চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। প্রথমতঃ তিনি কি নীতিতে জার্মাণ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গঠিত হবে তা স্থির করলেন; দ্বিতীয়তঃ তিনি ল্যাটিন এবং গ্রীক ব্যাকরণ, সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র, মনস্তত্ব, নীতিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন; তৃতীয়তঃ তাঁর হাজার হাজার ছাত্রের ভেতর থেকে তৈরী হ'ল বহু শিক্ষক যাঁরা উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হলেন।

মেলাংকথনের নামের সংগে সংগেই ধর্ম সংস্কারক **মার্টিন লুথারের** (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রীঃ অঃ) নাম এসে পড়ে, তাঁকে জনশিক্ষার প্রবর্তক বলে অভিনন্দিত করা হয়। তিনি তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে

দেখেছিলেন জনশিক্ষার মত বৃহৎ ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কত বেশী ; তাই তিনি বলেছিলেন বহু সংখ্যক স্কুল খুলে ছোটদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রেরই কর্তব্য ; তিনি এও বুঝেছিলেন যে শিক্ষিত জনতা ছাড়া রাষ্ট্র বা সমাজের সর্বাংগীণ উন্নতি হ'তে পারে না। তিনি প্রথম বাধ্যতামূলক জনশিক্ষা ও শিক্ষণ-শিক্ষার কথাও বলেছেন। ধর্মশিক্ষাই ছিল প্রধান পাঠ্য বিষয়, তারপর ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু। তিনি স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষার ওপরেও জোর দেন, কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমেই প্রত্যেক বাইবেল পড়ে নিজে বিচার করবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা ; ইতিহাস, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সংগীতও তিনি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শিক্ষায় স্বাধীনতা ও আনন্দের যাতে ছোঁয়াচ লাগে সেজন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। জনশিক্ষার রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা বলে তিনি তাঁর অগ্রগামী মনের পরিচয় দিয়েছেন এবং যদিও তাঁর সময়ে অল্পসংখ্যক স্কুলেরই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তিনি যে জনশিক্ষার গোড়া-পত্তন করেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইংল্যাণ্ডে এ নব জন্ম বিকাশের কিছু দেরী হ'ল কিন্তু এর মহিমা এলিজাবেথের যুগের স্পেনসার, শেক্সপীয়র ও অন্যান্য লেখকদের কীর্তিতে অন্য সব দেশকে ছাপিয়ে উঠল। গ্রকিন (Grocyn) ও লিনাকার (Linacre) অক্সফোর্ডে গ্রীক ভাষা প্রবর্তন করেন, ইরাসমাস ও তাঁর ছাত্ররা করেন কেম্ব্রিজে এবং স্যার টমাস মোর রাজা অষ্টম হেনরীর সভায় মানবসম্বন্ধীয় বিষয়গুলোর (Humanities) দাবী সমর্থন করেন। কিন্তু শিক্ষার ইতিহাসের দিক থেকে জন কোলেটের (Colet) জীবনই আমাদের কাছে বোধ হয় বেশী প্রয়োজনীয়। কোলেটের জন্ম হয়েছিল ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি অক্সফোর্ড গ্রকিন ও লিনাকারের গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে লেকচার শোনেন, নিজেও পরে কিছুকাল অক্সফোর্ডে গ্রীক সম্বন্ধে লেকচার দেন এবং ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে সেন্টপল চার্চের ডিন (Dean) নিযুক্ত হন। তাঁর স্বাধীন চিন্তার

জন্য চার্চের সংগে তাঁর যে কিছু সংঘর্ষ না হয়েছিল তা নয়, তবে তাঁর উদ্যম ও উৎসাহ শীঘ্রই কিশোরদের শিক্ষার খাতে প্রবাহিত হ'ল। তিনি তাঁর নিজের অর্থব্যয় ক'রে গির্জার বিস্তৃত প্রাংগণে তিন জন শিক্ষক ও ১৫৩টি ছাত্র নিয়ে (বাইবেলে বর্ণিত ১৫৩টি মাছ এক সংগে ধরা পড়বার অলৌকিক কাহিনী অনুসরণে এ সংখ্যা স্থির হয়)* সেন্টপলস্ স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন ইরাসমাসের সাহায্যে; স্কুল পরিচালনার ভারও দেওয়া হয় অযাজকীয় হস্তে। সেন্টপলস্ স্কুলই প্রথম মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাও সংগে সংগে বিশুদ্ধ ল্যাটিন শিক্ষারও ব্যবস্থা করে এবং চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের ডোনাটাসের (Donatus) ল্যাটিন ব্যাকরণ বা দ্বিতীয়-তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের আলেকজাণ্ডারের অ্যারিষ্টটলের ভাষ্য বাদ দিয়ে কারণ শেষোক্ত এ দুটি বিষয়ই বহু সময় সাপেক্ষ ছিল অথচ বিশেষ কোন ফলও হ'ত না তাতে।

সেন্টপলস্ স্কুলের প্রভাবে উইঞ্চেষ্টার ও ইটন প্রভৃতি পুরাতন পাব্লিক স্কুলগুলোও গ্রীক শিক্ষা দিতে আরম্ভ করল এবং পরে ১৫৫১ থেকে ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল পাব্লিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'ল যথা—শ্রুস্‌বেরি (Shrewsbury), রাগবি, হ্যারো (Harrow), ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার তারাও এ পথের অনুবর্তী হ'ল। কিন্তু মাতৃভাষা অবহেলিত হ'তে লাগলো; তখনও অবশ্য শেক্সপীয়রের অমর লেখনীপ্রসূত নাটকাবলীর সৃষ্টি হয়নি। আবার গ্রীক ও ল্যাটিন শিক্ষাও শীঘ্রই ব্যাকরণের নীরস নিয়মাবলী, সামান্য কিছু ল্যাটিন কথোপকথন ও আয়াসপ্রসূত ল্যাটিন পদ্যে গিয়ে পর্যবসিত হ'ল। এদিকে ইউরোপ আস্তে আস্তে এ শতাব্দীতে (ষোড়শ শতাব্দীতে) জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হচ্ছিল; যার যার জাতীয় ভাষা ল্যাটিনের দাসত্ব শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হ'তে চাচ্ছিল। তাই রোজার অ্যাশ্চাম (Roger Ascham),

Times Educational Supplement—Aug. 12, 1920.

স্কুলশিক্ষক ও শিক্ষাসংস্কারক—যিনি রাণী এলিজাবেথকে পড়িয়েছিলেন—ইংরেজী ভাষা ও জাতীয় গৌরবের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। অ্যাশচাম তাঁর সুন্দর 'The Schoolmaster' নামক পুস্তকখানাতে সুষ্ঠুতর প্রণালীতে শিক্ষা দেবার আবেদন জানিয়েছেন এবং ভাষা শিক্ষায় যাতে দ্বিতীয়বার অনুবাদ (Double Translation) প্রথার ব্যবহার হয় সে কথা প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য অর্থাৎ প্রাচীন যুগের সাহিত্য, জীবন ও ভাবধারা মধ্যযুগীয় তর্কশাস্ত্রের স্কুলগুলোতে যেমন অবহেলিত হ'ত, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে প্রতিবাদ সত্ত্বেও ঠিক তেমনি ভাবেই অবহেলিত হ'তে লাগল এই নোতুন স্কুলগুলোতে।

মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করলেন ভবঘুরে চিকিৎসক র‍্যাবেলে (Rabelais, 1483-1553) হাসির গল্পের আবরণে সম্পূর্ণ নোতুন রকমের একটি শিক্ষাব্যবস্থার নক্‌সার ভেতর দিয়ে। মধ্যযুগীয় স্কুলের দৈহিক কৃচ্ছ্রতা, কর্মবিমুখতা, জ্ঞানের স্বল্পতা, তর্কশাস্ত্রের নীরস কচকচানি, বাহ্যিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি আক্রমণ করে র‍্যাবেলে বালক গারগাঞ্চুয়াকে (Gargantua) করে তুললেন একটি দৈত্য শারীরিক শক্তিতে নানা ব্যায়ামের ভেতর দিয়ে, মানসিক শক্তিতে একটি বিশ্বকোষ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রকৃতিপরিচয়, নানারকম ভাষা (গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ক্যালডিয়ান), ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, গণিত ইত্যাদি নানা শাস্ত্রের অনুশীলনে, ধর্মে ঈশ্বরের আন্তরিক ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাসের ভেতর দিয়ে, চারুকলায় পারদর্শী সংগীত, চিত্র, বাদন ইত্যাদির চর্চায়—অর্থাৎ সকলরকম জ্ঞান ও গুণের প্রতীক হবেন গারগাঞ্চুয়া এই হ'ল র‍্যাবেলের বক্তব্য। সবচেয়ে বড় কথা র‍্যাবেলে গারগাঞ্চুয়াকে সমাজের জীবন ও প্রকৃতির ঐশ্বর্য থেকে বিচ্ছিন্ন না করে স্বাভাবিক আসক্তি ও অনুরাগ অনুসারে বাস্তবের সংগে পরিচয় করিয়ে শিক্ষা দিবেন। কিন্তু সে সময়কার স্কুলশিক্ষকরা গল্পের কৌতুকাবরণ ভেদ করে র‍্যাবেলের মতবাদের ভেতর যেটুকু

নেবার মত ছিল তা গ্রহণ করতে পারেননি। উনবিংশ শতাব্দীতে বেন্থাম ও হার্বার্ট্ স্পেন্সার শিক্ষার্থীকে সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হ'তে হবে (Pansophism) এই মতবাদ প্রচার করেছেন।

প্রায় ত্রিশ বছর পরে আরেকজন ফরাসী লেখক মণ্টেন (Montaigne, 1533-1592) তাঁর প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে শিক্ষাকে আরও কার্যকরী ও জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট করতে চেষ্টা করলেন। সে হিসেবে মণ্টেনের স্থান ইরাসমাস ও র্যাবেলের মাঝখানে—ইরাসমাস শুধু গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য নিয়েই মগ্ন ছিলেন, বিপ্লবী র্যাবেলে চেয়েছিলেন মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তির, সকল রকম জ্ঞানের, চরম পরাকাষ্ঠা, কিন্তু মণ্টেন তার অভিজাত মনোভাব নিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। র্যাবেলের মত তিনি সকল প্রবৃত্তি বা সবরকম জ্ঞান চাইলেন না, প্রবৃত্তিগুলোর ভেতরে তিনি চাইলেন মানুষের বিচারবুদ্ধির উন্নতি, আর জ্ঞানের মধ্যে তিনি বিজ্ঞানের দিকে তত ঝোঁক দিলেন না,—ভাসাভাসা বিজ্ঞানের জ্ঞানেই তিনি সন্তুষ্ট—ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় আয়ত্ত করা ভাল কারণ ইতিহাসের উদাহরণ থেকে মানুষের বিচারবুদ্ধি বাড়ে, তার প্রকৃত জ্ঞান জন্মায়। তাঁর মতে যে-সব বিষয় মানুষকে জ্ঞানী ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ক'রে জীবনের উপযোগী ক'রে তোলে তাদেরই পাঠ্যতালিকায় স্থান পাওয়া উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নয়, মানুষকে জীবনের উপযোগী করে তোলা। গ্রীক ল্যাটিন ভাল জিনিষ সন্দেহ নেই ভদ্রের শিক্ষার জন্য কিন্তু একজন গ্রীক ল্যাটিন ভাল জানুক বা না জানুক তার সাধারণ বুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধি হয়েছে কিনা সেটা অনেক বেশী প্রয়োজন। এ বিষয়ে তাঁর একটি সুন্দর উক্তি উদ্ধৃত করলে অবান্তর হবে না "A well-made head is worth more than a head well-filled." এক রাশ বিদ্যা দিয়ে মাথা বোঝাই না করে অল্প বিষয় হৃদয়ংগম করে বিচারবুদ্ধিরও জ্ঞানার্জন করা ভাল। শুধু শব্দ নিয়ে খেলা নয়, জিনিষের তাৎপর্যই হ'ল আসল; তাৎপর্য

হৃদয়ংগম হ'লে, শব্দ বা বাক্য আপনি আসিবে। শিক্ষায় শব্দের চেয়ে জিনিষের কদর বেশী র‍্যাবেলে একথা বলেছিলেন; তবে মন্টেন আরো পরিষ্কার করে বললেন—"Things precede words." এ নীতি আজ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে মেনে নেওয়া হয়েছে। তাঁর আর একটি নীতিও আমরা আজ মেনে নিয়েছি ছেলেমেয়েদের শাসন করা সম্বন্ধে—'Severe mildness,' তাদের সংগে সদয় ব্যবহার করতে হবে, অথচ দৃঢ় হবে, লাগাম ছেড়ে দিতে হবে, আবার দরকার হলেই টেনে ধরতে হবে। মন্টেনের পিতা এ নীতিতে মন্টেনকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিলেন। এমনকি প্রত্যূষে ঘড়ির অ্যালার্মের ক্রিং ক্রিং কর্কশ আওয়াজে মন কাজের প্রতি বিমুখ হবে বলে মন্টেনের পিতা সুমধুর বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন মন্টেনের ঘুম ভাঙাতে কিন্তু প্রত্যূষে তাঁকে উঠতে হ'তই। মন্টেন আরো বিশ্বাস করতেন পৃথিবী ও মানুষের সংস্পর্শে এসে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে বুদ্ধি খোলে না, তাই তিনি বলেছেন ছেলেরা অল্প বয়সেই বিদেশ ভ্রমণে বেরুবে। শিক্ষায় যারা সংজ্ঞা খুঁজে বেড়ান, তাঁরা মন্টেনকে 'সমাজ বাস্তববাদী' (social realist) বলে অভিহিত করেন। যদিও মন্টেন ভদ্রের শিক্ষার কথা বলেছেন, তা হলেও পরবর্তী কালের রুশোর মত তিনিও সমগ্র মানুষই তৈরী করতে চেয়েছিলেন তা তাঁর এই উক্তিটি থেকেই বোঝা যাবে "It is not a soul, it is not a body we are training; it is a man, and we must not make two parts of him." তাঁর সাহিত্যিক রচনাভংগীর জন্য তাঁর 'Essays' সর্বসমাদৃত।

তিনজন লেখকের তিনখানি পুস্তক

(ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী)

র‍্যাবেলে বা মন্টেনের দু'জনের একজনও শিক্ষক ছিলেন না : এবার আমরা তিনজন শিক্ষকের তিনখানি বই সম্বন্ধে কিছু বলবো কারণ শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনেক কার্যকরী তথ্য ও খুঁটিনাটি নির্দেশ আমরা তাঁদের পুস্তক থেকে পাই। মন্টেনের 'Essays' বের হবার দু'বছর পর রিচার্ড মালকাষ্টারের (Richard Mulcaster, 1530-1611) নামক *Positions* শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মালকাষ্টার কুড়ি বছর লণ্ডনে 'Merchant Taylor's School'-এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর জীবনের প্রথম দিকের একজন ছাত্র ছিলেন কবি স্পেন্সার। তবে মন্টেন বা র‍্যাবেলের মত তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না, তাঁর রচনাভংগী ছিল অত্যন্ত কঠিন, কাজেই তাঁর বইয়ে অনেক তথ্য থাকলেও এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুতে তিনশ' বছর পার হ'য়ে যায়। কাজেই তাঁর যে খ্যাতি প্রাপ্য তা তিনি পাননি। যদিও তিনি পাব্লিক (মাধ্যমিক) স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন সত্য এবং গ্রীক ল্যাটিন নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের প্রয়োজন তিনিই সর্বপ্রথম লোকসমক্ষে উপস্থিত করেন। সেজন্য তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় মংগলাকাঙ্ক্ষী বলা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, স্কুলের যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক তাঁরাই সর্বনিম্ন শ্রেণীতে পড়াবেন, গোড়াপত্তন তাঁদের হাতেই হওয়া উচিত, তাঁদের পুরস্কার হবে এই শিশুদের অগ্রগতি এবং পরবর্তী কালে তাদের প্রস্ফুটিত জীবন। ল্যাটিনের পরিবর্তে মাতৃভাষা বা ইংরেজীভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যাঁরা সর্বপ্রকারে উপলব্ধি করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম ; তাঁর মতে ইংরেজীভাষা খুব ভাল করে শেখার পর ল্যাটিন শিখতে আরম্ভ করা উচিত, এ বিষয়ে তিনি কুইন্টিলিয়ানের

মত বিরোধী (কুইন্টিলিয়ান বলেছিলেন ল্যাটিন শেখার আগেই ছেলে গ্রীক শিখবে), মালকাষ্টার মেয়েদের শিক্ষারও সমর্থন করেন। শিক্ষকের শিক্ষণ-শিক্ষার কথাও তিনি প্রস্তাব করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এ শিক্ষণ-শিক্ষা হওয়া উচিত একথা তিনি বলেছেন এ ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হওয়ার তিনশত বৎসর আগে।

এবার আরেকজন অভিজ্ঞ সুশিক্ষকের একখানা পুস্তকের কথা বলব, তাঁর নাম জন ব্রিন্সলি। কুড়িবৎসর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ফল তিনি তাঁর *'The Grammar School'* নামক পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ করেন, পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে যে বছর সেক্সপীয়র তাঁর নাটক লেখা বন্ধ করেন এবং যখন মিল্টন মাত্র তিন বছরের শিশু। এ-পুস্তক খানিকে শুধু তখনকার নয়, পরবর্তী বহু বৎসরের গ্রামার (মাধ্যমিক) স্কুলের পাঠ্য ব্যবস্থার মুকুর বা দর্পণ বলা যেতে পারে, কারণ দু'জন শিক্ষকের কথোপকথনের ভেতর দিয়ে সে সময়ের গ্রামার স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার ও সমস্যাগুলোর একটি স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। একজন শিক্ষক আরেকজনের কাছে উপদেশ চাইছেন তাঁর সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য। ইংরেজী না জেনে অতি শিশু বয়সেই অনেক ছেলেরা গ্রামার স্কুলে আসতো, তাতে শিক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত হোতো ; বানান শেখার অদ্ভুত নিয়ম ছিল, ১৩৯টি সব-চেয়ে কঠিন শব্দাংশ ছেলেদের সর্বদা মুখস্থ করতে হোতো, ছোট একটি বোর্ডে সে সব শব্দাংশ তাদের চোখের সামনে প্রায়ই ধরা হোতো স্মৃতি শক্তিকে কিছুটা সাহায্য করার জন্য! ইংরেজীর পরিবর্তে প্রথম থেকেই ল্যাটিনের ওপর জোর দেওয়ার বিষময় ফলও এতে বর্ণিত হয়েছে, যে সব ছেলেরা ইংরেজী পড়ার ভাল জ্ঞান নিয়েই স্কুলে আসতো তারাও ল্যাটিনের চাপে ইংরেজী পড়তে ভুলে যেতো, ফলে তাদের ইংরেজীর জ্ঞান একেবারে কমে যেতো, এবং পিতামাতারাও ভয়ানক বিরক্ত হতেন শিক্ষকদের ওপর। উপদেষ্টা শিক্ষক এ প্রতিকূল অবস্থার ভেতরও যাতে ইংরেজীর

চর্চা হ'তে পারে তার পথ নির্দেশ করে দিলেন। ল্যাটিন থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে, মধ্যে মধ্যে ইংরেজীতে কিছু মৌলিক রচনা করে, ল্যাটিন ব্যাকরণের জন্য ইংরেজী সাহায্য পুস্তক ব্যবহার করে খানিকটা ইংরেজীর চর্চা হ'তে পারে। পিতামাতার বিরক্তি সম্বন্ধে উপদেষ্টা শিক্ষক উল্টো তাঁদের ওপরেই দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন, তাঁরা যদি সব বিষয়েই শিক্ষককে দোষ না দিয়ে নিজেরা সান্ধ্য-ভোজনের পর ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিয়মিতভাবে একটু করে বাইবেল পড়েন রোজ তাহলে আর ইংরেজী চর্চার কোন অসুবিধে হয় না। অংক শিক্ষার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, কারণ গির্জায় গিয়ে সংখ্যাজ্ঞান না থাকায় ছেলেরা বাইবেলের পাতা ওল্টাতে পর্যন্ত অনেক সময় পারতো না। ল্যাটিনই ছিল প্রধান বিষয়, সংগে কিছু গ্রীক, হিব্রু ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। উপদেষ্টা শিক্ষক ধৈর্যের সংগে সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা এবং ছেলেরা হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হয়েছে কিনা সে বিষয়ে শিক্ষককে সতর্ক হ'তে উপদেশ দিয়েছেন, ক্লাশে ১৬ থেকে ৪০এর বেশী যেন ছাত্র না থাকে, ইনি মনিটর বা আশার (Usher) নিয়ম প্রবর্তনের কথাও বলেন। ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রশ্ন-উত্তর ধরনে হ'ত (যথা প্রঃ—ভগবান প্রথমে কি করলেন? উঃ—তিনি স্বর্গ ও মর্ত সৃষ্টি করলেন। প্রঃ—তিনি কখন স্বর্গ ও মর্ত সৃষ্টি করলেন? উঃ—একেবারে সর্বপ্রথম। প্রঃ—স্বর্গ ও মর্ত কি চিরদিনই ছিল না? উঃ—না, ভগবান এদের সৃষ্টি করেছেন)। নৈতিক পাঠের ভেতর শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা আছে। শাসনের সময় দয়া ও সহানুভূতির কথা শিক্ষক যেন না ভোলেন সেজন্য উপদেষ্টা শিক্ষক বলছেন, "ভগবান যদি অপরাধের জন্য আমাদের প্রতিবারই কঠিন শাস্তি দিতেন আমরা যেমন দিয়া থাকি আমাদের ছেলেমেয়েদের, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত?" এ বইখানি থেকে আমরা দেখতে পাই যে ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালী ও ইংলণ্ডে যেমন ল্যাটিনের প্রভাব ছিল সপ্তদশ

শতাব্দীতেও ঠিক তেমনই আছে, যদিও শিক্ষা সংস্কার করা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ওপর জোর দিতে আরম্ভ করেছেন। ইংরেজী ও বিজ্ঞানকে স্কুল পাঠ্য-তালিকায় স্থান পেতে এখনো দু'তিন শতাব্দী লাগবে যদিও ব্রিন্সলির সময়ে ইংরেজী সাহিত্যের চরম বিকাশ শুরু হয়েছে এবং কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, উইলিয়াম গিলবার্ট, নেপিয়র, হার্ভি, নিউটন, প্রভৃতি মনীষীরা সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু নোতুন তথ্য, নীতি ও আশ্চর্য জিনিষ (দূরবীক্ষণ, ইত্যাদি) আবিষ্কার করে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তখনকার যুগে মাসিক পত্রিকা, জার্নাল বা সংবাদপত্র ছিল না, কাজেই বিজ্ঞানীদের নবাবিষ্কৃত তথ্যাদির কথা শিক্ষকেরা সহজে জানতে পারতেন না। তবে ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) পুস্তকাবলী প্রকাশিত হবার পর পৃথিবীতে যে মহাপরিবর্তন এসেছে বিজ্ঞানের সংগে সংগে—ছাপাখানা, বারুদ ও কম্পাস বা দিকনির্ণয় যন্ত্রাদির মাধ্যমে—তা আস্তে আস্তে শিক্ষিত জগতের কাছে প্রকট হ'তে লাগলো।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাচীন গ্রীকল্যাটিন সাহিত্যে মানুষের যে পরিচয় আছে মানুষ তা আবিষ্কার করেছিল সত্য কিন্তু প্রকৃতির বা পৃথিবীর পরিচয় আবিষ্কার করতে পারেনি। বর্তমান বিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রদূত ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) পুস্তকাবলী প্রকাশিত হবার পর সপ্তদশ শতাব্দীর দৃষ্টিভংগী আস্তে আস্তে বদলাতে লাগলো। বেকন বললেন, শুধু সিলোজিজম্ আর শব্দ নিয়ে থাকা মহা ভুল, তিনি শব্দের পরিবর্তে পৃথিবীর দিকে, বস্তুজগতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন যাতে মানুষ লাভবান হ'তে পারে প্রকৃতির সম্পদ আহরণ ক'রে। তাঁর সীমাহীন আত্মপ্রত্যয়, নোতুন জিনিষ আবিষ্কারের উৎসাহ এবং নোতুন অনুসন্ধানপদ্ধতি শিক্ষাবিদ্ ও অন্যান্য মনীষীদের ওপর একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার ক'রল। তাঁর বিশ্বাস ছিল এমন এক অনুসন্ধান পদ্ধতি বের করা যায় যাতে করে সকল

সত্যানুসন্ধিৎসুরাই একই ভাবে কাজ করতে পারবেন; তাঁর *Novum Organum* নামক জগদ্বিখ্যাত পুস্তকে এ নোতুন পদ্ধতির কথা তিনি সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ পদ্ধতি হ'ল বস্তুজগৎ গভীরভাবে নিরীক্ষণ এবং নিজের অন্তর্দৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ ও উর্ধ্বগ যুক্তি দ্বারা সত্যের সম্মুখীন হওয়া। খুব সহজ সরল জিনিষের জ্ঞান থেকে আস্তে আস্তে সাধারণ নিয়মে উপনীত হ'তে হবে এবং পরীক্ষা ছাড়া কোন তথ্য বা ধারণা মেনে নেওয়া চলবে না। বেকনের ভাবধারা সপ্তদশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদ্ ও অন্যান্য মনীষীদের গভীরভাবে প্রভাবান্বিত ক'রল; শিক্ষায় ও মানব মনের উন্নয়নে সোজা থেকে কঠিনে আসতে হবে, কোন তথ্য মেনে নিয়ে পরে তার যুক্তি না দেখিয়ে সে তথ্য মোটেই গ্রাহ্য কিনা তা বিচার করে দেখতে হবে, শব্দের বিশ্লেষণ ছেড়ে বস্তুজ্ঞান হওয়া অধিকতর প্রয়োজনীয়। অবশ্য জ্ঞানের জগতে কিছুই মেনে নেওয়া চলবে না, সমস্ত জ্ঞানই শিশুকে আবিষ্কার করতে হবে এ নীতি শিক্ষায় সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে গেলে শিক্ষাই অচল হয়ে পড়ে, কিন্তু তবু এই নীতিতে যে মস্ত বড় সঞ্জীবনী সত্য নিহিত আছে তার প্রয়োগ সুফলপ্রসূ হয়েছে শিক্ষায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান ব্যতীত, তিনি তাঁর *The Advancement of Learning* নামক পুস্তকে ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য, আধুনিক ভাষা ইত্যাদি শেখাবার প্রস্তাব করেছেন পরিবর্তিত জগতের সংগে তাল রেখে চলবার জন্য।

বেকনের নোতুন পদ্ধতি শিক্ষায় প্রয়োগ করে কতকগুলো শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বোহেমিয়ার (বর্তমান চেকো-শ্লোভাকিয়ার) লব্ধপ্রতিষ্ঠ নির্ভীক শিক্ষক জন এমস কমেনিয়াস (John Amos Comenius, 1592-1671), তাই তাঁকে 'শিক্ষার বেকন' আখ্যায় অভিহিত করা হয়। মিশ্‌লে (Michelet) তাঁকে আধুনিক শিক্ষার সর্বপ্রথম প্রচারক বলে অভিনন্দিত করেছেন। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর আগে কমেনিয়াস তাঁর প্রাপ্য

যশ পাননি, তাহলেও তাঁর সম্বন্ধে প্রত্যেকটি আখ্যাই সত্য। যেমন তাঁর চরিত্র, শিশুর প্রতি অনুরাগ, তেমন তাঁর বুদ্ধি, তেমন তাঁর শিক্ষা দেবার আগ্রহ ও ধৈর্য। ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য জন্মভূমি মোরাভিয়া হ'তে নির্বাসিত হ'য়ে তাঁকে নগর থেকে নগরান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। (এ বিষয়ে তাঁর জীবনের সংগে রুশো ও পেষ্টালটজির জীবনের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে, তবে কমেনিয়াস বোধ হয় সবচেয়ে বেশী উৎপীড়িত হয়েছেন।) তবু কোন দিন তাঁর শিক্ষকতার কাজে বা শিক্ষা সম্বন্ধে পরিকল্পনা তৈরী করার কাজে শৈথিল্য আসেনি। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁর দীর্ঘ জীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন শিশুর কল্যাণে ও জনশিক্ষার ব্রতে। তিনি কুড়িখানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং ট্রানসিলভিনিয়া, ইংলণ্ড, সুয়েডেন প্রভৃতি দেশের কুড়িটি সহরে শিক্ষকতা ও উপদেষ্টার কাজ করেন। সর্ববিদ্যা শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা থেকে তিনি কখন বিরত হননি। প্রাথমিক শিক্ষায় কি কি পাঠ্য বিষয় থাকবে সে সম্বন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ধারণা দেন। তিন শ' বছর আগে তিনি অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিক্ষার যে বিভিন্ন ধাপ বা স্তরগুলো নির্দেশ করে দিয়েছেন আজো তা' আমরা মেনে চলেছি। শিক্ষকতা করবার জন্য যে কতগুলি অতি প্রয়োজনীয় নীতি অনুসরণ করা কর্তব্য সেগুলোও তিনি সুস্পষ্টভাবে লোক সমক্ষে উপস্থিত করেছেন। তাঁর সকল গ্রন্থের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ও নিষ্ফল; শুধু প্রয়োজনীয় দু'তিনখানা পুস্তকের কথা বলব। যে গ্রন্থখানায় তিনি তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন (ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এ গ্রন্থখানি একরকম অবিদিতই ছিল) তার নাম 'বৃহৎ শিক্ষাকোষ' বা *The Great Didactic* (Didactica Magna, 1632 A. D.)* এর আগে

*Didactica Magna প্রথম লেখা হয় চেক ভাষায় পরে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ল্যাটিনে লিখিত হয়।

তাঁর নাম হয়েছিল স্কুল পাঠ্য বই রচনা করে ; এসব পুস্তকে বস্তু ও ধারণার সংগে যোগাযোগে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন কমিনিয়াস্। সর্বপ্রথমে বইখানি *The Gate of Tongues Unlocked* or *The Seminary of all Languages & Sciences* খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এ অপূর্ব পুস্তকে ৮০০০ (আট হাজার) সাবধানে মনোনীত দরকারী সদা ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সাহায্যে এক হাজার বাক্য সন্নিবেশিত হয়েছিল একশত অধ্যায়ে, বাক্যগুলো সোজা হতে ক্রমিকভাবে কঠিন হয়েছে ; ডানদিকের পাতায় বাক্যগুলি ল্যাটিনে রচিত, বাঁ দিকের পাতায় মাতৃভাষায়। শব্দগুলি নানাবিষয় সংক্রান্ত—প্রকৃতি, চন্দ্র, সূর্য, তারা, বায়ু, আকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, চারুকলা, ধাতু, নগর ও রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা, নীতিবাদ, জীবজন্তু, মানুষ, তার দেহ, মন, ইত্যাদি। একটি অধ্যায় স্বর্গদূত ও শয়তান সম্বন্ধে পর্যন্ত রচিত হয়েছে। কয়েক বছর পরে এর একটি ছোট সংস্করণ বের হয়, আরও পঁচিশ বছর পরে (১৬৫৮ খ্রীঃ অঃ) কমিনিয়াস্ একটি মস্ত বড় কাজ করলেন এ পুস্তকটি আরও সরল করে এবং প্রতিটি বিষয় ও অধ্যায় চিত্র সম্বলিত করে। এই বোধ হয় জগতে চিত্র সম্বলিত প্রথম রীডার বা পড়ার বই। এই পুস্তকের নাম হ'ল *Orbis Pictus* or The Visible World—দৃশ্যমান জগত—*Orbis Pictus* ছোটদের বুদ্ধির স্তরে নেমে এসে লেখা এবং ল্যাটিন সাহিত্যিকদের কঠিন রচনা থেকে তাদের অব্যাহতি দিল—এই বোধ হয় প্রথম চিত্রসম্বলিত শিশুসাহিত্য এবং স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাপদ্ধতির (Intuitive method) সর্বপ্রথম প্রয়োগ।

'বৃহৎ শিক্ষাকোষ' বা *The Great Didactic* এবং *The Gate of Tongues* রচিত হয়েছিল অবশ্য একই সময়ে কিন্তু শিক্ষাকোষখানা ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে প্রকাশিত হয়নি। এ পুস্তকে তিনি জন্ম হ'তে যৌবন পর্যন্ত একটি সুচিন্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং তাঁর শিক্ষানীতি এবং বিভিন্ন স্তরের

স্কুলের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন বিজ্ঞতা ও সর্ববিদ্যা আয়ত্তের ভিত্তিতে (Pansophia or Universal Knowledge); কোন শিক্ষকের আর এরূপ বিরাট পরিকল্পনা নাই।

বৃহৎ শিক্ষাকোষে কমিনিয়াস্ অনেক সময় তাঁর যুক্তির সমর্থন করতে গিয়ে প্রকৃতি বা সমাজজীবন থেকে অনেক তুলনা দিয়েছেন যা হয়ত শিক্ষায় খাটে না, কোন কোন স্থলে হয়ত তাঁর কুসংস্কারও উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে ভাবধারার ভেতরে কিন্তু বইখানিতে এমন শিক্ষানীতি ও তত্ত্ব রয়েছে যাতে একে আমরা একটি অমূল্য গ্রন্থ বলে অভিনন্দিত করতে পারি। আজ যা আমরা অতি আধুনিক বলে গর্ব করি তা' দেখা যাবে কমিনিয়াস্ তাঁর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন তিন শ' বছর আগে। তার কয়েকটি উদ্ধৃত করলেই তাঁর মনের ও দূরদৃষ্টির পরিচয় আমরা পাব। তিনি বলেছেন, "মানুষকে শৈশবেই শিক্ষা দেওয়া যায় সব চেয়ে বেশী; ছোটরা (ধনী, নির্ধন, চাষী, মজুর) সব একসংগে শিক্ষা পাবে—এজন্য স্কুলের একান্ত প্রয়োজন; শুধু ছেলেরা স্কুলে যাবে না, মেয়েরাও যাবে।" তাঁর মতে শিক্ষা সবাইর জন্য শুধু ধনীর জন্য নয়—এ বিষয়ে তিনি অ্যাশচাম, মিল্টন এবং লক্ এঁদের সবাইর চেয়ে অগ্রগামী ও উদারনৈতিক। পাঠ্য-তালিকায় তিনি মাতৃভাষাকে দিয়েছেন সর্বোচ্চ স্থান। ল্যাটিনকে তিনি অনাদর করেননি, কিন্তু তা' আসবে বার বছরের পরে এবং যারা উচ্চশিক্ষা পাবে শুধু তাদের জন্য। প্রাথমিক স্কুলে ল্যাটিনের কোন স্থান নেই—সেদিনে একথা বুক উঁচিয়ে বলা ও স্কুলে কার্যকরী করা অসাধারণ সাহস ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। ছেলেমেয়েদের বস্তুর সাহায্যে শিক্ষার ওপর তিনি খুবই জোর দিয়েছিলেন, নেহাৎ বস্তুর অভাবে তার মডেল বা ছবির সাহায্য নিতে হবে এই ছিল তাঁর নীতি। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা না হ'লে কোন ধারণা বা জ্ঞান সুস্পষ্ট হ'তে পারে না বেকনের এই নিয়ম তিনি পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। সর্ব-

বিদ্যা আয়ত্তের (Pansophia) পরিকল্পনা থেকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে শিশু প্রথম থেকেই পরে যা' শিখতে হবে তার মোটামুটি একটা সহজ সরল ধারণা আয়ত্ত করবে অর্থাৎ বর্তমানে আমরা যাকে সমকেন্দ্রীক শিক্ষা (Concentric) বলি তাই অনুসৃত হবে।

ক্রমিক ধারায় কোন্ মানসিক বৃত্তির পর কোন্ বৃত্তির শিক্ষা আসবে সে সম্বন্ধে কমিনিয়াস্ মানুষের প্রকৃতিকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়ে শিক্ষাকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অর্থাৎ প্রথমে ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা, তারপর স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং শেষ পর্যন্ত যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির শিক্ষা হবে। আজকে মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষায় হয়ত মানসিক বৃত্তিগুলির যুগপৎ শিক্ষা হয়; একটির পর একটি করে শিক্ষিত করা হয় না, তাহলেও কমিনিয়াসের ধারণায় যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। শাসননীতি সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ একেবারে আধুনিক। "ছেলে ভুল করিয়াছে বলিয়াই তাহাকে শাস্তি দিতেছি একথা ঠিক নয়। তাহাকে শাস্তি দিতেছি যাহাতে সে আর এরূপ ভুল না করে। পড়াশুনার জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়, যেখানে নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে সেখানে কঠিন শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে।"

এর পরে কমিনিয়াস্ তাঁর সর্বজনীন শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্তরের স্কুলের পরিকল্পনা দিয়েছেন; এ পরিকল্পনা তিনশত বৎসরের অভিজ্ঞতার নিকষে খাঁটি সোনা বলে উতরে গেছে। চার ধরনের স্কুল হবে বয়সের চারটি মান হিসেবে:—প্রথম হবে মাতৃক্রোড়ের স্কুল (The School of Mother's Lap) যেখানে শিশু ছয় বৎসর পর্যন্ত তার সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে মাতার নির্দেশে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং কথা ও গল্পচ্ছলে হৃদয়ংগম করবে; মানুষ, তার অংগপ্রত্যংগ, তার জীবন, জীবজন্তু, জানোয়ার, গাছ, বন, নদী, পাহাড়, বরফ, আগুন, বাতাস,

আকাশ, তারা, চন্দ্র, সূর্য, ঋতু, সময়, আলো, আঁধার, নানারকম রং, রাস্তাঘাট, শিল্প, কর্মকার, স্বর্ণকার, ছুতোর, কুমোর, পুলিশ, চৌকিদার, মেয়র, পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট, গ্রামের বা সহরের ইতিহাস (যতটুকু যে বুঝতে পারে) ইত্যাদি সব সম্বন্ধেই কিছু কিছু জ্ঞান আহরণ করবে তার ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে। গণিত, জ্যামিতিও তার কাছে অজ্ঞাত থাকবে না—সে দশ পর্যন্ত গুণতে শিখবে, বীচি বা কাঠির সাহায্যে যোগ-বিয়োগ শিখবে, সোজা লাইন, বাঁকা লাইন, বৃত্ত ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে আঁকতে শিখবে, গজ দিয়ে কাপড় মাপা, পাল্লায় জিনিষ ওজন করা, কোন জিনিষকে অংশ জোড়া দিয়ে বানানো বা অংশে বিভক্ত করা এসবই সে শিখবে। এ সময় মাতৃভাষায় শুদ্ধভাবে কথা বলতেও তাকে শিখতে হবে। অর্থাৎ মা তাকে জ্ঞানের নানা শাখায় মোটামুটি দীক্ষা দেবেন যাতে প্রাথমিক স্কুলে গিয়ে সে এসব বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করতে পারে। দ্বিতীয় স্তর হ'ল সাধারণ প্রাথমিক স্কুল যেখানে ছেলেদের ও মেয়েদের ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে ছয় থেকে বার বৎসর পর্যন্ত কাটাতে হবে। এখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে সমস্ত জ্ঞান আহরণ করতে হবে। অভিজাত ও ভদ্রঘরের সন্তান যারা পরে ল্যাটিন স্কুলে পড়বে তাদেরও এ স্কুলে পড়তে হবে চাষী ও মজুরের ছেলের সংগে। ল্যাটিন বার বছরের পরে শুরু করা হবে এবং বার বছর পর্যন্ত প্রাথমিক স্কুলে সকলেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করবে এবং তাতে থাকবে মাতৃভাষা, গণিত, জ্যামিতি, সংগীত, ইতিহাসের প্রধান ঘটনাবলী, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রকৃতি পরিচয় এবং ধর্ম। আজকের শিক্ষাসংস্কারে কমিনিয়াসের ধারণাকে আমরা মেনে নিয়েছি, কারণ প্রাথমিক শিক্ষাকে আমরাও স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বয়ং সিদ্ধ করতে চাই এবং আজকের প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যতালিকা অনেকটা কমিনিয়াসের পাঠ্য-তালিকারই মত, যদিও বা পাঠ্যসূচীর ভার বেশ কিছু লাঘব

করা হয়েছে। কমিনিয়াস্ নিজেই বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে শিক্ষকের ওপর খুবই চাপ পড়বে এতগুলো বিষয় শিক্ষা দিতে, সেজন্য তিনি স্কুলকে কতগুলো অংশে বিভক্ত করে শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। প্রত্যেক স্কুলে থাকবে খেলার আঙিনা বা মাঠ এবং স্কুলগৃহ হবে দেখতে সুদৃশ্য খোলামেলা। কিন্তু সুদৃশ্য আলোবাতাস খেলানো স্কুল-গৃহের দিন তখনো আসেনি, আসতে আরো অনেক দেরী হবে।

শিক্ষার তৃতীয় স্তরে হ'বে ল্যাটিন স্কুল যেখানে বার থেকে আঠার বছর পর্যন্ত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেমেয়েরা আরও পূর্ণতর বা মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করবে। শিক্ষার চতুর্থ স্তরে থাকবে একাডেমি বা উচ্চতর স্কুল (বিশ্ববিদ্যালয়) যেখানে ১৮ থেকে ২৪ বৎসর পর্যন্ত যুবকরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে।

কমিনিয়াস্ আরও বলেছেন যে প্রত্যেক গৃহে মাতার স্কুল থাকবে, প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক স্কুল থাকবে, প্রত্যেক সহরে ল্যাটিন স্কুল থাকবে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র বা প্রদেশে একাডেমি বা বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে। তাঁর এ স্বপ্ন আজও পৃথিবীতে সর্বত্র সফল হয়নি!

কমিনিয়াস্‌কে ইন্দ্রিয় বাস্তববাদী (Sense Realist) বলা হয় কারণ তাঁর মুখ্য কথাই হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলোই জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, তাদের মাধ্যমেই মানুষ তা'র সমস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার ধারণা সুস্পষ্ট করে ; শিক্ষনীয় বস্তু শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়নিচয়ের সম্মুখে উপস্থিত না করার জন্য শেখানো ও শেখবার কাজ উভয়ই কষ্টকর হয়ে ওঠে। পরীক্ষামূলক পদ্ধতিও তিনি শিক্ষার কাজে প্রয়োগ করেছেন। সেজন্য ব্যাকরণে কতগুলো নিয়ম মুখস্থ না করে উদাহরণের ভেতর দিয়ে নিয়মগুলো আয়ত্ত করার বিধি তিনি দিয়েছেন। *Orbis Pictus*-এর মত রীডার থেকেই ব্যাকরণের নিয়মাবলী শিশু শিখতে পারবে। কোন জিনিষ আয়ত্ত করতে গেলে যে বহু অনুশীলন ও অভ্যাস করা দরকার সে-কথা তিনি

অতি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। কিন্তু কমিনিয়াসের গৌরব কয়েকটি শিক্ষানীতি প্রবর্তন করার জন্য নয়। তাঁর গৌরব হচ্ছে শিক্ষাকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, বিভিন্ন স্কুলের স্তর ও প্রাথমিক স্কুলের আদর্শ নির্ণয় করার জন্য, ল্যাটিনের মোহ কাটিয়ে মাতৃভাষার স্থান খুঁজে বের করার জন্য, স্কুলের পাঠ্যতালিকায় বিজ্ঞানকে স্থান দেবার ও শিক্ষাকে সর্বজনীন করবার প্রচেষ্টার জন্য, বহু দেশকে শিক্ষার পরিকল্পনা দিয়ে সাহায্য করার জন্য। তাঁর দৃষ্টি ছিল উর্ধ্বে, তাঁর লক্ষ্য ছিল মানবাত্মার উদ্ধার। লাইবনিটজের (Leibnitz) মত কমিনিয়াস্‌ও প্রায়ই বলতেন, "কয়েক বৎসরের জন্য আমাকে শিক্ষা পরিচালনার ভার দেওয়া হউক, আমি পৃথিবীর রূপ একেবারে পরিবর্তন করিয়া দিব এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি।" স্কুলে বিজ্ঞান চালু হ'তে বা শিক্ষা সর্বজনীন হ'তে আরো দু'তিন শতাব্দী কেটে যাবে। কমিনিয়াসের জীবিতকালে শুধু দু'টি সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়েছিল—একটি সাক্স গোথার (Saxe Gotha) প্রাথমিক স্কুলের মাধ্যমে ও দ্বিতীয়টি মার্কিন দেশের সাধারণ স্কুলের মাধ্যমে। এ দু'দেশেই বোধ হয় কমিনিয়াসের প্রভাবেই এ সম্ভব হয়েছিল। তা'ছাড়া তাঁর চিত্র সম্বলিত স্কুল পাঠ্যপুস্তক, বিশেষ করে তার ল্যাটিন শিক্ষামঞ্জরী, এক অভিনব সৃষ্টি। শিক্ষাজগতে তাঁরও স্থান ভিট্টোরিণো ডা ফেলটারের মতই খুবই উঁচুতে, তবে ভিট্টোরিণোর জীবনে আনন্দের সূর্যালোক ছিল, কমিনিয়াসের জীবনের ওপরে পড়েছিল বিষাদের ছায়া। তাই তাঁদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এ দু'ই বিভিন্ন ছাপ পড়েছিল, একটিতে ছাত্রছাত্রী হাস্যোজ্জ্বল, আরেকটি বিষাদগম্ভীর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায়।

ভদ্রের শিক্ষা

(সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী)

মধ্যযুগে নাইটের শিক্ষা যাজক বা স্কলারের শিক্ষা থেকে বিভিন্ন ছিল, রেণেসঁসে এ দু'ধরনের শিক্ষার মিলন হ'ল, দেহ ও মনের চর্চা দুই শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান পেল। কিন্তু রেণেসঁসের প্রথম উদ্যম কেটে গেলে দেখা গেল তখনকার বিদ্যালয়গুলো আবার শুধু স্কলারের শিক্ষার স্থান হয়ে উঠছে, দৈহিক চর্চা বাদ পড়ে যাচ্ছে। অভিজাত ও ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে এ রকম শিক্ষায় সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভবপর নয়, তাঁরা যথার্থই মনে করলেন গ্রীক-ল্যাটিন ভদ্রের অলংকারস্বরূপ, তার ব্যবস্থা থাকা দরকার, কিন্তু ভদ্রের শিক্ষায় (The Education of a Gentleman) অসিচালনা, গুলিচালনা, অশ্বারোহণ, নৃত্য, গীত, ইতিহাস, ভূগোল, নানাভাষা, গণিত, কিছু বিজ্ঞান, এ সবও থাকা প্রয়োজন। সেনাপতিকে কিছু গণিত, জ্যামিতি ও বিজ্ঞান জানতে হয়, রাজনীতিজ্ঞের ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, নানাভাষা, বিজ্ঞান না জানা থাকলে কাজ করার সুবিধে হয় না। কিন্তু গ্রীক-ল্যাটিন স্কুলগুলোতে দৈহিক অনুশীলন বাদ পড়ে গেল আবার নোতুন বিষয়গুলোও পাঠ্যতালিকায় স্থান পেল না। কাজেই প্রয়োজন হ'ল নোতুন ধরনের স্কুলের নোতুন কর্মসূচী নিয়ে।

প্রথম প্রথম অবশ্য প্রাইভেট টিউটরের সাহায্যে বা এক ভদ্র অপর ভদ্রকে এসব শিখিয়ে স্কুলের শিক্ষার অভাব পূরণ করা হ'ত; কিন্তু সে বন্দোবস্ত খুব সুবিধাজনক হ'ত না। ফ্রান্সে প্রথম এ ধরনের স্কুল (দৈহিক ও মানসিক শিক্ষার সমবায়) প্রতিষ্ঠিত হ'ল ষোড়শ শতাব্দীর শেষে অভিজাত ও সম্ভ্রান্তবংশীয়দের পরিচালনায়। ভদ্রের শিক্ষার স্কুলের আরও উন্নতি হ'ল শীঘ্রই। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় Order of Oratory

নামক প্রগতিশীল খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীসম্প্রদায় যেসুইটদের (Jesuits) আপত্তি সত্বেও প্যারিসের নিকটে Académie Royale খুললেন—এখানে শিক্ষা দেওয়া হ'ত অনেক নোতুন জিনিষ, পদার্থ বিজ্ঞান, ডেকার্টের দর্শন, গণিত (জ্যামিতিসহ), ভূগোল, ফরাসী ইতিহাস, অভিজাতবংশ শাস্ত্র (heraldry), গ্রীক, ল্যাটিন, ইতালীয়ান ও স্প্যানিস্ ভাষা, সবচেয়ে নীচু শ্রেণীতে ফরাসী বা মাতৃভাষা পড়ানো হ'ত; চতুর্থ শ্রেণীর পর ল্যাটিন পড়ানো বাধ্যতামূলক ছিল, কিন্তু ইতিহাস শেষ পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমেই পড়ানো হ'ত। অংকনবিদ্যা, নৃত্য, গান, বাজনা, অশ্বারোহণ, খেলাধূলা ইত্যাদিকে সম্মানিত স্থান দেওয়া হ'ত। এ ধরনের Académie ফ্রান্সে আরো গড়ে উঠলো, Oratory পরিচালিত স্কুলগুলোতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান (স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে) সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়, এবং এদের বিশেষত্ব এই ছিল যে এখানে ডেকার্টের ভাবধারা শিক্ষাকে সঞ্জীবিত করতো এবং স্বাধীন চিন্তার সংগে ধর্মভাবের উদ্দীপনার সংযোগ সাধিত হ'ত। Society of Port Royal বা জানসেনিষ্ট নামক আরেকটি প্রগতিশীল খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের চেষ্টায় কতগুলো ভদ্রের শিক্ষালয় (১৬৪৩-১৬৬১ খ্রীঃ অঃ) গড়ে উঠল, এখানে নোতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হ'ত, এবং ফরাসী ভাষা এই প্রথম ফ্রান্সে অতি যত্নের সংগে পড়ানো হ'ত। এখানকার তর্কশাস্ত্র পড়াবার খ্যাতিও খুব ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানেও Oratory শিক্ষালয়-গুলোর মতই মোটামুটি পাঠ্যতালিকা ছিল। তবে নৃত্য কর্মসূচী হতে বাদ পড়েছিল এবং ধর্মের ওপর আরও বেশী জোর দেওয়া হ'ত। এখানকার শিক্ষকদের লিখিত ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে পুস্তকাবলী সমস্ত ইউরোপে খুব বেশী ব্যবহৃত হ'ত। যেসুইটদের (Jesuits) প্ররোচনায় এঁদের স্কুলগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয় ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু এদের আয়ু স্বল্প হ'লেও এদের প্রভাব ছিল বিরাট এবং এক হিসেবে এ স্কুলগুলোই ফ্রান্সের

প্রতিভার ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত প্রতীক। ফরাসী প্রভাবে জার্মাণীতে 'একাডেমি' বা এ ধরনের শিক্ষালয় কতগুলো প্রতিষ্ঠিত হ'ল ত্রিশ বৎসরের ধর্মযুদ্ধের (১৬১৮-১৬৪৮ খ্রীঃ অঃ) আগে ও পরে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এসব শিক্ষালয়েই জার্মাণ অভিজাতবংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এবং পদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ শিক্ষালাভ করতেন।

মিল্টনের (১৬০৮-১৬৭৪ খ্রীঃ অঃ) *Tractate of Education* (1644) একটি ইংলিশ একাডেমি স্থাপনের পরিকল্পনা। এ পুস্তকখানির যেমন সুন্দর ভাষা, তেমন এর অপূর্ব প্রস্তাবাবলী। ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্ট ও রাজার গৃহযুদ্ধের প্রথম দিকেই (যখন তিনি একটি মাধ্যমিক স্কুলে কিছু দিনের জন্য শিক্ষকতা করেছিলেন) এ পুস্তকখানি লেখা এবং যাতে ভাল সেনানায়ক ও ভাল সেনানী পার্লামেন্টের পক্ষে পাওয়া যায় সেজন্য এ শিক্ষার পরিকল্পনা। মিল্টন শিক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা আজও কার্যকরী ; তিনি বলেছেন, "সুতরাং আমি সে শিক্ষাকেই সম্পূর্ণ ও মহানুভব শিক্ষা বলে অভিনন্দিত করিব যে শিক্ষা শান্তির সময়েই হউক বা যুদ্ধের সময়েই হউক, মানুষকে তাহার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ন্যায়সংগতভাবে, সুকৌশলে ও ঔদার্যের সহিত সমাধান করিতে সমর্থ করে।"* কিন্তু মিল্টন যে পরিকল্পনাটি দিয়েছেন সেটা খুবই বিরাট ও মহিমময় সত্য, কিন্তু বস্তুত অকার্যকরী কারণ পাঠ্যবিষয়ের মাত্রা কমিনিয়াসের পাঠ্যতালিকারই মত (সমস্ত পুরনো বিষয় ত পড়তে হবেই, সমস্ত নোতুন বিষয়ও পড়তে হবে)। তবে একথা সত্য ইংল্যাণ্ডে এর পরে যেসব একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে মিল্টনের পাঠ্যতালিকার প্রায় সব

---

* I call therefore a Complete and Generous Education that which fits a man to perform justly, skilfully and magnanimously all the offices, private and public, of peace and war.

বিষয়ই পড়ানো হ'ত, যদিও ভাসাভাসাভাবে পড়ানো ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।

এ একাডেমি বা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ১২ বছর থেকে ২১ বছরের কিশোর ও যুবকেরা পড়বে এবং ছাত্রসংখ্যা মোটামুটি ১২০র মত হবে। তাঁর মতে গ্রামার স্কুলে ৭।৮ বছর সময় বৃথা নষ্ট হয় সামান্য ল্যাটিন বা গ্রীক শিখতে, অথচ এ শিক্ষা আনন্দের ভেতর দিয়ে এক বছরের মধ্যেই হতে পারে। এ শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করতে হ'লে কুড়ি বছর বয়সের আগে ল্যাটিন বা গ্রীকে মৌলিক রচনা না করা, কোন একখানা ছোট ল্যাটিন বা গ্রীক বই খুব ভাল করে পড়ানো, শিক্ষকের উৎসাহপূর্ণ বাগ্মিতা এবং ছুটি কমান—এ সব উপায় অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষক তাদের সর্বদা উদ্দীপনা দেবেন দেহ, মন ও আত্মার উন্নতিসাধন করতে যাতে তারা নানা সদ্‌গুণে ভূষিত হয়ে দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক হ'তে পারেন। মিল্টন শিক্ষায় হিউম্যানিজিম্ ও বাস্তববাদের (realism) দু'য়েরই পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি জ্ঞান আহরণের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামের ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন। যদিও তিনি একজন বড় ভাষাবিদ্ ছিলেন, তা'হলেও তাঁর মতে নানা ভাষায় পারদর্শী হবার জন্যই ভাষা শেখা নয়, ভাষার একমাত্র কাজ হচ্ছে ভাবধারার বাহন হওয়া। কি কি ভাষা শিখতে হবে? ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, কালডেক, সিরিয়ান, ইতালীয়ান। তিনি ফরাসী ভাষার উল্লেখ আদৌ করেননি এবং ইংরেজী ভাষার উল্লেখও নামমাত্র ঘটনা প্রসংগে করেছেন—এটা একটু অদ্ভুত শেক্সপীয়রের সমস্ত অবদানের পরেও। ১২ বছরে ল্যাটিন, ব্যাকরণ, পাটীগণিত, জ্যামিতি শুরু করে ১৩ বছরে ল্যাটিন বই পড়তে ছেলে আরম্ভ করবে—কুইন্টিলিয়ানের বইয়ের প্রথম অধ্যায়গুলো পড়লে ল্যাটিনও শেখা হবে, শিক্ষা সম্বন্ধেও কিছু ধারণা জন্মাবে। ১৩ বছরে ম্যাপ ও গ্লোবের সাহায্যে ভূগোল ও প্রকৃতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করবে এবং গ্রীকভাষাও শুরু করবে।

১৪-১৫ বছরে তারা প্রাণীবৃত্তান্ত ও বিজ্ঞান ল্যাটিনে পড়বে এবং দেহতত্ত্ব (Physiology) গ্রীক ভাষায় পড়বে এবং সেই সংগে পড়া হবে ত্রিকোণমিতি, এঞ্জিনিয়ারিং, অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান, শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy) এবং তারপর বয়সের সংগে সংগে আসবে ইতালীয়ান, হিব্রু, নীতিবাদ, দর্শন, গ্রীক ও ল্যাটিন নাটক, কবিতা, দর্শন, রাষ্ট্রের ইতিহাস—অর্থাৎ সর্ববিদ্যাবিশারদ হ'তে হবে। সান্ধ্য ভোজনের পর এবং রবিবার তারা বাইবেল ও খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি পড়বে কিন্তু সান্ধ্য ভোজনের আগে ও পরে প্রত্যহই কিছু সংগীত শোনা ও শেখার বন্দোবস্ত থাকবে। শরীরচর্চার ব্যবস্থাও মিল্টন ভাল করেছিলেন —তরবারি খেলা ও মল্লযুদ্ধ দেড়ঘন্টা এবং জাতীয় সামরিক বাহিনী ও সেনানায়কের কাজ দু'ঘন্টা। পনর বছর বয়স হ'লে বসন্তকালে তারা দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করবে।

এ শিক্ষা উদার নীতিসম্পন্ন নিশ্চয়ই তবে মিল্টনের সময়ের গ্রামার স্কুলে পুরনো ব্যবস্থাই চলছিল—আট বছর বয়সে ল্যাটিন একটা অপরিবর্তনীয় নিয়ম ছিল এবং ব্রিন্সলির পুস্তকও যে প্রচলিত স্কুল ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করতে পেরেছিল তারও কোন নিদর্শন নেই, তবে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর অর্থাৎ দ্বিতীয় চার্লসের পুনঃ প্রতিষ্ঠার (Restoration) পর ধর্মীয় অবিবেচক আইন ও অত্যাচারে যে-সব একাডেমী ডিসেন্টারদের (Dissenters) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে নোতুন সুর বেজেছিল সন্দেহ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে যা কিছু নোতুন ও শুভ তার জন্ম হয়েছে সংঘাতের ফলেই।

দ্বিতীয় চার্লস নিজে পরধর্ম অসহিষ্ণু ছিলেন না, কিন্তু তাঁর রাজকীয় দল রাজপ্রতিষ্ঠিত ইংলিশ চার্চের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন খ্রীষ্টীয় ধর্ম সইতে পারলেন না; অত্যাচারী আইন হ'ল দফায় দফায়; ফলে ইংলিশ চার্চের বিরোধী (Dissenters) খ্রীষ্টান শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রামার স্কুল পরিত্যাগ করতে বাধ্য

হয়ে নিজেদের একাডেমি প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং এসব নোতুন স্কুলে তাঁদের সমধর্মাবলম্বনকারীদের জন্য স্বাধীনভাবে পাঠ্য-তালিকা চালু করতে সক্ষম হ'লেন। এসব একাডেমি বা গ্রামার স্কুলে নানারূপ অসুবিধে সত্ত্বেও বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজী ও অন্যান্য আধুনিক ভাষা ইত্যাদি পড়ানো হ'তে লাগল। কিন্তু অভিজাত, সম্ভ্রান্ত ও জমিদার বংশীয় ছাত্রছাত্রী সাধারণতঃ সে যুগে ইংলিশ চার্চের অনুবর্তী, সুতরাং এসব ডিসেণ্টার বা নন্‌কন্‌ফর্মিষ্ট (Nonconformist) পরিচালিত একাডেমিতে তারা যেত না; তাদের জন্য পুরানো গ্রীক-ল্যাটিন সাহিত্যিক শিক্ষা ছাড়া নোতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা করতে হ'লেই প্রাইভেট টিউটর বা গৃহশিক্ষক ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪ খ্রীঃ অঃ) লর্ড শাফ্‌ষ্টবেরীর গৃহে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পর এমনি একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক কর্মের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে। বস্তুতঃ লক্ ছিলেন একজন বড় মনস্তাত্ত্বিক এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক, দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং ডিগ্রি নিয়েছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রে। তিনি Royal Society-র সভ্য মনোনীত হয়েছিলেন এবং সেখানে নিউটনের সংগে পরিচিত হন। মিল্টনের মতই তিনি সে সময়কার গ্রামার স্কুলের পুরানো গ্রীকল্যাটিন প্রভাবান্বিত সাহিত্যিক শিক্ষা ও দুরন্ত ছেলেপিলে মোটেই পছন্দ করতেন না এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যযুগীয় শিক্ষাও তাঁর আদৌ ভাল লাগেনি। তাই তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করে লর্ড শাফ্‌ষ্টবেরীর সংগে তাঁর সচিব হিসেবে রাজনৈতিক কার্যে লিপ্ত হলেন এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভারও গ্রহণ করলেন। তাঁর হাত দিয়ে দু'দুজন লর্ড শাফ্‌ষ্টবেরীর শিক্ষা হয়েছে। তিনি বার বার বলেছেন ছেলেকে স্কুলে না পাঠিয়ে গৃহশিক্ষকের হাতে দিতে।

লকের শিক্ষা সম্বন্ধে মতবাদ সপ্তদশ শতাব্দীর আশাবাদী ডেকার্ট ও পোর্ট রয়ালের (Port Royal) ভাবধারা দ্বারা যথেষ্টভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। তাঁর লেখার খ্যাতি ইউরোপের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাঁর প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছিল তাঁর জীবিতকালেই। তাঁর বৈজ্ঞানিক ও পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভংগী সত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। তাঁর শান্ত বিবেচনা ও বিচারবুদ্ধি, তাঁর স্বাধীনতাকামিতা ও কল্পনাবিলাস বিমুখতা সবাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও তাঁর পুস্তকাবলী সযত্নে পঠিত হ'ত। যদিও তাঁর খ্যাতি *The Essay Concerning Human Understanding* (1690)—নামক পুস্তকখানি হতেই (এ পুস্তকখানি রচনা করতে তাঁর কুড়ি বৎসর লেগেছিল) হয়েছিল দর্শনজগতে, তবু শিক্ষাজগতেও তার খ্যাতি প্রায় সমানই হয়েছিল। তাঁর শিক্ষক-জীবনের পরিণত অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করলেন তাঁর *Some Thoughts Concerning Education* (1693) নামক পুস্তকে এবং তাঁর শেষ পুস্তক *On the Conduct of the Understanding* প্রকাশিত হয় ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর হু'বছর পরে। তাঁর Thoughts রুশো ও হেলভেশিয়াসের মতবাদকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নতিতে চারিদিকে আশাবাদের একটা হাওয়া বইছিল যে জগত আরও উন্নততর হবে। তার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই *Thoughts*-এর প্রথম অনুচ্ছেদেই। লক্ কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—মানুষ (অন্ততঃ তার দশ ভাগের নয় ভাগ) তৈরী হয় শিক্ষা দ্বারা, উত্তরাধিকার দ্বারা নয়। লক্ ও অন্যান্য মনীষীদের এই মতবাদ (মানুষের প্রকৃতি শিক্ষা দ্বারা পরিবর্তিত হবে) পরবর্তী শতাব্দীতে সুপরিকল্পিত এক সমাজ প্রগতির থিওরিতে দাঁড়িয়ে গেল।

লক্ চিকিৎসক ছিলেন, কাজেই স্বাস্থ্যকেই শিক্ষার সত্যিকার ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর বই শুরুই হয় স্বাস্থ্যের আলোচনা দিয়ে। ছোট বয়সে শিশুদের কাপড়-জামা, খাদ্য, ব্যায়াম, নিদ্রা, সদভ্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে লক্ই সর্বপ্রথম জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সদুপদেশ দেন, পরে রুশো এ বিষয় নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। লকের প্রথম নীতিই ছিল প্রয়োজন নীতি (Principle of Utility) তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল, শিশুকে শক্ত ও মজবুত করা—স্পার্টার 'Hardening Process'—যাতে মানুষ দুঃখকষ্ট সবই হাসিমুখে সহ্য করতে পারে এবং স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে। স্বাস্থ্য ছাড়া মানুষ সংসার-সংগ্রামে দাঁড়াতে পারে না। ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলগুলো এ বিষয়ে লকের নীতি অনুসরণ করেছে যেমন করেছে অনুসরণ তাঁর প্রদর্শিত ভদ্রোচিত আচরণের আদর্শ। স্বাস্থ্য এবং নৈতিক ও ব্যবহারিক গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন তার পুস্তকের দুই-তৃতীয়াংশ ভরে কারণ তাঁর মতে মানুষের সবচেয়ে বড় ও স্থায়ী আনন্দ হচ্ছে স্বাস্থ্য, সুনাম, পরোপকার, জ্ঞান এবং অনন্ত সুখভোগের আশা। তিনি বলেছেন, "A sound mind in a sound body is a short but full description of a happy state in the world." ভদ্রের শিক্ষার উদ্দেশ্যের ভেতর তিনি গুরুত্ব হিসেবে যথাক্রমে চারটি প্রধান জিনিষ ধরেছেন—ধর্মভাব বা বিবেক (Virtue), পরিণামদর্শিতা বা বিচক্ষণতা (prudence or wordly wisdom) ভদ্র আচরণ (breeding) এবং বিদ্যা (learning)। কেতাবী বিদ্যায় রুশোর মতই লকের কাছেও বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না। তাঁর মতে বিবেক ও বিচারবুদ্ধিই মানুষের শ্রেষ্ঠ অলংকার। সেজন্য তিনি 'little Latin and less Greek'-এর জন্য মোটেই ব্যস্ত হননি, তিনি বিবেককেই তার শিক্ষার মূলমন্ত্র করেছিলেন এবং বিবেক যাতে জাগ্রত থাকে সেজন্য বিচার

নীতির (principle of rationality) আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলছেন "ধর্মভাব ও বিবেকের ভিত্তি হইতেছে এই যে মানুষ তাহার প্রবৃত্তিকে দমন করিবে, ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারিবে এবং যাহা তাহার বিচারবুদ্ধি সংগত তাহাই করিবে, যদিও প্রবৃত্তি তাহাকে হয়ত ঠিক বিপরীত পথে ধাবিত করিতে চেষ্টা করিবে।" বিবেক ও প্রবৃত্তির সংঘাতে বিচারবুদ্ধির সহায়তায় বিবেকের জয় এই হোল লকের মুখ্য কথা। তিনি ডেকার্টের মতই বিশ্বাস করতেন যে মানুষের বিচারবুদ্ধি তার প্রবৃত্তির তাড়না ও ভাবাবেগকে সংযত করে বিবেকের পথে নিয়ে যেতে পারে। আজ হয়ত ম্যাকডুলালের মত মনস্তত্ত্ববিদ্ একথা অস্বীকার করবেন এবং নৈতিক আত্মভাবরস (moralised sentiment of self-regard) ব্যতীত বিচারবুদ্ধি অসহায় একথা বলবেন কিন্তু যাহোক বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিচারবুদ্ধির জয়গানই মনস্তত্ত্ববিদরা করে এসেছেন।

লক্ বলেন বিচারবুদ্ধি শৈশবেই প্রকট হয় এবং প্রথম থেকেই এর অনুশীলন করা উচিত। যদিও বিচারবুদ্ধি শৈশবে প্রকট হয়, এ আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত হয় এবং সেজন্য বহুদিন পর্যন্ত বয়স্কদের দ্বারা শিশুকে পরিচালিত হতে হবে। লক্ এক জায়গায় বলেছেন শিশু ঠিক পথে চলছে তখনি বলা যায় যখন দেখা যাবে সে প্রশংসনীয় জিনিষগুলো করতে আনন্দ পাচ্ছে এবং তিনিই প্রকৃত শিক্ষক যিনি শিশুকে করণীয় কাজে বা সমাজানুমোদিত বাঞ্ছিত কাজে আনন্দের সংগে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন কারণ তিনিই শিক্ষার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছেন। আনন্দে বাঞ্ছিতকাজে মগ্ন হতে হলে রীতিমত সদভ্যাসের প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত, প্রশংসা ও নিন্দা, পুরস্কার ও শাস্তি এবং নিয়ত পুনরাবৃত্তির দ্বারা সদভ্যাস গঠিত হয় এবং নৈতিক আদর্শও শিশু বা বালকের নিকট সহজ, সুস্পষ্ট এবং সুখকর হয়ে ওঠে। সেজন্য শিশুর পরিবেশ বা সমাজ হবে সুন্দর ও নৈতিক ধরনের এবং স্কুলের দুরন্ত বালক বা

দুশ্চরিত্র দাসদাসীর সংস্পর্শে সে আসবে না। শিশুর সদভ্যাসগুলো যখন একবার গড়ে উঠবে, তখন থেকে শিশু নিজেই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করবে, তবে যতদিন তার বিচারবুদ্ধি পরিপক্ব না হবে, ততদিন বয়স্কদের নির্দেশে তাকে নিয়ত অভ্যাসে সদাচরণ আয়ত্ত করতে হবে। প্রয়োজন হ'লে এমন ঘটনার সৃষ্টি করতে হবে যাতে সদাচরণের অবকাশ শিশু পায়। অভ্যাস নীতি হ'ল লকের তৃতীয় নীতি। লক্ যতটা শিশুর বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, ততটা কিন্তু ঠিক নয় কারণ শিশুর আত্মসম্মানবোধ এত শীঘ্র পরিস্ফুট হয় না। দার্শনিক কান্ট বলেছেন "It is labour lost to talk of duty to children."

শিক্ষার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য বিচক্ষণতা (worldly wisdom) ও ভদ্র আচরণ (breeding or good manners) অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মানুষকে আয়ত্ত করতে হয়। অভিজ্ঞতা হ'ল লকের চতুর্থ নীতি। বিচক্ষণতা লকের মতে হচ্ছে নিজের কাজ, দক্ষতা ও পরিণামদর্শিতার সহিত গুছিয়ে নেবার ক্ষমতা। এ ক্ষমতা অভিজ্ঞতার সংগে আস্তে আস্তে জন্মায় এবং শিশুর হাতের নাগলের বাইরে। তবে সংসারে যে বহু ধূর্ত ও অসৎ লোকের প্রাদুর্ভাব তা তাকে আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে তার চরিত্রকে কলুষিত না করে অর্থাৎ সে নিজে যেন ধূর্ত (cunning) বা অসৎ বা নীচ না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ভদ্র আচরণ ও শিক্ষা দিতে হবে মানুষের সংগে ব্যবহারে এবং এই নীতিটি সর্বদা বালককে মনে রাখতে হবে, "Not to think meanly of ourselves and not to think meanly of others." লকের এই উক্তিটি ইংলণ্ডের ভদ্রসমাজের আচরণের মূলমন্ত্র বললেও অন্যায় হবে না এবং দু'শ বছর পর ডিন ইঞ্জ (Dean Inge) ইংরেজ চরিত্রের আদর্শ আঁকতে গিয়ে লকের কথারই পুনরাবৃত্তি

করছেন : "An ideal of character, based on self-respect and respect for others; on hatred of underhand tricks and dodges; on a determination to play the game fairly; and last, on a self-mastery which prevents a man from being violent or complaining or bullying or cringing or ridiculous." চরিত্রের আদর্শ হিসেবে বোধ হয় এর চেয়ে উচ্চতর বা বৃহত্তর কল্পনা খুব কমই আছে।

শিক্ষার চতুর্থ উদ্দেশ্য—বিদ্যা বা জ্ঞানার্জন সম্বন্ধেও তিনি প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতা নীতি অবলম্বন করেছেন। বাস্তব জগতের জ্ঞান শিশু ও বালক আহরণ করবে তাদের ইন্দ্রিয়-গ্রামের ভেতর দিয়ে। অসিক্রীড়া, নৃত্য, যন্ত্রপাতির ব্যবহার এসব শিখবে হাতে-নাতে, নানা দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে ভ্রমণের ভেতর দিয়ে। তবে অন্যান্য বাস্তববাদী অভিজ্ঞতানীতি যতটা শিক্ষায় প্রয়োগ করেছিলেন লক্ হয়ত ততটা করেননি কারণ ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষায় তিনি শিশুদের মাঠে নিয়ে গিয়ে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করাননি।

পূর্বেই বলা হয়েছে লক্ বিদ্যার্জনের ওপর বেশী জোর দেননি, তাঁর মতে, চরিত্র ঠিক হ'লে, বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হ'লে, আত্মসম্মানবোধ সুতীক্ষ্ণ হ'লে, পুঁথির বিদ্যা বা খবরাখবর সংগ্রহ আপনা হ'তেই আসবে। শিশু কি কি পড়বে তা নির্ণয় ক'রতেও তিনি প্রয়োজন নীতি অবলম্বন ক'রেছেন—ভদ্রের শিক্ষায় কি কি বিষয়ের প্রয়োজন ? তবে বিষয় শিক্ষার আগে জ্ঞানের তৃষ্ণা এবং তার অংকুর কৌতূহলের ওপর লক্ যথার্থই জোর দিয়েছেন। কারণ সমস্ত বিদ্যার্জনই এই কৌতূহলের ওপর নির্ভর করে। কাজেই এ কৌতূহলকে শিশুদের ভেতর বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, বা উত্তর দিতে বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে—যে অজ্ঞতা নিয়ে শিশু

জন্মগ্রহণ করেছে তার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে শিশুকে প্রত্যেক বয়স্কের সাহায্য করা উচিত। শিশু নোতুন দেশে এসেছে, এ সুন্দর ধরণীতে সে আগন্তুক, আমরা যারা পুরানো বাসিন্দা আমাদের উচিত তাদেরকে এর বৈচিত্রের পরিচয় দেওয়া।

শিশু কথা বলতে শিখলেই লকের মতে তাকে পড়াতে শেখান প্রয়োজন। এ জিনিষটা খেলাচ্ছলে হাতীর দাঁতের অক্ষর দিয়ে শেখান যেতে পারে, সংগে এক-আধখানা সহজ সরল বই। লেখা পড়তে শেখার অল্প পরেই শুরু করা উচিত। লক্ মনে করতেন সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত ঘরের ছেলের শ্যর্টহ্যাণ্ডও শেখা উচিত কারণ তাহলে পার্লামেন্টের বক্তৃতা ইত্যাদি হুবহু তোলা যাবে। প্রথমে ইংরেজী (মাতৃভাষা) ও ড্রয়িং শিখতে হবে, তারপরে ফরাসী এবং তারপরে ল্যাটিন। তিনিও মিল্টনের সংগে একমত যে ভাষা শিক্ষা করতে হবে কথাবার্তার ভেতর দিয়ে ব্যাকরণের হাত এড়িয়ে এবং ব্যাকরণ শিক্ষা শুরু হবে, যখন ভাষা শিক্ষা বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। সকলের পদ্য লেখা, ল্যাটিনে গদ্য বা পদ্য রচনা বা কবিতার বৃহদংশ মুখস্থ করা ইত্যাদি সব বাদ যাবে। গ্রামার স্কুলের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে লকের এই মতবাদ হয়ত অনস্বীকার্য। তবে লকের কতগুলো মত অগ্রাহ্য—যেমন, পদ্য আদৌ ভাষা শিক্ষায় থাকবে না; কারণ পদ্য লিখে বা পড়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে বা পদ্য ও জুয়াখেলা (poetry and gambling) সমপর্যায় পড়ে, ইত্যাদি। তিনি বলছেন "It is very seldom seen that anyone discovers mines of gold or silver in Parnassus." অদ্ভুত কথা—প্রয়োজনবাদীর কাছ থেকেও ললিতকলা সম্বন্ধে এতটা ঔদাসীন্য কেউ প্রত্যাশা করে না! সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের উৎস গ্রীকভাষা তাও বাদ যাবে —শুধু পণ্ডিত ব্যক্তিরা গ্রীক পড়বেন। নৃত্যবিদ্যা শেখান যেতে পারে কারণ এতে দেহের চারুভংগী সংসাধিত হয় কিন্তু

বাদ্যযন্ত্রাদি শিক্ষা বাঞ্ছনীয় নয় কারণ বহু সময় নষ্ট হয় এতে এবং বাদ্যকারীদের সংশ্রবও ভাল নয়। পুরনো দিনের অকেজো ল্যাটিন শিক্ষায় যে সময়ের অপব্যয় হ'ত সে সময়ের ভেতর বেশ কিছু ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি পড়ান হবে। সব বিদ্যারই কিছু কিছু শিখবে ভদ্র (smattering curriculum) যাতে জ্ঞানের দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হ'তে পারে যদি পরে তার কখনও ইচ্ছা হয় বিশেষভাবে কোন বিষয় অধ্যয়ন করবার। অশ্বারোহণ ও অসিক্রীড়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল এবং অল্প-স্বল্প চলতে পারে কিন্তু দু'তিনটি শিল্প শেখা আরো ভাল স্বাস্থ্য ও অবসর বিনোদনের জন্য। ছুঁতোরের কাজ, কামারের কাজ, মালীর কাজ, কারুশিল্প, ধাতুশিল্প, বহুমূল্য পাথর কাটবার কাজ, ইত্যাদি ভদ্র শিক্ষা করতে পারেন, তবে লক্ উদ্যান ও দারু-শিল্পের কাজই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন। দু'তিনটি শিল্প শেখার ফলে স্বাস্থ্য ও আনন্দ ছাড়াও শ্রমজীবীদের জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান হয় এবং পরে প্রভু হিসেবে মজুর খাটাতে সুবিধে হয়। শিক্ষার শেষ সময়ে কিশোর যখন যৌবনে পদার্পণ করবে গৃহশিক্ষকের সংগে বিদেশ ভ্রমণে বেরুবে সে। লক্ নিজে এমন একটি ছেলেকে নিয়ে ফ্রান্সে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

লকের দু'টি খুব বড় বিশ্বাস ছিল—মানুষের স্বাধীনতা বাসনায় ও বিচারবুদ্ধিতে। তাই তিনি শিক্ষায়ও বিশেষ করে 'ডিসিপ্লিন' বা নিয়মানুবর্তিতা বিষয়ে, স্বাধীনতার কথা বলেছেন। রুশো পরে এ স্বাধীনতাকে আরো চরমে নিয়ে গেছেন। ডিসিপ্লিন বিষয়ে লক্ মণ্টেনের মতানুবর্তী—'severe mildness' তাঁরও নীতি। "The rod is a slavish discipline, it makes a slavish temper." লকের মতের বাহাদুরী হচ্ছে এই যে, সে সময়ে ইংলণ্ডে বেত্র ব্যবহারটা বেশ চালু ছিল এবং তার প্রভাব আজো একেবারে কাটেনি। শুধু একটি ক্ষেত্রে লক্ বেত্র ব্যবহার

বরদাস্ত করেছেন—সেটি হচ্ছে যখন ছেলে একেবারে বিদ্রোহী হয়ে হুকুম অমান্য করে। তা'ছাড়া লক্ ছেলেদের হাতেই ছেলেদের শাসন দিতে প্রস্তুত এবং স্কুলে স্বায়ত্তশাসনের তিনি একজন বড় পথপ্রদর্শক। তিনি বলেছেন, "Trust to the honour of the child." ঠিক এইখানেই মুস্কিল—অল্প বয়সে ছেলেদের আত্মসম্মান, লজ্জাবোধ বা বিচারবুদ্ধি জন্মায় না, কর্তব্য সম্বন্ধেও কোন বিশেষ স্পষ্ট ধারণা থাকে না—কাজেই অপরিণতবয়স্ক বালকের হাতে ডিসিপ্লিন একেবারে ছেড়ে দিলে চলে না। তাকে স্নেহ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, দরকার হোলে বুঝিয়ে শাসন করা দরকার। সেজন্য দার্শনিক কান্ট বলেছিলেন, "It is labour lost to speak of duty to children. They comprehend it only as a thing whose transgression is followed by the ferule........so one ought not to try to bring into play with children the feeling of shame, but to wait for this till the period of youth comes. In fact, it cannot be developed in them till the idea of honour has already taken root there." ছেলেকে শাসনের হাত হ'তে, ভয়ের হাত হ'তে নিষ্কৃতি দিতে গিয়ে তার মর্যাদাকে লক্ এত বড় করে তুলেছেন যে সে একটা প্রায় কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে।

অবশেষে লক্ তাঁর পুস্তকে অভিভাবকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, তাঁরা যেন পুত্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করবার সময় গতানুগতিকের অনুবর্তী না হন; পরন্তু তাঁদের নিজেদের বিচারবুদ্ধি দ্বারা যেন পরিচালিত হন। লক্ সম্বন্ধে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভাস্কর যেমন সমগ্র মানুষটিকে তাঁর স্রষ্টার দৃষ্টিতে দেখেন, লক্ও তেমনি মানুষের সামগ্রিক রূপটি দেখেছিলেন—বলিষ্ঠ দেহ মানব, ধীশক্তিসম্পন্ন মানব, সামাজিক মানব, কর্মকুশলী করিৎকর্মা মানব, নৈতিক মানব, রাষ্ট্রীয় মানব

এবং ধর্মনিষ্ঠ মানব। ভদ্রের শিক্ষার এত বড় রূপ আর কোথাও বড় একটা মিলে না।

মালকাষ্টার, ব্রিনসলি, বেকন, কমিনিয়াস্, মিল্টন, লক্, রুশো প্রভৃতি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষাসংস্কারকগণ রেণেসঁসের শেষের দিকের সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার গলদ দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ভদ্রের শিক্ষার আরেকটি প্রধান কেন্দ্র (ভাষাতত্ত্ব, অ্যারিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক বিচার) বিশ্ববিদ্যালয় তা তখনো মধ্যযুগীয় স্কলাষ্টিসিজমের আবহাওয়ার ভেতরেই পরিচালিত হচ্ছিল। সেজন্য মিল্টন কেম্ব্রিজে ও লক্ অক্সফোর্ডে তাঁদের সময় অযথা নষ্ট হচ্ছে বলে অনেক সময়েই মনে করতেন। রাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর সংরক্ষণশীলতা আরো বেড়ে গেল এসব কেন্দ্রে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রেণেসঁসের নব আলোকে আনা প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

যেমন অন্যত্র ঘটেছিল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও তেমনি নোতুন বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতিগুলো কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে তাদের স্থান আস্তে আস্তে করে নিচ্ছিল। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে প্রগতিশীল ছাত্র ইচ্ছে করলে যে কোন নোতুন বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করতে পারতো প্রাইভেট টিউটরের কাছে গিয়ে। গণিতশাস্ত্র, অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকরা পুরানো শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে লাগলেন তীব্রভাবে; যাহোক শুধু গণিতের ভাগ্য প্রসন্ন হোল কেম্ব্রিজে ডেকার্ট ও নিউটনের শিষ্যদের চেষ্টায়। কেম্ব্রিজে দর্শন সংক্রান্ত বিষয়ের ভেতর লকের *Essay Concerning the Human Understanding* পাঠ্য করা হোল কিন্তু অক্সফোর্ডে হোল না, কারণ পুস্তকে যুক্তির সহিত একেশ্বরবাদের সমর্থন থাকলেও প্রত্যাদেশ ধর্মে (revealed religion) যেন বিশ্বাসের অভাব ছিল। লকের পুস্তক অ্যারিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র পঠনপাঠনের চিরাচরিত ধারাও বদলে দিল। স্কটল্যাণ্ডেও এই তর্কশাস্ত্রের তীব্র সমালোচনা হ'তে লাগল এবং

এর জন্যই যত প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তা মধ্য যুগে ব্যাহত হয়েছিল একথা বিদ্বৎসমাজে মেনে নেওয়া হোল। সিলোজিসমের মারফত জ্ঞানের মুখোস প'রে বিজ্ঞানে পৌঁছান যায় না একথা যেন আজ এতদিন পর সবই বুঝতে পারল। স্কটল্যাণ্ডের লর্ড কেমস্ (Lord Kames) বলছেন, "চিন্তাকালীন আমি অনেক সময় অ্যারিষ্টটলের তর্কশাস্ত্রকে শিশুর খেলার সামগ্রী সাবানের বুদ্বুদের সংগে তুলনা করিয়াছি, বাহিরে মনোরম, রঙীন কিন্তু ভিতরে ফাঁপা।" এ ধরনের মতবাদের ফলে স্কটিশ্ বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে বেকন ও লক্ পাঠ্যতালিকায় স্থান পেলেন, অ্যারিষ্টটল পড়লেন পিছিয়ে। গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক অ্যাডাম স্মিথ্ (১৭৫০ খ্রীঃ অঃ) দর্শনের লেকচার ল্যাটিনে না দিয়ে ইংরেজীতে দিলেন এবং সেই হ'তে এ ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। ইংরেজীতে লেকচার হ'তেই ধরা পড়ে গেল যে এ ধরনের তর্কশাস্ত্র না করে বৈজ্ঞানিক চিন্তায় সাহায্য, না করে কর্মক্ষেত্রে জীবন-সংগ্রামে সাহায্য। স্কটল্যাণ্ডের দার্শনিকরা যথাসম্ভব ব্যবস্থা বদলে দিলেন। গ্ল্যাসগোতে উর্দ্ধগ তর্কশাস্ত্র ও মনস্তত্ত্ব ছাড়াও ইংরেজী রচনা ও সাহিত্য পাঠের বন্দোবস্ত হোল, অ্যাবারডিন ও এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়েও এ পরিবর্তনের ঢেউ এসে লাগল।

সমস্ত আন্দোলনটাই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও অধিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সপ্তদশ শতাব্দী হ'তে মানুষ যেন নোতুন এক রাজ্যে এসে বাস করতে সুরু করল। এ শতাব্দীতে এত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হয়েছে জীবনের নানাক্ষেত্রে যে মানুষ সাময়িকভাবে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ল, আর কিছুদিনের মত নোতুনের পেছু ছুটলো না—তাই অষ্টাদশ শতাব্দী মনে হয় সব চুপচাপ শান্ত, কোন প্রগতির তাড়া নেই। কিন্তু এই নিস্তরংগ নদীগর্ভে লোক-চক্ষুর অন্তরালে আবার নোতুন ঢেউ ফুলে ফুলে উঠছিল,—সমাজের ভেতর আবার নানা নোতুন প্রেরণা এসে দেখা দিল এবং সামাজিক আলাপ-আলোচনা সবই এই নোতুনের খাতে প্রবাহিত হ'তে

লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সম্ভ্রান্ত যুবকরা এমন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে তাঁরা আলোচনা বা সমালোচনা করেননি, এমনকি তাঁরা অনেক সময় অসভ্যের স্বাভাবিক জীবনকেও বরণ করে নিতে প্রস্তুত হোলেন (অন্ততঃ কথার মারফতে) অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদগ্ধ জীবনের কৃত্রিমতায় জর্জরিত হয়ে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, প্রকৃতির আওতায় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং এদের লিখনভংগি ও ভাবাবেগে শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এই নব প্রেরণা এল একজন ফরাসীদেশ নিবাসী সুইস (Swiss) মনীষীর কাছ থেকে যাঁর প্রতিভার তুলনা আজও জগতে পাওয়া ভার।

রুশো ও শিশু

প্রকৃতির শিক্ষা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষা নিশ্চল হ'য়ে পড়েছিল কিন্তু নোতুন প্রেরণা গজিয়ে উঠছিল রুশোর ভাবধারায়, ফরাসী-বিপ্লবীদের পরিকল্পনায় ও পেষ্টালট্‌সির নানা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থায়। কুসংস্কার ও আনুষ্ঠানিক প্রাণহীন ধর্মকে দূর করে জমি তৈরী করলেন ভল্‌টেয়ার, ডিডিরো এবং তাঁদের সমসাময়িক ইংরেজ ও ফরাসী লেখকরা। তাঁরা অবশ্য শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেননি, কিন্তু তাঁরা মানসিক আবহাওয়াটি বদলে না দিলে শিক্ষাসংস্কারের কথা কেউ কানেও তুলতো না।

শিক্ষা সম্বন্ধে ফরাসীদেশে যত নোতুন ও বৈপ্লবিক চিত্তচমৎকারী ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন আর কোথাও হয়নি। তবে একদিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যেসুইটদের প্রগতি-বিমুখতা এবং অপর দিকে ক্ষীয়মাণ রাজন্যশক্তির দুর্বলতায় কার্যকালে কোন সংস্কারই সম্ভব হয়নি।

শিক্ষায় রুশো (১৭১২-১৭৭৮) যুগপ্রবর্তক, বিপ্লবী, শিশুর স্রষ্টা, তাঁর মতবাদ আজও আমাদের শিক্ষা নীতি ও প্রণালী গভীর-ভাবে প্রভাবান্বিত করছে—শিক্ষায় প্রকৃতিবাদ (Naturalism) আজও খুবই প্রাণবন্ত। রুশো প্রথম লোক চক্ষুর সম্মুখে এলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ডিজোঁর একাডেমির (Academy of Dijon) পারিতোষিক লাভ করে; তাঁর প্রবন্ধ *Discourse on Science and Arts* (*1750*) এর মৌলিক ভাবসংঘাতে প্যারিসে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল। তিনি বললেন বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে অর্থাৎ সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটে, তার সাহস, বীরোচিত ব্যবহার, নাগরিকত্ব এককথায় মনুষ্যত্ব যায় হারিয়ে। তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধে

Discourse on the Origin of Inequality Among Men (*1754*) তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হোলেন যে প্রকৃতির রাজ্যে সভ্য সমাজের চাইতে অনেক বেশী সাম্যভাব থাকে পরস্পরের মধ্যে—এবং শিক্ষা মানুষের স্বাভাবিক অসাম্যকে আরো বড় করে তোলে। সমাজের সংস্কার তখনই সম্ভব যখন মানুষ আবার প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাবে। প্রকৃতির রাজ্য অবশ্য রুশোর আবিষ্কার নয়, তাঁর যথেষ্ট সন্দেহও ছিল। অন্যান্য মনীষী প্রকৃতির রাজ্যের যেরূপ বর্ণনা দিয়েছেন সেরকম কিছু আদবেই ছিল কিনা। তাই তিনি তাঁর প্রকৃতির রাজ্যের নোতুন মূর্তি গড়লেন—তাকে পরিণত করলেন আদর্শ অবস্থায় বা সমাজে। যদিও রুশো সময় সময় উন্নতমনা আদিম অধিবাসীর (the noble savage) কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি বর্বর বা আদিম জীবনে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছা কোন দিনই প্রকাশ করেননি। যে প্রকৃতির রাজ্যের কথা রুশো বলেছেন তা হচ্ছে সরল সাদাসিধে চাষী জীবনের শান্ত পরিবেশ, শহরের বিলাসিতা, দুর্নীতি, দুষ্ট আবহাওয়া ও শ্রেণীভেদ থেকে বহুদূরে। এ আদর্শ টমাস জেফলার মনের মত আরো অনেকেরই ছিল। তবে প্রকৃতি শব্দটি রুশো সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখেননি, মানুষের প্রকৃতি ও অন্যান্য অর্থেও ব্যবহার করেছেন তা আমরা পরে দেখতে পাবো। *Discourse* দুইখানি ছাড়াও, প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর পক্ষে রুশোর এ কয়খানি বই জানা দরকার :—*Discourse on Political Economy* (*1755*), *Julie or the New He´loise* (*1761*), *The Social Contract* (*1762*), *The E´mile* (*1762*), এবং *The Considerations on the Government of Poland* (*1773*), এগুলোর ভেতর শুধু *E´mile*-কেই শিক্ষানীতি সম্বন্ধে গোটা পুস্তক বলা যেতে পারে, *Julie* বা *The New He´loise* একটি রোমান্টিক নভেল গৃহশিক্ষার আদর্শ নিয়ে লেখা। 'এমিল' ও 'জুলি' দুটিই পরিবারের বা গৃহের শিক্ষাকেই অনেক উঁচু স্থান দিয়েছে স্কুলের শিক্ষার চাইতে।

অপর তিনটি পুস্তকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনার ভেতরে রাষ্ট্রপরিচালিত সাধারণ স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং শেষোক্ত পুস্তকে একটি পরিকল্পনাও দেওয়া হয়েছে। কাজেই রুশো সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে একেবারে বর্জন করেছেন একথা বললে অন্যায় হবে। তবে আদর্শ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে রুশো সন্দিহান ছিলেন ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য, তাই প্রচলিত কার্যে শিক্ষাব্যবস্থার হাত হ'তে রক্ষা পেতে হোলে গৃহশিক্ষাই শ্রেয়, তিনি মনে করতেন বিশেষ করে যাদের অর্থ আছে তাদের জন্য।

রুশোর নাম চারদিকে বিশেষভাবে জাহির হয়ে পড়লো *Julie* বা *New Héloise* প্রকাশিত হবার সংগে সংগে (১৭৬১)। এখানি ভাবরসের উপন্যাস এবং সমস্ত ফরাসী দেশের ভেতরে যেন একটা নব শিহরণ প্রবাহিত হয়ে গেল। প্রাণহীন বিদগ্ধ জীবনের কৃত্রিমতার ভেতর এ নব সঞ্জীবনী রসের সঞ্চার করে রোমান্টিক যুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল। এ উপন্যাসে আমরা দেখি জুলির প্রাক্তন প্রণয়ী (রুশো) জুলি ও তাঁর স্বামীর গৃহে উপনীত হয়েছেন এবং জুলি কিভাবে তাঁর শিশুসন্তানদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাই হচ্ছে রুশোর শিশুজীবনের শিক্ষাদর্শ। এ প্রণালীটি অতি আধুনিক এবং মনে হয় যেন মন্টিসরি স্কুলে শিক্ষা হচ্ছে—হাসিখুশী উচ্ছল শিশুর দল উদ্যান ও গৃহের নানা কাজে ব্যস্ত, মাতা দূরে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষিকা হিসেবে। জুলিকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে শাসন করতে হচ্ছে না, 'এটা করো', 'ওটা করো না' বলতে হচ্ছে না, কথা কইতে বা চুপ করতে বলতে হচ্ছে না, সব জিনিষটাই যেন একটা সুশৃংখলার ভেতর দিয়ে শান্ত প্রফুল্ল আবহাওয়ায় চলেছে। জুলি রুশোকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এ আপাত প্রতীয়মান নির্বিকার ভাবের পেছনে রয়েছে মাতার তীক্ষ্ণ জাগ্রত দৃষ্টি, এবং তাতেই সম্ভব হচ্ছে এ প্রশান্তি ও আনন্দ। তিনি তাঁর ও স্বামীর শিশুশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বলছেন, "আমরা

আমাদের সন্তানদের উপর জোর করিয়া কৃত্রিম বাহ্য রূপের ছাপ অংকিত করিয়া দিতে চাই না, আমরা চাই তাহারা তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে ভিতর হইতে গড়িয়া উঠুক।" এখানে প্রকৃতির অর্থ শিশুর প্রকৃতি, তার সহজাত প্রবৃত্তি, অনুভূতি, ভাব ইত্যাদি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সকল শক্তির সমবায়। শিশু, বালক, কিশোর ও যুবকের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাই হোল এমিলের উপপাদ্য বিষয় এবং সেজন্য এমিলকে যুগান্তকারী পুস্তক বলা হয়। কারণ এর পূর্বে কমিনিয়াস্ প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রকৃতিলব্ধ কতগুলো শিক্ষানীতির কথা উল্লেখ করলেও রুশোর মত এত গভীরভাবে বিষয়টির ভেতর প্রবেশ করেননি এবং শিশুকেও তার স্বাধীন সত্তা দেননি। লক্‌কে রুশো শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর কাছে কতগুলো মতবাদের জন্য ঋণীও, কিন্তু গৃহশিক্ষা ছাড়া লকের সংগে অত্যাবশ্যক বা মুখ্য ব্যাপারগুলোতে রুশোর মিল নেই। কাজেই রুশোকে লকের প্রোৎসাহী প্রতিভাশীল ভাষ্যকার হিসেবে দেখার মত ভুল নেই।

Émile-এর মত আর কোন পুস্তকই মানুষের মনের ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। যেমন এর প্যারাডক্স বহুল লিখনভংগি, আন্তরিকতা ও প্রাণস্পর্শী ভাব তেমনি এর মানুষের মনকে ধাক্কা দেবার প্রচণ্ড ক্ষমতা প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিষাণ বাজিয়ে, শিক্ষায়, ধর্মে, সঞ্জীবনী রসে সিক্ত সম্পূর্ণ এক নোতুন বাণী প্রচার করে। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এমিল প্রকাশিত হয় এবং সংগে সংগেই প্রগতিবিরোধী সংরক্ষণশীল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যাচারের জয়মাল্যে রুশোকে বিভূষিত করে তাঁর পুস্তকের বৈপ্লবিক অভিনবত্ব জগৎ সমক্ষে প্রকট করে। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় সরবোন (Sorbonne) ও স্পেনের Inquisition কর্তৃক এমিল নিন্দিত হয়, প্যারিসের আর্চবিশপ কর্তৃক ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত হয়, এবং প্যারিসের ক্যাথলিক পার্লামেন্ট এবং জিনিভার প্রটেষ্টান্ট কাউন্সিল কর্তৃক এ পুস্তকখানিকে পুড়িয়ে

ভস্মসাৎ করবার হুকুম দেওয়া হয়। সে অবধি জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক, প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক, উদ্দীপনা দ্বারা হোক বা প্রত্যাখ্যান দ্বারাই হোক এমিল জগতের শিক্ষানীতি ও পদ্ধতিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। রুশো, লক্, মন্টেন, প্লুটার্ক ও অন্যান্য শিক্ষাবিদের কাছে ঋণী সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর প্রেরণা ও প্যারাডক্সের প্রভাবে এমিল শুধু বিদ্বৎসমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রইল না সাধারণ মানুষের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল। Madame of Staëb-র কথায় বলতে হয়, "রুশো সমগ্র পৃথিবীতে যেন একদিনে আগুন ধরাইয়া দিলেন।" শিক্ষাজগতের রুশো হোলেন কপোর্নিকাস্ ; তিনি বয়স্ককে প্রত্যাখ্যান করে শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্র করলেন, অর্থাৎ বয়স্ক-কেন্দ্রিক না হ'য়ে শিক্ষা হোল শিশুকেন্দ্রিক। তিনি স্পষ্টভাবে এমিলের ভূমিকায় একথা বলেছেন, "জগতের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা বয়স্ক মানুষের কি শিক্ষা করা উচিত এই চিন্তা নিয়াই নিয়ত ব্যস্ত রহিয়াছেন, শিশু কি শিক্ষা করিতে পারে সে কথা নিয়া নয়। শিশুর ভিতরে পূর্ণবয়স্ক মানুষটির সন্ধানই তাঁহারা নিয়ত করিয়াছেন, কিন্তু কোন সময়েই বয়স্ক মানুষে পরিণত হইবার পূর্বে শিশু কি ছিল সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নাই। ......সুতরাং সর্বপ্রথম কাজ হইতেছে শিশুকে বিশেষ করিয়া জানা কারণ তাহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিবার আছে।" রুশোই শিশুমনস্তত্বের জনক এবং তাঁর সময় হ'তেই শিক্ষাকে মনস্তাত্বিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলে এসেছে, পেষ্টালট্সি প্রথম এ কাজে হাত দেন, তাঁর নাম এজন্য চিরস্মরণীয়। পাঁচশ' পাতার বই এমিল পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত ; প্রথম অধ্যায়ে দু'বছর পর্যন্ত ভাবী নায়কের (শিশুর) শিক্ষা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দু'বছর থেকে বার বছর পর্যন্ত শিক্ষা, তৃতীয় অধ্যায়ে বার বছর থেকে পনের বছর পর্যন্ত শিক্ষা, চতুর্থ অধ্যায়ে পনের বছর থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত কৈশোরের শিক্ষা এবং পঞ্চম অধ্যায়ে নায়িকা

সোফির (Sophie) শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এই পাঁচটি ভাগে বা স্তরে ছাত্রের শিক্ষাজীবনকে ভাগ করেছেন রুশো এবং খুব জোরের সহিত তিনি বলেছেন যে শিক্ষা হবে ক্রমিক অর্থাৎ যে স্তরের শিক্ষা যেরূপ হওয়া প্রয়োজন সেরূপ ব্যবস্থাই হবে। পুরানো শিক্ষায় কোন স্তর বা ভাগ ছিল না। শিশু ছিল বয়স্কের ছোট সংস্করণ, জ্ঞান ও তথ্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মস্তিষ্কে যেমন গুঁতিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত তেমনি করেই দেওয়া হ'ত শিশুর মস্তিষ্কে। রুশো এমিল লেখার পর এরকম অস্বাভাবিক ব্যাপার বন্ধ হ'য়ে গেল।

রুশো আমাদের বলেছেন যে শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থী একজন মাতাকে সাহায্য করার প্রচেষ্টা থেকেই এমিলের উৎপত্তি। তবে বইখানি সম্পূর্ণ ও বৃহৎ, হয় ত দার্শনিকের কল্পনা-জল্পনায় ভরা, কারো কারো মতে স্বপ্নের মত অলীক কিন্তু পুস্তকখানা যে শিক্ষানীতি ও ভাবধারার একটি অফুরন্ত উৎস সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজও যতবার বইখানা পড়া যায় ততবারই শিশু, বালক ও কিশোর চরিত্রের নানা অনুদ্ঘাটিত দিক যেন খুলে যায়, দৃষ্টি হয়ে আসে স্বচ্ছ, এর নোতুনত্ব যেন আর শেষ হয় না। রুশো যে প্রশ্ন নিয়ে সুরু করেছেন সেটি হচ্ছে এই নয়—আমরা কি করে বিদ্বান্, ব্যবহারজীবী, সেনানী বা চিকিৎসক তৈরী করব? কিন্তু প্রশ্নটি হচ্ছে এই—কি করে শিশুকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী প্রথমে শিশু, পরে বালক, কিশোর ও বয়স্ক মানুষ হিসেবে তৈরী করতে পারি যেমনটি করে তার প্রকৃতি দাবী করে? জীবনে পদ, মান বা আর্থিক অবস্থার কিছুই স্থিরতা নেই, কাজেই রুশো বলছেন, "মানুষের মত বেঁচে থাকতে হয় কি করে শিশুকে বৃত্তি হিসাবে সে শিক্ষাই দিব" এবং প্রথমে শিশুর জীবন উপভোগ করে সে প্রকৃত শিশু হোক এই রুশোর কামনা।

রুশো নিজকে শিশুর গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কল্পনা করলেন। পিতামাতা থাকলে শিক্ষকের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারেন

এই ভেবে রুশো এমিলকে করলেন অনাথ কিন্তু ধনী সন্তান যাতে শিক্ষার পরিবেশটি হয় যথাযোগ্য। "Cities are the grave of the human race"; সুতরাং রুশো এমিলকে নিয়ে গেলেন গ্রামাঞ্চলে বৃহৎ উদ্যান ও বনানী সম্বলিত এক প্রাসাদদুর্গে শহর থেকে দূরে যেখানে মালী, চাকরবাকর, গ্রামের ছোট বালকের দল একেধারে থাকবে তার হাতের চেটোয়।

এমিলের সুরুই হয়েছে শিশুর মৌলিক প্রকৃতি দেবপ্রকৃতি এই বিশ্বাস নিয়ে এবং এ কলুষিত হয় দুষ্ট সমাজের পংকিল আবহাওয়ায়। তাই রুশো গোড়ায়ই বলেছেন, "Everything is good as it comes from the hands of the Author of Nature. Evil results from the perversion of Nature. God makes all things good; man meddles with them and makes them evil." সুতরাং শিক্ষার কাজ হচ্ছে—শিশুর নির্মল দেবপ্রকৃতিকে সংসারের কলুষ হ'তে রক্ষা করা এবং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাতে করে নিজ হাতেই শিশুর প্রবৃত্তি ও শক্তিনিচয় পুষ্ট ও বর্ধিত হ'তে পারে। শিক্ষার কাজ হচ্ছে তার শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির অন্তরায়গুলোকে সরিয়ে দেওয়া —সে হিসেবে প্রথম দিকের শিক্ষা হবে নেগেটিভ। রুশোর এ চরম মতবাদে অবশ্য অসামঞ্জস্য কিছু না আছে তা নয়, কারণ মানুষ যদি সকল সৎপ্রবৃত্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে তাহলে সমাজের সংস্পর্শে এসে মানুষ বা শিশু খারাপ হবে কি করে? রুশোকে এ চরম মতবাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল অন্য একটা প্রচলিত চরম মতবাদকে খণ্ডন করবার জন্য—সেটি হচ্ছে মানুষের আদিম পাপ (Original Sin), শিশু সয়তান, অসৎপ্রবৃত্তির আগার ইত্যাদি মধ্যযুগীয় চার্চের কলংক অবলেপনের প্রচেষ্টা ও কঠোর দৈহিক শাস্তিব্যবস্থা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে। শিশুর কতগুলো প্রবৃত্তি যে খারাপ থাকতে পারে বা কালক্রমে খারাপ হ'তে পারে এ বিষয়ে রুশো যদি একেবারে এত অজ্ঞ থাকতেন, তাহলে এমিলের

শিক্ষার বিষয়ে রুশো এত সতর্কতা অবলম্বন করতেন না। আজকের মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, প্রবৃত্তিগুলো আমাদের খারাপও না, ভালও না, সবই জীবনের প্রয়োজনে দরকার; তবে এগুলোর নৈতিক ও সামাজিক খাতে চালিত করতে পারলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হয়। এমিল খুঁটিয়ে পড়লে রুশোর মতবাদ যে এ থেকে খুব বিভিন্ন ছিল তা বলে মনে হয় না। এ কথা অবশ্য সত্য রুশো শিশুর মধ্যে দেবত্বের ভাব দেখেছিলেন বেশী, যেমন দেখেছিলেন কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ—

> 'Trailing clouds of Glory, do we come
> From God who is our home.'

রুশো চাইলেন তাঁর এমিল উন্নতমনা সাদাসিধে আদিম অধিবাসীর মতই বলিষ্ঠ দেহ স্বাস্থ্যে দীপ্তিমান হোক, তাই শিশুকে আঁটা কাপড়-চোপড়, টুপি, বন্ধনী দিয়ে ঢেকে-ঢুকে রাখবার প্রচলিত ব্যবস্থা পরিত্যাগ করতে বললেন যাতে শিশুর অংগে আলো-বাতাস লাগে এবং রক্তচলাচল স্বাভাবিকভাবে হয়। ধাত্রী হবে অনাথ এমিলের প্রথম শিক্ষক, সে তাকে প্রশস্ত দোলনায় নরম বিছানায় শুইয়ে দেবে যেখানে সে মনের আনন্দে খুশীমত হাত-পা ছুঁড়বে। ধাত্রী বা মাতা তাকে বুকের স্তন্য দেবে, কিছুদিন বাদে যখন সে হামাগুড়ি দিতে পারবে, তখন তাকে ঘরময় ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। তাকে প্রায়ই স্নান করিয়ে দেবে ধাত্রী (সেদিনে এবং আজও ইউরোপে স্নানের ব্যবস্থা খুবই খারাপ) যাতে স্নানের অভ্যাস হয় প্রথমে উষ্ণ জলে এবং পরে ঠাণ্ডা জলে এবং আস্তে আস্তে একেবারে ঠাণ্ডা জলে। ডাক্তার ডাকার বালাই রাখবে না, তাঁদের ওষুধে কোন কাজ হয় না। অন্ধকার ঘরে শিশু থাকতে যাতে ভয় না পায় তা দেখতে হবে—অন্ধকার সম্বন্ধে ধাত্রীর বা মাতার যেন কোন ভয় না থাকে। খুব সাদাসিধে ধরনের খাদ্যের ব্যবস্থা হবে, নিরামিষ আহার শ্রেয় কারণ মাংসাহার অস্বাভাবিক। এ পর্যন্ত রুশো যে উপদেশ দিয়েছেন

তা অতি চমৎকার এবং চিকিৎসাশাস্ত্রাভিজ্ঞ র‍্যাবেলের চাইতেও এ বিষয়ে যেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি বেশী ছিল। তবে এর পরে রুশো যে কথাটি বললেন তা নিয়ে অনেক প্রতিবাদ হয়েছে কিন্তু তিনি কি বলতে চেয়েছেন সেটা খুব তলিয়ে না দেখেই প্রতিবাদ হয়েছে।

তিনি বললেন, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, খেলাধুলো ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন অলংঘ্য অভ্যাস গঠন করবে না। "The only habit the child should be allowed to form is to contract no habit at all." নিয়মিত সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে খাওয়া-দাওয়া, ঘুম ইত্যাদি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল রুশো একথা জানতেন, অভ্যাস গঠনের বিরুদ্ধেও ছিলেন না,—তিনি নিজেই শিশুর স্নানের অভ্যাসের কথা বলেছেন, তবে তিনি যা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে ক্ষুধার তাড়না না থাকলেও ঠিক সময়ে খেতে হবে, শরীর ভাল না থাকলেও খেলতে হবে, নিয়মিত সময়ে ঘুমের প্রয়োজন না থাকলেও ঘুমুতে হবে, প্রয়োজন না থাকলেও অভ্যাস হয়েছে বলেই কোন কাজ করতে হবে—অর্থাৎ অভ্যাসের দাস হ'তে হবে এ জিনিষটি রুশো মোটেই বরদাস্ত করেননি। প্রয়োজন থাকলেও রুশো বলছেন, কোন বিষয়ে অভ্যাসের শৃংখলে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। শিশুকে যদি ধাত্রী শুধু এক হাতে কোলে তুলে নিয়ে বেড়ায়, তাহলে অন্য হাতে নিতে গেলেই তার আপত্তি হবে। কাজেই বিভিন্ন সময়ে দু'হাতে নেওয়ার ব্যবস্থাই করতে হবে। শিশুকেও সমানে দু'হাতই ব্যবহার করতে দিতে হবে যাতে এক হাতে কাজ করার অভ্যাস দাঁড়িয়ে না যায়। প্রয়োজনবোধে মানুষ কাজ করবে এবং অভ্যাস ভাল হোলেও একেবারে অভ্যাসের দাস হবে না একথা আজকের মনস্তাত্ত্বিকরাও বলেন। ম্যাক্‌ডুগাল তাঁর *Outlines of Psychology*-তে একথা বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন অভ্যাসের ওপরে সেন্টিমেন্টের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। কাজেই রুশো যে শুধু প্যারাডক্সের লোকে এ কথা বলেছেন একথা ঠিক নয়।

এমিল উন্মুক্ত আলো-বাতাসে খেলা করবে এবং খেলার সামগ্রী হবে খুব সাদাসিদে ধরনের—ফুলফলশুদ্ধ গাছের ডালপালা, আফিং বা পোস্ত গাছের ফুল, বীচি যা নাড়লে ঝন্ঝন্ করে আওয়াজ হয় ইত্যাদি,—দামী কলকজার খেলনা নয়। যাতে তার স্নায়ুগুলো শক্ত হয় ও ভয় না জন্মাতে পারে সেজন্য আস্তে আস্তে তাকে কোল ব্যাঙ, কাঁকড়া, সাপ, ক্রমিকভাবে নানারকম বীভৎস মুখোস দেখিয়ে, ছোট পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়ে বা অন্যান্য আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন করে সাহসিকতার অভ্যাস গঠন করতে হবে। শিশুর আবদার বা একগুঁয়েমির প্রশ্রয় কখনও দিয়ো না, চোখের জলে যেন সে প্রভু হয়ে না বসে। যদি সত্যিকার শারীরিক কষ্ট হয় শিশুর তা অবশ্য দূর করবে। ভৃত্যেরা যেন তাকে বিরক্ত বা যন্ত্রণা না করে। শিশু শুনবে সুষ্ঠুভাবে উচ্চারিত শব্দ বা কথাবার্তা (কুইন্টিলিয়ানের উপদেশের কথা স্বতঃই মনে আসে) ও আনন্দের গান। এখন শিশুর দু'বছর পূর্ণ হোল, সে কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু মস্ত বড় ভুল হবে যদি আমরা তাড়াতাড়ি করে তাকে অনেক কথা বলতে শিখিয়েদি যে-সব কথা বা শব্দের অর্থ সে হৃদয়ংগম করতে পারে না (অভিজ্ঞতার অভাবে)—এরূপ করা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ হবে।

শিশু তার আপন ধারণা বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্য শব্দ ব্যবহার করে, তার ধারণা যখন বাড়বে, তখন নিজেই সে বেশী শব্দ ব্যবহার করবে। জোর করে তাকে বেশী শব্দ শিখিয়ে দিলে তার মানসিক শক্তি হ্রাস পাবে এবং পরবর্তীকালে স্পষ্ট ধারণা না থাকা সত্ত্বেও বুলি আওড়ে যাবার বদ অভ্যাস গঠিত হবে। "Let the Child's vocabulary, therefore, be limited ; it is very undesirable that he should have more words than ideas ; that he should be able to say more than he thinks...."

(1) তিন বছর থেকে বার বছর পর্যন্ত এমিলের ইন্দ্রিয়গ্রাম ও দৈহিক শক্তি গঠন করা হবে। লকের শরীর মজবুত করবার ব্যবস্থা শৈশব থেকে সুরু হয়ে বাল্যকাল ও কৈশোর অবধি চলবে, মুক্ত বাতাসে দৌড়ধাপ ও ব্যায়াম করে সে শুধু তার শরীরকেই সবল করবে না, তার ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রকৃতির পরিবেশ থেকে পরিপুষ্ট করবে এবং বাস্তব জগতের নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে। জলে ও ডাঙায় এমিলকে সমান পারদর্শী হ'তে হবে—বড়লোকের ছেলেরা পয়সা লাগে না বলে সাঁতার শেখেনা, শেখে ঘোড়ায় চড়া—এমিল ছ'টোই শিখবে সাঁতারের স্কুল বা ঘোড়ায় চড়ার স্কুলে না গিয়ে।

শিশুদের যুক্তিশক্তি (reason) যে একেবারে নেই রুশো একথা বলেন না। তিনি বলেন তাদের যুক্তিশক্তি খুবই সীমাবদ্ধ। নিজেদের অতি নিকট সুখ বা মংগল সম্বন্ধে যেটুকুন বুঝতে পারে সেটুকুন সম্বন্ধেই অল্পস্বল্প বিচার করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে, তাদের সত্যিকার মংগল কি, লোকে কি ভাববে বা বিমূর্ত ধারণা (abstract ideas) সম্বন্ধে তাদের বিচার করবার শক্তি শৈশবে উন্মেষিত হয় না। উপযুক্ত বয়সের আগে ভালমন্দের তফাৎ ও সামাজিক সম্বন্ধ তারা ধরতে পারে না, সুতরাং কর্তব্য করা উচিত এসব কথা তাদের না বলাই ভাল; লক্ ছেলেমেয়েদের বিচার দ্বারা বুঝিয়ে দিতে বলেছেন। কিন্তু বিচারবুদ্ধি হয় সবচেয়ে দেরীতে কাজেই তাদের সংগে তর্কবিতর্ক করা বৃথা সময় নষ্ট। সুতরাং তাদের কোন হুকুমও দিতে নেই, কিছু বারণও করতে নেই। তার নিজের কর্মফলই তাকে শিক্ষা দেবে। আলাদা করে শাস্তি দেবার প্রয়োজন নেই। একেই স্বাভাবিক বা প্রকৃতির কর্মফলনীতি বলা হয়—উনবিংশ শতাব্দীতে Herbert Spencer-এর আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। এমিল যদি জানালা ভাঙে নিজেই ঠাণ্ডায় ভুগিবে; বোকা হওয়ার চাইতে ভোগা ভাল। সুতরাং নীতিবাদ এবং ইতিহাস, ভাষা,

সাহিত্য ইত্যাদি সামাজিক ও ধারণামূলক পাঠ্য বিষয় শিশুদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার মত ভুল আর নেই, কারণ সত্যিকারের সে জিনিষটা বুঝতে পারে না অথচ শিশু ও বালকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় যে শব্দ ও ভাষা আয়ত্ত করলেই জ্ঞান জন্মায়। কিন্তু 'Verbal knowledge comes but wisdom lingers.' এইখানেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গলদ। কৈশোরের সংগে সংগে যুক্তিশক্তি আসবে, তখন তাকে সামাজিক ও নৈতিক আচরণের প্রয়োজনীয়তা শোনাব এবং সেও আনন্দচিত্তে শুধু শিক্ষককেই নয়, গোটা সমাজকেই মেনে চলবে। শিশু নিজের ভাবে দেখে, চিন্তা করে ও অনুভব করে, তার সম্মান আমাদের দিতে হবে।

তাই রুশো বলছেন, "The education of the earliest years should be merely negative. It consists not at all in teaching virtue or truth but shielding the heart from vice and the mind from error." তাই এমিলকে সহরের কলুষ হ'তে দূরে সরিয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। রুশোর মতে এমিলকে যদি বার বছর বয়স পর্যন্ত পুস্তকের ভারে নিষ্পেষিত না করে ও সহরের নানা প্রলোভন থেকে দূরে রেখে স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ভাস্কর করে তোলা যায় এবং অভ্যাস ও ভ্রান্ত সংস্কারের হাত হ'তে মুক্তি দেওয়া যায়, তাহলে পরে তার পক্ষে জ্ঞান আহরণ করা ও যুক্তি বা বিচারশক্তি অর্জন করা অনেক সোজা হবে। এ অবশ্য প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার একেবারে উল্টো, তাই তিনি বলেছেন, "Reverse the usual practice and you will almost always do right······Exercise his body, his organs, his senses, his powers, but keep his mind lying fallow (idle) as long as you possibly can." এই থেকে রুশো তার দ্বিতীয় মূল নীতি উদ্ভাবন করছেন, "The most useful rule in education is not to gain time but to lose it." এতে শিক্ষকের পক্ষেও ছাত্রকে অধ্যয়ন করার মস্ত বড়

সুযোগ ঘটে—তার প্রকৃতি অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দিতে হোলে তার রুচি, শক্তি, প্রয়োজন সবই খতিয়ে দেখতে হবে।

পুস্তকাদি বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাম কি করে শিক্ষা দিতে হবে যে সম্বন্ধে রুশো আমাদের কতগুলো মূল্যবান্ উপদেশ দিয়েছেন, কি করে জিনিষের উচ্চতা ও দূরত্ব নির্ণয় করতে শেখানো যায় এমিলকে, ড্রয়িং ও ব্যবহারিক জ্যামিতি (কাটা কাগজ ও দড়ির সাহায্যে) দ্বারা তার পর্যবেক্ষণ শক্তি কি করে বাড়ানো যায়, ইত্যাদি। রুশো সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, কাজেই শিক্ষণীয় বিষয় থেকে সঙ্গীতকে তিনি বাদ দেননি। কিন্তু এমিলকে পড়তে শেখাবার প্রয়োজন নেই, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যখন সে পড়তে শিখতে চাইবে, তখনই সে অতি সহজে শিখে ফেলবে। অন্য ছেলেরা এমিলকে পার্টির জন্য নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছে, পড়তে না পারলে তার ভাগ্যে আনন্দ জুটবে না, কাজেই সে পড়তে শিখবে। রুশো এখানে একটু হয়ত ভুল করেছেন, এত অনায়াসে ভাষা আয়ত্ত করা যায় না। ভাষাশিক্ষার ভিত্তি এত শিথিল থাকলে গ্রীক, ল্যাটিন্ এমিল কুড়ি বছর বয়সে রীতিমত অধ্যয়ন না করে শিখল কি করে? একি সম্ভব? মাতৃভাষা, ড্রয়িং ও ব্যবহারিক জ্যামিতি ছাড়া এ বয়সে আর কিছুই শেখবার প্রয়োজন নেই, বিচারশক্তি না হওয়া পর্যন্ত সত্যিকারের স্মৃতিশক্তি জন্মাতে পারে না, কারণ স্মৃতিশক্তি বিচারশক্তির ওপর নির্ভর করে, কাজেই শব্দ, ভাষা মুখস্থ হোলেও আসল অর্থ ও ধারণা শিশুর নাগালের বাইরে থাকে ; তাই গুচ্ছের ভাষা বা ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ ইত্যাদি শেখা সময়ের অপব্যয় মাত্র। রাজা, সাম্রাজ্য, বিপ্লব, আইন এসব ইতিহাসে ছেলে পড়তে পারে, কিন্তু এসব সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণাই তার হবে না, কাজেই কিছুই মুখস্থ করা উচিত নয়। এমনকি লা ফঁটেনের সুলিখিত গল্পও নয়—ধারণা স্পষ্ট হ'তে পারে না বলে লা ফঁটেনের নৈতিক গল্পগুলোও এমিলের প্রকৃতির বা স্বাভাবিক শিক্ষায় স্থান পাবে না।

কিন্তু কয়েকটি সাধারণ ধারণা আছে যা এমিলকে শিক্ষা দেওয়া যেমন সম্পত্তি সম্বন্ধে ধারণা। বাগানে মালীর কাজ দেখে এমিল নিজেই চারা গাছ পুঁততে চাইবে। অভিজ্ঞতার অভাবে যেখানে মালী খুব ভাল তরমুজের বীচি ছড়িয়েছে, সেখানেই এমিল সাধারণ ফরাসী বিনের (French bean) চারা গাছ পুঁতে দিল। মালী দেখে চটে আগুন, সে বুঝিয়ে দিলে তার জায়গায় হাত দিয়ে তার জিনিষ নষ্ট করা অন্যায় হয়েছে, বরং এমিলকে অন্য ছোট জমি দেওয়া হবে, যেখানে তার বিন সে জন্মাতে পারে। এ ধরনের ঘটনা থেকে নিজের এবং অপরের সম্পত্তি সম্বন্ধে তার ধারণা জন্মাবে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভোজবাজিকরের খেলা দেখে চুম্বকের গুণ ও গর্ব করার ভ্রম ইত্যাদি সম্বন্ধে তার ধারণা জন্মাবে। মণ্টমরেঞ্চির বনে শিক্ষকের কৌশলে পথ হারিয়ে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যামিতি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে।

স্বাভাবিক শিক্ষায় কোন অবস্থাতেই লোভ, প্রতিযোগিতা, হিংসা, আত্মগরিমা, ভীরুতা এসব নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, যেমন প্রচলিত শিক্ষায় দেওয়া হচ্ছে। ফলে এমিল বার বছর বয়সে স্বাস্থ্যে দীপ্তিমান, বলিষ্ঠ দেহ, বলিষ্ঠ মন, অমায়িক স্বভাব ও সজাগ ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করল।

বার থেকে পনের বছর বয়স অবধি এমিলের নানা পাঠ্যবিষয় নিজে শেখবার সময়—তার সজীব সতেজ প্রকৃতি, তার মানসিকশক্তি ও কর্মোদ্যমও অনেক বেশী প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ছাত্র অপেক্ষা। এখানে রুশো শিক্ষায় স্বাধীনতা-নীতি অবলম্বন করেছেন—এমিলের যা শিখতে ভাল লাগবে তাই সে শিখবে, সুতরাং শিক্ষক এমিলকে যা শেখাতে চান তা যেন এমিলের ভাল লাগে, যেন সে নিজে শিখতে চায় এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। শিক্ষায় স্বাধীনতা প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার আজ মূলমন্ত্র, তার জনক রুশো। আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষায় এর প্রয়োগ হচ্ছে সবচেয়ে বেশী —পাঠ্যতালিকায় বহু বিষয় স্থান পেয়েছে, যার যা খুশী তাই বেছে

নিতে পারে। ইংলণ্ডের পরীক্ষাব্যবস্থায়ও আজ ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছানুসারে পাঠ্যবিষয় বেছে নেবার পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে একটা নীতি রুশো উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে প্রয়োজননীতি—নানাবিধ জ্ঞানের ভেতরে যা বালক বুঝতে পারে এবং প্রয়োজন তাই সে আহরণ করবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এ নীতি রুশো মোটেই সংকীর্ণভাবে গ্রহণ করেননি। এ স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রাকৃতিক জগতকে বুঝতে শেখা এবং সরল সামাজিক সমস্যাগুলো সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জন করা। কৌতূহল হবে প্রধান সহায়। ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যার মূল তথ্যগুলো এমিল আবিষ্কার করবে আকাশ ও পৃথিবী থেকে, ম্যাপ বা গ্লোবের সাহায্যে নয় এবং পারিপার্শ্বিক থেকে নিজেই ম্যাপ তরী করতে শিখবে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে রুশো খুব ভাল কথা বলেছেন, "It is not proposed to teach the sciences but to give him a taste for them and methods for learning them when this taste will be better developed." পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ছোটখাট যন্ত্র এমিল নিজেই তৈরী করবে প্রয়োজন মত শিক্ষকের সহায়তায়; বাজার থেকে কিনে আনবে না। সব জিনিষই সে নিজে আবিষ্কার করবে—বর্তমান Heuristic Method-এর রুশোই জনক। তবে জ্যামিতি ও বিজ্ঞানের তথ্যাদি সবই নিজে আবিষ্কার করা সাধারণ ছাত্রের পক্ষে একবারে অসম্ভব। মেলায় ভোজবাজিকরের খেলা দেখে সে বিদ্যুতের গুণাবলী সম্বন্ধে সহজ ধারণা লাভ করল এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা সে থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, সাইফন, স্থিতিবিজ্ঞান (*Statics*), বারিবিজ্ঞান (*Hydrostatics*) ইত্যাদির অন্তর্নিহিত নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে। সে যে খুব বেশী শিখবে তা নয়, তবে শেখবার ক্ষমতা কৌতূহলের তাড়নায় তার জন্মাবে এইটেই রুশোর কাম্য এবং আজ আমাদেরও। পনের বছর হওয়ার আগেই এমিল ব্যবহারিকভাবে সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি সম্বন্ধে—কিভাবে

মানুষ একে অন্যের ওপরে নির্ভর করে (নৈতিক সম্বন্ধ বাদ দিয়ে) শিল্প ও বৃত্তির মাধ্যমে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করবে। সে নিজেই শিল্পী ও কারিগরের ঘরে যাবে এবং কি করে জিনিষ বানাতে হয় তাই দেখে সন্তুষ্ট না হয়ে, নিজেই হাতেনাতে কিছু তৈরী করতে শিখবে। রুশো লোহার কাজ, কাঠের কাজ, কৃষি এই সব প্রধান শিল্পই বেছে নিয়েছেন খোদাইর কাজ, সোনারূপোর কাজ, হীরে কাটার কাজ ইত্যাদির পরিবর্তে। সবচেয়ে বড় কথা এমিল নিজে একটি বৃত্তি শিখবে, সেটি হচ্ছে ছুতোরের কাজ, দরকার হয় জীবিকার্জন করবার উপায় হিসেবে। কারণ বিপ্লব আসছে রুশো তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "We are approaching a state of Crisis and a Century of Revolutions." লক্ বলেছিলেন একটি বৃত্তি শিখা শ্রমের মর্যাদাবোধের জন্য, কিন্তু রুশো আরও গভীরে গিয়ে বললেন শুধু মর্যাদাবোধের জন্যই নয়, মানুষের জীবনকে বোঝবার জন্য, সামাজিক অনিশ্চয়তায় জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসেবে। সর্বশেষে রুশো পুস্তকের কথা বলছেন—শুধু একটি পুস্তক পড়বে এমিল, শুধু পড়াই নয় তার জীবনের সংগে গেঁথে রাখবে—সেটি হচ্ছে রবিনসন্ ক্রুশো,—স্বভাবের শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বন্ধু—অ্যারিষ্টটল নয়, প্লেটো নয়, প্লিনি নয়।

পনর বছর বয়সে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বিচারশক্তির অনুশীলন হয়েছে। এবার কৈশোরে (১৫ থেকে ২০ বছর) এমিল সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবে, ভাবাবেগ ও অনুভূতির প্রাচুর্যের সংগে সংগে। এমিল চিন্তা করতে শিখেছে, এবার শিখবে ভালবাসতে—তাই উদ্দেশ্য হ'বে "to perfect the reason through the feelings." রুশো কৈশোরকে 'a period of storm and stress' বলেছেন, কারণ এসময়ে তীব্র ভাবাবেগে শিক্ষার সমস্ত ভিত্তি নড়ে যাবার মত হয়। মানুষ দ্বিজ, তার জন্ম দু'বার হয় একবার শৈশবে, আরেকবার কৈশোরে বা যৌবনে।

আমাদের মুখ্য জীবনরস হচ্ছে আত্মপ্রেম বা আত্মানুরক্তি এবং অহংভাব বা অন্যের ওপর আধিপত্য করবার বাসনা। আত্ম-প্রেমকে সুষ্ঠুভাবে চালিত করলে তা বিশ্বপ্রেমে পরিণত হ'তে পারে এবং নানা কোমল ভাবের উৎস হ'তে পারে। অন্যের প্রেম পেতে হোলে, সে পুরুষই হোক বা মেয়েই হোক, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হ'তে হবে। এই সত্যকে ভিত্তি করেই নৈতিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে। তবে প্রেম অর্জন করার প্রয়াস থেকে উল্টো ফলও হ'তে পারে—মানুষ হিংসা, দ্বেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জর্জ্জরিত হ'তে পারে। কাজেই নৈতিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে আত্মসংযম ও বিচারবুদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সব তীব্র অনুভূতি ও ভাবাবেগগুলো যাতে না প্রকট হয় তার চেষ্টা করা। অশ্লীল পুস্তক, দুশ্চরিত্র বন্ধুবান্ধব এবং তোষামোদকারী ভৃত্য এসবই নৈতিক অবনতির কারণ হ'তে পারে। রুশোর মতে ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিক আচরণ যুক্তিবিদগ্ধ বা যুক্তিউদ্দীপিত অনুভূতি, ধর্মনিষ্ঠা (Virtue) অন্তরের জিনিষ। রুশো এভাবেই এমিলের নৈতিক চরিত্র গঠন করতে চেয়েছিলেন।

রুশো অনুভূতির ভেতর দিয়ে নৈতিক বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে অন্যায় করেননি, কারণ শুধু বিচারবুদ্ধি দিয়ে নৈতিক ভাব গড়ে ওঠে না, তার পেছনে চাই ভাবাবেগ বা অনুভূতির প্রেরণা—নৈতিক ভাব বা সেন্টিমেন্টের প্রতিষ্ঠা হোলে আত্মসংযমের অভাব হয় না। স্বভাবের শিক্ষায় আত্মসংযম গড়ে ওঠে না এ কথা মানা শক্ত।

মানুষের সংগে পরিচয় হবার এই সময়। অভিজাত সমাজের আবর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ার আগে মানুষের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। ইতিহাসের মাধ্যমে খানিকটা এ উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারবে, কারণ নৈতিক আচরণ শিক্ষা দেবার জন্য সত্যিকারের বড়লোকদের জীবনী হচ্ছে একটি প্রধান উপায়। যদিও নীতিশিক্ষা ইতিহাসের উদ্দেশ্য এ কথাটা আজকালকার

শিক্ষাবিদরা মেনে নেবেন না, তাহলেও এও অনস্বীকার্য যে ইতিহাস থেকে নীতিবিদ্ ও রাজনীতিবিদের অনেক শেখবার বিষয় আছে। প্রচলিত ইতিহাস লেখার পদ্ধতি সম্বন্ধে রুশো মূল্যবান্ সমালোচনা করেছেন।

এসময়ে যৌনজ্ঞান সম্বন্ধে এমিলের কৌতূহল জাগবে। রুশো এবিষয়ে খুব ভাল উপদেশ দিয়েছেন—তিনি বলেছেন কোনরকম চাঞ্চল্য বা অপ্রতিভ ভাব না দেখিয়ে কিশোর যা জিজ্ঞেস করবে তার যথাযথ উত্তর দিতে হবে। দরকার হয় তাকে থামিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু অসত্য উত্তর দেওয়া চলবে না। আজও আমরা এ উপদেশ পালন করতে সাহস পাই না, কিন্তু এ না-হোলে স্ত্রীপুরুষ সম্পর্ক সম্বন্ধে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ধারণার সৃষ্টি হবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেমন এতদিন হয়ে আসছে। তবে রুশোর একটা ভুল হয়েছে—কামিবা ও যৌনজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল শৈশবেই জাগে, কৈশোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। তবে রুশোর উপদেশ সব অবস্থাতেই প্রযোজ্য। এতদিন এমিলকে ধর্মসম্বন্ধে কিছু শেখানো হয়নি কারণ ভগবানের সত্তা সম্বন্ধে তার ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতো এবং শেষ পর্যন্ত অন্ধ পৌত্তলিকতায় গিয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু আজ সময় এসেছে তাই বিশেষ ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের শৃংখল এড়িয়ে রুশো এমিলকে স্বাভাবিক ধর্মের দুটি খুব বড় জিনিষ—ভগবানের অস্তিত্ব এবং আত্মার অবিনশ্বরত্ব শেখালেন খ্রীষ্টীয় প্রত্যাদেশ ধর্মের দোহাই না দিয়ে। পাহাড়ের ওপরে উদীয়মান সূর্যের আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল প্রভাতে হোল এই শিক্ষা। রুশো বিশ্বাস করতেন একজন সুশিক্ষিত কিশোর তার ধীশক্তি বলে নিজের অন্তঃকরণ এবং প্রকৃতি ও পৃথিবীর ভেতরই ভগবানের অস্তিত্ব ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ পাবেন। ভগবদ্বিশ্বাস নৈতিক আচরণকে আরো সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলো, কর্তব্যের জন্য ভগবদ্‌প্রেমের জন্য এমিল প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত নয়।

শেষ বা পঞ্চম অধ্যায়ে রুশো এমিলের ভাবী স্ত্রী সোফিকে স্বামীর মনোরঞ্জন করতে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে তাই নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়টিতে নোতুন কথা বিশেষ কিছু নেই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষার যে ধারণা প্রচলিত ছিল তারই মোটামুটি সমর্থন করেছেন এবং *New Heloise*-এ যে-সব কথা বলেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

এমিলের মধ্যে এত প্যারাডক্স, অত্যুক্তি, বক্তৃতা, পুরানো মনস্তত্ত্ব ও অনেক সময় মাত্রার অভাব লক্ষিত হয় যে এর প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা হয়ত শক্ত হয়ে পড়ে, তবে এটি যে একটি যুগান্তকারী অমূল্য গ্রন্থ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সেদিনের বিদ্বৎসমাজে তাই এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। 'প্রকৃতির শিক্ষা' এর মানে যতই অস্পষ্ট হোক, এ একটা সঞ্জীবনী মন্ত্রে দাঁড়িয়ে গেল। এর তাৎপর্য হোল সুখী স্বাধীন শৈশবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতার অন্তরায় সকল শৃংখলের অপসারণ, পুরানো দিনের নীরস শব্দতাত্ত্বিক শিক্ষার পরিবর্তে জিনিষের শিক্ষা, অভিজ্ঞতার শিক্ষা, বিজ্ঞানের শিক্ষা এবং সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের প্রতিষ্ঠা যে মানুষ সমাজের কলুষে কলুষিত হবে না, সরল সাদাসিদে আদিম অধিবাসীর সাহস, সহ্যশক্তি, অসীম কৌতূহল, উদ্ভাবনী শক্তি, কর্মোদ্যম, স্বাবলম্বন ও স্বাভাবিক যৌন জীবনের ফলে নিজেকে সমাজের গলদ হ'তে বাঁচাতে সমর্থ হবে অথচ সমাজের কৃষ্টিজীবনের যা কিছু সুন্দর ও মহৎ তার অধিকারী হবে। প্রকৃতির শিক্ষা কোনদিনই সমাজকে উপেক্ষা করেনি, সভ্যতার দানকে অগ্রাহ্য করেনি, শুধু ডুবে যেতে চায়নি সমাজের পংকে। রুশোর এ মূলনীতি বুঝতে না পারলে এমিলকে তার প্রকৃত স্থান দেওয়া হবে না। শিক্ষাসংস্কারের দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয় রুশোই সর্বপ্রথম যে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে তার মনকে জানবার একান্ত প্রয়োজনের কথা বললেন এবং শিক্ষাকে শিশু মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

তিনিই সর্বপ্রথম মানুষ শুধু শেখবার একটা যন্ত্র রেণেসাঁসের শিক্ষা সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা নির্মূল করে প্রকৃত শিক্ষা কাকে বলে তা বুঝিয়ে দিলেন—অনুশীলন ও ডিসিপ্লিনের ভেতর দিয়ে বহুমুখী পূর্ণ মানুষের সৃষ্টি। দৈহিক অনুশীলনকে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ছাড়াও নৈতিক প্রকৃতির উন্নতি বিধায়ক হিসেবে দেখে তিনি নোতুন আলোকসম্পাত করলেন। বালককে পুস্তকের কীট না করে প্রকৃতির খোলা বই থেকে জীবনে ও জিনিষের সংস্পর্শে এসে নানা জ্ঞান আহরণ করতে ও তথ্য আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি বললেন শিক্ষা হোল অন্তরের রস থেকে গাছের মত বেড়ে ওঠা, ফুলের মত আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত হওয়া। মানুষ বা শিক্ষক তাকে সাহায্য করবে মাত্র, তার জীবনীশক্তিকে ব্যাহত করবে না কর্তৃত্বের নিষ্পেষণে।

শুধু ফ্রান্সের নয়, বিদ্বৎসমাজই জার্মানীতে ক্যান্ট, বেসডো, পেষ্টালটসি, ফ্রেবেল প্রভৃতি মনীষিগণ রুশোর ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হোলেন এবং তাদের লেখা ও কাজের ভেতর দিয়ে এই নোতুন মন্ত্র ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। এক ফরাসীদেশেই এমিল প্রকাশিত হবার ২৫ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে এত বই প্রকাশিত হোল যে আগের ষাট বছরে এর অর্ধেকও প্রকাশিত হয়নি। ইংলণ্ডেও রুশোর একদল শিষ্য হোলেন। কাজেই মর্লি (Morley) যথার্থই বলেছেন—"It is one of the seminal books in the history of literature." এমিল আজও মানুষকে উদ্দীপনা দিচ্ছে।

একথা অবশ্য ঠিক, ফরাসী স্কুলগুলোর অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি পরিবর্তিত হোল না এবং ফরাসী বিপ্লবের আগে রুশোর ভাবধারা স্কুলে প্রবাহিত করবার কোন কথাও ওঠেনি। কিন্তু যারা মনে করেন ফ্যাশানদুরস্ত মা'রা শুধু শিশুকে স্তন্য দিতে শিখলেন রুশোর লেখার ফলে আর কোন ফলই হোল না তারা মারাত্মক ভুল করেছেন বলতেই হবে।

নোতুন স্কুল ঃ নোতুন নির্মাতা

বেসডো, পেষ্টালটসি, হার্বার্ট, ফ্রেবেল

শিশু মনস্তত্ব ও প্রকৃতির শিক্ষা সম্বন্ধে রুশো যে নোতুন বাণী প্রচার করে গেলেন তার ফলে নোতুন ধরনের স্কুল গড়ে উঠলো—অভিজাত শ্রেণীর জন্য বেসডোর (১৭২৩-১৭৯০) ও তাঁর শিষ্যদের Philanthropinum এবং দরিদ্রের জন্য পেষ্টালটসি (১৭৪৬-১৮২৭) ও তাঁর অনুবর্তীদের সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এমিলের শিক্ষা হয়েছিল একক, ছেলের দলের সংশ্রবের বাইরে। এবার পরখ করবার সময় এল রুশোর শিক্ষানীতি স্কুলে প্রযোজ্য কিনা। রুশো যে শুধু অলীক স্বপ্নই দেখে গেছেন তা আর মনে হোল না—এসব পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে বেসডো, বিশেষ-করে পেষ্টালটসির মত দরদী শিক্ষাবিদের চেষ্টায় একটা নোতুন সুর বেজে উঠল, রুশোর ভাবধারা মূর্তরূপ নিল। শিক্ষা আর স্থাণুর মত জড় বা অচল রইল না, কর্মোদ্দীপনায় সজীব হয়ে উঠল। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে নোতুন বিষয় পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হোল এবং পুরানো বিষয়গুলোও নোতুন পদ্ধতিতে ও নোতুন অনুপ্রেরণায় অধীত হ'তে লাগল। নোতুন অনুপ্রেরণাই হোল এ সমস্ত আন্দোলনের প্রাণ, কারণ নোতুন শিক্ষায় মানুষের জীবনও ধীরে ধীরে সমাজের জীবনের আমূল পরিবর্তন হবে এ বিশ্বাস নিয়েই শিক্ষাব্রতীরা কার্যে অগ্রসর হোলেন।

বার্ণার্ড বেসডো (Bernard Basedow) জার্মানদেশের হামবুর্গ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করবার কথা ছিল তাঁর, কিন্তু তাঁর মতবাদ পুরানো পন্থীদের এতটা বিরোধী ছিল যে শেষ পর্যন্ত তাঁর গির্জার আওতায় আসা হোল না, এমন কি ডেনমার্কে অধ্যাপকের পদও রক্ষা করা সম্ভব হোল না। এ সময় (১৭৬৩) এমিল তাঁর সমস্ত

মনোরাজ্য অধিকার করে বসলো এবং শিক্ষাসংস্কারের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হোল। পাঁচ বছর পর তিনি রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণের কাছে এক নিবেদন পত্র পেশ করলেন; তাতে তিনি রাষ্ট্রপরিচালিত অযাজকীয় সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থার কথা প্রস্তাব করলেন এবং নিজে একটি আদর্শ বিদ্যালয় পরিচালনা এবং একটি প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক লিখবার জন্য অর্থসাহায্য চাইলেন। শিক্ষার দিকে অনেকেরই তখন দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল, তাই অর্থ এল সম্রাট দ্বিতীয় যোযেফ, রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ এবং ডেনমার্কের রাজার কাছ থেকে। এতে তার পাঠ্যপুস্তকখানা বের করবার সুযোগ হোল, রাষ্ট্র পরিচালিত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হ'তে এখনও প্রায় শ'খানেক বছরের দেরি ছিল। এ পুস্তকখানার নাম *Elementarwork*, (Elementary Book), কমিনিয়াসের *Orbis Pictus* এরই সংশোধিত সংস্করণ এ'কে বলা যেতে পারে, তবে রুশোর নীতিতে শিক্ষার উপযোগী করে নেওয়া। এতে ছিল কতগুলো কথোপকথন, গল্প, কবিতা অনেকটা পুরানো দিনের স্কুল রীডারের মত; এর সংগে ছিল আর যা বেরুল তা একটু অসাধারণ—একখানা মানচিত্রের বই, একখানা প্রায় একশত চিত্র সম্বলিত সুন্দর ছবির বই রীডারের তথ্যকে চিত্তাকর্ষক করবার জন্য এবং একখানা *Book of Method for Fathers and Mothers* (১৭৭০) যাতে অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষার কথা আছে কারণ বেসডোর মতে 'Reform must begin at the top.' এ পুস্তকে তিনি যেসব শিক্ষাপদ্ধতি ও নীতির কথা বলেছেন তা মূল্যতঃ রুশোরই নীতি—প্রকৃতির শিক্ষা এবং "Things, Things! Too many words!"

ডেসোর অধিপতি (Prince Leopold of Dessau) যে অর্থ দিলেন তা দিয়ে বেসডো তাঁর Philanthropinum নামক Institute খুললেন (১৭৭৪) এর নাম থেকেই বোঝা যায় যে

পরহিত, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও বিশ্বপ্রেমই এ মূল নীতি—জাতীয়তাবাদ নয়। ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী না হোলেও এ স্কুলের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ইউরোপের শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতগণ দেখতে এলেন এবং দার্শনিক ক্যান্ট এর খুবই প্রশংসা করলেন। কারণ তাঁর মতে Philanthropinum ছাড়া আর কোথাও শিক্ষকরা নোতুন কিছু পরীক্ষা করবার সুযোগ পান না। বেসডো অবশ্য খুব বেশী দিন এ স্কুলের সংগে সংশ্লিষ্ট রইলেন না, কারণ তাঁর প্রধান শিক্ষক হবার মত গুণাবলী ছিল না। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরও ইনষ্টিটিউটের কাজ তাঁর কয়েকজন সহকারী কিছু দিনের জন্য চালিয়েছিলেন এবং একজন নামজাদা সহকারী স্যালজমান (Salzmann) অন্যস্থানে Philanthropinum বা Institute প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডেসোর ইনষ্টিটিউটের শিক্ষানীতি জার্মানীর শিক্ষাপদ্ধতিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করলো। Elementarwork এ প্রস্তাবিত পুঁথিগত শিক্ষা ইনষ্টিটিউটে অনুসৃত হোল না। ছেলেদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, অনুরক্তি ও রুচিকে উৎসাহিত করা, ইন্দ্রিয়গ্রামকে বস্তুজগতের সংগে পরিচিত করে শক্তিশালী করা এবং পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে ছেলেদের কর্মোদ্যম বৃদ্ধি করা ছিল বেসডোর উদ্দেশ্য। পাঠ্যবিষয় প্রয়োজননীতি অনুসারে নির্বাচিত হোল। কথাবার্তার ভেতর দিয়ে ভাষা শিক্ষা, প্রকৃতি পরিচয় (Nature study), মাঠেঘাটে ঘুরে নানা ফুলফলপাতা সংগ্রহ, ড্রয়িং, হাতের কাজ, শিল্প, ব্যায়াম শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বয়সোপযোগী জিমনাষ্টিক ও খেলাধূলা, দল বা গ্রুপ হিসেবে কার্য ইত্যাদি হোল কর্মসূচী। প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় বিষয়ই কর্ম, পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাশীলতার মাধ্যমে আয়ত্তীকৃত হবে। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক ছিল মধুর এবং শারীরিক শাস্তিবিধানও বন্ধ হোল। ইনষ্টিটিউট্ পরিচালনা কার্যেও ছাত্রদের সংশ্লিষ্ট করা হোল। ইনষ্টিটিউটের ভাবধারা যাতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেজন্য

এখানে শিক্ষণ-শিক্ষার কেন্দ্র করবার কথা হোল। এ বেসডোর একজন সহকারী তাঁর শিক্ষণ-শিক্ষার ধারণাকে কিছুটা রূপ দিলেন হল বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Hull)—এই হলেই বোধ হয় সর্বপ্রথম শিক্ষণ-শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত প্র্যাকটিস্ স্কুল খোলা হয় (১৭৭৯)।

রুশোর শিক্ষানীতিকে মূর্ত রূপ দেবার কাজ এবার পড়ল বেসডোর চাইতে অনেক বড় একজন শিক্ষাবিদের হাতে, তিনি হোলেন জোহান হাইনরিক পেষ্টালটসি (১৭৪৬-১৮২৭)। পেষ্টালটসি জার্মান-সুইস, তার জন্ম হয় সুইজারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ নগর জুরিকে (Zürich)। ছয় বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হবার পর মাতা ও প্রভুভক্ত অনুগত দাসীর যত্নে তাঁর শৈশব আনন্দেই কেটেছিল এবং সে সুখস্মৃতি তাঁর মনে একটা গভীর দাগ কেটেছিল, তাই পরবর্তী কালে তিনি আদর্শ পরিবার বা গৃহকেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে গ্রাহ্য করেছেন। তবে মাতার অতি আদরে শৈশবে পালিত তাঁর জীবনে যুক্তির চাইতে ভাবাবেগ ও অনুভূতির প্রভাবই বেশী ছিল। তাঁর জীবনের আরেকটি দিক—গরীব দুঃখী ও অত্যাচারিতের প্রতি তাঁর সীমাহীন দরদ—খুলে যায় যখন তিনি তাঁর ধর্মযাজক পিতামহের সংগে এসে দীর্ঘ দিন ধরে বাস করতেন জুরিকের বাইরে একটি গ্রামে। সেখানে এবং জুরিকের দরিদ্র বস্তির ভেতরে পেষ্টালটসি যে দুঃখ ও অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাতে তিনি সমাজের কল্যাণ ও সংস্কার ব্রত হিসেবে গ্রহণ না-করে পারলেন না। পেষ্টালটসিকে আমরা মুখ্যতঃ সমাজ-সংস্কারক হিসেবেই দেখব। তিনি দেখলেন দয়া ও অর্থসাহায্য গরীবকে চিরদিন গরীব করেই রাখে, মানুষ করে না, রোগকে আরোগ্য করে না, জীইয়ে রাখে। কাজেই তিনি স্থির করলেন শিক্ষাই একমাত্র উপায় যা দ্বারা সমাজকে প্রথম শিক্ষিত, পরে উন্নত ও পবিত্রীকৃত করা সম্ভব এবং সেই কার্যে জীবন উৎসর্গ করলেন।

স্কুলের শিক্ষা তার খুব ভাল না হোলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে তার ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য ও প্রকৃতিবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ ভালই জ্ঞান হোল, কিন্তু কর্মকুশলতা তার চরিত্রে গড়ে উঠলো না। নিজের চরিত্রের এই দুর্বলতা লক্ষ্য করে বোধ হয় তিনি পরে শব্দের শিক্ষার চাইতে বস্তুর শিক্ষার ওপর জোর দিলেন, হয়ত বা রুশোর এমিলের যাদুকরী মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে এই পথের অনুবর্তী হোলেন। এমিল নাবল তাঁর জীবনে ভাবধারার জোয়ার নিয়ে প্রথম যৌবনে—অষ্টাদশ বর্ষে। তিনি বলেছেন, "The moment Rousseau's *E'mile* appeared, my visionary and unpractical spirit was taken with that visionary and unpractical book."

তিনি শীঘ্রই ধর্মযাজকের বৃত্তির বা আইনজীবীর বৃত্তির কল্পনা পরিত্যাগ করে দরিদ্র সুইস চাষীদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চাইলেন শিল্প ও শিক্ষা দ্বারা। যদিও কৃষি সম্বন্ধে অতি সামান্য অভিজ্ঞতাই তিনি অর্জন করেছিলেন একটা ফার্মে চার পাঁচ মাস বাস করে, তবু জুরিকের নিকট নেওহফে (Neuhof) তিনশ' বিঘা পাথুরে জমি কিনে তিনি কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হোলেন এবং সেখানে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর দালান ঘর, গোশালা ইত্যাদি নির্মাণ করলেন। এই সময়ে (১৭৬৯) তিনি অ্যানা শুলথেস্ (Anna Schulthess) নামক একটি মহীয়সী রমণীকে বিবাহ করেন, এই মহিলার সেবা, যত্ন ও সাহায্য পেষ্টালটসির মহৎ কিন্তু দুঃখময় জীবনে আগাগোড়া একটা মস্ত বড় অনুপ্রেরণার কাজ করেছিল। তাঁদের শিশুপুত্রেরও শিক্ষার ইতিহাসে একটি বড় স্থান আছে, কারণ তাকে শিক্ষা দিলেন পেষ্টালটসি হুবহু রুশোর নীতিতে এবং এ শিক্ষাকার্য হ'তেই পেষ্টালটসির নিজের শিক্ষা-নীতিরও জন্ম হোল।

নেওহফের কৃষিফার্মের কাজ অনভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতার অভাবে শীঘ্রই প্রায় বন্ধ হয়ে এল, কিন্তু অর্থের অনটন সত্ত্বেও

জনসাধারণের অর্থসাহায্য ও স্ত্রীর সহযোগিতায় পেষ্টালটসি তাঁর জীবনের স্বপ্ন দরিদ্রের শিক্ষাকে রূপ দিতে চেষ্টা করলেন অসম সাহসে নির্ভর করে। তাই নেওহফ পরবর্তী কালে যশ অর্জন করলো কৃষিশিক্ষার উন্নতিমূলক পরীক্ষার জন্যে নয় কিন্তু রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ভিখিরী অনাথ দরিদ্র শিশুর সাধারণ শিক্ষার সংগে সংগে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভিনব ব্যবস্থার জন্য। তিনি প্রায় পঞ্চাশটি এরকম শিশু নিয়ে কাজ শুরু করলেন (১৭৭৪) এবং নৈতিক শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, পড়তে লিখতে ও গুণতে শেখাবার সংগে সংগে সূতোকাটা, কাপড়বোনা, কৃষিকাজ, ফলের বাগান করা ইত্যাদি নানাশিল্পও শেখাতে লাগলেন। কাপড়-চোপড় খাইখরচও পেষ্টালটসিই দিতেন। শিক্ষক ও তদারককারীদের সংখ্যা আস্তে আস্তে প্রায় বারজনে এসে দাঁড়াল; পেষ্টালটসি মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজের মারফত এ নোতুন পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে দেশকে জানাতেন এবং আরও অর্থ সাহায্য চাইতেন। ফল খুব ভালই হোল বেশীর ভাগ ছেলের পক্ষেই, কিন্তু এদের মধ্যে আবার কারুর কারুর এত নৈতিক অবনতি ও ভিক্ষাপ্রবৃত্তি আগে থেকেই ছিল যে তাদের নিয়ে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হোল না। যাদের বাপ-মা ছিল তারাও সহযোগিতা করলো না, এদিকে অর্থঘাটতিও বৃদ্ধি পেতে লাগলো দিন দিন, স্বামীস্ত্রীও কৃচ্ছ্র তা ও অর্ধ অনশনে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কাজেই ছয় বৎসরের সাফল্য ও নিরাশার পর ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। পেষ্টালটসিকে বেশীর ভাগ জমি বিক্রী করে দিতে হোল, তাঁর রইল শুধু বসতবাটী, দালানগুলো, এবং তার প্রিয় উদ্যানটি। বড় দুঃখে তিনি পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, "কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি এই পঞ্চাশটি খুঁদে ভিখারীর সংগে ভিখারীর মত বাস করিয়াই আমার নিজের রুটির অংশ ইহাদিগকে দিয়াছি শুধু এই আশায় যে এই ভিখারীরাও একদিন মানুষ হইবে।"

নেওহফের দরিদ্র বা অনাথ আশ্রমই (১৭৭৪-১৭৮০)

পেষ্টালটসির প্রথম শিক্ষা অভিযান। এর পরে তিনি যে-সকল পরীক্ষামূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন সেগুলো হচ্ছে ষ্ট্যান্‌জের (Stanz) অনাথআশ্রম (১৭৯৮-১৭৯৯), বার্গডর্ফের (Burgdorf) প্রাথমিক স্কুল (১৭৯৯), বার্গডর্ফের ইনষ্টিটিউট্ (১৮০১-১৮০৪) এবং সর্বশেষ ইভারডনের (Yverdun) ইনষ্টিটিউট (১৮০৫-১৮২৫)।

কিন্তু নেওহফের অসাফল্যের পর তাঁর বদনাম রটে গেল অকেজো আদর্শবাদী বলে, তাই স্কুল গড়ে তোলবার টাকা তাঁর হাতে আর শীগ্‌গির (আঠার বৎসর) কেউ দিলেন না অথচ শিক্ষার অনুপ্রেরণা তাঁকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে দিচ্ছিল না এক মুহূর্তও—আশ্রম বা বিদ্যালয় পরিচালনা কার্যে তিনি কর্মকুশল না হ'তে পারেন—নোতুন শিক্ষানীতি চারদিকে ছড়িয়ে দিতে তিনি নিশ্চয় পারেন লেখনীর মারফত। তাই তিনি শিক্ষার নোতুন ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে লাগলেন একজন সহৃদয় প্রকাশকের সাহায্যে। নেওহফ বন্ধ হবার কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি অনেক লিখলেন, তবে সব তখন প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু যা প্রকাশিত হোল তাতে তাঁর খ্যাতি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম খ্যাতি তাঁর হোল *Evening Hours of a Hermit* (1780), এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় রোমান্স বা উপন্যাস *Leonard and Gertrude* (1781), বেরুবার সংগে সংগে। *Leonard and Gertrude*-এর মূল কথা হোল নৈতিক বা আর্থিক অবস্থার উন্নতি শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং এসব সংস্কারের সুরু হবে শিক্ষা নিয়ে। গল্পটি হচ্ছে পেষ্টালটসির অতি পরিচিত সুইস গ্রাম্য জীবন নিয়ে—নায়িকা হোলেন স্নেহপরায়ণা শান্ত-প্রকৃতি মাতা, ছেলেপিলেকে চরকায় সুতোকাটার সংগে সংগে বাইবেলের গান, কবিতা ও নানা নীতি কথা শেখাতেন এবং দৈনিক জীবনে যে-সব নৈতিক আচরণ নিয়ে সমস্যা উঠতো তাই নিয়ে আলোচনা করতেন তাদের সংগে। পাটীগণিত শিক্ষাও তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে দিতেন।

বোনবার সময় সূতোর গ্রন্থি, ঘরের সিঁড়ি, জানালায় ৪'টি কাচ ইত্যাদি গোনা এবং জিনিষ দেখিয়ে পরিমাণ ও আকার সম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা ও শব্দগুলো—যেমন 'বেশী', 'কম', 'লম্বা', 'সরু', 'গোল' ইত্যাদি শেখাতেন। পরিবেশের সমস্ত জিনিষই খুব মনোযোগ সহকারে দেখবার এবং পর্যবেক্ষণের ফল হাতেনাতে কাজ করে সার্থক করে তোলবার শিক্ষা মাতা দিতেন। আর সব জিনিষ ছাপিয়ে উঠতো একটি জিনিষ সেটি ছিল মাতার স্নেহ ও ভালবাসা। এর সোনার কাঠির পরশে সমস্ত জীবন হ'ত মধুময়, ইন্দ্রিয়গ্রাম হ'ত তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার, আচরণ হ'ত শান্ত সমাজানুমোদিত। গ্রামে যখন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হোল, তখন এই একই উদ্দীপনা ও পদ্ধতি হোল তার ভিত্তি। গারট্রুড শেখালেন স্কুল হবে গৃহেরই মত, তবে তাতে থাকবে নানা বিচিত্র ব্যবস্থা বিভিন্ন রুচির চাহিদা মেটাতে যা মেটানো গৃহের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই উপন্যাসখানা লেখার ফলে নিজের দেশের বিদ্বৎসমাজের বাইরে ইউরোপেও তাঁর পাঠকের অভাব হোল না।

জার্মানীতে তাঁর মহাকবি গেটের সংগে আলাপ হোল, ফরাসীরা তাঁকে বিপ্লবের পর (১৭৮৯) 'রিপাব্লিকের নাগরিক' এই উপাধিতে সম্মানিত করলেন, কিন্তু জনসাধারণ ও সর্বহারাদের জন্য তিনি কিছু করতে পারছেন না, কোমলমতি শিশুদের জীবন গড়ে তুলতে পারছেন না পেষ্টালটসির মর্মান্তিক যাতনা রয়েই গেল কিন্তু খুব বেশী দিন আর তাঁকে অপেক্ষা করতে হোল না, তারও জীবনের শুভ লগ্ন এল দীর্ঘ আঠার বৎসর পর বাহান্ন বৎসর বয়সে। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ড হেলভেশিয়ান রিপাব্লিকে পরিণত হোল, সুইস মন্ত্রী ষ্টাপফার (Stapfer) দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে পেষ্টালটসির পরিকল্পনার অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময়ে Forest Cantonগুলোতে ক্যাথলিকদের বিদ্রোহ হওয়াতে ফরাসীরা ষ্ট্যান্‌জ (Stanz) নামে ছোট্ট সহরটিকে একেবারে পুড়িয়ে ভস্মসাৎ করে ফেলল

তখন পেষ্টালটসিকে গৃহহারা অনাথ শিশুদের প্রতিপালন ও শিক্ষার কার্যে সুইস গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করলেন। এখানে পেষ্টালটসি অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হোলেন; শুধু একটিমাত্র দাসী বা পরিচারিকার সাহায্যে রুগ্ন শরীরে তিনি চল্লিশটি, পঞ্চাশটি, আশীটি ছিন্নবস্ত্র, চর্মরোগ দুষ্ট, অপরিচ্ছন্ন কেশ, অভুক্ত, ধূর্ত, অকৃতজ্ঞ ছেলেমেয়ের সংগে বাস করে সীমাহীন পরিশ্রম ও স্নেহ দিয়ে তাদের পরিচ্ছন্ন, শান্ত, স্বাস্থ্যবান্, ভদ্র ও শিক্ষিত করে তুললেন ছ'মাসের ভেতরে—সকলে অবাক্ হয়ে গেল। ভেসে যাওয়া শিশুকে ডাঙায় তোলবার এত বড় পরীক্ষা জগতে খুব কমই হয়েছে। ষ্টানজেই প্রথম পেষ্টালটসি ইন্দ্রিয়ানুভূতির (Sense Perception) ওপর জোর দিতে লাগলেন এবং শিক্ষাকে মনস্তাত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অভিব্যক্তি বা প্রকাশের সুযোগ ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা ধারণা শিশুকে দেওয়া উচিত নয় এই মূল নীতি তিনি এখানে প্রবর্তন করলেন। তিনি এ'ও বুঝলেন হাতের কাজের মূল্য হচ্ছে শিক্ষার দিক দিয়ে, শরীর ও মনের বিকাশের দিক দিয়ে, অর্থের দিক দিয়ে নয়। ষ্টানজে আরেকটি জিনিষও তিনি শিখলেন; তিনি দেখলেন ছেলেমেয়েরা ছোট্ট ছোট্ট দলে বা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অনেক ভাল কাজ করে একা একা কাজ করার চেয়ে। এ নীতি তিনি পরে তাঁর কাজে আরো বিশদভাবে প্রয়োগ করবেন। কিন্তু এত অপ্রত্যাশিত সাফল্য সত্ত্বেও ছ'মাসের মধ্যে এ অনাথ আশ্রম বন্ধ হয়ে গেল, কারণ আশ্রমগৃহটি প্রয়োজন হোল সৈন্যদের হাসপাতালের জন্য। এবার ষ্টাপফার পেষ্টালটসিকে পাঠালেন বের্ণ (Bern) সহরের অনতিদূরে বার্গডর্ফে।

পেষ্টালটসির শিক্ষক ও শিক্ষাসংস্কারের জীবনে বার্গডর্ফের কয়েক বছরই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও বৃহত্তর সাফল্যের দিন তাঁর আসবে ইভারডনের দীর্ঘদিনব্যাপী স্কুল-কার্যের ভেতর দিয়ে। বার্গডর্ফের কাজ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সুরু হয়ে শেষ হয় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে তাঁকে দরিদ্র

ঘরের একেবারে ছোট্ট ছেলেমেয়েদের তাড়াতে দেওয়া হয়, কারণ পাদুকানির্মাতা (shoemaker) প্রধান শিক্ষক তাঁর নোতুন ধরনধারণ পছন্দ করতেন না, এর পর তাঁকে আর এক স্কুলে যেতে হোল। প্রথিতযশা একজন শিক্ষককে নিয়ে এমন খেলা করা একটু অদ্ভুত বলেই মনে হয়। যাহোক তাঁর দুর্ভাগ্য শীঘ্রই কেটে গেল এবং দুর্গপ্রাসাদে তাঁকে নিজের একটি স্কুল খুলতে অনুমতি দেওয়া হোল। এখানে তিনি তাঁর আপন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন এবং ক্রুসি (Krüesi), টোবলার (Tobler) এবং ড্রয়িংশিক্ষক বাস্ (Buss) এর মত শিক্ষকের সহযোগিতা পেলেন। বার্গডর্ফে তাঁর পদ্ধতির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেন *How Gertrude teaches her Children* (1801) নামক পুস্তকে। পুস্তকখানি তাঁর বন্ধু গেসনারকে (Gessner) লিখিত চোদ্দখানা চিঠির সমষ্টি। মাতা শিশুসন্তানকে কিভাবে প্রতিপালন করবেন ও শিক্ষা দেবেন এই হোল পুস্তকের উপপাদ্য বিষয়। ক্রুসির সাহায্যে তিনি *Book for Mothers* নামক পুস্তকও প্রণয়ন করলেন। দেশে তাঁর খ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়ল যে সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র ভবিষ্যতে কি ধরনের হবে সে বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য তিনি একজন সুইস প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে প্যারিসে গেলেন, কিন্তু তিনি আলোচনার শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলেন না কাজের অবহেলা হয় বলে। নেপোলিয়নের সংগে সাক্ষাৎকার চেয়ে বিফল হয়েছিলেন, কারণ এত বড় লোকের A B C নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। প্যারিস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দেশবাসী যখন নেপোলিয়নের সংগে দেখা হয়েছিল কিনা জিজ্ঞেস করল তখন তিনি বলেছিলেন, "নেপোনিলয়নের সংগে আমার দেখা হয় নাই।" মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকের উপযুক্ত উত্তর। পেষ্টালটসির সংগে সাক্ষাৎ হোলে শিক্ষায় কেন্দ্রীকরণের (Centralization) যে ভুল তা বোনাপার্টের চোখে ধরা পড়ত এবং ফরাসী শিক্ষাও এক শতাব্দী ধরে এ ভুলের ফলভোগ করতো না। যাহোক, বার্গডর্ফে

ইউরোপের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের তীর্থযাত্রা সুরু হোল এবং বিদেশীদের মধ্যে অনেকেই এই স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি জানতে আসতেন। হার্বার্ট (Herbart) দু'বছর শিক্ষকতা করার পর এ স্কুলের পাঠ দেবার ক্রমিক পদ্ধতি (সরল থেকে কঠিনে যাওয়ার) এবং ছাত্রদের পাঠ্যবিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করবার সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তিনি কতগুলো প্রশ্নও তুলেছিলেন। ফ্রাংকফোর্টের গ্রূনার (Gruner of Frankfort) পেষ্টালটসির একটি নৈতিক পাঠ শুনে আনন্দে অধীর হয়েছিলেন। এই গ্রূনারই পরে পেষ্টালটসির নীতি অনুসারে স্কুল স্থাপনা করেন এবং সেই স্কুলেই ফ্রেবেল তাঁর জীবনের সাধনার সন্ধান পান। ষ্টাপফার Society of Friends of Education নামে একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে এ স্কুলের জন্য অর্থ তোলা এবং স্কুলের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তার করবার জন্য প্রস্তুত হোলেন, কিন্তু আবার (প্যারিস থেকে ফেরবার এক বছরের মধ্যেই) পেষ্টালটসিকে দুর্গপ্রাসাদের স্কুল থেকে বিতাড়িত হ'তে হোল, কারণ দুর্গপ্রাসাদটি প্রিফেক্টের (Prefect) বাসস্থান বলে নির্ধারিত হোল।

শেষ পর্যন্ত ইভারডনের পুরাতন দুর্গপ্রাসাদে তাঁর স্কুলের জন্য স্থান তিনি পেলেন এবং দীর্ঘ কুড়ি বৎসর (১৮০৫-১৮২৫) ধরে সেখানে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি প্রচার করে ইউরোপের শিক্ষাজগতের মুকুটমণি হয়ে রইলেন। রাশিয়ার জার, প্রাশিয়ান গভর্ণমেন্ট, জার্মান দার্শনিক ফিক্টে (Fichte) ও সর্ববিদ্যাবিশারদ ইংলণ্ডের লর্ড ব্রুহাম এবং ইউরোপের অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অনেকেই তাঁর স্কুল দেখতে এসেছেন এবং তাঁর মহৎ কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন।

ফিক্টে তাঁর *Addresses to the German Nation*এ ইভারডনের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করায় ইভারডন ইউরোপের মক্কা হয়ে দাঁড়াল। ছাত্ররাও নানা দেশ থেকে এসেছিল—জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালী, স্পেন, ইংলণ্ড, এমন কি আমেরিকা। ইভারডনের

ইন্‌ষ্টিটিউট সত্যিকারের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই রকম একটি আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানের সমস্যাও ছিল অনেক—বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন জাতীয় ঐতিহ্য, বিভিন্ন চরিত্র। একনিষ্ঠ কিন্তু মাত্রাজ্ঞানহীন নিজমতোন্মাদ শিক্ষকবৃন্দ নিয়ে পেষ্টালটসির দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত দেশে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা, শিক্ষকবৃন্দের ভেতরে গোলযোগের সৃষ্টি। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানা শুলথেসের মৃত্যু, পেষ্টালটসির চরিত্রে পরিচালনা শক্তির অভাব, শিক্ষকবৃন্দের ওপর পেষ্টালটসির প্রভাব লোপ, শিক্ষকবৃন্দের চাকরি ত্যাগ, মামলা-মোকদ্দমা, ঋণভার, বার্ধক্য এবং খানিকটা তাঁর খামখেয়ালী স্বভাবের দরুণ ইভারডনের ইন্‌ষ্টিটিউট ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে বন্ধ হয়ে গেল। ভগ্ন হৃদয়ে নৈরাশ্যের ভার বহন করে পেষ্টালটসি জীবনের প্রথম অভিযান নেওহফে ফিরে এলেন। কিন্তু ইভারডনের প্রথম দিকের জীবন শিক্ষার আকাশে একটি উজ্জলতম নক্ষত্র, তাঁর জ্যোতি আজও আমাদের কাছে এসে পৌঁছোচ্চে। পেষ্টালটসির যাদুকরী শক্তিতে শিক্ষকবৃন্দ একনিষ্ঠতা, আত্মত্যাগের ও সমাজতান্ত্রিকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। শিক্ষকদের বাঁধাধরা কোন মাইনে ছিল না, তাঁদের জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো হ'ত, তাঁরা আর কিছু চাইতেন না। যখন নোতুন কাপড়-চোপড় বা নোতুন জুতো কেনা প্রয়োজন হয়ে পড়তো, তখন যে বাক্সে ছাত্রদের 'ফি' বা বেতন রক্ষিত হ'ত সেখান থেকে তাঁরা প্রয়োজন মত অর্থ নিয়ে তাঁদের কেনা-কাটা করতেন। তাঁরা ভোর চারটায় উঠতেন, একজন দু'টায় উঠে পেষ্টালটসিকে উঠিয়ে দিতেন এবং বহু বৎসর ধরে কোন শিক্ষকই রাত তিনটার পর বিছানায় থাকতেন না। তিনি শিক্ষার আরম্ভ শিশুর চেষ্টার ভেতরেই নিহিত করেছেন এবং ভেতরের জিনিষ আস্তে আস্তে বাইরের রূপ পরিগ্রহণ করবে এই ছিল তার বক্তব্য। "Education should begin in the child and work from within outwards" ফ্রেবেলও

'making the inner outer' এই কথাটি ব্যবহার করেছেন শিশুর স্বজনী শক্তি সম্বন্ধে, তার মানসিক ভাবকে বাহ্যরূপ দেবার প্রসংগে। পেষ্টালটসি এও বলেছেন যে কোন জিনিষ শিখতে গেলেই একেবারে তাকে তার মূল সূত্রে বা মৌলিক উপাদান-গুলোতে নিয়ে যেতে হবে এবং পরে তাদের গ্রথিত করে সমগ্র জিনিষটিকে পাওয়া যাবে, যেমন সংবেদন থেকে জন্মায় আমাদের ধারণা (idea)। এভাবে ভাষা শিক্ষা, গণিত শিক্ষা, ভূগোল শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা সবই হ'তে পারবে শিশুর বয়স ও মানসিক শক্তি অনুসারে। মানসিক এসকল প্রক্রিয়াকে লক্ষ্য করেই পেষ্টালটসি বলেছিলেন, "I wish to psychologize instruction." পেষ্টালটসি নিজে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা প্রচলিত আদব-কায়দা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন। তাঁর এক ছাত্র তাঁর একটি বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায় বেশ পরিপাট্য সম্বন্ধে তাঁর কোন হুঁসই ছিল না, কোন সময় তাঁর স্বর ছিল সঙ্গীতের মত মিষ্টি, আবার কোন সময় বজ্রের মত কঠিন, কোন সময় প্রফুল্ল, কোন সময় বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক, কোন সময় অবিবেচক শিক্ষকের সংগে চেঁচামেচি, অসভ্য ব্যবহার, আবার ঠিক পরমুহূর্তেই কোন শিশুকে দেখে শান্ত ভাব ধারণ এবং শিক্ষকের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা, এবং সর্বসময়ে শিশুর প্রতি সীমাহীন সহানুভূতি, স্নেহ ও ভালবাসা। এরকম শিক্ষকের যাদুকরী প্রভাব যতদিন থাকে ততদিনই স্কুল ভালভাবে চলতে পারে, সে প্রভাব কেটে গেলে সবই বিশৃংখল এলোমেলো হয়ে পড়ে। ইভারডনেও তাই হোল।

উনাশী বৎসর বয়সে ভগ্নহৃদয়ে নেওহফে ফিরে এসেও পেষ্টালটসি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লোকহিত ও শিশুশিক্ষার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেলেন। তাঁর শেষ দুইখানি বিষাদময় পুস্তকে—*Swan Song* ও *Life's Experiences* তিনি নিরপেক্ষভাবে নিজকে বিচার করে গেছেন এবং মানুষের প্রতি তাঁর প্রথম জীবনের বিশ্বাস অটুট আছে

এই প্রমাণই দিয়ে গেছেন। যে-সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলো সেদিনকার জাতীয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও জনসাধারণের শিক্ষা। এই মহামানবের খ্যাতি জীবনের অন্তিম সময়ে আবার এত বৃদ্ধি পেল যে তাঁর একজন প্রাক্তন শিক্ষকের আগ্রহে একজন বড় প্রকাশক তাঁর সমস্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করবার দলিল করলেন এবং লাভের অংশে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাংক দিতে সম্মত হোলেন। পেষ্টালটসি অকাতরে সে-সমস্ত অর্থ শিক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত করলেন। "সবই পরের জন্য, নিজের জন্য কিছুই নয়" তাঁর সমাধিস্তম্ভে যথার্থই লেখা হয়েছে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁর শেষ বক্তৃতা তিনি দেন জনসাধারণের কাছে শিশুশিক্ষা প্রসারের জন্য। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী মাসে ৮১ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে একশ' বছর পর 'পেষ্টালটসি শতাব্দী জয়ন্তীতে' পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজ বক্তৃতা, প্রবন্ধ, স্মারক গ্রন্থের ভিতর দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন এ অক্লান্ত কর্মী শিশুসুহৃৎ মহানুভব শিক্ষকের প্রতি তাঁর সমস্ত অসাফল্যের ও নৈরাশ্যের গ্লানি মুছে দিয়ে। তাঁর কর্মকুশলতার অভাব থাকলেও তিনি জগতের কাছে শাশ্বত আদর্শ শিক্ষক।

এখন পেষ্টালটসির পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, কারণ থিওরি বাদ দিয়ে তিনি হ'তে চেয়েছিলেন প্র্যাক্টিকাল শিক্ষক। সমস্ত শিক্ষাই গৃহ ও স্কুলের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এবং অভিজ্ঞতা আসে *Anschauung* এর ভেতর দিয়ে। *Anschauung* কথাটির ঠিক অনুবাদ হয় না, তবে একে পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের ফলে সহজ বোধশক্তি (Intuition) বলা যেতে পারে। কতগুলো বিশৃংখল সংবেদন (Sensation) ও অনুভূতি (Sense-impression) নিয়ে পর্যবেক্ষণের কাজ সুরু হয়, উইলিয়ম জেমস্ বলেন, "The World for the child a blooming buzzing confusion" বা পেষ্টালটসি বলেন, "The world

lies before eyes like a sea of confused sense-impression, flowing into one another." মনোযোগের সংগে সংগে এই বিশৃংখল ধারণা বা সংবেদনগুলো স্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে ওঠে। এবার যে কোন দ্রব্য বা বস্তু তার আপন গুণগুলো নিয়ে অন্য জিনিষের চেয়ে পৃথক হয়ে একক (unit) রূপ ধারণ করে এবং তখন একে চেনা যায়, এর বর্ণনা করা যায় এবং শেষ পর্যন্ত নামকরণ ক'রে একে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এর পরে আসে পর্যবেক্ষণের তৃতীয় এবং শেষ ধাপ যখন কোন বস্তু বা দ্রব্যকে অন্য বস্তু বা দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় এবং সকল বস্তু জগতের সংগে এর সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। সমগ্র বস্তু-জগতের ধারণা সহজ বোধ শক্তি ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়, কারণ এ জিনিষ আমাদের ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ; শুধু সহজ বোধশক্তি দ্বারাই বস্তু-জগত উপলব্ধি করা সম্ভব। মানুষের মন জড় হয়ে বসে থাকে না, সে বেছে নেয় এবং পর্যবেক্ষণের শেষ ধাপের জন্য আমাদের প্রস্তুত করে অর্থাৎ কোন্ কোন্ শ্রেণীতে দ্রব্য বা বস্তু বিভক্ত হবে তাই ঠিক করে দেয়। পেষ্টালটসি তিনটি মুখ্য শ্রেণী করেছিলেন—সংখ্যা, আকৃতি এবং ভাষা। কাজেই পর্যবেক্ষণের এই ক্রম—বিশৃংখল সংবেদন বা ধারণা, স্পষ্টতা ও বর্ণনা, সংজ্ঞা এবং শ্রেণীবিভাগ। দীর্ঘ সময় ধরে স্কুলের কাজ হ'ত। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দশটি ঘন্টায় ক্লাসের কাজ হ'ত, মধ্যে মধ্যে বিরামের ব্যবস্থা ছিল। দিনের প্রারম্ভে ও শেষে পেষ্টালটসি ছাত্রদের সংগে সভায় বসে আলোচনা করতেন। কতগুলো ঘন্টায় অবশ্য শিক্ষকের বেশী প্রস্তুতির প্রয়োজন হ'ত না, যেমন ড্রয়িং, সঙ্গীত, জিমনাষ্টিক। সর্বশেষ ঘন্টা—সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টা যার যা খুশী তাই করতে পারতো—চিঠি লেখা, মডেল বানানো, আঁকা, বই পড়া, ইত্যাদি। শিক্ষকদের সপ্তাহে তিনবার প্রত্যেক ছেলের কাজ ও আচরণ সম্বন্ধে পেষ্টালটসির নিকট রিপোর্ট দিতে হ'ত অপরাপর শিক্ষকরা (তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন শিক্ষণ-

শিক্ষাব্রতী) স্কুলের ঘণ্টার বাইরের কৃত্যালীর তত্ত্বাবধান করতেন, ছেলেদের সংগে খেলাধূলা করতে এবং রাত্রে ছেলেদের শোবার লম্বা ঘরে ঘুমুতেন। কিন্তু ছেলেদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হ'ত, দুর্গপ্রাসাদের ফটক সমস্ত দিন থাকতো খোলা, ছাত্রেরা গৃহেরই মত যখন খুশী যাওয়া-আসা করতো। শিশু ও বয়স্ক এভাবেই তাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তবে শিক্ষককে এই পর্যবেক্ষণে সাহায্য করতে হবে। পেষ্টালটসিও রুশোরই মত বস্তু-জগতের বিচিত্র ভাণ্ডার হ'তে জ্ঞান আহরণ করতে শিশুকে অবাধে ছেড়ে দেন, কিন্তু রুশোর চাইতে তিনি ব্যক্তিগত বা সামাজিকভাবে শেখার কাজে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন।

প্রজেক্টপ্রণালী পর্যবেক্ষণ পাঠের একটি পূর্ণ রূপ। প্রজেক্ট-প্রণালীর জনক যেই হোন—রুশো, বেসডো বা এমনকি প্লেটো—পেষ্টালটসি যে এ প্রণালীর ব্যবহার করেছেন ভূগোল শিক্ষায় তার কোন সন্দেহ নেই। নিকটবর্তী পাহাড়, উপত্যকা ইত্যাদিতে ছেলেরা দল বেঁধে গিয়ে পর্যবেক্ষণের ফলে তাদের ধারণাগুলোকে পরে বালি ও মাটির ভেতর দিয়ে ক্লাশে মূর্ত রূপ দেওয়াকে বা ম্যাপ দেখার আগে রিলিফ তৈরী করাকে প্রজেক্টপ্রণালী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? পেষ্টালটসিই স্থানীয় ভূগোল বা গৃহ ভূগোল প্রজেক্টের সাহায্যে প্রাথমিক স্কুলে প্রবর্তন করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম বলেন, ভূগোল মানে নদী, পাহাড়, বনই নয়, অধিবাসীদের জীবন, আচার-ব্যবহার, আর্থিক অবস্থা, ইত্যাদি অর্থাৎ মানবীয় ভূগোল বা Human Geography. পেষ্টালটসি, কার্ল রিটার (Karl Ritter, 1779-1859) এবং তাঁদের ভাষ্যকাররা এই মানবীয় ভূগোলের জন্মদাতা। ভাষা শিক্ষাতেও পর্যবেক্ষণ ও কথোপকথনের ওপর জোর পড়েছে। পাটীগণিত শিক্ষার প্রারম্ভে প্রকৃত বস্তুগণনাই প্রধান স্থান অধিকার করেছে অংক কষার আগে, বিজ্ঞান শিক্ষায় নিজ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মূল সরল তথ্যগুলো আবিষ্কৃত হবে, শিশু লিখবার আগে আঁকতে শেখে, তাই ড্রয়িং

শুধু বাইরের জগতকে রূপ দেবার জন্যই শিশু শিখবে না, হাতের লেখার প্রয়োজনেও শিখবে। জ্যামিতিও শিখবে আকৃতি-বোধের চাহিদায় (রুশো যেমন বলেছিলেন) আরোহ প্রণালীতে ব্যবহারিকভাবে। এমনকি শারীরিক ব্যায়ামকে তার মূলসূত্রে বিশ্লেষণ করে শেখানো হ'ত—যেমন প্রথমে সরল সহজ দেহভংগীগুলো আলাদাভাবে শিখিয়ে পরে সেগুলো একত্রিত করে খেলাধূলোয় যে জটিল অংগভংগীর দরকার হয় তা শেখান হ'ত। প্রত্যেক বিষয় শিক্ষার সময়েই নিজ অভিজ্ঞতার প্রাধান্য পাঠ্যপুস্তকের তুলনায় তিনি একটি অলংঘ্য নীতি হিসেবে প্রবর্তন করেছেন। এসব থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার ('Psychologizing education') তাৎপর্য কি।

এসব বিষয় ছাড়াও পেষ্টালটসির ইন্‌ষ্টিটিউটে কিছু হাতের ও কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা, সামরিক ড্রিল, শারীরিক অনুশীলন, প্রকৃতি পরিচয়, সঙ্গীত ও নৈতিক ও ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ই বিশেষজ্ঞের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। কিন্তু সাহিত্য, ইতিহাস এবং সৌন্দর্যবিজ্ঞান শিক্ষার দিকে যতটা নজর দেওয়া উচিত ততটা দেওয়া হ'ত না। পেষ্টালটসি নিজেই নৈতিক ও ধর্ম শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি শিশুকে এত ভালবাসতেন এবং তারা অকপটে তাঁর কাছে হৃদয়ের দ্বার এমনভাবে খুলে দিতো যে এর তুলনা শিক্ষার ইতিহাসে মেলা ভার। বড়দিন, নববর্ষের প্রথম দিন এবং পেষ্টালটসির জন্মতিথি (১২ই জানুয়ারী) উপলক্ষে উৎসব হ'ত, উৎসবে ছেলেমেয়েরা সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় বীর ও নায়কদের জীবনী কেন্দ্র করে অভিনয় করতো, অভিনয়ের সাজসজ্জা তারা নিজের হাতেই তৈরী করে নিতো।

সঙ্গীতশিক্ষা ও শারীরিক অনুশীলন পেষ্টালটসির ইন্‌ষ্টিটিউটের (ইভারডন ও বার্গডর্ফ দু'জায়গায়ই) বিশেষত্ব ছিল। ছোটদের

উপযোগী করে গান রচনা করা হ'ত এবং সব একসংগে গান গাইতো। জোষেফ নীফ (Joseph Neef) নামে নেপোলিয়নের একজন প্রাক্তন সেনানীর ওপর দৈহিক শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। ক্রমিক জিমনাষ্টিক, খেলাধূলা (বন্দুক দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করা একটি খেলা ছিল), সামরিক ড্রিল, গ্রীষ্মকালে সাঁতার, শীতকালে স্কেটিং ইত্যাদি শেখানো হ'ত। নীফ পরে আমেরিকায় পেষ্টালটসি নীতি পরিচালিত স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পেষ্টালটসির দৈহিক শিক্ষাব্যবস্থা পরে স্পেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও অন্যান্য দেশে অনুসৃত হয়।

পেষ্টালটসি নীতির মূল সূত্রগুলোর একটি চুম্বক এখানে দেওয়া যেতে পারে :—

১। উত্তম গৃহ আদর্শ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, কারণ এটি হচ্ছে সাধারণ হিতের জন্য ভালবাসা ও সক্রিয় সহযোগিতার মুখ্য কেন্দ্র।

২। বৃহত্তর সমাজে যে বিচিত্র শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন তা গৃহে সম্ভবপর না হওয়ায় স্কুল ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, কিন্তু স্কুল গৃহের আদর্শেই পরিচালিত হবে। শিশুর প্রতি ভালবাসাই পিতৃস্থানীয় শিক্ষককে তাঁর কর্তব্যসম্পাদনে অনুপ্রেরণা জোগাবে। ডিসিপ্লিন সহৃদয় হলেও দৃঢ় হবে।

৩। মানুষের সকল বৃত্তির সমঞ্জস স্ফুরণই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমরা মুখ্যতঃ মানুষ তৈরী করতে চাই, তারপর নাগরিক ও শ্রমজীবী তৈরী করার কথা ওঠে।

৪। দরিদ্র সর্বহারাদের উন্নয়নই সমাজের প্রধান কর্তব্য। তাদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যে তাদের কর্মোদ্দীপনা আসবে, তাদের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হবে। শুধু দানে কোন প্রতিকার হবে না।

৫। শিক্ষা সামাজিক ও সর্বজনীন হবে।

৬। শিক্ষাকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে অর্থাৎ শিশুর মনোবিকাশের ক্রম লক্ষ্য করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে

হবে। এ নীতিতে শিশুদের তীক্ষ্ণধী, মন্দধী ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে হবে, প্রতি স্তরে তাদের মনোবিকাশের উপযোগী করে পাঠ্যবিষয় এবং শিক্ষাপদ্ধতি নির্ণীত হবে এবং শিশুর কর্মশক্তি ও প্রয়োজনের প্রেরণাকে কাজে লাগাতে হবে। শিশু ও বালকের রাজনৈতিক জ্ঞান ও চরিত্রগঠনের জন্য স্কুলে যথাসম্ভব স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হবে। শিক্ষা পর্যবেক্ষণ প্রণালীতে দিতে হবে এবং মূল সূত্র বা মৌলিক উপাদানগুলো হ'তে ক্রমে ক্রমে জটিলতর অবস্থায় উপনীত হ'তে হবে। একটি নোতুন ধারণা বা তথ্য অপর একটি পুরানো জ্ঞাত ধারণা বা তথ্যের সংগে সংশ্লিষ্ট হবে।

৭। ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক ধারায় পাঠ্যসূচীর বিস্তৃতি করা প্রয়োজন। যদিও তিনি এ কথাগুলো ব্যবহার করেননি, তাহোলেও "Activity and Experience Curriculum"ই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

৮। শিক্ষকতার কার্যে শিল্পীর নৈপুণ্য ও নৈতিক অণুপ্রেরণার প্রয়োজন। শিক্ষকরা তাঁদের বৃত্তি শিক্ষা করতে পারেন সুষ্ঠুভাবে একমাত্র পরীক্ষামূলক স্কুলে, কারণ সেগুলোই হোল নোতুন আলোর সন্ধানী ও পথপ্রদর্শক।

স্কুলের ওপর পেষ্টালটসি নীতির সবচেয়ে বেশী প্রভাব হোল জার্মানীতে। জেনার পরাজয়ের পর (১৮০৭) ফিক্টে তাঁর *Addresses to the German Nation*এ পেষ্টালটসির কথা বলেছিলেন এবং নেপোলিয়নের পরাভবের (১৮১৪) পর তাঁর শিক্ষানীতি খুব দ্রুত জার্মানীতে প্রবর্তিত হ'তে লাগল এবং শিক্ষাসংস্কারের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। সেজন্য জার্মানীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার নামকরণ হোল "প্রাশিয়ান-পেষ্টাল-টসিয়ান শিক্ষাব্যবস্থা"। প্রাশিয়ার বহু শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক পেষ্টালটসির নিকট শিক্ষা লাভ করলেন।

নিওলিথিক মানুষের যা কাম্য, যে শুভের, যে কল্যাণের সে প্রার্থী তা মোটামুটি আমাদের কাম্যেরই মত—বিশেষ কোন

পার্থক্য নেই বাসনার দিক থেকে যেমন নেই তাদের দেহ ও আমাদের দেহের মধ্যে। আমাদেরই মত তারা সন্তানকে ভালবাসে, সংগীর পাশে এসে দাঁড়ায় বিপদে, দৈহিক সুখ ছাড়া আরও যে উচ্চতর সম্পদ আছে তারও খোঁজ রাখে। ঐশ্বরীয় শক্তি বা ভূত-প্রেতকে শান্ত করবার জন্য তারা ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে এ কথা বললে মিথ্যা বলা হবে, তাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের পেছনে যে নিষ্ঠা আছে, বিশ্বাস আছে তা সভ্য সমাজে বিরল। নিওলিথিক মানুষ যখন তার পেটে কাল পাথর ঘষে নৃত্য করে, সভ্য মানুষ হয়ত বিদ্রূপের হাসি না হেসে পারে না, কিন্তু তার গভীর ধর্মভাব কি আমাদের চোখে পড়ে না, তার ভাঙা ভাঙা ভাষায় যে ভেতরের অভিজ্ঞতার কথা সে ব্যক্ত করে তা কি স্পর্শ করে না আমাদের বিদগ্ধ অন্তরকে? সে বলে এই কাল পাথর ঘষার ফলে সে 'শক্তিশালী' হয়েছে, সে 'জ্ঞানী' হয়েছে, সে 'ভাল' হয়েছে, সে 'আনন্দিত' হয়েছে। এ জিনিষকে সভ্য সমাজে আমরা যাকে প্রার্থনা বলে অভিহিত করি সে আখ্যা হয়ত দেওয়া যায় না, কিন্তু বস্তুতঃ এ অসভ্য ব্যক্তি ঐশ্বরীয় শক্তির কাছে প্রার্থনাই করছে, তার বাসনার পূরণও হচ্ছে। তবে সভ্য মানুষের সংগে হয়ত এই তফাৎ—এ অনুষ্ঠানের পর যখন শিকারে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসে সে অকপটে স্বীকার করে এ শিকার তার আপন কৃতিত্বে মেলেনি কিন্তু মিলেছে যে লোকোত্তর শক্তি তার ভেতরে আছে, এবং যাঁকে সে ডেকেছে তাঁরই কৃপায়! মানুষের অক্ষমতা থেকেই আসে শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজা ও আকাঙ্ক্ষা—এই হোল ধর্মের মূল উৎস—তা একে ধর্মই বলা হোক বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত করা হোক। যে অসভ্য সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসতে জানে, গোষ্ঠীর সহায়তা করতে জানে নিজের সুখসুবিধে বিসর্জন দিয়ে, লোকাত্তর শক্তি মহিমা কীর্তন করতে পারে একান্ত সরল বিশ্বাসে তার চরিত্রবল যে সভ্য মানুষের চাইতে কম নয়, হয়ত বা বেশী একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। হয়ত তাদের আচার-অনুষ্ঠানের বাহ্যিক রূপ

আমাদের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকবে, ধর্মের নামে অনেক জিনিষ যা তারা শিখিয়েছে সন্তান-সন্ততিকে তা হয়ত ধর্মপদবাচ্যই নয়, কিন্তু এ কথা ভুললেও চলবে না ধর্মের প্রাণ আচার-অনুষ্ঠানের বাহ্যিক রূপ নয়, সে হোল অন্তরের বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা। সে জিনিষ ছিল পুরোমাত্রায় আমাদের পূর্ব পুরুষদের দশ-পনেরো হাজার বছর আগে। আর ভালমন্দের সংমিশ্রণ যা রয়েছে আমাদের চরিত্রে তা তাদেরও ছিল,—হাজার হাজার বৎসর শিক্ষার ফলেও তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

আবার এও বলা হয় আরও পরবর্তী কালে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল (যেমন প্রাচীন ভারতে বা ইস্রায়েলে) তা অনেকাংশে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সুষ্ঠুতর—ঋষিদের দিব্য-দৃষ্টিতে যে সত্য ধরা পড়েছিল তা আজ অন্তর্হিত হয়েছে প্রায় সম্পূর্ণরূপে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে—কাজেই শিক্ষায় উন্নতির চাইতে হয়েছে অবনতি, অগ্রগতির চাইতে পশ্চাদগতি, পুরনো দিনের শিক্ষায় ফিরে গেলেই হবে শিক্ষার প্রকৃত সংস্কার। কিন্তু কালের গতিকে আটকে রাখা যায় না, জীবনে ও সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে (তা ভালোর জন্যই বা মন্দের জন্যই হোক) তাকেও মুছে ফেলা যায় না—তাই জটিলতর জীবনসমস্যার সম্মুখীন হয়েই করতে হবে আধুনিক মানুষকে তার শিক্ষাব্যবস্থা পুরনো দিন থেকে যা নেওয়া সম্ভব তা নিয়ে একেবারে পুরনো দিনে ফিরে যাওয়ায় হয়ত একটা রোমান্টিক ভাব আছে কিন্তু সে কি আজ আর সম্ভব ?

দার্শনিক ফিক্টে ছাড়াও আরো দু'জন বড় জার্মান মনীষী পেষ্টালটসির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন—একজন হোলেন হার্বার্ট এবং অপর জন ফ্রেবেল। গ্রেট ব্রিটেনে 'Object lesson' (বস্তুর সাহায্যে পাঠ দান) এবং শিশুবিদ্যালয়গুলো গড়ে উঠল পেষ্টালটসি-নীতির প্রভাবে কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রভাব পরিলক্ষিত হোল শিক্ষণ-শিক্ষাক্ষেত্রে। তবে গ্রেট ব্রিটেনের

সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে পেষ্টালটসি-নীতি প্রবর্তিত হ'তে তাঁর মৃত্যুর পর আরও পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেল। যে-সব দেশে যাজক পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব কমই আশা করা যায়; তাই ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের আগে পেষ্টালটসির প্রভাব বিশেষ কিছু পরিলক্ষিত হয়নি, কিন্তু ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর গিজো ও কুঁজা (Guizot and Cousir) যখন দেখলেন প্রাশিয়ায় এ নীতি সুফলপ্রসূ হয়েছে তখন তাঁদের চেষ্টায় ফ্রান্সের স্কুলগুলোতে এ নীতির প্রবর্তন হোল। স্পেন, রাশিয়া, ইতালী, ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ডেও পেষ্টালটসি নীতি অনুসারে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হোল কিন্তু খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারলো না। একজন বড় শিক্ষাবিদ বলেছেন জেনার পরাভবের পর জার্মানীর উত্থান পেষ্টালটসি প্রভাবান্বিত স্কুলগুলোর জন্যই সম্ভব হয়েছিল এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পর এ স্কুলগুলোর প্রভাব কমে যাওয়ার দরুণই জার্মানীর নৈতিক অবনতি আরম্ভ হয়। আমেরিকায় পেষ্টালটসি নীতির ঢেউ এসে পৌঁছুল তিন দফায়—প্রথম ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন জোযেফ নীফ এসে তাঁর স্কুল খুললেন এবং এই সব শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে দু'একখানি পুস্তক প্রকাশিত করলেন। মৌলিক পাটীগণিত শিক্ষা এসময়ে সুরু হোল। সাধারণ শিক্ষার সংগে কৃষি বা অন্য শিল্পের সংযোগও কোন কোন স্কুলে স্থাপিত হোল। পেষ্টালটসি প্রভাব দ্বিতীয় দফায় এল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি; এ সময়ে সর্বজনীন সাধারণ প্রাথমিক স্কুল, শিক্ষণ-শিক্ষা, বিস্তৃততর পাঠ্যসূচী, ভূগোল ও সঙ্গীত শিক্ষাপদ্ধতি এবং অকঠোর শাসননীতি ইত্যাদির ধারণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো পেষ্টালটসির ব্যবস্থার প্রভাবে। তৃতীয় দফায় ইংলণ্ডের মারফত আবার পেষ্টালটসি প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল—এবার বস্তুর সাহায্যে পাঠদানের ভেতর দিয়ে। নিউইয়র্ক রাষ্ট্রের Oswego Normal School এর নেতৃত্বে এ পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছিল বলে একে Oswego System বলা হয়। পেষ্টালটসি সম্বন্ধে তিনি

আধুনিক শিক্ষার সব জিনিষেই হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই শেষ করেননি। এ কথা বলা ভুল, কারণ শিক্ষার শেষ কোথাও নেই, মানবমনের চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তি যতদিন থাকবে, যতদিন মানবমনের গ্রহণশক্তির নব নব রূপ আবিষ্কৃত হবে, ততদিন শিক্ষার চরম সমাপ্তির কথা উঠতেই পারে না। পথ চলার শেষ নেই, কাজেই যাঁরা পথপ্রদর্শক, যাঁরা পথে চলতে কিছু সাহায্য করেছেন তাঁরাই আমাদের নমস্য।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নোতুন শিক্ষার অবদান শিক্ষাপদ্ধতিকে বহুলভাবে পরিবর্তিত করেছিল সত্য কিন্তু ভ্রান্ত বা ভুল মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করায় কতকগুলো গলদও থেকে গেছল। এখন আমরা দু'জন চিন্তাশীল মনীষীর কথা বলব —হার্বার্ট ও ফ্রেবেল যাদের চেষ্টায় মানব ও শিশু মনের প্রকৃতি ও জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আরও সুষ্ঠুতর ধারণা জন্মাল।

এঁদের কথা বলবার আগে পেষ্টালটসির আরেকজন শিষ্যের কথা একটু বলা প্রয়োজন, কারণ নেওহফের পরীক্ষার ধারাবাহিকতা—সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্পশিক্ষার ঘনিষ্ঠ সংযোগ—তিনিই বহু চেষ্টা ও আত্মত্যাগে রক্ষা করেছিলেন—ইনি হলেন বের্ণ সহরের একজন বিশ্বপ্রেমিক অভিজাত এমানুয়েল ফেলেনবার্গ (Emmanuel Fellenberg, 1771-1844)। তিনি বের্ণ সহরের প্রান্তে একটি বড় ফার্মে দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন, একটি ধনী শিশুদের জন্য, অপরটি দরিদ্র শিশুদের জন্য। সাহিত্যিক শিক্ষার সংগে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চলতে লাগল এবং স্কুলের ছাত্রমণ্ডলীকে একটি রিপাব্লিকে পরিণত করে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হোল। এ ধরনের শিক্ষা আজ পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, যদিও এর জন্মদাতা পেষ্টালটসিও নন, বা ফেলেনবার্গও নন, কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এ ধরনের শিক্ষা পেষ্টালটসির অগ্নিময় উদ্দীপনা ও ফেলেনবার্গের কর্মকুশলতায় শিক্ষাজগতে তার আসন করে নিতে সমর্থ হয়েছে।

হার্বার্ট ও ফ্রেবেল দু'জনেই পেষ্টালটসির প্রিয় শিষ্য এবং গুরুর অবদানের দুটো দিক নিয়ে দু'জনে শিক্ষাকার্যে ব্রতী হয়েছেন। অধ্যাপক গ্রেভস (Prof. F. P. Graves) যথার্থই বলেছেন যে পেষ্টালটসির নীতির দুটো দিক আছে, সে দুটো আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরস্পর বিরোধী কিন্তু সত্যিকারের তা নয়। একদিকে পেষ্টালটসি বলেছেন যে শিক্ষা হোল অন্তরের বা ভেতরের জিনিষ, এবং ভেতর থেকেই হবে এর বিকাশ বা অভিব্যক্তি; অপর দিকে তিনি বলেছেন শিক্ষা হোল বাস্তব জগতের সংস্পর্শে এসে শিশু যে অভিজ্ঞতা ও ধারণা অর্জন করে তাই। একপক্ষে এ যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে প্রস্ফুটিত করতে শিশুকে সাহায্য করার নামই শিক্ষা, অপরপক্ষে পর্যবেক্ষণ প্রণালীর সাহায্যে সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ধারণাই জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি। পেষ্টালটসি চেয়েছিলেন দুটোরই সমবায়, কিন্তু ফ্রেবেল নিলেন মূল্যতঃ পেষ্টালটসির প্রথম দিকটা, আর হার্বার্ট দ্বিতীয় দিকটার ওপর এমনই জোর দিলেন যে সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশের দিকটা যেন একেবারে চাপাই পড়ে গেল।

জন ফ্রেডেরিক হার্বার্ট (১৭৭৬-১৮৪১) পেষ্টালটসির শিষ্য হোলেও গুরুর সংগে বাহ্যিক কোন সাদৃশ্যই ছিল না। হার্বার্ট ওল্ডেনবার্গে একটি সম্ভ্রান্ত প্রতিভাশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর বেশভূষা ছিল পরিপাটী, চেহারা ছিল সুশোভন, প্রতিভার দীপ্তি যেন মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে। তিনি জিমনাসিয়ামে (গ্রামার স্কুল) পড়া শেষ করে জেনার বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক, দর্শন ও গণিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং এ তিনটি বিষয়ই তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চ স্থান পেয়েছে। জেনার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দার্শনিক ফিক্টে দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। রুশো রবিনসন ক্রুশো একমাত্র পাঠ্যপুস্তক হিসেবে স্থির করেছিলেন এমিলের স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য,

হার্বার্ট মনোনীত করলেন অমর কবি হোমারের 'ওডেসী', তাঁর মতে নৈতিক ও বহুমুখী শিক্ষার উৎস হচ্ছে ওডেসীর কাহিনী, এর মত পুস্তক জগতে বিরল। এ পুস্তক মনোনয়নের মধ্য দিয়েই রুশোর সংগে হার্বার্টের প্রভেদ আমরা বিশেষ করে টের পাই। প্রথম যৌবনে বের্ণ সহরের একজন সুইস উচ্চ কর্মচারীর তিন পুত্রের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে তিন বৎসরে (১৭৯৭-১৭৯৯) তিনি যে অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন শিশুপ্রকৃতি ও শিশুর জ্ঞানার্জন সম্বন্ধে তা লাগলো তাঁর বিশেষ কাজে মনস্তাত্বিক শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভবে। তিনি এখানে চেষ্টা করলেন আত্মা বা মানুষ তার নিজের পৃথিবী নিজেই সৃষ্টি করে ফিকটের এই নীতি (The self creates its own world) পরখ করে দেখতে, কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন তাঁর ছাত্ররা তাদের নিজের পৃথিবী বা ভাবরাজ্য নিজেরা সৃষ্টি করে না, বরং উল্টো যে সব ভাব বা ধারণা (ideas) তাদের সামনে উপস্থিত করা হয় তার দ্বারাই তারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয় এবং এভাবেই তাদের মনোরাজ্য গড়ে ওঠে। এখানেই হার্বার্টের শিক্ষাব্যবস্থার কলকাঠি বা চাবি। সমাজ ও শিক্ষক যে-সব ভাবধারা শিশুর মনের ওপর দিয়ে বইয়ে দেন তাতেই শিশুমনের পতিত জমিতে সোনার ফসল ফলে।

যাহোক এর পরে তিনি বার্গডর্ফে গিয়ে পেষ্টালটসির প্রণালী খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন এবং পরে জার্মানীতে এর প্রচার সুরু করলেন। জার্মানীতে গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন ও শিক্ষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে এত খ্যাতি লাভ করলেন (এ সময়েই তিনি তাঁর প্রথম জীবনের কয়েকখানি শিক্ষাবিজ্ঞানের পুস্তক লেখেন—*Science of Education*; *Lectures and Letters on Education*, *Psychology applied to Education*, যে কনিগসবার্গে ইমানুয়েল ক্যান্টের পর তাঁকেই অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হোল। এখানে তিনি সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে

(১৮০৯-১৮৩৩) অধ্যাপনা করেছিলেন এবং মনস্তত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক লেখেন। তিনি দর্শন ও শিক্ষাবিজ্ঞান ত পড়াতেনই, তাছাড়া একটি শিক্ষা সম্বন্ধীয় গবেষণাগার এবং শিক্ষণ-শিক্ষার জন্য কুড়িটি শিশু নিয়ে একটি প্র্যাকটিস্ স্কুল স্থাপন করেন। তাহলেই দেখতে পাচ্ছি আজ যে প্রায় প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষা সম্বন্ধীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও নানা অনুসন্ধান চলেছে তার সূচনা করেছিলেন মহামতি হার্বার্ট। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কনিগসবার্গে প্রাশিয়ার মানসিক আবহাওয়া অসহ্য হওয়াতে তিনি গটিনজেনে আবার অধ্যাপক হয়ে ফিরে আসেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত (১৮৪১) সেখানেই কাটান। গটিজেনের শেষ জীবনে শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁর সবচেয়ে ব্যবহারিক পুস্তক প্রকাশিত হয়—*The Outlines of Educational Doctrine.*

হার্বার্ট নিজে ছিলেন মন সম্বন্ধে অনুষংগবাদী বা সংযোগবাদী; অভিজ্ঞতা, ধারণা ও চিন্তার অনুষংগে বা সংযোগে (Association) মনের ভেতর কতগুলো ভাবমণ্ডলী বা ভাবপুঞ্জ গঠিত হয়, পুরানো ভাবমণ্ডলীর সাহায্যে যখন নোতুন কোন তথ্য, ধারণা বা ভাব কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে হৃদয়ংগম করা হয়, তখন এই নোতুন ও পুরাতনের অনুষংগকে বা সংযোগ বিধিকে Apperception (Perceiving in relation to ideas already in the mind) বা সমবেক্ষণ বলা যেতে পারে। হার্বার্টের মতে মানুষের ও শিশুর শিক্ষা সমবেক্ষণপুঞ্জের সাহায্যেই সংঘটিত হয়ে থাকে। এই সমবেক্ষণ পদই মনস্তাত্বিক শিক্ষাবিজ্ঞানে হার্বার্টের বিশেষ অবদান। হার্বার্টের অনুষংগবাদ তাঁর পূর্ববর্তী মনস্তাত্বিকদের অনুষংগবাদ হতে খানিকটা বিভিন্ন, কারণ তাঁদের অনুষংগবাদ ছিল যান্ত্রিক প্রাণহীন কিন্তু হার্বার্টের অনুষংগবাদের বিশেষত্ব ছিল এই যে এ'তে মনের ভাব বা ধারণাগুলো প্রাণবন্ত ছিল, কোন নোতুন ধারণাকে তারা গ্রহণ করবে, কোন ধারণাকেই তারা বর্জন করবে তা নির্ভর করবে মনের ভাবনিচয়ের ওপর অর্থাৎ সক্রিয় মনের

ওপর। কাজেই মনের ভাবপুঞ্জের গ্রহণ বা বর্জন করবার শক্তি রয়েছে। এই সক্রিয় অনুষংগবাদের প্রচারের সংগে সংগে হার্বার্টকে প্রচলিত মনের প্রকোষ্ঠমূলক শক্তিবাদকে (Faculty Theory of Psychology) ঘোরতর আক্রমণ করতে হোল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক মনস্তাত্ত্বিকদের বিশ্বাস ছিল যে স্মৃতি, মনোভিনিবেশ, কল্পনা, যুক্তি, বিচার প্রভৃতি পৃথক পৃথক শক্তির সমবায়ে মন গঠিত ; এই মতবাদে মনের একত্ব ও অবিভাজ্যতা অস্বীকৃত হয় এবং তাছাড়া, অনুষংগবাদ ও সমবেক্ষণবাদকেও অগ্রাহ্য করা হয়। ভাবসমূহ মনের মণিকোঠায় পৃথক পৃথক ভাবে সঞ্চিত ও রক্ষিত হয় না কিন্তু পরস্পর মিলে গিয়ে সংহতি বা অনুষংগ ধর্মে নোতুন ভাবপুঞ্জের বা সমবেক্ষণবাদের সৃষ্টি করে। অভিজ্ঞতা, ভাব ও ইচ্ছার সপিণ্ডকরণ ঘটে। কাজেই হার্বার্ট প্রথম থেকেই প্রচলিত মানসিক শক্তির প্রকোষ্ঠবাদ নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। প্রকোষ্ঠমূলক শক্তিবাদের আরেকটি মস্ত বড় গলদ ছিল। এই নীতির মনস্তাত্ত্বিকদের মতে মনের যে কোন একটি বৃত্তি বা শক্তিকে যে কোন জিনিষের ভেতর দিয়ে গড়ে তুলতে পারলে সে শক্তি চিরদিনের জন্য কায়েম হয়ে থাকবে এবং সর্ব অবস্থায়ই ও সকল জিনিষ সম্বন্ধে তার প্রয়োগ ও সাফল্য থাকবে অক্ষুণ্ণ বা অব্যাহত (Transfer of Training or Formal Discipline)। যথা স্মৃতিশক্তি বাড়াবার জন্য যদি ছড়া বা কবিতা মুখস্থ করানো হয়, তাহলে স্মৃতিশক্তি গঠিত হবে নিশ্চয় কিন্তু জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই স্মৃতিশক্তি কি অর্থনীতির পরিসংখ্যান বা ইতিহাসের সন তারিখ মনে রাখবারও সহায়তা করবে না শুধু কবিতা ও সাহিত্য মনে রাখবার সাহায্য করবে—অর্থাৎ এই শক্তি কি সাধারণ ও ব্যাপক, না শুধু বিশেষ বিশেষ বিষয়ের স্মৃতি ? তেমনি সীবন বা ছুঁচের কাজের সৌন্দর্য বা পরিচ্ছন্নতা বোধ, প্রকৃতিপাঠের পর্যবেক্ষণক্ষমতা, জ্যামিতি শেখার বিচারশক্তি কি জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও কার্যকরী হবে, না শুধু ঐ

বিষয়গুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকবে? প্রকোষ্ঠমূলক শক্তিবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের মতে এই শক্তি ব্যাপক, কিন্তু হার্বার্ট ও অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিকরা তা স্বীকার করেন না, তাঁরা বলেন এই শক্তি একই ধরনের বিষয় না হোলে অন্য বিষয়ে প্রয়োজ্য নয়, যে বিষয়ে এই শক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা হবে সে বিষয়ে অনুরাগ থাকা দরকার (Doctrine of Interest), মন তাকে গ্রহণ করবে এ অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, নইলে শুধু কবিতা মুখস্থ করার শক্তি গঠিত হয়েছে বলেই যে অর্থনৈতিক বা ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান মনে রাখবার সুবিধে হবে তা মোটেই নয়—এসব পরিসংখ্যান মনে রাখতে হোলে অর্থনীতি বা ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ে মনকে সচেতন হতে হবে, অর্থাৎ তার প্রতি অনুরাগের উদ্ভব হওয়া প্রয়োজন। সপ্তদশ শতাব্দীতে লক মানসিক শক্তির বিষয়নিরপেক্ষ অবাধ প্রয়োগের প্রচারক ছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীতে হার্বার্ট তাঁর সমাধিস্থান রচনা করবার ব্যবস্থা করলেন, কারণ তাঁর মতে মনের জ্ঞানাহরণ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী মনস্তাত্ত্বিকগণ ভ্রান্ত পথে এগিয়েছিলেন, সববেক্ষণপুঞ্জের সাহায্যেই শুধু নানা বিষয়ে জ্ঞানাহরণ সম্ভব। কিন্তু মনের প্রকোষ্ঠমূলক নীতিবাদের জীবনীশক্তি আজো একেবারে হ্রাস পায়নি; বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আজো এ ধারণার বশবর্তী হয়ে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ, হার্বার্টের শিক্ষানীতি রুশো, পেষ্টালটসি ও ফ্রেবেলের শিক্ষানীতির খানিকটা বিরোধী; কারণ তাঁদের মতে শিক্ষা মানে শিশুর মনের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ভাবধারার বিকাশ অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে। কিন্তু হার্বার্ট মনে করেন শিক্ষা শুধু হিতকামী তদারককারীর ব্যাপার নয় যাতে করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা বিশেষ কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন না; তাঁর মতে শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে শিক্ষকের শিশুকে জ্ঞানদান, তার ধীশক্তির উন্মেষ ও পরিপুষ্টি এবং পরবর্তী জীবনে সমাজ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বহুমুখী

একটা অনুরাগের সৃষ্টি হয় মনোমধ্যে এমন সব ধারণা ও ভাবের উদ্ভব অর্থাৎ শিক্ষককে একটা বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে শিশুকে জ্ঞানদান করতে, তাকে মানুষ করে তুলতে। সংগে সংগেই হার্বার্ট বলেছেন এই শিক্ষাদান হবে এমন সব প্রণালীতে যাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিশুর মন আকৃষ্ট হয়, মনে অনুরাগ জন্মে (the doctrine of interest)। এ থেকে হার্বার্টের আরেকটি বিশেষত্ব প্রকট হয়। রুশো এবং ফ্রেবেল শিক্ষাদান ব্যাপারে প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিষয়গুলোর (naturalistic studies) ওপর জোর দিয়েছেন কিন্তু হার্বার্ট ও তাঁর শিষ্যরা জোর দিলেন লোক সম্বন্ধীয় বা হিউম্যানিষ্টিক (সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প, চারুকলা, ইত্যাদি) বিষয়গুলোর ওপর কারণ, তাঁদের মতে এই বিষয়গুলোর সাহায্যেই জীবনের প্রতি একটা বহুমুখী অনুরাগ সৃষ্টি করা সম্ভব, এদের সাহায্যেই মানব চরিত্র সহজে গঠিত হতে পারবে।

তৃতীয়তঃ, হার্বার্ট, রুশো ও ক্যান্টের নীতিবাদের তীব্র সমালোচনা করলেন। রুশো 'নেগেটিভ' শিক্ষার কথা বলেছিলেন নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে; ক্যান্ট ছিলেন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ধারক ; তাঁর মতে মানুষের ইচ্ছাশক্তি মনের ভেতর কি ধারণা বা ভাব আছে তার ধার ধারে না, সে আপন স্বাধীন খাতে অনায়াসে প্রবাহিত হয়ে যায় বা যেতে পারে। হার্বার্ট এ দুটি মতবাদই অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন মানুষের সমস্ত কাজই ধারণাপ্রসূত (ideo-motor) অর্থাৎ এ ভাবসমষ্টি বা সমবেক্ষণপুঞ্জ, বা ভাবসমষ্টি বা সমবেক্ষণপুঞ্জ সঞ্জাত। তাঁর বিশ্ববিশ্রুত কথা হচ্ছে "All action springs from the circle of thought." সুতরাং শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে শিশুর মনে এমন ধারণাসমষ্টি সুশৃঙ্খলভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে করে নৈতিক আচরণ সম্ভব হতে পারে এবং প্রকৃতি ও সমাজের প্রতিও বহুমুখী অনুরাগের সৃষ্টি হয়। নৈতিক শিক্ষায় 'নেগেটিভ' নীতি অকার্যকরী ও

ভ্রান্তিকর, শিশুর মনে নৈতিক ভাবসমষ্টির শেকড় ছড়িয়ে পড়ে জট না বাঁধলে জীবনে বিষবৃক্ষেরই উদ্ভব হবে, অমৃত ফলের আশা বৃথা। তবে শুধু উপদেশ দিলেই হবে না শুধু নৈতিক ধারণাসমষ্টি মনের ভেতর থাকলেই হবে না, শিশুকে এই ভাবের অনুবর্তী হয়ে স্বেচ্ছায় সহজে নৈতিক আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে, নিয়ত স্বাধীন নৈতিক আচরণের ভেতর দিয়েই ফুটে উঠবে তার জীবনের পরম পরিচিতি। হার্বার্ট বলেছেন ধর্ম মানে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সদিচ্ছা, সক্রিয় সামাজিক সহযোগিতা, ন্যায়বিচার, বিবাদবর্জন এবং শাসন অনুবর্তিতা এই হোল হার্বার্টের নীতিবাদ। এ বিষয়ে তিনি লকের সংগে একমত। তাঁর মতে ধীশক্তি গঠনের চাইতে নৈতিক চরিত্র গঠনই অধিক কাম্য। তবে এ দু'টি জিনিষ অবিভাজ্য অর্থাৎ নৈতিক উৎকর্ষ তখনি সম্ভব যখন শিক্ষকদত্ত উপযুক্ত ধারণাসমষ্টি বা সমবেক্ষণপুঞ্জের ফলে শিশুর জীবনের প্রতি অর্থাৎ প্রকৃতি ও সমাজের প্রতি বহুমুখী অনুরাগের সৃষ্টি হয়। এই বহুমুখী অনুরাগই প্রকৃত শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি। সেজন্য হার্বার্ট বলেছিলেন, "the stupid man cannot be virtuous" কথাটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগে, কিন্তু একেবারে খাঁটি।

ধারণাগুলো জন্মে আমাদের প্রকৃতির সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও সামাজিক আদানপ্রদানের ফলে, তাই তিনি পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, তবে ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি থেকে মানুষের নৈতিক ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিগুলো গঠিত হয় বলে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, চারুকলা, সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতিকে পূর্বেই বলেছি তিনি উচ্চতর স্থান দিয়েছিলেন বিজ্ঞানের চেয়ে। কুইন্টিলিয়ানের মত তিনি গ্রীক ল্যাটিনের আগে শেখার পক্ষপাতী ছিলেন। পাঠ্যসূচীর বিষয়গুলো যেন একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে না পড়ানো হয় সেজন্য তিনি বিষয়গুলোর মধ্যে একটা সংযোগ বা সংহতি রক্ষা করতে

উপদেশ দিয়েছেন। এই অনুবন্ধ (Correlation) প্রণালীতে জ্ঞান যে একক এবং বিষয়গুলোর মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে। বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে পড়াতে ছবি, মডেল ইত্যাদি ব্যবহৃত হবে যদি ছাত্রদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকে। বর্ণনা এমন জীবন্ত হওয়া প্রয়োজন যাতে ছেলেদের মনে হবে চোখের সামনে স্পষ্ট জিনিষটা দেখতে পাচ্ছে। ইতিহাস পাঠের ওপর তিনি সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন ; "History should be the teacher of mankind ; if it does not become so, this blame rests largely with those who teach history in school." ইতিহাস জীবনী ও গল্প দিয়ে সুরু হবে এবং তাঁর মতে *Odyssey* হোল সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প। ইতিহাস শিক্ষক সরসভাবে গল্প বলবেন, এবং বলা অভ্যেস করবেন—গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস যেমন চিত্তাকর্ষক করে গল্প বলেছেন সেই আদর্শ অনুকরণ করবেন শিক্ষক। কার্যকারণ সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে হবে। একঘেয়েভাবে বেশী কথা বলে ছেলেমেয়েদের বিরক্তিই শিক্ষক জন্মাবেন, অনুরাগ নয়। "To be tedious is the greatest of teaching sins". সাধারণ ইতিহাসের সংগে বিজ্ঞান ও চারুকলায় নানা আবিষ্কারের ছোট একখানি ইতিহাস পাঠ্য থাকবে। বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র আরোহী প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং হাতের কাজের ব্যবস্থা থাকবে। শাসন-ব্যবস্থায় ছেলেদের স্বায়ত্তশাসনের কথা তিনি অনুমোদন করেছেন, তবে যেখানে ছেলেদের নৈতিক মনোভাব পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি সেখানে অভিভাবক বা শিক্ষকের শাসন বা কর্তৃত্ব মানতেই হবে। ছেলেদের একেবারে প্রলোভনের আওতার বাইরে রাখলে চরিত্র গঠিত হবে না, প্রলোভনের সম্মুখীন হয়ে তাকে আত্মসংযম ও সদিচ্ছার বলে জয়ী হতে হবে। কিন্তু ছেলেদের বেশী প্রলোভন বা আত্মসংযমের মধ্যে ছেড়ে দিলেও চলবে না। সুতরাং শিক্ষককে খুব বুদ্ধি করে চলতে হবে।

শিক্ষকদত্ত ধারণাসমষ্টির ওপর জোর দিতে গিয়ে হার্বার্ট দু'একটি ভুল কথাও বলেছেন। তাঁর মতে জন্মকালে সকল শিশুই সমচরিত্র বা সমান—উত্তরকালে তাদের প্রভেদের কারণ হচ্ছে তাদের শিক্ষার অসমতা—সুতরাং শিক্ষক যিনি কতগুলো এবং কি ধরনের ভাবধারা দিতে হবে এইসব প্রশ্নের নিয়ন্তা তিনিই শিক্ষায় সর্বপ্রধান। হার্বার্ট অবশ্য সময় সময় স্বীকার করেছেন যে দেহের বিভিন্নতার জন্য হয়ত ব্যক্তিগত প্রভেদের সৃষ্টি হয়। দেহ বলতে যদি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্নায়বিক গঠন বোঝায়, তাহলেই দেখা যাবে শিশু চরিত্রের ওপর এর বিভিন্ন প্রভাবের দরুণ শিশুরাও প্রথম থেকেই বিভিন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। হার্বার্ট মনের কতগুলো অন্তর্নিহিত শক্তি আছে একথা অস্বীকার করেছেন প্রকোষ্ঠমূলক শক্তিবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে। প্রকোষ্ঠমূলক শক্তিবাদ ভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু সংরক্ষণ-শক্তি, জীবনীশক্তি বা গতিশক্তি ও কর্মশক্তি ইত্যাদি কতগুলো মনের অন্তর্নিহিত শক্তি আছে এই মৌলিক প্রকল্প (fundamental hypothesis) মেনে নিয়েই আজ বহু মনস্তাত্বিক কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন।

যা হোক আমরা হার্বার্টের মনস্তত্বের দোষগুণ নিয়ে এখানে বিচার করব না, যে জিনিষটি শিক্ষাক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় অবদান—জ্ঞান আহরণে মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা—কিভাবে জ্ঞান অর্জিত, সজ্জিত ও সঞ্চিত হয়—সেই বিষয়টি একটু আলোচনা করে এ নিবন্ধ শেষ করব। তাঁর মতে মানসিক অগ্রগতি নোতুন ও পুরাতনের সংযোগে সাধিত হয়, সেজন্য শিক্ষা-প্রণালীর সবচেয়ে বড় কথা হবে নোতুনকে পুরাতনের সংগে সংশ্লিষ্ট করা, মনকে পুরাতনের সাহায্যে নোতুনকে গ্রহণ করতে সাহায্য করা (apperception); মনের মধ্যে যে ধারণাগুলো আগে থেকেই আছে তারা নোতুন ধারণাগুলোকে গ্রহণ করবে না-পরিহার করবে তা যে প্রণালী দ্বারা স্থিরীকৃত হয় তাকেই সমবেক্ষণ (apperception) প্রণালী বলা যেতে পারে। মনের

মধ্যে ধারণাপুঞ্জগুলোর ভেতর যেটি সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায় সেই অনুসারেই মানুষ কাজ করে। সুতরাং পদ্ধতির দিক থেকে শিক্ষকের দুটি প্রধান কর্তব্য রয়েছে : কোন নোতুন পাঠ দিতে হোলে তাঁকে সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে যথাযথ অনুকূল ধারণা-সমষ্টি বা সমবেক্ষণপুঞ্জ মনোমধ্যে আলোড়িত হয়েছে কিনা; দ্বিতীয়তঃ, তাঁকে নোতুন বিষয়বস্তুটি এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যে তা অতি সহজে আগে থেকে আয়ত্তীকৃত ধারণাগুলোর সংগে সংযুক্ত হয়ে যাবে। এই মূলনীতি দুটিই হার্বার্টের পদ্ধতির পঞ্চধাপ বলে পরে শিক্ষাজগতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে—তৈরীকরণ (Preparation), উপস্থাপন (Presentation), তুলনা ও বিচ্ছিন্নীকরণ (Comparison and Abstraction), সাধারণ সূত্র (Generalization) এবং প্রয়োগ (Application)। হার্বার্ট নিজে এই পাঁচটি ধাপের জন্য মাতামাতি করেন নাই, করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা। তিনি নিজে শুধু স্পষ্টতা, সংযোগ, সরল সূত্র এবং ছাত্রের চিন্তাশক্তি এই চারটি নীতির কথা বলেছেন। আমরা আজ জানি এই পাঁচটি ধাপই প্রত্যেক পাঠে প্রযোজ্য নয়, যেমন সাহিত্য বা ইতিহাস বিষয়ক পাঠে সাধারণ সূত্র, প্রয়োগ ইত্যাদি ধাপ অপ্রাসংগিক ও অনুপযুক্ত—বিজ্ঞান বিষয়ক বা সমস্যামূলক পাঠেই এগুলো খাটে। মার্কিন দার্শনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউয়ি তাঁর সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে অনুরূপ পঞ্চ ধাপের ব্যবস্থা করেছেন।* হার্বার্টের পঞ্চ ধাপের খ্যাতি স্কুলে হয়ত আজ ততটা নেই কিন্তু যেসব নীতির কথা তিনি বলে গেছেন তা হোল শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি এবং সর্ব অবস্থায় প্রযোজ্য। তাঁর শিষ্যদের পঞ্চ ধাপও শিক্ষাজগতের অশেষ উপকার সাধন করেছে একথা বলতেই হবে।

---

* ১। সমস্যার সম্মুখীন হওয়া বা উত্থাপন, ২। তথ্যসংগ্রহ, ৩। একটি সংকল্প বা প্রস্তাব অস্থায়ীরূপে গ্রহণ, ৪। সূত্র উদ্ভাবন, ৫। সূত্রের যাচাই ও প্রয়োগ।

হার্বার্ট সম্বন্ধে আরেকটি সমালোচনা করা হয় যে তিনি শারীরিক শিক্ষার ওপর জোর দেননি যেমন দেননি মার্কিন শিক্ষাবিদ জন ডিউয়ি, বিশেষ করে করেন তাঁরা যাঁরা শারীরিক শিক্ষাকে চরিত্রগঠনের ভিত্তি বলে মনে করেন। ব্যায়াম ও আমোদ-প্রমোদের উপকারিতা তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু হার্বার্ট বা ডিউয়ির ধীশক্তি পরিপোষক শিক্ষাব্যবস্থায় শারীরিক শিক্ষা যে খুব উচ্চ স্থান পাবে না এটি স্বাভাবিক এবং এতে তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

হার্বার্টের প্রভাব মাধ্যমিক শিক্ষার ওপরেই বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল যদিও তাঁর শিষ্যদের প্রভাব পরে বিস্তৃত হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে। যদিও আজ হার্বার্টের শিষ্য বলে কেউ বিশেষ পরিচয় দেন না, তবু একথা বলতেই হবে প্রত্যক্ষেই হোক বা পরোক্ষেই হোক শিক্ষার ওপর হার্বার্টের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। প্রথমে অষ্ট্রিয়া, পরে জার্মানী ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায় মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাক্ষেত্রে হার্বার্টের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। হার্বার্টের শিষ্যমণ্ডলীর অস্তিত্ব আজ না থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর মূল শিক্ষানীতি-গুলো শিক্ষার দৈনন্দিন পাঠক্রমে ও কৃত্যালিতে প্রতিফলিত ও রূপায়িত হয়েছে এবং তাঁর কতগুলো ভ্রান্ত ধারণা বা সিদ্ধান্ত ও তাঁর শিষ্যদের পাণ্ডিত্য জাহির আজ বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে।

তাঁর অবদানের মধ্যে কয়েকটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হার্বার্ট প্রতিষ্ঠিত কনিগসবার্গের শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যায়তন ও 'প্র্যাকটিস' স্কুল আদর্শ কালে সকল বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা গৃহীত হোল। যদিও তাঁর মনস্তত্ত্ব আজ অনেকাংশে অগ্রাহ্য, তাহলেও শিক্ষায় মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ ভবিষ্যতের গৌরবময় দিনের সূচনা করেছিল এবং তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা মনস্তাত্ত্বিক নীতির দিক থেকে একেবারে যথাযথ না হোলেও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। ইতিহাস ও

সাহিত্য শিক্ষায় হার্বার্টের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। এ প্রভাবের ফলে ইতিহাস আজ আর সন তারিখ রাজরাজড়ার বংশ পরিচয় ইত্যাদি নীরস জিনিষের ভারে ভারাক্রান্ত নয়, আজ ইতিহাস মানুষের অগ্রগতি, সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন এ সব চিত্ত-চমৎকারী বিষয় নিয়ে কিশোরকিশোরীর মনোরঞ্জন করে, প্রকৃত শিক্ষা দেয়। সাহিত্যে প্রচলিত খণ্ড খণ্ড অনুচ্ছেদ পাঠ ও বৃহৎভাষ্যের পরিবর্তে হার্বার্টের শিষ্যরা গদ্য ও পদ্য আদ্যোপান্ত পড়ার যে নির্মল আনন্দ তা স্কুলের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। *Odyssey*কে সংস্কৃতির উৎস বলে মেনে নিয়ে জাতীয় সাহিত্য ও চারুকলায় গ্রীক সাহিত্যের অনুপ্রেরণার প্রতি বিশেষ ইংগিত করেছেন। অন্য যে কোন শিক্ষাব্যবস্থা অপেক্ষা হার্বার্ট ও তাঁর শিষ্যদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি যে স্কুলের জীবনকে সরস, সার্থক ও আনন্দময় করে তুলেছে সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নেই।

শিক্ষার ইতিহাসে কিণ্ডারগার্টেন বা শিশু উদ্যানের স্রষ্টা ফ্রেডেরিক ফ্রেবেলকে (১৭৮২-১৮৫২) রুশোও পেষ্টালটসির উত্তর-পুরুষ বলা যেতে পারে। জীবনের প্রথম দিকে শিক্ষার মতবাদ তাঁর গড়ে উঠেছিল পেষ্টালটসির স্কুল ও কার্যকলাপ দেখে, আজ তাঁর নাম বিশ্বের ঘরে ঘরে। শিশু উদ্যান কথাটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ফ্রেবেলের শিশুর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা, স্নেহ ও শ্রদ্ধা এবং তাঁর শিক্ষাপ্রাণালীর গূঢ়তত্ত্ব। বাগানের মালীর যত্ন ও সস্নেহ পরিচর্যায় যেমন উদ্যানের চারা গাছগুলো আপনা হতেই নিজ নিজ স্বভাবেব ধারায় দিন দিন বেড়ে ওঠে চিক্কণ শ্যামলতায়, স্কুলের শিশুরাও বেড়ে উঠবে তাদের আপন আপন স্বভাবের পথে শিক্ষকের সযত্ন তদারকে দৈহিক ও মানসিক শক্তির দীপ্তিতে ও সৌন্দর্যে। বাগানের মালী যেমন ক্রমবর্ধনশীল চারা গাছের বৃদ্ধির পথে কোন বিঘ্ন ঘটায় না, গাছের স্বভাবধর্মকে মেনে চলে, শুধু আগাছা পরিষ্কার করে, ছেঁটেছুঁটে, সার দিয়ে তার বৃদ্ধির পথ সহজ করে দেয়, শিক্ষকও তেমনি শিশুর স্বাভাবিক

বিকাশে কোন বাধা দেন না, শুধু দূর হতে দাঁড়িয়ে নিয়ন্ত্রিত পথে তার শক্তির প্রস্ফুটন সস্নেহে নিরীক্ষণ করেন এবং তার আত্মশক্তি উন্মেষের যে সব অন্তরায় তার দূরীকরণে সচেষ্ট হন। শিশুরাও উদ্যানের পুষ্পের মত আপন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও আনন্দের দীপ্তিতে স্কুলগৃহকে ভরে দেয়—তাই তাঁর শিশু স্কুলের নাম তিনি দিলেন "শিশুউদ্যান" (Kindergarten—Child's Garden)। এ শিক্ষামতে দুটি জিনিষ বিশেষভাবে প্রকট হয়—ফ্রেবেলও রুশোর মত মনে করতেন শিশু দেবশিশু—পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্তান—তার সকল শক্তিই কল্যাণের আধার, আনন্দময় কর্মের ভেতর দিয়ে তার বিকাশেই মানবাত্মার পূর্ণ সার্থকতা, কোন কোন শিশুর মধ্যে যা কিছু গলদ দেখা যায় তা নিয়মের ব্যত্যয় মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, এই অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তির বিকাশ আপনা হ'তেই হয় অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে, কারণ শিশু এ পরিবেশে তার প্রাণের সজীবতাকে সামাজিকতাকে কর্মের ভেতর দিয়ে মূর্ত না করে থাকতে পারে না—শিক্ষকের কর্তব্য বাগানের মালীর মত পরিবেশটিকে আত্মশক্তির স্বতঃস্ফূরণের উপযুক্ত করে তোলা।

ফ্রেবেলই সর্বপ্রথম শিশুপ্রকৃতির ক্রমবিকাশের ওপর শিক্ষানীতি ও শিক্ষার কার্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি মনস্তাত্বিক ছিলেন না সত্য কিন্তু তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার একটি মনস্তাত্বিক ভিত্তি ছিল। তাঁর মতে শিক্ষা কর্মের মাধ্যমে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, এই শক্তি বৃদ্ধি পায় অভ্যাসের ফলে এবং এর পূর্ণ পরিণতি হয় স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রণোদনার ভেতর দিয়ে। তাই ফ্রেবেল বলেছেন, "We learn by doing. Play is the essence of life." তৃতীয়তঃ, যে কোন প্রকারের কর্ম দিয়ে শিশুপ্রকৃতির ক্রমবিকাশ সাধিত হয় না, শুধু সেই ধরনেরই কৃত্যালীর প্রয়োজন যা শিশুপ্রকৃতি যে স্তরে আছে তার উপযোগী অর্থাৎ তার পক্ষে খুব সহজও নয়, দুরূহও নয় অথচ

তার প্রকৃতির ক্রমবিকাশের সংগে খাপ খায়। তাই কৃত্যালীর ভেতর দিয়ে শিশুর সৃজনী শক্তি বর্ধিত করা প্রয়োজন তাকে বিমূর্ত ধারণার অধিকারী করবার আগে। ফ্রেবেল বর্তমান নোতুন শিক্ষার গোড়াপত্তন করেছেন এই বলে যে সত্যিকারের বিকাশ হয় তখনি যখন শিশু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বাধীন পরিবেশে কর্মে নিমগ্ন হয় আত্মার অভাব বা চাহিদা মেটাতে এবং শিশু-প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিকাশের একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা বয়ে চলেছে। তিনি আরো বলেছেন, শিশুপ্রকৃতির বিভিন্ন দিকেরও একটা সামঞ্জস্য থাকা খুবই প্রয়োজন, না হলে হয় বিকাশ হয়ে যাবে বন্ধ নয় হবে অন্য কথা। যথা আমরা স্মৃতিশক্তি এমন বাড়াতে পারি যে বিচারশক্তি বা যুক্তিবিবেচনা শক্তি কমে যাবে, বা শারীরিক শক্তি এমন বৃদ্ধি করতে পারি যে ধীশক্তি মন্দীভূত হয়ে যাবে। ফ্রেবেলের এই মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ থেকে দু তিনটি জিনিষ অতি সহজে প্রতিপাদ্য হয়:—(১) জ্ঞান নিজের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, এর প্রয়োজন আত্মশক্তি ও ধীশক্তি বিকাশের জন্য, কর্মকুশলতার জন্য। (২) শিশুর বিভিন্ন শক্তি বর্ধিত করবার কাজে এদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজন এবং (৩) স্বতঃপ্রণোদিত না হলে কোন বিকাশ সম্ভব নয়—ওপর থেকে জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দিলে যে তাঁর বুদ্ধির স্ফূরণ হচ্ছে তার কোন প্রমাণ নেই। শিশু প্রকৃতির অন্তঃস্থলভেদী এমন গভীর দৃষ্টি বহু মনস্তাত্ত্বিকেরও নেই। ফ্রেবেলের চরিত্রের আরেকটা দিক ছিল; তিনি ছিলেন 'মিষ্টিক' (mystic) অধ্যাত্মবাদী; মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস করতেন এবং সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতেই তিনি অনুভব করতেন ভগবানের সান্নিধ্য, প্রকৃতিই যেন ছিল ভগবানের লীলাক্ষেত্র, তাঁর বাহ্যরূপ এবং আমাদের নৈতিক অনুপ্রেরণার আধার। তাই তিনি বলেছেন, "All nature even the world of crystals and stones teaches us to recognize good and evil." কবি ওয়ার্ডস্-

ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। শিশু যেমন প্রকৃতির অংগ তেমনি সমাজেরও অংগ। একথা বললে অত্যুক্তি করা হবেনা যে এসব বিষয়ে তিনি পেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতের সনাতন ঋষিদের দিব্যদৃষ্টি এবং তাঁদের মত বিশ্বাস করতেন আনন্দময় কর্মের ভেতর দিয়েই মানুষের আত্মশক্তির চরম বিকাশ এবং পরম ব্রহ্মের সহিত মিলন। তার সামজিক বিবর্তনবাদ নীতিটিও আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে শিশু, যুবক, পরিণতবয়স্ক মানুষ এরা প্রত্যেকেই জাতীয় শক্তি গড়ে তোলেন আবিষ্কার, উদ্ভাবনী শক্তি ও পরস্পর দানের মাধ্যমে এবং যেন এক ঐতিহাসিক ধারায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ভগবানের গূঢ় রহস্যময় ইচ্ছা বা পরিকল্পনা পূর্ণ করেন। তাঁর এই সব মতবাদ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রধান পুস্তক "*The Education of Man*"-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বইখানি সুখপাঠ্য নয়, অনেক সময় দুর্বোধ্য, তবে তা থেকে তাঁর মুখ্য মতবাদ ধরে নেওয়া যায়। ভূমিকাটি সুলিখিত। এবার তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা প্রয়োজন, কারণ তাঁর শিক্ষা-মতবাদের সংগে এ'র একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

ফ্রেডেরিক ফ্রেবেল (১৭৮২-১৮৫২) জার্মানদেশের থুরিঞ্জিয়া (Thuringia) বনানীর মধ্যে একটি ছোট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতা ছিলেন ধর্মযাজক, ঘরে ছিলেন বিমাতা; কিন্তু একথা ঠিক নয় পিতা ও বিমাতার অবহেলায় বা অত্যাচারে তাঁর মন ব্যথায় স্নেহে ভরে উঠল অনাদৃত শিশুদের জন্য বা তাঁকে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হ'ত গৃহের অশান্ত পরিবেশ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য। আধুনিক গবেষণায় একথা অলীক বলেই স্থির হয়েছে। তবে একথা ঠিক তিনি একটু একাকী বোধ করতেন এবং ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই বনে বনে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন এবং প্রকৃতির মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ভগবানের প্রতিমূর্তি। এ

থেকেই সুরু হোল তাঁর মিষ্টিসিজম্, ঈশ্বরপ্রেম এবং সরল বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় অপরিসীম অনুরাগ। তাঁর বড় ভাই ক্রিষ্টফ্ (Christop) ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু এবং তাঁর মনে যেসব নানারকম সমস্যা ও প্রশ্নের উদয় হ'ত তার সমাধান্ করতেন তিনি। তা হোলেও তাঁর নিঃসংগভাব কাটলো না। সেজন্য দশ বছর বয়সে তিনি মামার বাড়ীতে গিয়ে বাস করেন, এখানে অধিকতর স্বাধীনতা ও যত্ন পাওয়ায় তাঁর আত্মিক জীবন পূর্ণতর হয়ে উঠল। স্কুলে ভর্তি হলেন কিন্তু শিক্ষকতা ভাল না হওয়ায় (বেশী দুরূহ হওয়ায়) এবং খেলাধূলোয় পারদর্শিতা না থাকায় স্কুল থেকে তিনি বিশেষ কিছু পেলেন না; তা হোলেও মামার বাড়ী থাকাকালীন তাঁর জীবনের রুদ্ধ দ্বার যেন খুলে গেল। এ চার পাঁচ বছরের সুখস্মৃতি তাঁর চিরদিন মনে ছিল। তিনি ভাইকে লিখেছিলেন, "The kindly influences of my youth gave me a freedom which broadened my views, increased my strength and developed my inner life."

এর পরে তাঁকে একজন বনানী অফিসারের কাছে শিক্ষানবীশ (apprentice) করে দেওয়া হোল, এখানে প্রকৃতির ও বিজ্ঞানের সংগে তাঁর আরো অন্তরংগ পরিচয় হোল, যত না হোল বৃক্ষ সংরক্ষণ বা কাঠের ব্যবসা সম্বন্ধে জ্ঞান। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে এখানে তিনি উপলব্ধি করলেন সমস্ত প্রকৃতিই যেন একসুরে গাঁথা, বহুর মধ্যে একের বিকাশ। এর পরে তিনি জেনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাবার একটি অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেলেন (১৭৯৯)। এখানে গণিত শাস্ত্র ছাড়াও তিনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপকের কাছে জীববিদ্যা (Zoology) শিখতে লাগলেন। অধ্যাপক পরীক্ষাগারে দেখালেন সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর কংকালই—সে মাছই হোক, পাখীই হোক, মাতৃস্তন্যপায়ী জীবই হোক—প্রায় একরকম। বিবর্তনবাদের এসব ধারণা তাঁকে বহুর মধ্যে একের এবং সমস্ত প্রকৃতির সুশৃংখলত্ব ও অংশের সহিত অংশের মিলন

মন্ত্রে দীক্ষা দিল। প্রায় আড়াই মাস অধ্যয়নের পর তাঁর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জীবন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল ত্রিশ শিলিং ঋণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েদখানায় বন্দী হয়ে।

এর পরে তিনি একে একে হোলেন কৃষক, কেরাণী, হিসাবরক্ষক —এসব ভাল না লাগাতে স্থির করলেন ফ্রাঙ্কফোর্টে গিয়ে স্থপতি-বিদ্যা শিখবেন কিন্তু ফ্রাঙ্কফোর্টে আসা মাত্রই তিনি শিক্ষকের মহাব্রত গ্রহণ করলেন, তিনি বুঝলেন এই তাঁর জীবনের কাজ। এখানে তাঁর দেখা হোল গ্রুণার (Gruner) নামক পেষ্টালটসির একজন শিষ্যের সংগে। গ্রুণার একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের কৃতকর্মী প্রধান শিক্ষক, তিনি পেষ্টালটসিকে ৯ বৎসর থেকে ১১ বৎসরের ছেলেদের পড়াবার সুযোগ দিলেন। মাছ যেমন জলে সাঁতার কাটে আর পাখী যেমন আকাশে উড়ে খুশী হয় তিনি বললেন, শিক্ষকতা করে তেমনিই তিনি খুশী হয়েছেন। এখানে পেষ্টালটসির পুস্তকাদি পড়ে তিনি ইভারডুনে যাবার জন্য ব্যগ্র হোলেন এবং ছুটি হওয়ামাত্রই মহামতি পেষ্টালটসির সন্নিধানে গিয়ে উপস্থিত হোলেন। পেষ্টালটসির স্নেহ ও উৎসাহে অভিভূত হয়ে পড়লেও তিনি বুঝতে পারলেন শিক্ষকতায় এখানে কিছু কিছু ফাঁক বা গলদ ছিল। ইভারডুন থেকে ফিরবার (অক্টোবর, ১৮০৫) পর গ্রুণার তাঁকে তিন বছরের জন্য শিক্ষকতার কাজ দিলেন এবং এখানে ভূগোল ও প্রকৃতিপরিচয়ের শিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দু'বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি পদত্যাগ ক'রে হার্বার্টের মত একজন ধনীর তিন পুত্রের শিক্ষার ভার নিলেন এবং প্রথমে ভাবলেন রুশোর নীতি অনুসারে তাদের সমাজের আওতার যথা সম্ভব বাইরে রেখে শিক্ষা দেবেন। কিন্তু তাঁর প্ল্যান বদলে গেল, এই নোতুন জীবনে যাতে তিনি শ্রেষ্ঠ সাফল্যলাভ করতে পারেন, সেজন্য তিনি স্থির করলেন রুশো ও হার্বার্টের নীতির অনুসরণ না করে তিনি প্রথম ইভারডুনে গিয়ে পেষ্টালটসির কাজ ভাল করে দেখবেন

এবং পরে গটিনজেন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁর অধ্যয়নের কাজ শেষ করবেন।

এই কার্যসূচী অনুসারে তিনি তাঁর তিনটি ছাত্রকে নিয়ে দ্বিতীয়বার ইভারডুনে এলেন (১৮০৮), ইভারডুন তখন যশের উচ্চ শিখরে। ছাত্রদের স্কুলে ভর্তি না করলেও তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে পেষ্টালটসির স্কুলের সমস্ত অনুপ্রেরণা পাবার পথে কোন বাধা না জন্মায়, তারা স্কুলে এসে মেলামেশা করতো এবং তাদের সংগে স্কুলের দশবারটি ছেলে ফ্রেবেলের শিক্ষাবিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হ'ত। এখানকার ড্রয়িং, ভাষা ও ইন্দ্রিয়গ্রাম শিক্ষা এবং ছোট শিশুর শিক্ষায় মাতার গুরুতর দায়িত্ব সম্বন্ধে পেষ্টালটসির মতবাদকে ফ্রেবেল বিশেষ প্রশংসা করেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ইভারডুনে এসেই তাঁর দৃষ্টি ছোট শিশুদের শিক্ষার ওপর বিশেষভাবে নিবদ্ধ হোল এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর কাজের ভেতর এর প্রভাব স্পষ্ট দেখা গেল। অল্প বয়সে শিক্ষার কাজ সুরু করলে ছেলেমেয়েরা যে আনন্দময় কর্মের ভেতর দিয়ে নানা বিপদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্তি পায় পেষ্টালটসির কাজ দেখে তাঁর আর কোন সন্দেহ রইল না। বিশেষ করে, এইখানেই তিনি খেলার শারীরিক, নৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হোলেন। সে সময়ে ইভারডুনে দুজন খুব ভাল সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন, ফ্রেবেল তাঁদের সঙ্গীত শেখান পদ্ধতি দেখে ও বক্তৃতাবলী শুনে বিশেষ উপকৃত হোলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোলেন যে সঙ্গীত, গতি এবং ভাষা ভাবপ্রকাশের অংগাংগীভাবে জড়িত তিনটি রূপ। এ সব ভাবধারা তিনি পরে তাঁর কিণ্ডারগার্টেন বা 'শিশু-উদ্যানে' রূপায়িত করলেন। ইভারডুনে শিক্ষকদের মধ্যে এই সময়ে মনান্তর সুরু হয়েছিল। সুতরাং ফ্রেবেল ৩০ বৎসর বয়সে গটিনজেন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৮১২) তাঁর অধ্যয়নের কাজ (বিজ্ঞান ও ভাষা) সমাপ্ত করতে যাত্রা করলেন। ১৮১৩

খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তাঁকে যুদ্ধে যেতে হোল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই ছাড়া পেলেন। এই সময়ে ছোট শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিনিয়াসের মতবাদ তাঁর মনের ওপর গভীর রেখাপাত করলো এবং যে কাজের জন্য আজ ফ্রেবেল বিশ্ববিশ্রুত সে কাজের জন্য একটা বিশেষ অনুপ্রেরণা পেলেন। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যলিপ্সা ও যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল; তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন মানুষের মনকে সৌন্দর্য ও অধ্যাত্মভাবে ভরে না দিলে মানব-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে; তিনি বুঝলেন শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মানবমনের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন, তাই জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডে নানা ঘোরাঘুরি, জল্পনা-কল্পনা এবং পরীক্ষামূলক স্কুল স্থাপনার পর ৫৮ বৎসর বয়সে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাতৃভূমি থুরিঞ্জিয়ায় ব্লাংকেনবার্গ (Blankenburg) নামক ছোট্ট সহরে তার প্রথম 'শিশু-উদ্যান' পাঁচ বছর থেকে আট বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেন। 'শিশু-উদ্যানের' সংগে শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগও খোলা হোল যাতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এই নাম সম্বন্ধেও একটি সুন্দর গল্প আছে। তিনি আগে যে সব নাম দিয়েছিলেন স্কুলের সেগুলো ছিল বড্ড বড়, তাঁর মনঃপূত হয়নি, যথা—'A School for Psychological Education', 'A School based on the active instincts of Children.' তিনি সুন্দর অথচ ছোট্ট একটি নামের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে প্রভাতে পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর মনের ভেতর একটি নাম খেলে গেল, তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "Eureka! I have found it. The School is a Kindergarten."—স্কুল হবে উদ্যান যেখানে শিশু অতি স্বাভাবিক সহজভাবে বেড়ে উঠবে যেমন ওঠে চারা গাছ মালীর সযত্ন পরিচর্যায়। নামকরণটি সার্থক হয়েছিল সন্দেহ নেই কারণ আজ পৃথিবীর সর্বত্র এ চালু।

ব্লাংকেনবার্গের শিক্ষিকারা জার্মানীর নানা জায়গায় 'শিশু-উদ্যান' প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন এবং Baroness Von Marenholtz Bülow নাম্নী একটি ধনী রমণী কিণ্ডারগার্টেনের বার্তা জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ইটালী, ইত্যাদি নানা দেশে সাফল্যের সংগে প্রচার করলেন। ইংলণ্ডের শিক্ষাজগতে যদিও কিণ্ডারগার্টেন ফ্রেবেলের মৃত্যুর পূর্বেই স্থান পেয়েছিল, তা'হলেও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পরেই এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় সে দেশে। এ সব দেশের বড় সহরে কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর ফ্রেবেলও কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির শিক্ষিকা তৈরী করবার জন্যই প্রায় সমস্ত সময় ব্যাপৃত থাকতেন। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে ফ্রেবেলের মৃত্যুর এক বৎসর আগে (১৮৫১) ভুল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে (যে সব স্কুল ঈশ্বরে অবিশ্বাস করে) প্রাশিয়ার শিক্ষা ও ধর্ম মন্ত্রী কিণ্ডারগার্টেন প্রাশিয়ার রাজ্যে বন্ধ করে দিলেন ; অবশ্য জার্মানীতে প্রাশিয়ার বাইরে এ চালু রইল এবং ফ্রেবেলের মৃত্যুর পূর্বেই জার্মানীতে কিণ্ডারগার্টেন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাহোক ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় এবং কিণ্ডারগার্টেনের দ্রুত প্রসার হতে সুরু হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড তার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষণ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাতের কাজের প্রবর্তন করে এবং সুইডেন করে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাই হাতের কাজের সব প্রেরণা একমাত্র কিণ্ডারগার্টেনে আছে এবং নূতন শিক্ষা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত কিণ্ডারগার্টেন দ্বারা। মার্কিন দেশেও আস্তে আস্তে কিণ্ডারগার্টেন সুপ্রতিষ্ঠিত হোল এবং হয়ত সে দেশেই এর চরম উন্নতি হয়েছে।

ভারতবর্ষ ও সুদূর প্রাচ্যেও ছোটদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনগুলোতে কিণ্ডারগার্টেন নীতি অনুসৃত হোল। সে হিসেবে ফ্রেবেলের শিশু-উদ্যানকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বলা যায় যেমন পরবর্তী-কালে হোল মণ্টেসরির শিশু-নিকেতন (Casa de Bambini).

অন্তর্নিহিত শক্তির স্বাভাবিক বিকাশধারার নিয়ম এবং সৌন্দর্য ও সামাজিক বোধনীতি ছাড়াও আমরা দেখেছি তাঁর আরেকটি বড় নীতি ছিল তাঁর রহস্যময় ঐশীবাদ—বিশ্ব ব্রহ্মবাদ বা প্রকৃতি ব্রহ্মবাদ। তাই ফ্রেবেল তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা (Pantheism), অধ্যাত্মবাদ ও প্রতীকত্ববাদের ওপরেও বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরোক্ত এসব তাঁর বিশ্বাস বা মতবাদ হয়ত আজ আর কেউ খুব মেনে নিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্যান্য অমূল্য অবদানের জন্য কিছু অদল-বদল হয়ে আজ সর্বত্র চালু হয়েছে। যদিও তিনি শিশু অবস্থা থেকে কৈশোর পর্যন্ত শিক্ষার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করেছিলেন, তা হোলেও তাঁর পরিচয় কিণ্ডারগার্টেন দিয়েই। এ হিসেবে শুধু মণ্টেসরির সংগেই তাঁর তুলনা চলে, কারণ তাঁরও পরিকল্পনা ছিল শিক্ষার নানাস্তরে তাঁর নীতি প্রযুক্ত হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত জগত সম্মুখে গ্রাহ্য হোল শুধু তাঁর 'শিশু-নিকেতন'। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মশক্তি ও আত্মপ্রকাশের ওপরই প্রকৃত শিক্ষা নির্ভর করে এই মত ফ্রেবেলের মত মণ্টেসরিও পোষণ করতেন এবং কার্যক্ষেত্রে দু'জনেই তা সপ্রমাণ করেছেন। শিশুর অন্তর্নিহিত নৈতিকতা সম্বন্ধে রুশোর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; ফ্রেবেল অতটা দূর অগ্রসর না হোলেও মণ্টেসরির মতই পুরানো দিনের দমননীতিতে মোটেই বিশ্বাস করতেন না; আনন্দময় কর্মের ভেতর দিয়ে আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশই ছিল তাঁদের কাম্য। ফ্রেবেলের নিজের একান্ত বিশ্বাস ছিল শুধু কর্মের ভেতর দিয়েই অন্তর্নিহিত দেবশক্তিকে জাগ্রত করা সম্ভব। তাই তিনি বলেছেন, "প্রথম হইতেই কর্ম যদি ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়, তবেই হৃদয়ে ধর্মমূল সুদৃঢ় হয় এবং ধর্মজীবন ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। কর্মহীন ধর্ম স্বপ্নের ন্যায় অলীক ও শূন্যগর্ভ; উহা অলস মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র। সেইরূপ আবার ধর্মহীন কর্ম, উহা শিল্পকর্ম বা অন্য যে কোন কর্মই হউক না কেন, মানবকে ভারবাহী পশু করিয়া তুলে।

কর্ম ও ধর্ম অংগাংগীভাবে বিজড়িত—কারণ আনন্দ-স্বরূপ ভগবান অনাদিকাল হইতে নিজেই সৃষ্টিকার্যে নিমগ্ন রহিয়াছেন।” ইহা ভারতীয় ঋষিদের প্রাণের কথা; তাই মনে হয় ফ্রেবেল হয়ত কোন পূর্ব জন্মে ভারতীয় ঋষি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উপনিষদে আছে—

“বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদ উভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা, বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে ॥”

অর্থাৎ বিদ্যা এবং অবিদ্যা (কর্ম) দুই সমান প্রয়োজন, কর্মের (অবিদ্যার) দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যার সাহায্যে মানুষ অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করে।

তাই তিনি শিশুর অনুকরণ শক্তিকে প্রোৎসাহিত না করে তার সৃজনী শক্তিকে আত্মপ্রকাশ করবার পূর্ণ সুযোগ দিলেন নোতুন পদ্ধতিতে। শিশু পরিবেশের ভেতর নানা আকৃতির নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর জিনিষ তৈরী করে এবং নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ও খেলার ভেতর দিয়ে তার সৃজনী শক্তিকে স্বেচ্ছায় আনন্দে ফুটিয়ে তুলবে এবং তাতেই আস্তে আস্তে হবে তার অন্তর্নিহিত শক্তির বৃদ্ধি, ক্রমবিকাশ ও সৃষ্টিকর্তা দেবতার অংশগ্রহণ। এই ছিল ফ্রেবেলের বিবর্তনবাদ (ডারউইনের বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ ও প্রাকৃতিক নির্বাচন হ'তে একেবারে বিভিন্ন) এবং এ বিষয়ে তিনি রুশোর অনুবর্তী।

খেলা শিশুর অত্যন্ত প্রিয় জিনিষ, সুতরাং খেলা শিক্ষার কাজে লাগাতে পারলে পাঠ্যসূচী ও পদ্ধতির সমস্যা অনেক পরিমাণে সমাধান হয়। খেলার ভেতর দিয়ে শিশুপ্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হয় এ বিশ্বাস তাঁর ছিল এবং খেলার ভেতর দিয়ে শিক্ষানীতির (The Playway in Education) এবং খেলার মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যের তিনি প্রথম প্রচারক না হলেও অক্লান্ত প্রবর্তক। (তিনি কমেনিয়াস্ ওবারলিন (Oberlin) ও আপোর্টির (Aporti) চাইতে অনেক বেশী অগ্রসর হয়েছিলেন এ বিষয়ে।)

তিনি বলেছেন, "Play is the great game of life itself in its beginnings." খেলাই হোল জীবনের প্রস্তাবনা ; ভবিষ্যৎ-কালের জন্য প্রস্তুতি। খেলা এবং শিক্ষামূলক কাজের মধ্যে প্রভেদ তিনি মুছে দিয়েছিলেন। খেলাই শিক্ষামূলক কাজ এই বাণী তিনি প্রচার করেন। যে কোন কাজ স্বাধীন ও আনন্দময় হোলে তাকে খেলা বলা চলে এই ছিল তাঁর ধারণা। তাঁর কাছে শিশুর দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রামের সক্রিয়তা হোল কুঁড়ি এবং খেলা, সৃজন, নৃত্য, গীত হোল শিশুর ক্রমবিকাশে নবীন ফুলদল, এই নিয়েই হোল শিশু-উদ্যান। খেলাচ্ছলে বা খেলার ভেতর দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ শিক্ষা করা বা কোন বাঞ্ছনীয় ফল লাভ করাই হোল শিক্ষা। শিক্ষা ক্রীড়াময় হবে কিন্তু কখনও হবে না আয়াসহীন পরিশ্রমবিমুখ।

খেলা বা কাজ পরিশ্রম ও ধর্মের সংগে সংশ্লিষ্ট এবং এ দুয়েরই প্রথম হ'তেই অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন। কারণ, পূর্বেই বলেছি, ফ্রেবেলের মতে কর্মহীন ধর্ম অলীক এবং ধর্মহীন কর্ম মানুষকে পশু করে তোলে। অতি শৈশব অবস্থা হ'তেই মাতাপিতা শিশুর সংগে খেলা করবেন এই ছিল তাঁর নির্দেশ "Come, let us live with our children and for them." ভাষা ও অংগ-প্রত্যংগের সচলতা বা সক্রিয়তা প্রায় সমানভাবে চলে, তবে ভাষার চাইতেও শিশু অংগপ্রত্যংগের সচলতা, অংগভংগী, গানের সুর, ইত্যাদি আগে হৃদয়ংগম করে। সুতরাং শুধু মুখের কথায় কোন ভাব বা ধারণাকে প্রকাশ না করে কিছু তৈরী বা সৃজন করে বা কোন আনন্দময় কর্মের ভেতর দিয়ে ভাষার সাহায্যে শিশু যদি তা ব্যক্ত করে তা'হলে তা অনেক বেশী কার্যকরী হয় শিশুর উপলব্ধির ও আত্মবিকাশের দিক থেকে। তাই ফ্রেবেলের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে শব্দ ও ভাষার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হোল শিশুর অবাধ সৃজনী শক্তি। একটু বড় হোলে (boyhood) খেলা জটিলতর ও অপেক্ষাকৃত অবিচ্ছিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করে। একসংগে দল বেঁধে খেলা ও দীর্ঘ সময়ের জন্য প্ল্যান করে কাজ বা খেলার

বন্দোবস্ত হয় এ সময়ে। জিনিষ সংগ্রহ করা, বাগান তৈরী করা, খেলাঘর তৈরী করা, নৌকায় ঘোরাঘুরি করে নোতুন জিনিষের সন্ধান নেওয়া এবং জিনিষপত্রের অধিকারী হওয়া এইসব নিয়ে বাল্যকাল কেটে যায়। ছেলের নিজের ঘর, বাগান, বাগানের যন্ত্রপাতি, বই এইসব থাকবে যাতে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। ছেলে বা মেয়ে যখন আরো বড় হয় তখন এই খেলা-প্রবৃত্তিকে আরো উচ্চতর রূপ দিতে হবে। উদ্‌গতি (sublimation), অনুসন্ধিৎসা, খুঁজে বের করার নেশা, উদ্যম, উদ্দেশ্য ও কর্মে আনন্দ এইগুলো হবে তার কৈশোর ও যৌবনের ধর্ম। ক্রীড়ানীতি ফ্রেবেলের সৃষ্টি না হ'তে পারে কিন্তু তিনি এর পূর্ণ রূপ দিয়েছেন। এ নীতি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রাণস্বরূপ এবং প্রজেক্ট, ডল্টন ও অন্যান্য নব নব রূপধারী সৃজনাত্মক কর্মের উৎস। ফ্রেবেল যদি শিক্ষায় আত্মবিকাশের জন্য ক্রীড়া ও সৃজনী নীতি প্রবর্তন ছাড়া আর অন্য কিছু নাও করতেন তা'হলেও তিনি সকল শিক্ষাব্রতীর সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা পেতেন। শুধু নীতির কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, কি করে এই নীতিকে পূর্ণরূপ দেওয়া যায় তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তিনি স্থির করে দিয়েছেন। রুশোর অনুবর্তী হোলেও এ বিষয়ে তিনি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। রুশো এমিলকে সমাজের আওতার বাইরে বনানীর আবেষ্টনীতে নিয়ে গিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন, কারণ তখনকার ফরাসী সমাজ অত্যন্ত কলুষিত ছিল এবং প্রকৃতির শান্ত সমাহিত রাজ্য কোন-না-কোন সময়ে বাস্তব রূপ নিয়েছিল এই ছিল তাঁর ধারণা। ফ্রেবেল সমাজের মধ্যেই শিশুকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন এবং শিশুজীবনে স্কুলের নানা কৃত্যালীর ভেতর দিয়ে সমাজসেবা (একে অন্যের কাজে লাগা) ও সহযোগিতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, পরবর্তী কালে মন্টেসরিও এই নীতির অনুবর্তন করেছিলেন।

কিণ্ডারগার্টেনে সেজন্য বইয়ের বালাই বিশেষ কিছু ছিল না,

পুস্তকের স্থান অধিকার করলো ছয়টি 'উপহার' (Gifts) এবং কতকগুলো কৃত্যালী (Occupations)। 'উপহার'গুলোর মধ্যে রং বেরংয়ের উলের বল ও তিনটি দারুময় আকৃতি বিশেষ করে ফ্রেবেল বেছে নিয়েছিলেন ভগবানের নানা গুণের প্রতীক হিসেবে—গোলক (sphere), ঘন (cube) এবং সমগোলাকার পাত্র বা চোংগ (cylinder) এবং ঘনের নানা ক্ষুদ্রতর বিভাগ বা উপবিভাগ বল বা গোলক বিশ্বের ও ভগবানের এককত্বের এবং এর পরে, ঘন একের মধ্যে বহুর প্রতীক হিসেবে শিশুর কাছে প্রতীয়মান হবে। শুধু খেলার সামগ্রী বা সরঞ্জাম হিসেবে এসব কাঠের গোলক বা ঘন ইত্যাদি দেখলে ফ্রেবেল অত্যন্ত বিরক্ত হতেন, তিনি বলতেন এই ভাব-রূপের ভেতর দিয়ে সমস্ত বিশ্বের ও ভগবানের এককত্বের ধারণা তিনি শিশুর মনে প্রতিফলিত করবেন এবং তার অধ্যাত্মশক্তির অর্গল খুলে দেবেন। "God clothed His own image in a mass of clay and was not ashamed of His creation ; neither will I be ashamed to set forth in little blocks of wood my ideas upon the nature of man." যাহোক এসব অস্পষ্ট রহস্যময় দার্শনিক ভাবধারা আজ কিণ্ডারগার্টেন থেকে বর্জিত হয়েছে এবং উপহারগুলো খেলার সরঞ্জাম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এসব খেলার সামগ্রীর মাধ্যমে দ্রব্যগুণ, খেলা ও নানা বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান ব্যতীতও সৃজনী শক্তির বিকাশের বিশেষ সুবিধে হয়—কাঠের ব্লকগুলো দিয়ে ঘর-বাড়ী, পিরামিড, গম্বুজ, চেয়ার, ইত্যাদি নানা সুদৃশ্য জিনিষ গড়া সম্ভব হয় এবং শিশুরাও এতে মশগুল হ'য়ে থাকে, সংগে সংগে তাদের মনোযোগ ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। উলের বল নিয়ে খোকা-খুকিও ফুটবলের মত লাফালাফি খেলাও চলে। কৃত্যালীর ভেতর পড়ে বাগান করা, মাটি দিয়ে মূর্তি বা জিনিষ গড়া, কাগজ ভাঁজ করা, ছোট কাঠির সাহায্যে কর্কের কাজ, কার্ডবোর্ডের কাজ, ফুলবীচি ও কাচের গুটি দিয়ে মালা গাঁথা, নানা রংয়ের পেন্সিল

বা তুলি দিয়ে ছবি আঁকা, নাচগান বাজনা, ইত্যাদি। শিশুর সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন ফ্রেবেল, কারণ তাঁর মতে এটা একটা শুধু বাইরের চাকচিক্যের ব্যাপার নয়, এটা হোল অন্তরস্পর্শী গভীর শিক্ষানুভূতি যাতে মানুষকে দেবত্বে পৌঁছে দেয় নিজের সামান্য স্বার্থের গণ্ডী পেরিয়ে। স্বাধীন স্বাভাবিক পরিবেশের ভেতর আনন্দময় কৃত্যালীর মাধ্যমে এইভাবে গড়ে ওঠে শিশুর ব্যক্তিত্ব। ফ্রেবেল শিশুপ্রকৃতি ভাল করে নিরীক্ষণ করেছিলেন তাই তিনি শিশুদের জন্য তাদের উপযোগী ছোট টেবিল, চা-সেট ইত্যাদির ব্যবস্থা করলেন তারা যেন মনে করে এ সত্যি তাদেরই রাজ্য, তারাই এ সৌরজগতের সূর্য। মন্টেসরিও টেবিল চেয়ারের এরকম ব্যবস্থা করেছিলেন। গল্প. গান, কর্মসংবলিত সঙ্গীত (action songs) নৃত্য ও আঁকা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল কিণ্ডারগার্টেনে কারণ ফ্রেবেল বিশ্বাস করতেন শিশুর সৌন্দর্যবোধ বয়ে আনে শান্তি ও পরিপূর্ণ শক্তি জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে। মন্টেসরির প্রণালীতে একই ব্যবস্থা ছিল, তবে রূপকথার বা উপকথার স্থান ছিল না তাতে অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে বলে। এ বিষয়ে মন্টেসরির চাইতে ফ্রেবেলের অন্তর্দৃষ্টি ছিল গভীর, শাশ্বত।

একথা ঠিক কিণ্ডারগার্টেন ফ্রেবেলের কাছে যেমন সজীব প্রাণবন্ত অনুপ্রেরণার আধার ছিল পরে আর তেমনটি রইল না; অনেকাংশে যান্ত্রিক আধ্যাত্মিকতাহীন হয়ে দাঁড়ালো। এ দোষ খানিকটা পরবর্তীদের হাতে পেষ্টালটসি ও ফ্রেবেলের পদ্ধতির সংমিশ্রণের জন্য হয়েছে। উপন্যাস লেখক ডিকেন্স ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বিপদের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ফ্রেবেল গল্প, পাথর ও প্রকৃতি হ'তে অন্যান্য সংগৃহীত বস্তুকে কখনও 'Object Lessons' এর জন্য ব্যবহৃত হ'তে দিতেন না—জ্ঞানের জন্য এসবের ব্যবহার তিনি পছন্দ করতেন না, তাঁর কাছে এর মূল্য ছিল শিশুর নানা উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়োজনে। কিন্তু 'Object Lessons'

কিণ্ডারগার্টেনে প্রবর্তিত হোল। কিণ্ডারগার্টেনে একেবারে উদ্দাম ও অনিয়ন্ত্রিত খেলা চলবে এও ফ্রেবেলের অভীপ্সিত ছিল না, কারণ সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই তিনি একটা নিয়ম-শৃংখলা দেখতে পেলেন। কাজেই মার্কিন দেশের কতগুলো কিণ্ডারগার্টেনের উদ্দাম ক্রীড়া-পদ্ধতি তাঁর বিতৃষ্ণাই হয়ত জন্মাতো। অনেক স্কুলে ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে বাজারের তৈরী-করা জিনিষের মত সুন্দর সুঠাম জিনিষ প্রত্যাশা করা হতো—সৃজনী শক্তির চাইতে উৎকর্ষের চোরা বালিতে শিশু নিজেকে হারিয়ে ফেলতো, তার সত্যিকারের আত্মবিকাশ হতো কিনা এতে সন্দেহ হয়। যাহোক একথা ঠিক আজকের দিনে কিণ্ডারগার্টেনের মূল নীতিগুলো—আত্মশক্তির স্ফুরণ, স্নেহ, ভালবাসা, স্বাধীনতা, সৃজন, প্রকৃতির সংগে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, ভগবদ্‌ভক্তি, ক্রীড়াচ্ছলে আঁক কষা, অক্ষর পরিচয়, বাক্য বানানো, এক সংগে খেলা, আঁকা, নৃত্য, গীত, বাদ্য—এক কথায় স্বাধীন আনন্দময় কর্মপ্রবাহ—প্রায় প্রত্যেক দেশের প্রগতিশীল স্কুলই মেনে চলে যদিও ফ্রেবেলের দারুনির্মিত নির্দিষ্ট শিক্ষাসামগ্রী হয়ত অনেক স্কুলেই আর ব্যবহৃত হয় না, আর এ শিক্ষাসামগ্রী ঠিক প্রকৃতির শিক্ষার আওতায় পড়েও না। ফ্রেবেলের সৌন্দর্যবোধ ও ক্রীড়ানীতি (The Play way in Education) শিক্ষার সকল স্তরে মনস্তাত্বিক ভিত্তিতে আজ গ্রাহ্য হয়েছে। কিণ্ডারগার্টেনের আরেকটি বড় অবদান হচ্ছে শিক্ষিকার ভূমিকায় নারীর আবির্ভাব ও শিশুমনস্তত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। কিণ্ডারগার্টেনের সাহায্যেই পৃথিবীর নানাদেশে নারী সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান পেয়েছেন (কারণ ছোট শিশুদের শিক্ষায় পুরুষের চাইতে নারী উপযোগী বেশী)। এতে গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ দৃঢ়তর ও কল্যাণকর হয়েছে সন্দেহ নেই। প্রাথমিক স্কুলের রূপ বদলে গেল, শিশু মনস্তত্বের দিকে মানুষের ঝোঁক চাপল; শিশু, বালক ও কিশোর জীবন আনন্দময় হয়ে উঠল, সংগে সংগে শিক্ষার ভাবধারাও আমূল পরিবর্তিত হতে লাগলো। রুশো যে মন্ত্র পেষ্টালটসি ও ফ্রেবেলের কানে কানে দিয়েছিলেন তাঁরা তাকে মূর্তরূপ দিলেন শিশু ও বালকের জীবনে, রুশো প্রবর্তিত প্রকৃতির শিক্ষা এতদিনে সার্থকতর সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলল।

ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা

ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়

জার্মানী যখন উদার মানবতার উপর ভিত্তি করে এক মহতী শিক্ষাধারার বুনিয়াদকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করছিল এবং সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার উদার আলোক বিকিরণ করে নাগরিকদের সুবিকশিত ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্রের শক্তির উৎসরূপে পরিগণিত করছিল, তখন ফ্রান্স কিন্তু এই শিক্ষাপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত একটি পন্থা অনুসরণ করছিল। বৈপ্লবিক যুগের প্রথম দশকে দেখা গিয়েছিল যে শিক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত হ'বে না তা থাকবে ব্যষ্টির হাতে এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের অবিরাম সংঘর্ষের মাধ্যমে তা ধীর অথচ অবিচলভাবে স্বাধীনতাপন্থী হ'য়ে উঠছিল; কিন্তু নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সের হর্তাকর্তা বিধাতা হ'য়ে উঠলেন, তখন কিন্তু সমগ্র দেশের শিক্ষা একনায়কতন্ত্রের আওতায় চলে এলো। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন করে এবং দু'বছর পরে আর এক উপধারার সাহায্যে রাষ্ট্র সমস্ত দেশের শিক্ষার ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করলো। বিপ্লবের যুগে ফ্রান্সের সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি নিছক সাহিত্যিক শিক্ষা এবং যান্ত্রিক শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে লুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্থলাভিষিক্ত হ'য়েছিল। উচ্চ শিক্ষার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয় নামে এক নবতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোজিত ক'রে দিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ দেশের শাসকশ্রেণীর দ্বারা মনোনীত হ'তেন এবং এঁদের কার্যাবলী শাসকবর্গই নিয়ন্ত্রিত করতেন। নব-প্রতিষ্ঠিত এই ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরই ন্যস্ত হ'লো সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। এই নির্দেশনামা জারী করা হ'লো যে এই রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ব্যতীত অথবা এর যে কোন শাখার স্নাতক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ফ্রান্সে কোন

বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করতে পারবে না বা সর্বসমক্ষে শিক্ষাদান ক'রতে পারবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারের বাইরে এবং এর সর্বোচ্চ কর্ণধারের বিনা অনুমতিতে কোন বিদ্যালয় কোথাও স্থাপিত হ'তে পারবে না।

নেপোলিয়ন-প্রবর্তিত ফ্রান্সের এই নবতম শিক্ষাপদ্ধতির বিধিব্যবস্থার উদ্দেশ্য আদৌ অস্পষ্ট নয়। দেশের সৈন্যবিভাগ যেমন তাঁর অঙ্গুলিসংকেতে চালিত হ'তো, তিনি তেমন চেয়েছিলেন দেশের শিক্ষাপদ্ধতিও তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের আজ্ঞাধীন হ'য়ে থাকবে। রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলিতে দত্ত শিক্ষার দুটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। একটি হ'লো ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি একানুগত্য আর অপরটি হ'লো সম্রাটের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য। সমগ্র দেশের মংগলের একমাত্র প্রতিভূ হলেন দেশের সম্রাট; নেপোলিয়নের বংশধরগণ হলেন দেশের ঐক্যের ধারক—ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার মাধ্যমে দেশে প্রচারিত হচ্ছিল। এই মতবাদ অনুসারে জাতীয় শিক্ষার একমাত্র কাজ হ'বে দেশের সামরিক অধিনায়কের মনস্তুষ্টিসাধন। বস্তুতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠিত হয়েছিল সৈন্যবাহিনী যে নীতিতে সংগঠিত হয়, সেই নীতির উপর নির্ভর করে। এখানকার নিয়মাবলী ছিল অতিশয় কঠোর। এখানকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে বিনা প্রতিবাদে সেই নিয়মাবলী মানতে হ'তো। কোন শিক্ষক যদি কোন নিয়ম ভংগ করতেন অথবা কর্তৃপক্ষস্থানীয়ের অপ্রীতিভাজন হতেন, তাহ'লে তাঁকে তখনই কারারুদ্ধ করা হ'তো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সভ্যকেই এক ধরনের বেশভূষা পরিধান করতে হ'তো। এখানকার কলেজকে নেপোলিয়নীয় সৈন্যবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বললে কোন প্রকার অত্যুক্তি করা হবে না। প্রত্যেকটি establishment কয়েকটি কোম্পানীতে ছিল বিভক্ত এবং এক একটি কোম্পানী আবার সার্জেন্ট ও করপোরালদের অধীনে থাকতো। এখানকার প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম দামামার

বাহের দ্বারা হতো সঞ্চালিত। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর জন্য নিয়মনিষ্ঠ সৈন্য তৈরী করা, যথার্থ মানুষ তৈরী করা নয়।

নেপোলিয়ন-প্রবর্তিত এই শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার কোন বিধিব্যবস্থা ছিল না। এদিকে যে নেপোলিয়নের কোন নজর ছিল না একথা বললে ভুল বলা হবে। নিম্নোক্ত কাহিনী থেকে তা' প্রতিপন্ন হবে। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পেষ্টালটসি একবার প্যারিসে এসেছিলেন। তিনি নেপোলিয়নের সংগে একবার দেখা করতে চেয়েছিলেন। নেপোলিয়ন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি পেষ্টালটসিকে এই কথা বলে পাঠিয়েছিলেন যে দেশের ছেলেদেরকে A, B, C, ইত্যাদি শেখান হবে কিনা এ-সব বিষয় ভাবা ছাড়া তাঁর অনেক কিছু চিন্তা করবার আছে। সুতরাং ওদিকে মনোযোগ দেবার তাঁর অবসর কোথায়? এই ঘটনার কিছুকাল পরে পেষ্টালটসির এক শিষ্য প্যারিসে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। নেপোলিয়ন পরে অবশ্য একদিন এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছিলেন। এর পর তিনি এক ইস্তাহার জারী করলেন যে কলেজ এবং lycée-গুলির কাজের অংগ হিসেবে এক বা একাধিক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত। বস্তুতঃ, তাঁর একনায়কতন্ত্রে গণশিক্ষার কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা রূপায়িত হয়ে ওঠেনি। জনশিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর একটি মাত্র কাজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের অনুমতিতে Brethren of the Christian Schools নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক শিক্ষা চালাবার অনুজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সে যখন আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লো, তখনও এদিক দিয়ে বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে Society for Elementary Instruction নামক এক বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আওতায় Teaching Congregation-গুলো প্রাথমিক শিক্ষার কাজ

চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এই প্রয়াস দেশের প্রয়োজনের অনুপাতে নিতান্ত অল্পই ছিল। ইংলণ্ডে প্রবর্তিত সর্দারপড়ুয়া-প্রথা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচমানসে এদেশে চালু করার প্রয়াস করা হলো। ইংলণ্ডে যেমন এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হয়নি, ফ্রান্সে তেমন এই পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ হলো না। তাই ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যখন জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের কথা উঠলো, তখন এক পুংখানুপুংখ অনুসন্ধানের ফলে যে তথ্য আবিষ্কৃত হলো তা কোন দেশের পক্ষেই সম্মানের কথা নয়। দেখা গেল, ফ্রান্সে জনসাধারণের মধ্যে তো ব্যাপক নিরক্ষরতা তো আছেই; উপরন্তু দেশের শিক্ষকগণ যে বেশ বিদ্বান সে-কথাও জোর ক'রে বলা চলে না।

ফ্রান্সে শিক্ষার অগ্রগতি

ফ্রান্সের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে সুরু ক'রে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত ফ্রান্সের জনসাধারণের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। এ দেশে শিক্ষাপদ্ধতির ধারা বাধাহীনভাবে যে পথে চলে আসছিল এতদিন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে সেই ধারার উৎস যেন গেল শুকিয়ে। এই সময়ে এ দেশের শিক্ষাব্রতীদের পরিধির বাইরে দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে অবশ্য নানাবিধ আলাপ-আলোচনা চলতো। একদিকে দেখা যায় ফ্রান্সে কতিপয় বিদুষী নারী গৃহশিক্ষার উন্নতিকল্পে নিজেদেরকে ক'রেছেন নিয়োজিত; অন্যদিকে আবার দেখা যায় একদল বিপ্লবী শিক্ষাব্রতী দেশের শিক্ষাজগতে অভাবনীয় ও আমূল পরিবর্তন এনে দেবার জন্য একান্তভাবে অভিলাষী। এঁরা চাইছিলেন যে শিক্ষায় আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে এঁরা সমগ্র সমাজে এমন একটি অচিন্তনীয় পরিবর্তন এনে দেবেন, যা' বিশ্বের কোন দেশে কখনও পরিদৃষ্ট হয়নি।

দেশের শিক্ষাব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শন ফ্রান্সের বিদুষী নারীদের কাছে এমন কিছু নোতুন ব্যাপার নয়। ইউরোপের অন্যান্য

দেশের বিদুষী রমণীগণের সংগে এঁদের কোনপ্রকার তুলনাই চলতে পারে না; একমাত্র ইংলণ্ডের বিদুষী ললনারা এঁদের সংগে তুলনীয় হ'তে পারেন। St. Cyrএ চতুর্দশ লুই প্রতিষ্ঠিত নাম-করা বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালিকা ম্যাডাম্ ডি মঁাতেনঁ (Madame de Maintenou), "*Advice to her Son and to her Daughter*" গ্রন্থ রচয়িত্রী ম্যাডাম্ ডি ল্যাংবার্ট (Madame de Lambart), "*Letters to my Son*" নামক পুস্তকের লেখিকা এবং রুশোর শিষ্যা ও পৃষ্ঠপোষিকা ম্যাডাম্ ডি এপিনে (Madame de Epinay) ও "*Letters on Education*" গ্রন্থের রচয়িত্রী ম্যাডাম্ ডি জেনলিস্ (Madame de Genlis)—এঁরা সবাই মিলে ফ্রান্সের শিক্ষাক্ষেত্রে এমন একটি ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিলেন, যার তুলনা সত্যই বিরল। অবশ্য ইংলণ্ডে এই সময় দুই বিদুষী মহিলাও শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। মিস্ এজ্ওয়ার্থ তাঁর "*Practical Education*"এ এবং মিস্ হ্যামিলটন তাঁর "*Elementary Principles of Education*" নামক গ্রন্থে স্কটিশ শিক্ষাদর্শকে কার্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতেও ফ্রান্সে নারী শিক্ষাব্রতীর অপ্রতুলতা ঘটেনি। নেপোলিয়নের শিক্ষাপদ্ধতি দেশে চালু হওয়ার ফলে সমগ্র ফ্রান্সে Teaching Congregation-গুলোর পুনরুদ্ভব হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে গৃহশিক্ষার ওপরই জোর দেওয়া হচ্ছিল বেশী। জনসাধারণের শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা ধর্মায়তনগুলির প্রভাব কোন-প্রকারে বরদাস্ত ক'রতে চাইতেন না, তাঁরা কিন্তু নেপোলিয়নীয় পদ্ধতির পক্ষপাতী হ'য়ে পড়ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই ফরাসী বিদুষী নারীগণের লেখনী থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকটি ভাল ভাল গ্রন্থ। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাডাম্ ডিষ্টায়েলের "*On Germany*" নামক গ্রন্থ হ'লো প্রকাশিত। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাডাম্ ডি ক্যাম্পাঁর "*On Education*" নামক পুস্তক প্রকাশিত হ'লো। এই খ্রীষ্টাব্দে ম্যাডাম্ ডি রেমুসা আবার "*Education of*

Women" নামক বই প্রকাশ করলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো ম্যাডাম্ গিজোর "*Domestic Education*" এবং ১৮৩৬-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ম্যাডাম্ নেকার ডি স্যাস্যুরে তাঁর "*Progressive Education*" বার করলেন।

ফ্রান্সের এই বিদুষী নারীদের মধ্যে ম্যাডাম্ নেকার ডি স্যাস্যুরের (১৭৬৫-১৮৪১) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁকে সমসাময়িক শিক্ষিতা রমণীগণের মুখপাত্র বললে অত্যুক্তি করা হয় না। অবশ্য মতবাদের দিক থেকে এঁরা যে সকলে একমত ছিলেন তা নয়; এঁদের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ পরিদৃষ্ট হ'তো। ম্যাডাম্ নেকার ছিলেন রুশোর সংগে এক-সহরবাসিনী। তিনি ছিলেন রুশোর শিষ্যা আবার সমালোচকও বটে। শিশুকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ ক'রে তিনি তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। তাঁর গুরু রুশো যেমন দিনপঞ্জী সংরক্ষণ করতেন, তিনিও ঠিক তেমনি তাঁর নিজের সন্তান-সন্ততির সহিত তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি সুকল্পিত বিবরণ সংরক্ষণ করতেন। তাঁর আলাপ-আলোচনায় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করতেন। মানসিক গুণরাজির পরিপূর্ণ বিকাশই ছিল তাঁর শিক্ষার চরম আদর্শ। অবশ্য সে শিক্ষা সুরু হ'বে ইন্দ্রিয়গ্রামের মাধ্যমে। নিজেদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্থিরীকরণে শিক্ষার্থীদেরকে যতদূর সম্ভব অবাধ স্বাধীনতা দিতে হ'বে; এখানে শিক্ষকের কাজ মুখ্যতঃ গৌণ। রুশোর সংগে ম্যাডাম্ নেকারের এক স্থলে খুব বেশী মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হ'তো। রুশো যেখানে শিশুর স্বাভাবিক আবেগের বহিঃপ্রকাশকে উত্তম আখ্যা দিয়েছেন; ম্যাডাম্ নেকার তাকে মন্দ ব'লে অভিহিত করেছেন। তাই ম্যাডাম্ নেকার রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাকে কোনদিনই সমর্থন করেননি। খারাপ জিনিষের প্রতি, মন্দ জিনিষের প্রতি শিশুর রয়েছে স্বাভাবিক প্রবণতা; তাই শিশু যা' করতে চাইবে, তাকে সব সময় তা' করতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না বরং তার পক্ষে যা' করা

উচিত, সেটা করতে দেওয়াই বিধেয়—এই ছিল ম্যাডাম্ নেকারের অভিমত। তিনি আরও বলতেন যে শিক্ষার্থীদের বয়ঃসন্ধিক্ষণকাল না আসা পর্যন্ত তাদেরকে কোনপ্রকার নৈতিক অথবা ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হ'বে না, এই অভিমতের পশ্চাতে কোন যৌক্তিকতা নেই। রুশো যেমন শিশুর ক্রমবর্ধমান জীবনকে কয়েকটি সসীম স্তরে বিভক্ত করেছেন; ম্যাডাম্ নেকার তেমন না ক'রে শিশুর জীবনের বিকাশকে ধারাবাহিক হিসেবে ধরে নিয়েছেন। তাঁর অভিমত হ'লো এই যে, শিশু যখন পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করবে, তখন তার বুদ্ধিবৃত্তি এমন কিছু কম পরিপুষ্ট হয় না। সেই সময় তার ইচ্ছাশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করলে, তার কল্পনাকে সুনির্দিষ্ট পথে সঞ্চালিত করলে সুফলই পাওয়া যাবে। তাঁর "*Progressive Education*" এর তৃতীয় সংখ্যক পুস্তকে রুশোর সংগে তাঁর তীব্র মতানৈক্য বেশ সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে —এই মতবিভেদ অবশ্য নারীশিক্ষার বিষয় নিয়ে। রুশো বলেছেন —নারীদের ঠিক ততটুকু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, যেটুকু তাকে তার স্ত্রীর কর্তব্য সম্পাদনে অথবা মায়ের কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করবে। ম্যাডাম্ নেকার নারীগণের জন্য চান এমন এক উদার-নৈতিক শিক্ষা, যে শিক্ষা নারী হিসাবে তার কর্তব্যসম্পাদনে যথাযথ সাহায্য করবে—যে শিক্ষার মাধ্যমে হ'বে নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। তাঁর মতে নারী শুধু মা-ই হ'বে না; না বা সে হ'বে শুধু স্ত্রী; সে হ'বে পরিপূর্ণা নারী, বৃহৎ সমাজের অংগ বিশেষ এবং সেই সংগে গৃহকর্ত্রী।

এই সময় ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অমোঘ বাণী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণের মনে এসেছিল এক অননুভূত জাগরণের স্পন্দন। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র ও রাজন্যবর্গের তীব্র বিরোধিতায় সেই স্পন্দন দিন দিন আসছিল স্তিমিত হয়ে। ফ্রান্সে আবার রাজতন্ত্র স্থাপিত হ'লো। ইউরোপের অন্যান্য

দেশগুলিতেও বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের কণ্ঠকে ধীরে ধীরে রুদ্ধ করার প্রয়াস চলছিল। কিন্তু বৈপ্লবিক ভাবধারাকে চিরতরে রুদ্ধ করে রাখা একেবারে অসম্ভব ছিল। এই সময় অবশ্য বিপ্লবব্রতীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অল্প; কিন্তু যাঁরা সেই আদর্শকে বিরুদ্ধ অবস্থার মাঝেও বুকে আঁকড়ে ছিলেন, তাঁরা অধিকতর আগ্রহের সহিত তাঁদের বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের আদর্শ বাধা পেয়ে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে হ'বে কি? উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চারদশকের মধ্যে সমাজকে সাম্য-মৈত্রীর ভিত্তির উপর স্থাপন করবার যে কল্পনাময় প্রয়াস তার কোন বিরাম ছিল না। এই সময় ইউরোপীয় সমাজকে নোতুন ছাঁচে ঢেলে ফেলবার জন্য নানাবিধ বিরাট অথচ উদ্ভট পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। ফ্রান্সে এই প্রকার কল্পনাবিলাসীর অভাব ছিল না। সেণ্ট সিমেঁা (১৭৬০-১৮২৫) ছিলেন এঁদের অন্যতম। তিনি চেয়েছিলেন এক "নব খ্রীষ্টান" সমাজ স্থাপন করতে। এই সমাজে মানব-প্রেমই হবে জীবনের মুখ্য অবলম্বন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এতাবৎকাল প্রচলিত সামন্ততন্ত্র একং সামরিক আধিপত্যের উৎখাত-সাধন আর সেই সংগে প্রতিষ্ঠা করবেন এমন একটি শিল্পপ্রধান সমাজ যেখানে শিল্পপতিরা হবেন সমাজের কর্ণধার এবং বিজ্ঞানীরা হবেন সমাজের নিয়ন্তা। ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী নেতা ফুরিয়ে (১৭৭২-১৮৩৭) চেয়েছিলেন সমগ্র সমাজকে ভেঙে কয়েকটি Phalangeএ বিভক্ত করতে। এতে অবশ্য বিভিন্ন মানসিক শক্তিসম্পন্ন নানা শ্রেণীর ব্যক্তি থাকবে। এদের সংখ্যা কোনক্রমে ১৮০০ এর বেশী হবে না। এই phalange-গুলি আবার কয়েকটি উপদলে বিভক্ত থাকবে। এই উপদলগুলির প্রতিটি সভ্য যাতে তাদের শক্তি অনুযায়ী পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা থাকবে এই সমাজে।

এই সময় ফ্রান্সে শিক্ষার যে নবতম আদর্শ ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠছিল, তাতে দেশের অতীতের প্রতি একটি অবহেলার ভাব

বেশ প্রকট হয়ে উঠছিল। শিক্ষাব্রতী Jean Joseph Jacotot (1770-1840) এই সময় ফ্রান্সে তাঁর শিক্ষার "universal method" নামে এক নবতম শিক্ষাধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে ফ্রান্সে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের আরও প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। এই সময়কার ফ্রান্সের রাজনৈতিক নীতিবাগীশরাও চাইছিলেন যে বৃহত্তর সমাজে যদি কোন রূপান্তর আনার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহলে তার আগে শিক্ষাক্ষেত্রেও রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে। Jacotat এর শিক্ষাগত ভাবধারা তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর জীবন ছিল নানান বৈচিত্র্যে ভরা। তিনি ছিলেন একাধারে সৈনিক, রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষক। তিনি ছিলেন ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্য, গণিত শাস্ত্র, রোমক ব্যবহারবিদ্যা, ফরাসী ভাষা ও সাহিতের অধ্যাপক। তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে সকলের সামনে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরতেন। তিনি তাঁর "*Universal Education*" নামক পুস্তকে এই কথাই বার বার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে সব মানুষই সামর্থ ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। প্রতিটি মানুষ যে কোন বিষয় শিক্ষালাভে সমর্থ। মানুষে মানুষে যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় সে পার্থক্য বুদ্ধিবৃত্তির অপূর্ণতা নয়, তা হ'চ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত অভিলাষ ও ইচ্ছাশক্তির ত্রুটি। তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে যদি কোন মানুষকে যথাযথভাবে কোন শিক্ষণীয় বিষয় ধরিয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে সে স্বয়ং যে কোন শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষিত হ'য়ে উঠতে পারে। তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে যদি কোন শিক্ষক কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী নাও হন, তাহ'লেও যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করলে তিনি সে বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারেন। তাঁর শিক্ষানীতি নির্ভর করতো "All is in all" (সব কিছু আছে সব কিছুর মাঝে) এই মতবাদের ওপর। এই উক্তির নিগূঢ় অর্থ হ'লো এই যে একটি ঘটনা বা বিষয় অন্য যে কোন ঘটনা বিষয়ের সংগে সম্পৃক্ত।

কার্যক্ষেত্রে এই নীতির বাস্তব রূপান্তর হ'লো এই যে কোন বিষয়-সমষ্টি শেখবার আগে একটি বিষয়ের অংশ সযত্নভাবে এমন ক'রে মুখস্থ করতে হবে যাতে নাকি সেটুকু আমাদের মনের অংশীভূত হ'য়ে যায় এবং পরে সেই বিষয়াংশকে সমগ্র বিষয়ের সংগে সংযোজিত করতে হ'বে। একটা উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি আর একটু পরিষ্কার হ'তে পারে। ধরা যাক, তিনি তাঁর ছাত্রগণকে ফরাসী ভাষা শেখাবেন। তিনি তখন করবেন কি ? তিনি প্রথমে তাঁর ছাত্রগণকে Fénelon-এর *Telemaque* নামক পুস্তকের ছটি অধ্যায় মুখস্থ করাবেন—তারপর তিনি তাদের পঠিতব্য বিষয়ের শব্দসমষ্টির দিকে সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করবেন, তারপর তাদেরকে বলবেন বাক্যের দিকে লক্ষ্য দিতে ; পরে তাদেরকে বলবেন ব্যাকরণের দিকে মনোযোগ দিতে এবং সর্বশেষে নানান ধরনের লেখ্য কাজের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিষয়-বস্তুটির প্রতি তাদের আন্তরিক আগ্রহ জাগিয়ে তুলবেন।

Jacotot-এর মতবাদ কার্যকারিতার দিক থেকে একেবারে অসম্ভব ব'লে প্রতিভাত হ'বে। তাঁর মতবাদ অলীক কল্পনায় পর্যবসিত হয়নি তার কারণ হ'লো এই যে তিনি তাঁর মতবাদকে ব্যক্তিগত শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতায় রূপায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভিন্নতা থাকবেই—এই মত আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত। এই যুক্তির নিকষে Jacotot-এর সম-ব্যক্তিতার নীতি আপনা হতেই খণ্ডিত হ'য়ে যায়। Jacotot-এর আপাতঃ-অসম্ভব মতবাদের পশ্চাতে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কার্যকরী অভিজ্ঞতা ছিল ; কিন্তু তাঁর সমসাময়িক ফ্রান্সের অন্য এক শিক্ষাবিদ্ Fourier-এর শিক্ষানীতির মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল এক ভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই তাঁর লিখিত পুস্তক *Natural Education*-এর মধ্যে বহু অবাস্তব কল্পনা-বিলাস পরিলক্ষিত হয়। তাঁর অভিমত হ'লো এই যে শিশুগণকে মাতাপিতার নিকট থেকে সরিয়ে নিয়ে তাদের শিক্ষা ইত্যাদির সমূহ ভার তুলে দিতে

হ'বে শিক্ষা-সেবিকাদের হাতে যাঁরা নাকি মাতাপিতার অপেক্ষা যোগ্যতরা হ'বেন ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক শিক্ষার দিক দিয়ে। শিশুর সহজাত বৃত্তি ও খামখেয়ালিপনাকে অবহেলা করলে চলবে না ; সেগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে থাকবে শিক্ষা-সেবিকাদের সদাজাগ্রত দৃষ্টি। এমনকি শিশুদের মধ্যে ধ্বংসপ্রিয়তা অথবা সম্পত্তি বিনাশের যে অপ্রীতিকর বৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়, তাকে সংযত না ক'রে তাকে ভিন্নমুখী করে দিতে হ'বে। যদি কোন অপরিণত শিক্ষার্থীর এই প্রকার বৃত্তি স্বাভাবিকভাবে প্রকট হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে তাকে নিয়োজিত করতে হ'বে কোন সরীসৃপ বা কোন হিংস্র প্রাণীর অনুসন্ধানে অথবা মৃত্তিকাগর্ভের পয়ঃপ্রণালীর পরিষ্করণে। সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগের নিকট থেকে কোনপ্রকার নিয়মানুবর্তিতা অথবা আনুগত্য আশা করা বাতুলতা মাত্র। চিত্তাকর্ষকরূপে জীবনের কার্যকরী দিকটার সংগে নিবিড় সংযোগ অথবা পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার নামই হ'লো শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশের দিকে সবিশেষ লক্ষ্য দেওয়া। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন—শিক্ষার্থীদের চার বৎসর বয়সের সময় তাদেরকে নিয়ে যেতে হ'বে কলকারখানায় ও দোকানে এই আশায় যে সেখানে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দে'খে তাদের মনে ঐ সব জিনিষের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা দিতে পারে এবং সেই ঝোঁক বা প্রবণতা দেখে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি-নির্বাচনের পথ হয়তো সুগম হ'তে পারে। তিনি বলেছেন রন্ধন-শিক্ষা শিক্ষার দিক থেকে অতি প্রয়োজনীয়। তাঁর মতে যদি কেউ ভাল ক'রে রন্ধন-শিক্ষা করে তাহ'লে সে এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে আরও অনেক কিছু শিখতে পারে যেমন,—ভূমিকর্ষণবিদ্যা, খাদ্য-সংরক্ষণবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিদ্যা এবং স্বাস্থ্য-সংরক্ষণবিদ্যা।

এই সময় ফ্রান্সের আকাশে-বাতাসে শিক্ষাবিষয়ক নানান ধরনের অদ্ভুত ভাবধারা ভেসে বেড়াত। কিন্তু এই সব অবাস্তব কল্পনা-বিলাসের পশ্চাতেও যথার্থ জ্ঞানের দ্যুতি মাঝে মাঝে

পরিদৃষ্ট হ'তো। St. Simon-এর অনুসরণকারীদের সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ করে খাটে। তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার বিষয়ে তাঁরা যে খুব খুসী ছিলেন তা নয়; বরং তাঁরা তার পরম বিরোধী ছিলেন। সামাজিক পুর্ণসংগঠনের যে সব পন্থা তাঁরা উদ্ভাবন করেছিলেন তা সব যে একেবারে অলীকতা-বর্জিত এমন কথা কেউ বলতে পারে না। তাঁরা অবশ্য Fourier-পন্থীদের মত উৎকটভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন না। তাঁদের শিক্ষাদর্শ অবশ্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক ছিল না—তা ছিল অবৈধভাবে সমাজতন্ত্রমূলক। তাঁদের নিকট শিক্ষা নিম্নোক্তরূপে হ'তো প্রতিভাত। "মানব সমাজ দিনদিন উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। সেই প্রগতিবাদী সমাজের সংগে মানব-সমাজের প্রতিটি নব নব যুগের লোককে ঐতিহ্য-সমন্বিত প্রাচীন যুগের সংগে সম্ভাবনাময় নবতম যুগের সমন্বয় সংসাধন করতে হয়। এর নাম হ'লো প্রকৃত শিক্ষা।" অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয় তাঁদের পরিকল্পিত শিক্ষার অর্থ হ'লো আদর্শ সমাজের অংগহিসেবে মানুষের সযত্ন প্রস্তুতি। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁরা মানুষের আদিম ভাবময় ও আবেগময় জীবনের দিকে তত বেশী নজর দিতেন না, যেমন দিতেন তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনের সহানুভূতিময় দিকটার দিকে যা দিয়ে মানুষ মানুষের সঙ্গে সমাজবদ্ধ হয়। তাই তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নৈতিক শিক্ষা এবং মানসিক শিক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছিল। তাঁদের শিক্ষাদর্শ অস্পষ্টতা দোষে দূষিত হ'লেও, এই সময়কার শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাব ছিল অনেকখানি। তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যে খ্রীষ্টীয় ভাবধারা ছিল তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তাঁরা ফ্রান্সের সর্বশ্রেণীর জন্য শিক্ষার সমসুযোগ দাবী করছিলেম এবং সেই সংগে তাঁরা বৃত্তিগত শিক্ষালাভের দিকেও কম জোর দেননি।

St. Simon-প্রদর্শিত শিক্ষাদর্শের মুখ্য হোতা ছিলেন Edouard Seguin (1812-1880)। ফ্রান্সের শিক্ষাজগতে Seguine "The Apostle of the Idiot" নামেই পরিচিত। বুদ্ধিহীনদেরকে

নানাভাবে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে বৃহত্তর সমাজদেহের কার্যকরী অংগ হিসেবে পরিণত করার কাজে তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক। যে নীতি অবলম্বন ক'রে তিনি কার্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা সব দেশে সব শিক্ষাক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হ'তে পারে। St. Simon-এর জীবনের আদর্শ ছিল অনুভূতিবাদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু Segnin যখন Simon-এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'লেন, তখন Simon-পন্থীদের মনে ও চিন্তায় অনুভূতিবাদ ও জার্মানীর আদর্শবাদ একাকার হয়ে গিয়েছে। রুশোর ন্যায় Seguin ছিলেন পুরোপুরি অনুভূতিবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষার্থীদের সুকুমার বয়সে সর্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়গ্রাম ও কর্মে প্রেরণাদানকারী স্নায়ুমণ্ডলীর সমুচিত শিক্ষা দেওয়া অবশ্য উচিত। যে শিক্ষায় মানুষের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের দিকে সবিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয়, সেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাম ও কর্মস্নায়ুর যথাযথ শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। Segnin রুশোর চেয়ে এটুকু বেশী বুঝেছিলেন যে মানবের ইন্দ্রিগ্রামের কথাই ধরা যাক, অথবা তার কর্মস্নায়ুর কথাই ধরা যাক, এতদুভয়ই মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের অংশবিশেষ মাত্র। এদিক দিয়ে Seguin ফ্রেবেলের সংগে একমত বললেই চলে। তাঁর কাছে মানব যেন জীবন্ত ত্রিমূর্তির (trinity) রূপ পরিগ্রহ করতো ; মানুষ যেমন একদিকে এককভাবে আত্মসচেতন, অন্যদিকে তার ব্যক্তিসত্বার প্রকাশ ত্রিরিধারাসমন্বিত। মানুষের যেমন আছে অনুভূতি, তেমন আছে তার বোধশক্তি আবার তেমন আছে তার স্বকীয় ইচ্ছাশক্তি। মানবের ব্যক্তিত্বের এই ত্রিবিধ প্রকাশ সে তার জীবনের প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে। মানুষের জীবনে প্রতিটি অধ্যায়ে যদিও সমগ্র মানবসত্বাই বিদ্যমান থাকে, তবুও শিক্ষাদাতার পক্ষে মানুষের ত্রিবিধ প্রকাশের সবকটির প্রতি যুগপৎ লক্ষ্য রাখা একেবারে অসম্ভব বললেই চলে। তারা মানুষের জীবনে স্বাভাবিকভাবে যেমন বিকশিত হয়ে ওঠে, শিক্ষাদাতা তেমনভাবে তাদের গতিকে করেন নিয়ন্ত্রিত।

"Idiocy"র ওপর তাঁর যে নাম-করা বই রয়েছে তার উপসংহারে তিনি নিম্নানুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন,—"স্পর্শকাতর অংগ-প্রত্যংগে বহির্চাপের যে অনুভূতি যা আমাদের বোধশক্তিকে করে উজ্জীবিত, তা থেকে সুরু ক'রে শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের যে কর্তব্যবোধ যা তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, সেই পর্যন্ত, আবার বৃত্ত ও বর্গক্ষেত্রের মধ্যে যে পার্থক্য তা থেকে সুরু ক'রে আমাদের সদসতের মধ্যে পার্থক্যবোধ পর্যন্ত আমরা একটা যতিহীন পন্থা অনুসরণ ক'রে এসেছি। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে সেখানে যেখানে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে সামান্যতম ধারণাগুলিকে, আর তার পরিসমাপ্তি ঘটছে সেখানে যেখানে আদর্শবাদের কুহেলি-কুয়াসা বিচ্ছিন্ন ক'রে আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলি অধিকতর উচ্চগ্রামে উঠতে একেবারে অপারগ।" এই মতবাদের ওপরই নির্ভর ক'রে শিক্ষাদাতার প্রাথমিক প্রয়াস হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের দেহগত কৃত্যালীর সংস্থাপন এবং তার সমুচিত সংরক্ষণ। কারণ, যে মানসক্ষেত্র সম্পর্কবিহীন ক্রিয়াকর্মদ্বারা ব্যাহত, সেখানে মনীষার সুফল আশা করা বাতুলতা মাত্র। Seguin বলেন, "এর পরে আসে দৈহিক শিক্ষার কথা; অর্থাৎ, মানব-জীবনের ক্রিয়া-কর্মের শিক্ষা। কি দৈহিক ক্রিয়াকলাপ, কি মানসিক কৃত্যালী উভয়েরই মধ্যে নিহিত রয়েছে স্পর্শস্নায়ুর শিক্ষা ও কর্মস্নায়ুর শিক্ষা। স্পর্শস্নায়ুর মাধ্যমে আমরা পাই বহির্জগতের জ্ঞান আর কর্মস্নায়ুর মাধ্যমে আমাদের মনোগত অভিলাষ বিকশিত হয়ে ওঠে জীবনের নানা কর্মপ্রয়াসে। আগে নজর দিতে হ'বে দেহের দিকে, তারপর আসবে মনের কথা; আগে আসবে কাজের কথা, তারপর হবে জ্ঞানের কথা। এবং পরিশেষে, সাধারণ ধারণার আকারে মানুষ যখন জ্ঞানলাভ করে, তখন শিক্ষাই তার ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ পরিণতি-দান করে এবং কর্ম ও ভাবধারার পশ্চাতে যে নৈতিক গূঢ় অর্থ আছে তার সম্বন্ধে চেতনশীলতা শিক্ষার্থীকে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের

সক্রিয় অংশরূপে পরিণত করে এবং তখনই সে বিরাট বিশ্বের নিগূঢ় উদ্দেশ্যের অংশভাগী হয়ে দাঁড়ায়।" কি কি বিভিন্ন পদ্ধতিতে Seguin একজন অপরিণত বুদ্ধি মানবকে যথার্থ "মানুষে" পরিণত করতে পারতেন তার বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁর শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে মানুষের চিত্তবৃত্তির ক্রমবিকাশকেই তিনি শিক্ষা বলে ধ'রে নিয়েছিলেন; তিনি মানুষের সামগ্রিক সত্বাকে তার অণুপরমাণুর মধ্যে অনুভব করতেন এবং মানুষের পূর্ণ পরিণতির বীজ তার জীবনের প্রারম্ভেই বিরাজিত রয়েছে একথা সম্যক উপলব্ধি করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে স্নায়ু ও অস্থির ওপর প্রতিক্রিয়া না তুলে যেমন মাংসপেশী-সংশ্লিষ্ট কোন কাজ করা অসম্ভব, ঠিক তেমন মানুষের বুদ্ধি ও ইচ্ছার ওপর স্বয়ংক্রিয় কোন প্রতিক্রিয়াসাধন না ক'রে মানুষের দ্বারা কোন কাজ করানো সমভাবে অসম্ভব। তাঁর নিজের ক্রিয়াকর্মের সমালোচনা প্রসংগে তিনি বলেছেন "নির্বোধকে (idiot) ধরে নিয়েছি আমরা একটি জড় মাংসপিণ্ড এই বিশ্বাসে যে সেখানে রয়েছে শুধু অসংবদ্ধ উপাদান। অসংবদ্ধ সেই উপাদানের মধ্যে রয়েছে যে আত্মা তার পরিপূর্ণ বিকাশও সম্ভব নয়। তাই মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে যখন, তখন আমাদের ইচ্ছাশক্তির সামান্য স্ফুলিংগকণাই আমাদের পেশী-সংকোচন অথবা তার প্রসারের পক্ষেই যথেষ্ট। আমাদের অন্তর্নিহিত অনুভূতিগুলির অনুশীলন আমরা আলাদাভাবেই করি, কিন্তু আমাদের মনের গহন কোণে যে সম্মিলিত ভাবগুচ্ছ রয়েছে তার সংগে একীভূত না হয়ে কোন ধারণাই আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'তে পারে না। যখন আমাদের বক্ষের সম্প্রসারণ ঘটলো, সেখান থেকে নবতম স্বর বেরিয়ে এলো; সেই বাণী প্রকাশ করলো নবতম ভাবধারা এবং নোতুন মনোভাব। আমাদের বাহুকে যখন আমরা শক্তিশালী ক'রে তুললাম, তখন সে প্রস্তুত হ'লো মনোগত আদর্শকে সৃষ্টিতে রূপায়িত করতে আমাদেরই শ্রমের মধ্য দিয়ে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের

মাধ্যমে আমাদের মনে জাগলো আনন্দ ও যন্ত্রণার অনুভূতি। মানুষের মধ্যে যে আদিমতম নির্বোধ লুকিয়ে আছে তার আত্মিক অংগে কোথায়ও না কোথায় ভাবতরংগ না তুলে আমরা তার কেশমাত্রও স্পর্শ করতে পারি না।"

ইংরাজি শিক্ষাধারায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

ফ্রান্সে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের উপপ্লবের পর ইউরোপের প্রধান ভূখণ্ডে যে আলোড়ন উঠেছিল তা' যেমন অভাবিত ও অভূতপূর্ব, সে দেশে ভাগ্যদেবীর বরপুত্র নেপোলিয়নের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও পতন তেমনই বিচিত্র। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে ইউরোপের প্রধান ভূখণ্ডের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক জীবনের বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ইংলণ্ড সেই বিপর্যয়ের হাত থেকে খানিকটা নিস্তার পেয়েছিল। এর কারণ ছিল এই যে ইংলণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থানই তাকে নেপোলিয়নের উদগ্র লালসার হাত থেকে খানিকটা বাঁচিয়ে দিয়েছিল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যলিপ্সার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল ইংলণ্ড। ইংলণ্ডই নেপোলিয়নের পতন সংসাধনে সবচেয়ে বেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রেছিল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীর তরংগ ইংলণ্ডের তটরেখায় আঘাত হানলেও ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত ইংলণ্ডে সেই আন্দোলনের তীব্রতা ততখানি প্রবল আকার ধারণ করেনি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ড যেমন ফরাসী বিপ্লবের প্রবল ধাক্কার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমন নবতম ভাবধারার তরংগ তাকে তেমন বিচলিত করতে পারেনি। তাই দেখা যায় ফ্রান্স এবং জার্মানীতে এই সময় শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রয়াস চলেছে। তখন ইংলণ্ডে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়নি। তখন ইংলণ্ডে শিক্ষাক্ষেত্রে বদান্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার যুগ চলেছে। তখন ইংলণ্ডে শিক্ষায় ল্যাংকাষ্টার ও বেল প্রবর্তিত সর্দার পড়ুয়া প্রথাই শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান

অধিকার করে আছে। এই প্রকার অবস্থার অর্থ এই নয় যে বৈপ্লবিক আদর্শে অণুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনা ইংলণ্ডের অনভিপ্রেত ছিল। বস্তুতঃ, শ্রমিক-সার্থের মধ্যে এমন অনেক প্রগতি-পন্থী ছিলেন যাঁরা শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন একচেটিয়া কারবার করে না রেখে, তাকে জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে পোঁছে দেবার জন্য উৎসুক হ'য়ে উঠেছিলেন এবং ইংলণ্ডের শিক্ষাধারাকে দানশীল ব্যষ্টিগত প্রচেষ্টার হাত থেকে মুক্ত করে তাকে সমষ্টিগত ভিত্তির ওপর স্থাপন করার উদ্দেশ্যে তাকে রাষ্ট্রগত করবার জন্য যত্নশীল হ'য়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কিন্তু ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় এই সময় জন-শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁদের এই প্রকার ধারণা ছিল যে, যদি জন-শিক্ষার বহুল প্রসার ঘটে, তাহ'লে সমাজে আসবে এমন এক আলোড়ন, যার ফলে কি সামাজিক অথবা কি জাতীয় উন্নতি হ'বে সম্পূর্ণ ব্যাহত। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত বা উচ্চশ্রেণীর প্রায় সকলেই ছিল পুরোপুরি রক্ষণশীল ; তাই তাঁরা কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে কোন প্রকার পরিবর্তনের সম্পূর্ণরূপ পরিপন্থী ছিলেন। শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার যে আন্দোলন ইংলণ্ডে অভিঘাত হেনেছে, তা যত না এসেছে ফরাসী বিপ্লবের ভাব-স্পন্দন হিসাবে অথবা ফ্রান্সে ও জার্মানীতে শিক্ষাকে রাষ্ট্রাধীন করার যে প্রয়াস চলেচিল তারই একটা রূপান্তর হিসাবে, তার থেকে বেশী উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়েছিল শিল্প-বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল থেকে। বাষ্পীয় যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হবার অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইংলণ্ডে নানাবিধ শিল্পের অগ্রগতির সংগে সংগে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছিল। ইংলণ্ডের নানাস্থলে কলকারখানা হয়েছিল স্থাপিত। ফলে ইংলণ্ডের নানাস্থানে নোতুন নোতুন সহর বা নগর গ'ড়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের সামন্তযুগের সমাজ-ব্যবস্থার কায়েমী কাঠামো শিথিল হ'য়ে আসছিল। গ্রামাঞ্চলের

নিরক্ষর ও অর্ধ-নিরক্ষর অধিবাসীরা দলে দলে নব-গঠিত নগরে এসে জমায়েত হ'তে লাগলো। কারখানা-কেন্দ্রীক এই সব নগর নিরক্ষরতা ও নানাবিধ সামাজিক দুর্নীতির প্রধানতম কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ালো। তাই ইংলণ্ডের পরহিতোদ্বুদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সব জনসাধারণের মাঝে শিক্ষার উদার আলোক বিকিরণ করে এদের মধ্যে যে সব সামাজিক গ্লানি ছিল সেগুলো অপনোদন করবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াসী হ'য়েছিলেন। আবার এমনও দেখা গিয়েছিল যে এই সব নগরের শ্রমিকশ্রেণী নাগর-সভ্যতার আংশিক সংস্পর্শে এসে তারা স্বাধিকারবোধ সম্বন্ধে উত্তরোত্তর আত্মসচেতন হ'য়ে উঠেছিল এবং নিজেদের দুর্গতি দূরীকরণমানসে পার্লামেণ্টে আসনলাভের জন্য একান্তভাবে উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী মালিকদের আর একটি প্রতি-আন্দোলনও ধীরে ধীরে মাথা তুলছিল। কলকারখানার লাভপুষ্ট মালিক অথবা কর্ণধারগণ এক নবতম মধ্যবিত্ত ধনিক সমাজের উদ্ভব করলো। ধনগর্বে স্ফীত হ'য়ে এরা শ্রমিকশ্রেণীর ন্যায্য আন্দোলনের শ্বাসরোধ করতে উদ্যত হ'য়েছিল। জীবনযুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে তারা ছিল আস্থাশীল। ধন-কৌলীন্যে তারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। নিছক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তারা যদি আজ সমাজের মধ্যমাণ হ'তে পারে, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীও তো আত্মচেষ্টায় একদিন সেই স্থান অধিকার করতে পারবে। তারা বলতো ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ব্যষ্টিগত কর্মপ্রেরণার মূলে কুঠারাঘাত করবে এবং ব্যক্তিগত স্বাবলম্বনের প্রধানতম উৎসকে শুষ্ক করে দিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত চারিত্রিক অবনতি ঘটাবে। ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের অভাবই ব্যক্তিত্ব বিকাশের একমাত্র সরণী। তাই নব-প্রতিষ্ঠিত এই বণিক-সার্থ, সামন্তশ্রেণী ও যাজক সম্প্রদায়ের সংগে হাত মেলালো এবং যাতে কোন প্রকার গণ-শিক্ষা অথবা জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তিত না হয় তার জন্য তারা সর্ববিধ পন্থা অবলম্বন করলো।

প্রথম দিকে অবশ্য তারা কিয়ৎকালের জন্য গণ-শিক্ষার আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।

ইংলণ্ডে জন-শিক্ষার বিরুদ্ধে বিত্তবান বণিকশ্রেণী, অভিজাত শ্রেণী ও যাজক সম্প্রদায়ের পরিপূর্ণ অনিচ্ছা থাকলেও সরকারী পক্ষ অবশ্য গণ-শিক্ষার আন্দোলনকে সমর্থন করছিল। কারণ, সরকারী পক্ষ ভেবেছিল যে ইংলণ্ডে কারখানা প্রথা প্রবর্তিত হবার পর থেকে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে ও সমাজদেহে যে সব দুরপনেয় কলঙ্ক প্রবেশ ক'রেছিল, সেগুলোকে দূর করতে হলে একমাত্র জন-শিক্ষাই হবে প্রধানতম সহায়। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হ'লো প্রথম কারখানা আইন এবং কারখানায় শিক্ষানবীশদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবন সম্বন্ধে আইন। এই আইন দুটো বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে কাপড় ও পশমের কারখানায় শিক্ষানবীশদের দৈনিক কার্যকাল বার ঘণ্টায় সীমায়িত হ'য়ে গেল; কারখানায় নৈশ কার্য্য একেবারে রহিত হ'য়ে গেল। এই আইন দুটোতে আরও স্থিরীকৃত হ'লো যে শ্রমিকদের শিক্ষানবীশ জীবনের প্রথম চার বৎসরে কারখানায় তাদের দৈনিক কার্যকালের কিছু সময় পঠন, লিখন ও গণিত শিক্ষায় ব্যয়িত হবে। এই সব শিক্ষানবীশের সামর্থ ও বয়সানুযায়ী হয় কোন শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে, না হয় কোন প্রকৃষ্টতম শিক্ষালয়ে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি শিক্ষানবীশের দৈনিক কার্যকালের কিছু সময় আলাদা করে রাখা বাঞ্ছনীয়। এই আইন দুটোর ফলে খুব কম সংখ্যক ছেলে মেয়ে হয়তো উপকৃত হয়েছিল; কারণ আইনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাদি থাকলেও যথাযোগ্য পরিদর্শনের অভাবে ছেলে মেয়েরা এর কোন শুভ ফলভোগ করতে পারছিল না। কিন্তু এটা হ'লো শুভ প্রয়াসের সূচনা মাত্র। উত্তরকালে এই বিষয়ে রাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার একটা নজীর হ'য়ে রইলো। এরপর কিছুকাল অবশ্য একই ভাবে কাটলো। রাষ্ট্র এই পথে

বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারলো না। রাষ্ট্রগতভাবে দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব অথবা জাতীয় কোষাগার থেকে স্বৈচ্ছিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব শ্রেণীগত স্বার্থ-সংঘাতের জন্য কোন ক্রমেই কার্যকরী হ'য়ে উঠছিল না। ইংলণ্ডে প্রথম সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হবার এক বৎসর পরে এদিক দিয়ে কিছু করতে পারা গিয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি নূতন কারখানা আইন পাশ হ'লো। এতে স্থির হ'লো যে কারখানায় বা খনিতে নয় বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েকে কাজে লাগানো হবে না। কারখানার কাজে লিপ্ত নয় থেকে তের বছরের ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক দুঘণ্টা করে কোন-না-কোন বিদ্যালয়ে যোগদান করার ব্যাবস্থা থাকবে। ঐ বৎসরেই আবার ইংলণ্ডের দুস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য এবং বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য সরকারী পক্ষ থেকে বৎসরে মাত্র ২০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করবার ব্যবস্থা হ'লো। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট থেকে আবার ১০,০০০ পাউণ্ড বরাদ্দ করা হ'লো রাষ্ট্রীয় শিক্ষকশিক্ষণের মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য। এর বছর চারেক পরে জনসাধারণের শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার স্থিরীকরণের জন্য প্রিভি কাউন্সিলের একটি বিশেষ কমিটি স্থাপিত হ'লো। এইভাবে স্বার্থসন্ধ শ্রেণীর অনিচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ধীরে ধীরে ইংলণ্ডে জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে লাগলো। অবশ্য ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রাষ্ট্র জাতির সমগ্র শিশুসম্প্রদায়কে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনতে পারেনি। এমনকি তখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার কোন প্রকার সুসঙ্গত ব্যবস্থা রাষ্ট্র করে উঠতে পারেনি।

এই যুগে গণ-শিক্ষার পূর্ণ সমর্থনকারীদের মধ্যে রবার্ট ওয়েনের (১৭৭১-১৮৫৮) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওয়েন ছিলেন ওয়েল্‌সের এক দোকানদারের পুত্র। অতি অল্প বয়সে তিনি ব্যবসায়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন। ১৭৯৯ সালে

গ্লাস্‌গোর সন্নিকটে নিউ লানার্ক নামক সহরে কয়েকটি কাপড়ের কলের অংশীদার হ'য়ে তিনি এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে তাঁর অধীনস্থ শ্রমিকগণের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ (প্রায় পাঁচ শত) হবে ভিক্ষুকের সন্তান। তিনি কারখানার মধ্যে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং অন্যান্য নানা উপায়ে তাঁর শ্রমিকগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিতরণ করে তাঁর কারখানা এলাকাকে একেবারে রূপান্তরিত করে ফেললেন। নিজের কার্যকারিতায় উল্লসিত হ'য়ে তিনি ঝটিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে তিনি যেমন নিউ লানার্কের কারখানা এলাকায় তাঁর শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের ও শিক্ষার মনোন্নয়ন করেছেন, অনুরূপ পদ্ধতিতে তিনি ইংলণ্ডের সমগ্র সমাজের নৈতিক অবনতির পথকে রোধ করতে চেয়েছিলেন। ১৮১৩-১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি "*A new view of Society*" or Essays on the Formation of Human Character নামক কয়েকটি পুস্তিকার মাধ্যমে তিনি তাঁর এই মতবাদকে প্রচার করতে চাইলেন। তাঁর মতবাদের উপজীব্য বিষয় হ'লো এই যে মানুষের চরিত্র ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে বাইরের পরিগমের ওপর। সেখানে মানুষের প্রবল অভিলাষও যে বিশেষ কার্যকরী হয় এমন নয়। সৎ ও অসৎ ব্যক্তির মধ্যে যে তারতম্যটুকু রয়েছে তা শুধু তাদের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য আছে বলেই। তাই দেখা যায় যে কোন জাতিই তার ভাগ্যের নিয়ামক হতে পারে। ওয়েন বলেছেন—যে কোন রাষ্ট্রের সরকার তার প্রত্যেকটি নাগরিককে হয় সর্বোত্তম না-হয় সর্বাধম নাগরিকে পরিণত করতে পারে। দেশের শাসন ভার যাদের হস্তে অর্পিত তারা ইচ্ছা করলে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে হয় নিরক্ষরতার বিষম পঙ্কে চিরকাল নিমজ্জিত রাখতে পারে, আবার তাকে জ্ঞানের আলোকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলতে পারে। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবো যে সেই

রাষ্ট্রকে আমরা সর্বোত্তম রাষ্ট্র বলবো যার আছে সর্বোৎকৃষ্ট জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা। তাই রবার্ট ওয়েন চেয়েছিলেন যে গ্রেট-ব্রিটেনে যেন এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয় যা হবে দেশের সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য, যা হবে একেবারে ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু তাঁর এই সমভাবে প্রযোজ্য শিক্ষাপ্রণালী যে কি প্রকার রূপ পরিগ্রহ করবে তা' তিনি পরিষ্কার করে কোথায়ও বলেননি। নিউ লানার্কে রবার্ট ওয়েন যে বিদ্যালয় স্থাপন ক'রেছিলেন, সেখানে ল্যাঙ্কাষ্টার ও বেল প্রবর্তিত সর্দার পড়ুয়া প্রথাই ছিল চালু। কিন্তু তৎকাল প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর মন কিছুতেই সায় দিত না। তিনি বলতেন বর্তমান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা হয় তো পঠন, লিখন, হিসাবরক্ষণ, সীবন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে; কিন্তু সেই সংগে যে তারা নিকৃষ্টতম গুণাবলীর আধার হ'য়ে উঠবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি সমাজের প্রতিটি প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি সৎ এবং বুদ্ধিমান হয়, তাহলে সেই সমাজের সন্তান-সন্ততিগণকে সৎ ও বুদ্ধিমান করে তোলা খুব কষ্টকর হ'য়ে উঠবে না। তাঁর মতে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার দু'বছর বয়সের সময় হয় তাকে কোন বিদ্যালয়ে না-হয় কোন ক্রীড়াক্ষেত্রে নিয়োজিত করা উচিত; সেই সময় তাদের মনের মধ্যে এই প্রকার ভাবধারার বীজ বপন করতে হবে যে যদি তারা নিজের জীবনে সুখলাভ করতে চায়, তাহ'লে তাদের জীবনের সহচরদেরকে আগে সুখী করে তুলতে হবে। এই বাণীর অন্তর্নিহিত নীতি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সম্যক জ্ঞান তো থাকবেই; পরন্তু তারা বিদ্যালয়ে শিখবে উত্তমরূপে পাঠ করতে এবং যা পাঠ করবে তা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করবে; সেখানে তারা কেমন করে দ্রুত ও সুন্দর ভাবে লিখতে পারে এবং সেই সংগে তারা সেখানে এমন ভাবে গাণিতিক জ্ঞানলাভ করবে যা তারা তাদের কর্মময় জীবনে যথাযোগ্য ক্ষেত্রে আরোপ করতে পারে। বালিকাগণকে শেখানো হবে সেলাই

করতে এবং পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করতে। এই সব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানলাভের পর তাদের যোগ দিতে হবে বিদ্যালয়ে সর্বসাধারণের জন্য যেখানে পাকশালা আছে সেখানে। তারা সেখানে শিখবে কেমন করে স্বল্পব্যয়ে পুষ্টিকর খাদ্য তৈরী করতে হয়; কেমন করে গৃহস্থালীকে সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। রবার্ট ওয়েন তাঁর "The new moral world" নামক পুস্তকে আরও একটি বিপ্লবাত্মক পরিকল্পনার রূপদান ক'রেছেন। তিনি সেই পুস্তকে দেখিয়েছেন যে শিশু জন্মগ্রহণ করার পর থেকে তার কুড়ি বছর বয়সকাল পর্যন্ত তার শিক্ষাজীবনকে চারটি সুসংগত স্তরে বিভক্ত ক'রে নিয়ে এবং প্রতিটি স্তরে তাদের বিভিন্ন রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করে এমন একটি মানব-গোষ্ঠী সৃষ্টি করবেন যারা দেহে, বুদ্ধিতে ও নীতিজ্ঞানে হ'য়ে উঠবে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। শিক্ষার্থীদের জন্ম থেকে তাদের পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তারা এমন একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষ হ'য়ে উঠবে যেখানে তারা শিক্ষালাভ করবে নিঃস্বার্থতা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং সেই সংগে সর্বজনীন কল্যাণ। পাঁচ থেকে দশ বৎসরের মধ্যে তাদেরকে বহির্জগতের সংগে পরিচয় ঘটাতে হবে; বয়োবৃদ্ধদের সংগে কথোপকথনের মাধ্যমে ও খেলাধূলার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা অগ্রসর হতে থাকবে। দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে তাদেরকে শেখান হবে কেমন করে তাদের থেকে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের শিক্ষার্থীদেরকে নানা বিষয় শেখাতে হয় এবং সেই সংগে তারা শিক্ষালাভ করবে সুকুমার ললিত কলা, হস্তশিল্প ও যান্ত্রিক শিল্প। পরিশেষে তাদের পনের থেকে কুড়ি বছর বয়সে তারা তাদের নিম্নতম স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাভার গ্রহণ করবে। এই ভাবে তারা সমাজ সংগঠনের সক্রিয় নির্মাতা হ'য়ে দাঁড়াবে। রবার্ট ওয়েনের এই সব পরিকল্পনার আদর্শগত দিকটা নেহাত মন্দ ছিল না; কিন্তু এই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার মত কর্মীর অভাব ছিল তখন ইংলণ্ডে। তাঁর শিশুবিদ্যালয়ের পরিকল্পনা

সমগ্র দেশ সাধারণভাবে গ্রহণ করেছিল। ইংলণ্ডে স্যামুয়েল উইল্‌ডারস্পিন এবং স্কটল্যাণ্ডে ডেভিড্ ষ্টো তাঁর শিশু বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকে একটি প্রকৃষ্ট রূপ দেবার প্রয়াসী হয়েছিলেন।

দেশের শিক্ষাপদ্ধতিকে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অধীনে আনার বিপক্ষে ইংলণ্ডের অনেক রাজনীতিবিদ ও ধর্মধ্বজী তো ছিলেনই; কিন্তু এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা আপোষহীন প্রতিপক্ষ ছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩)। হার্বার্ট স্পেন্সারের পিতৃপুরুষেরা ছিলেন বংশগতভাবে শিক্ষক। তাঁর পিতামহ, তাঁর পিতা, তাঁর পিতৃব্য সবাই ছিলেন মনে প্রাণে শিক্ষক। স্পেন্সার পুরুষানুক্রমে একটি তেজী সংস্কারবিমুখ মনের অধিকারী হ'য়েছিলেন। তাই ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রের কোন প্রকার সর্দারি তিনি কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। আর যদিও বা রাষ্ট্র কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করে, তাহ'লে তা সঙ্কীর্ণতম সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এই মতবাদের বশবর্তী হ'য়ে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে মানব জীবনে শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সেই ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বা তা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস ব্যক্তিগত জীবন প্রকাশের পথে অন্তরায় এবং অনিষ্টকর হ'য়ে দাঁড়াবে। জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে তাঁর "Social Statistics" এবং তাঁর "Essays on Education" নামক পুস্তক দুটিতে তিনি তাঁর এই মতবাদকে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। স্পেন্সার বলেছেন—পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুতিই হ'লো শিক্ষার চরমতম লক্ষ্য। তাঁর এই ধারণা ছিল যে ব্যষ্টিগত স্বার্থ আর সমষ্টিগত স্বার্থ পরস্পর পরস্পরের পরিপন্থী। ব্যক্তিগত স্বার্থই ছিল তাঁর কাছে সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্পেন্সার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং ব্যষ্টিগত কল্যাণকর বিষয়াদিকে পাঠ্যসূচীতে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সামাজিক বিষয়াদি, যেমন সাহিত্য ও সুকুমার ললিত কলা, পাঠ্যসূচীতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার

করতে পারে না—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি নিজের জীবনে যে বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ ক'রেছিলেন, সেই শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ক'রতেন বেশী। নিছক সাহিত্যিক শিক্ষা তাঁর কাছে নিরর্থক ব'লে প্রতিভাত হ'তো। তাঁর মতে যে শিক্ষা মানুষকে তার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাকীর্ণ পথকে অনেকখানি সুগম করে দেবে সেই শিক্ষাই হ'লো প্রকৃত শিক্ষা। প্রতিটি ব্যক্তি বিদ্যালয়ে লব্ধ তার জ্ঞানটিকে বাস্তব জীবনের কার্যকরী ক্ষেত্রে পরখ করে নিতে পারে। ইংলণ্ডে এতাবৎকাল প্রচলিত প্রাচীন ঐতিহ্যসমন্বিত শিক্ষাপ্রণালী ব্যক্তিগত বিচারসাপেক্ষ নয়।

প্রাচীন ঐতিহ্যসমন্বিত নিছক সাহিত্যিক শিক্ষার প্রতি স্পেন্সারের যে অনাস্থা তা আরও বেশী প্রকট হ'য়ে পড়ে তখন, যখন আমরা তাঁর বুদ্ধিগত শিক্ষার নীতিগুলি সমালোচনা করতে বসি। তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় রচনায় পেটালটসির Anschauung নীতির ঐকদেশিক ব্যাখ্যান হয়েছে। তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি নীতি নির্ধারণ ক'রে দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের যাত্রা হবে অপেক্ষাকৃত সরল বিষয়বস্তু থেকে জটিলতর বিষয়বস্তুতে। কিন্তু এ সবের গোড়াকার কথা হ'লো এই যে শিক্ষা হ'বে নিছক ব্যক্তিসর্বস্ব পদ্ধতি—এর আরম্ভ হবে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সংগে সংগে; শিক্ষার্থী নিজেকে আবিষ্কারকের পর্যায়ে ফেলে শিক্ষাকে স্বয়ংক্রিয় কর্মপদ্ধতিতে করবে রূপান্তরিত এবং সে সেই কর্মপ্রণালীর মধ্যে খুঁজে পাবে জীবনের আনন্দময় উৎসাহ উদ্দীপনা। পেষ্টালটসির শিক্ষানীতির সংগে স্পেন্সারের মতবাদের বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। তিনি রুশোর 'এমিল' গ্রন্থ পাঠ না করলেও রুশোর শিক্ষানীতির সুরও তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়।

স্পেন্সার নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন, সেখানে তিনি রুশোর মতবাদের সংগে একমত বললেও চলে। তিনি বলেছেন,—"ধরা যাক, একটি ছেলে কোথায়ও পড়ে গেল, অথবা

তার মাথা লেগে গেল টেবিলের কানায়। তখন সে তো যন্ত্রণা অনুভব করবেই। এর পুনরাবৃত্তি হ'লে ছেলেটি আরও সতর্ক হ'য়ে যাবে। এইরূপে একই ঘটনার পুনরাবর্তন হ'তে থাকলে শিক্ষার্থী আপনা হ'তেই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যাবে। তখন তার স্বতোৎসারিত নিয়ন্ত্রণবোধই তাকে তার আচরণকে সংযত করে দেবে। এ হেন ক্ষেত্রে প্রকৃতিদেবী স্বয়ং নৈতিক নিয়ন্ত্রণ-দ্বার খুলে বসে আছেন। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে শিক্ষার্থীর জীবনে সংযম বা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আনলে পিতামাতা বা শিক্ষক কৃত্রিম কোন শাস্তিব্যবস্থা না করে বা শারীরিক কোন যন্ত্রণা না দিয়ে তাঁরা অপেক্ষা ক'রে থাকবেন। তাঁরা দেখবেন যে তাঁদের সন্তান-সন্ততির কোন প্রকার অপকর্মের শাস্তি তারা আপনা হ'তেই পাবে। স্পেন্সারের নিকট প্রকৃতি-বিধি ও নৈতিক বিধির মধ্যে মূলগতভাবে কোন বিভিন্নতা নেই। তিনি আরও বলেছেন দুঃখ ও আনন্দের মাপকাঠিতে আমরা মানুষের আচরণের বিচার করে থাকি। যদি কোন আচরণে আমরা যন্ত্রণা বা দুঃখ পাই, তা সে চৌর্যবৃত্তিই হোক, অথবা আমাদের আঙুল পোড়ানোই হোক, তা'হলে তা হ'বে অসৎ। আর মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এর নিরানন্দময় ফলই প্রমাণ করে দেবে যে কাজটি অসৎ এবং তখনই অন্যায়কারী সেই অসৎ কর্মকে এড়িয়ে যাবার যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাবে। এর চাইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধের চমৎকার নিদর্শন আর কোথায় পাবো আমরা! কি নৈতিক, কি বুদ্ধিগত, সর্বপ্রকার শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা উদ্বুদ্ধ করার মানসে স্বাভাবিক শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ আছে, যে তারতম্য আছে, স্পেন্সার সে-সব কথা সব ভুলে গিয়েছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রতি শাস্তি যে আকার পরিগ্রহ করে, তার পশ্চাতে সামাজিক সমর্থন নেই, এ-কথা তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি বা তা স্বীকার করতে একেবারে অনিচ্ছুক ছিলেন। সমাজের আদর্শ ও বিধি-

নিষেধময় ব্যবহারিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেই প্রতিটি ব্যক্তির সত্বা কুসুমিত হয়ে ওঠে এ-কথাও সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি স্পেন্সার অথবা উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তিনি এই কথাকে অস্বীকার করেছেন।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা যদি ধরে নিই যে ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে ওয়েনের সমাজতন্ত্রবোধ আর স্পেন্সারের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ এই সময় খুব তীব্র আকার ধারণ করেছিল, তা'হলে বোধ হয় আমরা মস্ত বড় ভুল ধারণা ক'রে বসবো না। দেশের শিক্ষায় বিজ্ঞানের স্থান কোথায় এবং কেমন হ'বে তা নিয়ে এই দুই শিক্ষাবিদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। ওয়েন ছিলেন নিছক সাহিত্যিক শিক্ষার পক্ষপাতী কিন্তু স্পেন্সার শিক্ষায় বিজ্ঞানের প্রবর্তনের বিশেষ সমর্থক ছিলেন। অবশ্য এই সময়ের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষাবিদরা এই মত পোষণ করতেন যে দেশে যে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তিত হবে, তার পাঠ্যসূচী হ'বে মুখ্যত বিজ্ঞানমুখী। এই সময়ে গ্রেট ব্রিটেনে জর্জ কোম্ব (১৭৮৮-১৮৫৮) নামে এক শিক্ষাবিদ তাঁর "*Lectures on Popular Education*" নামক পুস্তকে ওপরের অভিমতই প্রকাশ ক'রেছেন। তিনি এডিনবরাতে এক বিশেষ শ্রেণীর বিদ্যালয় খুলেছিলেন যেখানে বিজ্ঞানের নানা শাখা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন কি সেখানে দেহবিদ্যা ও মস্তিষ্কবিদ্যা শেখাবার বন্দোবস্ত ছিল। দেশের জাতীয় শিক্ষা যাতে বিজ্ঞানধর্মী হয় তার স্বপক্ষে যুক্তি অবতারণার জন্যই তিনি এরূপ পন্থা অবলম্বন ক'রেছিলেন। স্পেন্সারের সমসাময়িক বহু বৈজ্ঞানিকের শিক্ষা বিষয়ে মতবাদ ছিল অনুরূপ। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বলতেন যে দেশের বর্তমান কৃষ্টির প্রধানতম উপাদান এই হওয়া উচিত যে বিদ্যালয়ে সাহিত্যিক শিক্ষার সহিত যেন প্রাকৃত বিজ্ঞান সংযোজিত হয়। জন টিণ্ডাল নামে অপর এক বৈজ্ঞানিক বলেছেন—"আমাদেরকে অতীতের যা

দেবার আছে, তা তো আমরা কৃতজ্ঞতাচিত্তে গ্রহণ করবোই। কিন্তু সেই সংগে আমরা যেন ভুল না ক'রে বসি যে বর্তমান শতাব্দীর ভাণ্ডার থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করারও আছে। অতীতের চিন্তাধারা এবং কর্মপ্রক্রিয়া যেমন আমাদের অনুসরণীয়, বর্তমান যুগের চিন্তাধারা এবং কর্মপদ্ধতিও ঠিক সমভাবে অনুকরণীয়।" টমাস হাক্স্লি (১৮২৫-১৮৯৫) প্রমুখ অপরাপর বিজ্ঞানীও এর থেকে জোরাল ভাষায় পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞানের সাংগীকরণের পক্ষে মতবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—"সত্যকারের কৃষ্টি-সম্পন্ন হ'তে গেলে নিছক সাহিত্যিক শিক্ষা যেমন কার্যকরী, নিছক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও ঠিক সমভাবে কার্যকরী।" এখানে অবশ্য একটি বিষয় সবিশেষ লক্ষ্যণীয় যে বিজ্ঞানকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার যে যুক্তির অবতারণা করা হ'য়েছে তা অবশ্য ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের মানসিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে একেবারে অপরিহার্য তা নয় (যদিও মধ্য ভিক্টোরীয় যুগের বহু বৈজ্ঞানিক এই অভিমত পোষণ করতেন) ; বরং এই যুক্তির অবতারণা করা হ'য়েছে সম্পূর্ণ সামাজিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে, কারণ বর্তমান জগতে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতির অর্থই হ'লো বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে অবহিত হওয়া। পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞানের দাবী একবার যখন স্থিরীকৃত হ'য়ে গেল, সেই সংগে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ও পাঠ্যসূচীর সহিত অংগাংগী-সম্পর্কে বিজড়িত হ'য়ে গেল। এখন প্রশ্ন দাঁড়ালো কোন বিষয়গুলো পরিপূর্ণ জীবন-ধারণের পথে অধিকতর সহায়ক ? উভয়বিধ বিষয়ই যে একে অন্যের পরিপূরক তা শীঘ্রই স্বীকৃত হ'লো এবং উভয় বিষয়ের সম্মিলিত অধ্যয়ন ও অনুশীলন শিক্ষার্থী-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়ালো।

অবশ্য এই বিরুদ্ধমুখী পাঠ্যবস্তুর মধ্যে সংগতি এবং সংহতি একদিনে সংসাধিত হয় নি। এর গতি অতি ধীর এবং মন্থর। তস্য কথা বলতে কি এদের মধ্যে যথার্থ মৈত্রী স্থাপন হতে এখনো

অনেক সময় লাগবে। আগে মনে হ'তো এই দুই বিষয়ের মধ্যে বোধ হয় কোন মিল ঘটানো যাবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্যাদি বিষয় এতদিন যে আসন অধিকার ক'রে বসেছিল, সে আসন থেকে তাকে হটানো আদৌ সহজসাধ্য ছিল না। স্পেন্সার আর তাঁর অনুসরণকারীদের কৃতিত্ব সেখানেই যেখানে তাঁরা সাহিত্যাদির অবিসংবাদিত একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আপত্তিসূচক প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। নিছক সাহিত্যিক শিক্ষা যে শিক্ষার্থীকে জীবন-যুদ্ধের যথার্থ সৈনিক ক'রে বিরাট বিশ্বের মাঝে তাকে ছেড়ে দিতে পারে না, এবং তার ভিতর যে অনেক ত্রুটি থেকে যাচ্ছে এই ব্যাপার উত্তরোত্তর সকলের কাছে প্রতিভাত হচ্ছিল। শিল্প-বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সকলের জীবনে অনুভূত হচ্ছিল। বৈজ্ঞানিক ভাবধারা ও আবিষ্কার সেই যুগের মানুষের মনে এক তীব্র আলোড়ন এনে দিয়েছিল। বিজ্ঞান-শিক্ষার মধ্যে শিক্ষার্থীর মনে যে বিচারবোধ ও দৃষ্টিশক্তি খুলে যায়, নিছক সাহিত্যিক শিক্ষা তো কোনদিন সংসাধন করতে পারে না। ইংলণ্ডে শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন বিজ্ঞানের কৌলীন্য স্বীকৃত হবার সময় এসেছিল, ঠিক তেমনি ইংলণ্ডে সেই সময়ে প্রচলিত গ্রামার স্কুল-গুলিতে পঠিতব্য সাংস্কৃতিক বিষয়াদির উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল। বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রাণবস্তু ছিল অনুসন্ধিৎসা। সেই অনুসন্ধিৎসাই গ্রামার স্কুলগুলির সংস্কৃতিমূলক পাঠ্যবিষয়াদির একাধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার তরংগ তুলেছিল। ইংরেজ জাতির হিতকামী সকলেই এই সময় উপলব্ধি করেছিলেন যে পরিবর্তনশীল জগতে, যেখানে মানুষকে প্রতি পদক্ষেপে নানান বিরুদ্ধ অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে চলতে হয়, শিক্ষাকে যথার্থ জাতীয় ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে গেলে তাকে শুধুমাত্র সাহিত্য-ধর্মী করে রাখলে চলবে না, তাকে ক'রে তুলতে হবে বিজ্ঞানমুখী।

সুখের বিষয় এই যে এই সময় ইংলণ্ডের গ্রামার স্কুলগুলিতে এই পরিবর্তনের চিহ্ন স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছিল। এই স্কুলগুলির

অভ্যন্তর থেকে চিরাচরিত শিক্ষাবিধির সংস্কার-সাধনে একটি স্বতোৎসারিত অভিলাষ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এই পরিবর্তনের লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকট হ'য়ে দাঁড়ালো। কয়েকজন স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষকের প্রগতিবাদী কর্মপন্থাই ছিল এই সংস্কারের মূলে। টোনব্রিজ গ্রামার স্কুলের প্রধানশিক্ষক ভিসেসিমাস নক্স, যিনি ১৭৮১ সালে তাঁর *"Liberal Education"* নামক পুস্তকে সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যাখ্যান ও সমর্থন করেছিলেন, টমাস জেমস যিনি ১৭৭৮ সাল থেকে ১৭৮৫ সালের মধ্যে রাগবি পাবলিক স্কুলকে শিক্ষার একটি মহাপীঠস্থান-রূপে পরিণত করেছিলেন, এবং যিনি ছিলেন এই স্কুলের কর্ণধার এবং পরিশেষে টমাস আর্ণল্ড (১৭১৫-১৮৪২) যিনি রাগবি পাবলিক স্কুলে দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেছিলেন, প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রযত্নে তাঁরা ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুল এবং অনুরূপ বিদ্যালয়গুলিতে নব-জাগরণের এক অপূর্ব সাড়া এনে দিয়েছিলেন। টমাস আর্ণল্ড যে এক বিরাট মৌলিকত্বসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তা নয়। তাঁর জীবনের শক্তির উৎস ছিল তাঁর নিষ্কলঙ্ক মধুর চরিত্রে এবং তাঁর গভীরতম অন্তর্দৃষ্টিতে। তিনি নিজে শিক্ষালাভ করেছিলেন উইঞ্চেষ্টার পাবলিক স্কুলে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। যে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে তিনি মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, তিনি সেই প্রণালীকে অবধারিত পদ্ধতি-রূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। অবশ্য এই ধারার মধ্যে যে সব ত্রুটি ছিল সেগুলি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। অতি সুকুমার বয়সে শিক্ষার্থীদিগকে গৃহের স্নেহময় নীড় থেকে সরিয়ে নিয়ে আবাসিক বিদ্যালয়ে সমবেত করার অপকারিতা তিনি সম্যক উপলব্ধি করতেন। কারণ, তিনি বুঝতেন যে এই বয়সে বাইরের প্রলোভনের প্রতি অপরিণতবুদ্ধি শিক্ষার্থী কিশোরদের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রথা তখন ইংলণ্ডে কায়েমী হয়ে আছে। তাকে হঠান তাঁর পক্ষে একেবারে

অসম্ভব ছিল। তাই সেই রীতিকে মেনে নিয়ে তার মধ্য থেকে যতখানি মংগল সংসাধন করা যায় সেই দিকে সমগ্রভাবে মনোনিবেশ করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আবাসিক বিদ্যালয়ের পরিগমকে যদি যথাযোগ্যরূপে নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায়, তাহ'লে সে-বিদ্যালয়ের নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে তোলা সম্ভব। রাগবির মত অনুরূপ পাবলিক স্কুলগুলোর নৈতিক মান উন্নীত করতে গেলে সেখানে স্বাস্থ্যকর নৈতিক ও ধর্মীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হ'বে। এটাকে কার্যকরী করে তুলতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আদর্শবাদী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কয়েকজন নিঃস্বার্থ শিক্ষক, যাঁরা ছাত্রদের কল্যাণকে জীবনের ধ্যান জ্ঞান করে নেবেন। যাঁরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং তাঁর সহকারী হবেন বিদ্যা-লয়ের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে তাঁদের যথাসম্ভব অবাধ স্বাধীনতা থাকা একান্ত আবশ্যক। বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির কর্তৃপক্ষগণ যদি তাদের কর্মে প্রতিনিয়ত বাধার সৃষ্টি করেন, তাহ'লে বিদ্যালয়ের সাধারণ অগ্রগতি তো ব্যাহত হ'বেই, উপরন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক শান্তিময় জীবন স্বার্থান্ধ রেষারেষিতে বিষাক্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। বিদ্যালয়ে আদর্শ-চরিত্র শিক্ষকের প্রভাব সর্বাগ্রে তো একান্তভাবে অপরিহার্য। কিন্তু বিদ্যালয় এবং তার পরিগমের নৈতিক মানোন্নয়ন আরও বেশী প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন শাসন-শৃঙ্খলা শিক্ষক মহাশয়গণের হাতে না রেখে, তা যদি বিদ্যালয়ের পরিণতবুদ্ধি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বিদ্যার্থীদের হাতে ন্যস্ত করা হয়, তাহ'লে সেই পদ্ধতি হবে বেশী ফলপ্রসূ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যদি এই সব বয়স্ক বিদ্যার্থীদের নিত্য সাহচর্যে আসেন, তাহ'লে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকর্ম অনেকখানি সহজ ও সুগম হ'য়ে পড়বে। যদি বিদ্যালয়ে কোন অবাঞ্ছিত শিক্ষার্থী পরিদৃষ্ট হয়, তাহ'লে তার যথাসময়ে বহিষ্করণ সমগ্র বিদ্যালয়-জীবনের পক্ষে মংগলদায়ক। বিদ্যার্থীদের বুদ্ধি ও মনীষার স্ফুরণে ঐতিহ্য-সমন্বিত প্রাচীন সাহিত্যাদি পাঠই হ'বে

বিশেষ সহায়ক—এই ছিল আর্ণল্ডের অভিমত। নিজের বিদ্যায়তন সম্বন্ধে বিবরণ দিতে গিয়ে ১৮৩৪ সালে *Journal of Education*এ তিনি বলেছেন যে—"আমরা যদি আমাদের বিদ্যালয়গুলো থেকে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা ব্যাপারটিকে চিরতরে বিসর্জন দিই, তাহলে বিদ্যার্থীদের দৃষ্টি হয় তাদের সমসাময়িক যুগে না হয় বড় জোর ঠিক তাদের পূর্ববর্তী যুগে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। এরকম করলে পৃথিবীর অনেক শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে পরিবর্জন করতে হয়। সে রকম করলে মনে হ'বে যেন মানবজাতির যাত্রা সবে মাত্র সুরু হয়েছে, এই ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এ্যারিস্টটলের কথাই বলি, আর প্লেটোর কথাই বলি, অথবা থুসিডাইডিস, সিসারো অথবা ট্যাসিটাসের কথা ধরাই যাক, এদেরকে প্রাচীন বলে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা থেকে বাতিল করা যায় না। তাঁরা সবাই আমাদেরই দেশের লোক; তাঁরা সর্বযুগের এবং আমাদেরই সমসাময়িক। আমাদের সুবিধা হ'লো এই যে জীবনের যাত্রা-পথে আমরা অনেকেই তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতার সন্ধানী আলোতে দিশা পেয়ে যাই। তাঁরা যে দূরদৃষ্টি পেয়েছিলেন তা সাধারণ মানুষের সামর্থের বাইরে। তাঁদের প্রদর্শিত পথের দিশা না থাকলে তমসাগাঢ় আমাদের জীবনপথ হয়তো আরো সমস্যাজটিল হয়ে থাকতো। তাই তাঁদের চোখ দিয়েই আমরা দেখি এবং তাঁদের লব্ধ সিদ্ধান্তই আমাদের বর্তমান যুগেও সমভাবে কার্যকরী হ'য়ে আছে।" কাজেই প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিনের ভাষাতত্ত্বের প্রতি গভীর মনোযোগ এবং সেই সংগে তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাকরণ-শিক্ষার নীতিকে তিনি তাঁর শিক্ষা-প্রণালীতে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মাতৃভাষাকে যথাযথভাবে শিক্ষা করতে গেলে এদুটোর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন শিক্ষায় তিনি বর্তমান যুগের অনেক সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতেন। এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রাচীন ইতিহাস ও ভূগোলের উপর খুব বেশী গুরুত্ব

আরোপ করতেন। তাঁর এই মতবাদ এমন কিছু নূতন নয়। এর মধ্যে আমরা "শিক্ষার নবোন্মেষের" আদর্শের ইংগিত পাই। প্রাচীন সাহিত্যাদি পাঠ যদি শিক্ষার বিশেষ উপাদানরূপে পরিগণিত হয়, তাহ'লে যে যুগ "শিক্ষার নবোন্মেষ" যুগের পরিপূরক মাত্র সে যুগেও তার সমাদর কমবে কেন ? রাগবির পাবলিক স্কুলের মত বিদ্যায়তনগুলি জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে কি প্রকার কার্যকরী হবে এ-সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত পোষণ করতেন, তাতে অবশ্য কিছু নূতনত্ব আছে। ইংলণ্ডের জন-সমাজ সেই সময় মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তিনি বলতেন, এই তিন বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য সাধারণভাবে তিন ধরনের বিদ্যালয় থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক বিদ্যায়তন নিম্নতন শ্রেণীর জন্য হবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের জন্য থাকবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি আবার রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। উর্ধ্বতন শ্রেণীর জন্য তিনি চাইতেন 'এনডাউড্ স্কুলস' অথবা স্বয়ংশাসিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যারা নিজেদের বিভিন্ন আদর্শানুযায়ী কাজ ক'রে যাবে ; অবশ্য কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ এই সব বিদ্যায়তনের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধানের কাজ করে যাবেন এবং প্রয়োজনবোধে এদের কর্মে উৎসাহও দিয়ে যাবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শ তিনিই বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। প্রতিটি বিদ্যায়তন হ'বে একটি সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ এবং সেখানকার বিদ্যার্থীরা তাদের আবাসিক জীবনকে করবে নিয়ন্ত্রিত এই ছিল আর্ণল্ডের শিক্ষাদর্শ। এখানে বিদ্যার্থীর ব্যক্তিত্ব কর্তৃপক্ষের অহেতুক চাপে পিষে যেতো না। পূত-চরিত্র শিক্ষকগণের নিবিড় সাহচর্যে তাদের জীবন হ'য়ে উঠতো সুষ্ঠুরূপে বিকশিত।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যবসায়-সূত্রে ভারতে ইউরোপীয় বণিকগণের আগমন ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। প্রাচীন ঐতিহ্য-সমন্বিত ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা বিজ্ঞানধর্মী ইউরোপীয় সভ্যতার নিবিড় সংস্পর্শে এলো। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহা-মিলন ভারত মহাতীর্থে ধীরে ধীরে সংসাধিত হ'তে লাগলো।

"The East is East,
The West is West,
And the Twain shall never meet."

এই বাণীর অসারতা প্রতিপন্ন হয়ে গেল। দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী ধ'রে ভারত ছিল মুসলমান শাসকগণের পদানত। ফ'লে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার ভাবধারা সমগ্র দেশে বিলীনপ্রায় হ'য়ে গিয়েছিল। মুসলমান আক্রমণকারী ও শাসকগণের জিঘাংসাময় ধর্ম-বিস্তার ও রাজ্যস্থাপনের প্রাণান্তকর বহ্নিতে ভারতীয় শিক্ষাধারার মহাপীঠস্থানগুলি একে একে ভস্মীভূত হ'য়ে গিয়েছিল। পাঠান ও মোগল শাসকগণের কেউ কেউ বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক হ'লেও, ভারতীয় শিক্ষা যে স্তরে এসে প'ড়েছিল, তার একটা যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করা অতি দুরূহ ব্যাপার, তবে অল্প কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে এই সময়কার ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস একেবারে তমসাবৃত। সেই ঘনান্ধকার ভেদ ক'রে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও কোথায়ও আলোর ক্ষীণতম রশ্মিটুকুও দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। মোগল-সাম্রাজ্যের অবসানের দিনে দিল্লীর সুলতানী শাসন যখন একেবারে অন্তঃসারশূন্য ও নিবীর্য হ'য়ে পড়েছিল, তখন সেই শাসনব্যবস্থা অন্তর্দ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণে একেবারে শিথিল হ'য়ে পড়েছিল, ভারতের চরমতম সেই দুর্দিনে দিনেমার, পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিক-সার্থ ভারতের বিভিন্ন বন্দরে স্ব স্ব বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত ভারতে ইউরোপীয় বিভিন্ন বণিককূলের ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে নানাবিধ সংঘাত লেগেই ছিল। উত্থানপতনময় সেই সংঘাতের মধ্য দিয়ে ইংলণ্ডের বণিক-সার্থ নিজেদের প্রতিপত্তিকে বেশ কায়েম ক'রে নিয়েছিল। দিল্লীর অথবা প্রাদেশিক রাজশক্তি কোনদিনও ভাবেনি যে "পোহালে শর্বরী" "বণিকের মানদণ্ড" একদিন "রাজদণ্ডরূপে" দেখা দেবে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে 'বাঙালীর খুনে' "ক্লাইভের খঞ্জর লাল" হয়ে গেল। পলাশীর ভাগীরথীতে যে রবি অস্তমিত হয়েছিল, দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী আত্মত্যাগ, শত শত শহীদের তাজা তাজা প্রাণ বিসর্জন এবং দেশের বীর সন্তানগণের অবিরাম সংগ্রামের ফলে ভারত আবার আজ স্বাধীনতা লাভ করেছে, সে আজ জগত-সভায় নিজের আসন প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছে। দেশের সেই দু'শ বছরের বৈচিত্রময় নানা পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনীর সংগে জড়িয়ে আছে আমাদের দেশের বিগত দু'শ বছরের শিক্ষার ইতিহাস। সেই বিদেশী শিক্ষাধারা কেমন ক'রে এই দেশে ধীরে ধীরে তার মূলকে প্রোথিত ক'রেছিল, তার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে আলোচিত হবে। বিগত দুই শতাব্দীর শিক্ষার ইতিহাস লিখতে গেলে অনেক বৃহদায়তন পুস্তক লিখে ফেলা যায়। এখানে অবশ্য আমাদের সে প্রয়াস নেই। বিগত দু'শ বছরে ভারতে কি ক'রে ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থা তার প্রতিপত্তি বিস্তার করলো, এবং কি ক'রেই বা তার মোহ পাশ থেকে ভারতীয়রা আপনাদিগকে ধীরে ধীরে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করলো তারই প্রধানতম ঘটনাগুলি স্বল্পপরিসরে এখানে আলোচিত হ'বে।

ভারতে বর্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হ'য়ে আছে তাকে আমরা ইংরাজি শিক্ষাপদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ অথবা ভারতীয় সংস্করণ ব'লে ধরে নিতে পারি। ভারতীয় বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির র্তবিবনকে আমরা একটি ঘটনাবহুল জীবন-নাট্যের সংগে তুলনা

করতে পারি। সেই নাট্য-কাহিনীর রূপমঞ্চ এই ভারতবর্ষ নয়; যবনিকার অন্তরালে ইংলণ্ডও ছিল। ভারতের বিগত দুশ বছরের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও শাসন-পদ্ধতির ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে ইংলণ্ডের সামাজিক রাজনৈতিক ও শাসন-পদ্ধতির ক্রমবিবর্তনের সংগে। একদেশের শিক্ষাদর্শ অন্য দেশের শিক্ষাদর্শের উপর ঘাত-প্রতিঘাত হেনেছে। ভারতীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আদর্শ যেমন ইংলণ্ডে অনুসৃত হ'য়েছে, তেমন ইংরেজী শিক্ষার বহু আদর্শ ভারতীয় মৃত্তিকায় তাদের মূলকে দৃঢ় করে নিয়েছে। দেখা গেছে ইংলণ্ডে শিক্ষাক্ষেত্রে যখন কোন সংঘাত এসেছে, তারই অনুরণন বেজে উঠেছে ভারতীয় সমসাময়িক শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে। আবার যখনই ইংলণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন এসেছে, তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে, ভারতীয় শিক্ষা প্রণালীর মাঝে; তা সে কখনো গেছে আগে, কখনও বা পরে। ভারতীয় বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তনকে যথাযথরূপে বুঝতে গেলে উপযুক্ত পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বুঝতে হ'বে। তা না হ'লে তা হয়ে পড়বে কারণবিহীন ফলাফল জানার মত।

ভারতের শিক্ষা ইতিহাসের নাটকে যে ঘটনা-সংঘাত রয়েছে সে সংঘাত হ'য়েছে প্রবীণ ও নবীনের চিরন্তন সংগ্রাম। একদিকে একটি অ-ভারতীয় শক্তি চেয়েছে যে ভারতীয়রা ইংরেজী শিক্ষার স্থুলভ অনুকরণ করুক। প্রয়োজনবোধে তাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয়দের ওপরে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য অ-ভারতীয়দের এই প্রয়াসের মূলে তাদের যে সদিচ্ছার অপ্রতুলতা ছিল তা নয়। অন্য দিকে আর একটি শক্তিও কাজ করছিল। সে-শক্তি অবশ্য সম্পূর্ণ ভারতীয়। এ-দল চাইছিল এদেশে এক নবতম শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করতে যা তাদের নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারবে এবং যা তাদের সমস্যাময় জীবনে বহুতর সমাধান এনে দিতে পারবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতিই বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু বেশী

দিন যেতে-না-যেতে ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকগণ যীশু খ্রীষ্টের সুমহান বাণী খ্রীষ্টানেতর ভারতীয়দের মধ্যে প্রচারকল্পে এদেশে এলেন। প্রাচ্যের জ্ঞান-গরিমা এবং সেইসংগে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষা প্রসারের জন্য এই সব ধর্মপ্রচারকের প্রয়াসের অন্ত ছিল না। এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে তাঁদের কতখানি পরহিতকামনা ছিল তা আজ বলা কঠিন। অনেকে সন্দেহ করেন তাঁদের এই পরকল্যাণবুদ্ধি ও ধর্মপ্রচারের কামনার পশ্চাতে সাম্রাজ্য-লিপ্সার লোল রসনা মাঝে মাঝে লিক্ লিক্ করে উঠ্তো। এদেশে শিক্ষাবিস্তারের কাজে ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকগণ অগ্রণী হ'লেও এক্ষেত্রে তাঁরা সংগীহীন ছিলেন না। তাঁদের এই শিক্ষাবিস্তারের কাজে প্রধান প্রধান সহায়ক ছিলেন সরকারী কর্মচারীরা আর ছিলেন কয়েকজন ভারতীয়। এই সব ভারতীয় আবার কেউ নবতম ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে উঠেছিলেন এবং তাঁরা এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত সুযোগ-সুবিধার যথাযোগ্য সমাদর করতেন। এই দুই শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি অনিশ্চয়তার ঘনান্ধকার থেকে সম্ভাবনাময় আলোকোজ্জ্বল প্রদেশে বেরিয়ে এলো। ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রবর্তিত হবার পর থেকে এর দ্রুত প্রসার ঘটছিল। এর কারণ ছিল অবশ্য অনেক। প্রথমত ধরা যেতে পারে যে ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজগণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের ভাষা, সাহিত্য এবং শিক্ষাপ্রণালী বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই সেগুলোকে পুরোপুরি অনুকরণ করা অথবা নিজেদের জাতীয় জীবনে গ্রহণ করা ভারতীয়দের পক্ষে মংগলদায়কই হবে। দ্বিতীয় কারণ নিহিত ছিল ভারতীয়দের মনোভাবে। এই সময়কার শিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত ভারতীয়গণ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এলো, তখন তারা এর চাকচিক্যে একেবারে বিমোহিত হ'য়ে গেল। তারা ভাবলো এ-হেন অভ্রান্ত পন্থার অন্ধ অনুকরণ ছাড়া

বুঝি গত্যন্তর নেই। তখন ইংরেজী শিক্ষার আদর্শকে তারা জীবনের ধ্যান, জ্ঞান ও ব্রত করে নিল। ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতির জনপ্রিয়তার তৃতীয় কারণ ছিল একেবারে অর্থকরী। শিক্ষার অর্থকরী দিকটাকেও ভারতীয়রা অবহেলা করেনি। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে সব ভারতীয় ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে উঠ্‌তো তারা সেই সময় সরকারের অধীনে মোটা মাইনের কোন-না-কোন চাকুরী পেতেন। নূতন শিক্ষার মোহে পুরাতন কোথায় তলিয়ে গেল তার সন্ধান কেউ রাখলো না। দেশীয় পাঠশালা-প্রথা হ'য়ে গেল বিদূরিত। ধীর অথচ অবিচল গতিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাবধারা সমগ্র দেশে তার প্রভাব বিস্তার করছিল। দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় বা গ্রাম্য পাঠশালাগুলিতে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে পঠন, লিখন ও গণিতে জ্ঞানদান করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সব গ্রাম্য বিদ্যালয় যেন কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। দেশের বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়গুলিতে দেশীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহন হ'য়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতি বেশী দিন বাধাহীনভাবে চললো না। কিয়ৎকালের মধ্যেই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া সুরু হ'লো। বিশ্বের ইতিহাসে এই সময় এমন এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো যার ফলে ইউরোপীয় জাতিগণের এতাবৎ দুর্ভেদ্যতার অলীক ফানুস গেল ফেটে। এত দিন এশিয়াবাসীদের মনে এক ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ছিল যে এশিয়ার অধিবাসীরা বোধ হয় ইউরোপীয়দের পদানত হয়ে থাকবার জন্যই যেন জন্মেছে। কিন্তু এই সময়ে সংঘটিত রুশো-জাপানী যুদ্ধে সে ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হ'য়ে গেল। এশিয়ার দ্বীপময় জাপানের উদীয়মান সামরিক শক্তির নিকট সুবিশাল ও সুপ্রাচীন রাশিয়ার সামরিক শক্তি পরাভব স্বীকার করলো। জাপানের এই বিজয় গৌরবের ফল ভারতীয় জনমতের ওপর এক অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করলো। রুশো-জাপানী

যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর এ দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে স্বতঃই এক প্রশ্ন জাগলো—ইউরোপীয় জাতিগুলো তাহলে দুর্জয় অথবা অপরাজেয় নয়; এশিয়ার অধিবাসীদের সামরিক প্রতিভা তাহ'লে এখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি। শিক্ষিত ভারতবাসীরা ইংরেজী শিক্ষার অবিসংবাদিত প্রাধান্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠলো। আর তা ছাড়া সেই সময় ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির আশানুরূপ সন্তোষজনক প্রসার ঘটছিল না দেখে সেই সময়কার শিক্ষিত জনমত ইংরেজী শিক্ষার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্ধিগ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। পূর্ববর্তী যুগের লোকেদের মত ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আস্থা একে একে শিথিল হয়ে আসছিল। শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে দেশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি নবানুরাগ পরিদৃষ্ট হ'লো। শিক্ষিত জনসাধারণ সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ দেশের কৃষ্টিগত ইতিহাস অধ্যয়ন করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলো। এই সময় বাধলো ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বসমর। এই সমরে ইউরোপীয় জাতিগুলির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের উদগ্র লালসা ও করাল দংষ্ট্রা প্রকটিত হ'য়ে গেল সারা বিশ্বের কাছে। সেই সময়কার শিক্ষিত ভারতীয়রা বুঝলো যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে কোথায় যেন এক বিরাট ত্রুটি রয়ে গেছে। তাই পাশ্চাত্য ভাবধারায় দেশের শিক্ষার ইমারতকে গড়ে তোলা যুক্তিযুক্ত হ'বে কি না এবং তার অন্ধ অনুকরণে এদেশে সত্যকার কোন কল্যাণ আসবে কি না এ-নিয়ে ভারতীয়দের মনে তীব্র সন্দেহ জাগলো। এর মোটামুটি ফল এই দাঁড়ালো যে ভারতীয়রা যে ইংরেজদের হুবহু নকল করতে আরম্ভ করেছিল, সে প্রয়াস তারা ছেড়ে দিল। তারা বুঝলো অন্ধ পরানুকরণে কখনো কোন জাতি বড় হয়ে ওঠে না। নিজের অন্তর্নিহিত স্বকীয়তা থাকলেই তবে কোন জাতি আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। তাই ভারতীয় শিক্ষিত জনমত দেশের প্রয়োজন মেটাতে পারে এমনতর শিক্ষাপদ্ধতির নবতম সৃষ্টির কথা চিন্তা করতে সুরু করলো। তাঁদের এই প্রয়াস একেবারে বিফল

হ'লো না। তাঁদের সাধু প্রচেষ্টা অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো নানাবিধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে। এই সময় স্থাপিত হ'লো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী অথবা অনুরূপ শিক্ষাকেন্দ্র জামিয়া-মিলিয়া। এই সব প্রতিষ্ঠান জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে ভারতের যা কিছু গৌরবের, যা কিছু বরেণ্য তাকে সংরক্ষণ করে পাশ্চাত্যে যা কিছু গ্রহণীয় তাকে নিজেদের করে নিয়ে এক অভিনব সমন্বয়-সাধনে যত্নপর হয়ে উঠ্‌লো। এই প্রকারের কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র সরকারী আওতার বাইরে চলে গেল। আবার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান—যেমন, বারাণসীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী আওতায় থেকেও পাশ্চাত্য প্রভাবের তীব্র মাদকতা থেকে নিজেদেরকে কিয়ৎপরিমাণে বাঁচিয়ে রাখলো। অবশ্য উভয়বিধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি বিষয়ে এরা একমত ছিল। সেটা হ'লো এই যে—আর পরানুকরণ নয়; "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"। এবার চাই নবতম সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির আনন্দে এই সব প্রতিষ্ঠান যেন মাতোয়ারা হ'য়ে উঠেছিল।

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রের অভিনয় মঞ্চের অভিনেতৃগণকে আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। প্রথম হ'লেন বিদেশী ধর্মপ্রচারকগণ; দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি হ'লেন সরকারী শিক্ষাবিভাগের কতিপয় শিক্ষানুরাগী ইংরেজ কর্মচারী এবং পরিশেষে কয়েকজন ভারতীয়দের নাম করা যেতে পারে যাঁরা ভারতে ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারে বিশেষভাবে অগ্রণী হয়েছিলেন। ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে বিদেশী ধর্মপ্রচারকগণ যে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সমাজ-সেবার বিভিন্ন অধ্যায়ে তাঁরা যে প্রকার কর্মক্ষমতা ও সংগঠন-শক্তি দেখিয়েছেন, তা আজও পর্যন্ত বিরল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে সরকারী শিক্ষাবিভাগে ইউরোপীয় কর্ণ-ধারগণ শিক্ষার রংগমঞ্চে অবতীর্ণ হননি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার

পূর্ব পর্যন্ত এই সব ইউরোপীয় শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার ক'রে আসছিলেন। দেশের কল্যাণকামী ভারতীয়গণ রংগমঞ্চে সর্বশেষে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে তাঁরা অর্থ সংগ্রহ ক'রে আধুনিক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব তাঁরা নিজেদের স্কন্ধে রেখে দিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে তাঁরা ভারতীয় শিক্ষাবিভাগকে একেবারে ভারতীয় করার দাবী করছিলেন। কিন্তু এই সময় দেশে রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি গেল সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হ'য়ে। তাই ভারতীয়রা চাইছিল শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত কিছু ব্যাপার ইউরোপীয় কর্ণধারগণের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের হাতে তুলে দিতে। এ-নিয়ে অবশ্য আন্দোলনের অন্ত ছিল না। এই আপোষহীন দাবী অংশতঃ পরিপূরিত হ'লো ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে, আরও বেশী অধিকার সাব্যস্ত হ'লো ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং এ-বিষয়ে পূর্ণ অধিকার পাওয়া গেল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে অবশ্য ভারতীয়দেরই একাধিপত্য বিদ্যমান। বিদেশী ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি দেশীয় খ্রীষ্টানদের হাতে তাঁদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ভার ন্যস্ত ক'রে দিচ্ছেন। শিক্ষা অধিকারে আর ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ দৃষ্ট হয় না। এদেশে বর্তমানে যত সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে তাদের অধিকাংশই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ভারতীয়দেরই হাতে। কেন্দ্রে এখন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত। রাজ্যগুলিতে শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করেন। দেশের শিক্ষাপদ্ধতি স্থিরীকরণে তাঁদের অবদানও উপেক্ষণীয় নয়। এইভাবে বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালী একটি মনোজ্ঞ রূপ পরিগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে ইংরেজী শিক্ষাধারার ইতিহাসকে আমরা একটি ঘটনাবহুল নাটকের সংগে তুলনা করতে পারি। সেই নাটকটিকে আবার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত করা

যায়। প্রথম অংক ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার সময় বা তার কিছু পূর্ব থেকে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হবার সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে সুরু ক'রে দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি একেবারে শিথিল হ'য়ে গিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারা স্ব স্ব স্বাধীন হ'য়ে পড়ছিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে সমগ্র দেশে এক ঘোর অরাজকতা বিরাজ করছিল। সেই দুর্যোগের দিনে পাশ্চাত্যের বণিক সম্প্রদায় ভারতের সুগম বন্দরগুলিতে এসে ধীরে ধীরে একটির পর একটি ব্যবসার কেন্দ্র খুলছিল। প্রথম দিকে এই সব বণিককুলের লক্ষ্য ছিল মুখ্যতঃ বাণিজ্যিক। কিন্তু কালের অগ্রগতির সংগে সংগে এদের দৃষ্টিভংগি গেল বদলে। বাণিজ্যের সুবিধার অজুহাতে এরা হয় দিল্লীর দরবার হ'তে না-হয় স্থানীয় শাসনকর্তাদের নিকট থেকে এদেশে সম্পত্তি ভোগ-দখলের অধিকার এবং সেই সংগে সামরিক অধিকার সনদ হিসাবে লাভ করছিল। বাণিজ্যের পথ অনুসরণ করে এদেশের নানাস্থানে ইউরোপীয় জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের বৈজয়ন্তী প্রোথিত হচ্ছিল। আর এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের পতাকা তলে ইউয়োপীয় শিক্ষার দেউল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল ভারতের পোতাশ্রয়-গুলিতে অথবা তাদের নিকটবর্তী স্থানগুলিতে।

ইউরোপীয় বণিকরা ভারতে যেখানে যেখানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করছিল, সে সব স্থানে নিজেদের কর্মচারীদের ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য তারা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। এগুলো অবশ্য প্রথম দিকে ছিল ইউরোপীয়; পরে অবশ্য এগুলোর মধ্যে স্থানীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা-প্রসারের ইতিহাসে ভাষার সমস্যা প্রথমেই দেখা দিয়েছিল। কোম্পানী পরিচালিত এই সব বিদ্যালয়ে প্রথমে পর্তুগীজ, পরে ফরাসী, তারপরে ইংরেজী এবং সর্বশেষে ফিরিংগি নামে এক জগাখিচুড়ি ভাষা চালু ছিল। ইউরোপীয় বণিকগণের ব্যবসায়

প্রসারের সংগে সংগে বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে শুধু ইউরোপীয়দের জন্য নয়, এদেশের কর্মচারী ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব বিভিন্ন ইউরোপীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ওপর এসে পড়ল।

ইউরোপীয় বণিক-সম্প্রদায়ের তাদের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যালয় স্থাপনের পশ্চাতে কতখানি ধর্মোন্মাদনা ছিল তা স্থির করা সুকঠিন। পর্তুগীজরা ভারতে এসেছিলেন শুধু ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তাদের মধ্যে অনেকে ধর্মধ্বজী ছিলেন। যীশু খ্রীষ্টের সুমহান বাণী ভারতীয়দের মধ্যে প্রচারের নিছক উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারক এদেশে এসেছিলেন। ভারতে যখন তাঁরা বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করলেন, তখন গোয়া, দিউ, দামন, কোচিন, হুগলী, প্রভৃতি স্থলে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এসব বিদ্যালয় স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এদেশে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বাড়ানো। এই সব বিদ্যালয়ে পর্তুগীজ এবং স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে পঠন, লিখন ও ক্যাথলিক ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়া হ'তো। পণ্ডিচেরী, মাহে, চন্দননগর, ইয়ানাম, প্রভৃতি স্থানে ফরাসী বণিকগণও অনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপন ক'রেছিলেন। ফরাসী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। এদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয় শিক্ষকরাই সেখানে নিযুক্ত হ'তেন। কিন্তু পণ্ডিচেরীতে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল, সেখানে ফরাসী ঔপনিবেশিক, সৈনিকদের সন্তান-সন্ততি ও ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এ-দেশীয় উর্ধ্বতন কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ফরাসী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। সমসাময়িক প্রামাণ্য গ্রন্থাদি থেকে আমরা ফরাসী বিদ্যালয়গুলির কার্যকারিতার কথা সবিশেষ জ্ঞাত হই। পর্তুগীজ ও ফরাসীদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মপ্রচারকগণ অতি প্রয়োজনীয় কর্মসাধন করেছেন। এই সব বিদ্যালয়ে তাঁরা যে শুধু খ্রীষ্টীয় ধর্মনীতি শিক্ষা

দিয়েছেন তা নয়। তাঁরা এঁদের শিক্ষানীতির রূপ দিয়েছেন বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। এঁদের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির পরিসীমার বাইরেও তাঁদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। সময়ে সময়ে তাঁরা অ-খ্রীষ্টানদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করতেন এবং সেই সব বিদ্যালয়ের জন্য তাঁদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ-সাহায্য করতেও কুণ্ঠিত হ'তেন না। এই সব বিদ্যালয়ে পাশের গ্রাম থেকে শিক্ষার্থীরা যোগদান করতো। এই সব ধর্মপ্রচারক অ-খ্রীষ্টান বিদ্যার্থীদিগকে কেবল বিদ্যাদান করেই ক্ষান্ত হ'তেন না। অনেক সময় এঁরা এই সব ছাত্রদের অশনভূষণের ভার নিতেন এবং এমনকি এদের বই ও শ্লেট দিয়ে সাহায্য করতেন।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ফরাসী ও পর্তুগীজদের মত অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হ'য়েছিল। কিন্তু তাহ'লে হবে কি? ভারতে এঁরা শতাধিক বৎসর ব্যবসায় বাণিজ্য করলেও, তাঁদের বাণিজ্য কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রসার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহসূচক কোন কাজ করেননি। যখন ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হ'লো তখন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের দৃষ্টিগোচর হ'লো যে ঐ এ্যাক্টে এক শিক্ষাধারা আছে যেখানে নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে যে কোম্পানীর সেনানিবাসগুলির সীমানার মধ্যে যেন যথাযোগ্য পুরোহিত রাখা এবং বিদ্যালয়াদি স্থাপনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিধান দেওয়া হ'য়েছিল কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারীদের সন্তানগণের জন্য, ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য নয়। এদেশে ব্যবসা করতে এসে প্রথম দিকে ভারতীয়গণের মধ্যে শিক্ষা বিকিরণের অনিচ্ছা কোম্পানীর পক্ষে আদৌ বিচিত্র নয়। কারণ, প্রথম দিকে কোম্পানী নিছক ব্যবসায় সমিতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁদের কাছে এদেশে বিলাতী শিক্ষাপ্রসারের আশা বাতুলতা মাত্র।

কিন্তু এদেশে ব্যবসায় ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন হ'তে লাগলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় বণিকগণের পারস্পরিক সংগ্রাম একটি পরিণতি লাভ করলো। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিযোগীতায় পর্তুগীজ, ডাচ ও ফরাসী বণিক সমিতিকে হারিয়ে দিয়ে নিজেদের একাধিপত্য বিস্তার করলো। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা ও বিহারের দেওয়ানি লাভ করলো, তখন ইংরেজ সমিতি আর কেবলমাত্র বণিক সম্প্রদায় নয়। সে তখন শাসক শ্রেণীতে হয়েছে রূপান্তরিত। এখন থেকেই কোম্পানীর উপর ভারতীয়গণের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের দায়িত্ব এসে গেল। আগে যেমন হিন্দু আমলে অথবা মুসলমান শাসনকালে শাসকবর্গ তাঁদের প্রকৃতিপুঞ্জের শাসন ব্যবস্থা করতেন, এখনও তেমন ইংরেজ শাসকগণের উপর এ দেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষা বিতরণের ভার পড়লো। কিন্তু কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী ভারতীয় ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হ'লেন না। তাঁরা ইংরেজীপন্থাকেই আদর্শ করে রাখলেন। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট যেমন তখনও পর্যন্ত ইংরেজদের শিক্ষার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেনি, এদেশে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীও তেমন ভারতীয়দের শিক্ষার কোন দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক এদেশে শিক্ষাপ্রসার ব্যাপারে দুটি নীতি বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমতঃ, কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী এবং তাদের কর্মচারীদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য ছিল। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী ভারতীয়দের শিক্ষার কোন্ প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে একেবারে অস্বীকার করছিলেন। আবার অন্য দিকে কোম্পানীর কর্মচারীরা চাইছিলেন যে কোম্পানী যেন ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের ভার নিজ স্কন্ধে বহন করে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ ধর্ম-প্রচারক ও কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যেও মতভেদ ছিল। ধর্মোন্মাদ ধর্মপ্রচারকগণ চাইছিলেন যে তাঁরা ভারতে এসে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের জীবনবেদ প্রচার করবেন।

কিন্তু কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর মনে এই আশংকা ছিল যে, ধর্মপ্রচারকগণের তীব্র উৎসাহ হয়তো ভারতীয়দের মনে বিরোধিতা জাগাতে পারে। তাই কোম্পানীয় এলাকার এঁদের প্রবেশ একদম নিষিদ্ধ ছিল বলিলেই চলে। অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পর ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হ'লে কোম্পানী এ দেশীয়দের শিক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছিল এবং এই উদ্দেশ্যে কোম্পানীর তহবিল থেকে কিছু অর্থ দিতেও কোম্পানী স্বীকৃত হ'য়েছিল। এছাড়া কোম্পানীর এলাকায় ধর্মপ্রচারকগণ যাতে পাশ্চাত্য শিক্ষার জ্ঞান ও আলো ভারতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে, সে বিষয়েও সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইউরোপীয়রা ভারতে শিক্ষাপ্রসারের জন্য কতখানি প্রয়াস করেছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে নিবদ্ধ করা হ'লো। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকগণ দক্ষিণ ভারতের গোয়া, কালিকট, প্রভৃতি স্থানে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাচ্, প্রোটেষ্টাণ্ট্ ধর্মপ্রচারকগণ সিংহলে কিছু কিছু শিক্ষাপ্রসারের পর, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিনেমার প্রোটেষ্টাণ্ট্ সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকগণ ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরভূমিতে এসে উপস্থিত হ'লেন। এই সব ধর্মপ্রচারকের পুরোভাগে ছিলেন দুই জন স্বনামধন্য ব্যক্তি যাঁদের নাম কৃতজ্ঞ-চিত্তে আমাদের স্মরণ করা উচিত। এঁদের এক জন ছিলেন Ziegenbalg এবং অপর জন হলেন Plutschou। তাঁরা এদেশে এসেই পর্তুগীজ ভাষা ও তামিল ভাষা শিক্ষা করতে লাগলেন এবং সেই সংগে ভারতীয়দের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তাঁরা বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট সংস্করণের তামিল অনুবাদ ক'রেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টানগণের মধ্যে সেই বাইবেল আজও বহুল প্রচলিত। এই সব ধর্মপ্রচারক ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের ছেলেদের জন্য ১৭টি এবং খ্রীষ্টান ছেলেদের জন্যে চারটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমোক্ত

১৭টি বিদ্যালয়ে অভিভাবকগণের ও এই সব বিদ্যালয়ে নিযুক্ত এ দেশীয় শিক্ষকগণের বিরোধিতার জন্য খ্রীষ্টীয় কোন প্রকার ধর্মশিক্ষা দেওয়া হ'তো না। তাই এই সব বিদ্যায়তন পরিচালনায় তাঁদের উৎসাহ মন্দীভূত হ'য়ে এলো। তখন তাঁরা খ্রীষ্টান বিদ্যালয়গুলির ওপর তাঁদের সমস্ত কর্মপ্রয়াস নিয়োজিত করলেন। এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম এবং ধর্মের ব্যাপার নিয়ে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হ'য়েছিল। দিনেমার ধর্মপ্রচারকগণ তামিল ভাষা শিখে নিলেন এবং এই ভাষায় শিক্ষা দিতে লাগলেন। অবশ্য শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় ও সেমিনারীগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। এসব ছাড়া তাঁরা একটি তামিল ভাষায় অভিধান এবং তামিল ও তেলেগু ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ক'রেছিলেন। এদিক দিয়ে প্রোটেষ্টান্ট্ দিনেমার ধর্মপ্রচারকগণ তাঁদের পূর্বগামী পর্তুগীজ অথবা ফরাসী ক্যাথ্লিক মিশনারীদের পদাংক অনুসরণ ক'রেছিলেন।

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের সর্বপ্রথম ইংলণ্ডের প্রোটেষ্টান্ট্ ধর্মপ্রচারকগণ মাদ্রাজে এসে অবতরণ করলেন এবং এখানকার দিনেমার মিশনারীরা যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেই কাজ তাঁরা চালিয়ে যেতে লাগলেন। মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, কুড্ডালোর, পালামকোট্টা, ত্রিচিনপল্লীতে বিদ্যালয় স্থাপিত হলো। Society for the Promotion of Christian Knowledge নামে এক সমিতি স্থাপিত হ'লো। Schulze এবং Schwartze নামে দুই পাদরী সাহেবকে শিক্ষাপ্রসারের কাজে নিয়োগ করা হ'লো। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা এলেন বাংলা দেশে এবং শ্রীরামপুরে তাঁরা তাঁদের শিক্ষাকেন্দ্র খুললেন। এতদঞ্চলের প্রায় ১০,০০০ শিক্ষার্থী তাঁদের শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হ'য়েছিল। এর কিছুকাল পরে London Missionary Society প্রথমে সিংহলে, পরে দক্ষিণভারতে এবং সর্বশেষে বাংলায় তাঁদের বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। সুরাট, আগ্রা, মীরাট, কলিকাতা,

ট্রাংকুইবার, কলম্বো, প্রভৃতি স্থানে এই সময় Church Missionary Society এবং Weslyian Mission নামে দুইটি প্রতিষ্ঠান আরও অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। বিভিন্ন এই সব মিশনারী প্রতিষ্ঠান এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কতখানি সফলকাম হয়েছিলেন সে-বিষয় যতখানি না গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল অন্য একটি ব্যাপার যে এই সব প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা-বিকিরণের কাজে সরকার-পক্ষকে প্রভূত পরিমাণে উৎসাহিত করেছিল। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদস্যদের সমধর্মী মিশনারীদের ক্রিয়াকর্মে সরকারী পক্ষ অথবা এ-দেশীয়দের তেমন কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁরা যদি অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের হতেন তা হ'লে কি সরকারী পক্ষ কি ভারতীয়দের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতেন! কিন্তু ধর্মসম্প্রদায় পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার মান উন্নত হওয়ায় এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হওয়ায় এই সব বিদ্যালয় বেশী দিন যেতে না যেতে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। বিশেষ করে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের বিদ্যালয় এবং গোয়া ও ট্রাংকুইবারের মিশনারী বিদ্যালয়গুলো যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। মিশনারীদের কর্মে উৎসাহিত হয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁদের পন্থা অনুসরণ করবার জন্য প্রয়াসী হ'লেন। অবশ্য ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মচারীরা ভারতীয়দের প্রতি সপ্রেম ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ হ'ননি, যতখানি হয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের স্বার্থ পরিপূরণে। এদেশের উচ্চ বংশের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিতরণের জন্য তাঞ্জোরের রেসিডেণ্ট স্বুলিভ্যান সাহেব কোম্পানীর নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ ক'রেছিলেন। মিশনারী Schwartze এই পরিকল্পনাটিকে প্রকৃষ্ট রূপ দেবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াসী হ'য়েছিলেন। এই সময়ে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর 'বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্' এই পরিকল্পনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁরা এই সব

বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিকে বাৎসরিক একশত পাউণ্ড অর্থসাহায্য করবেন ব'লে স্বীকৃত হ'লেন। তাঁরা নির্দেশ দিলেন যে এই সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী, অংক, তামিল, হিন্দি অথবা হিন্দুস্থানী এবং খ্রীষ্টান ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। মিশনারীদের আগ্রহাতিশয্যে শেষোক্ত বিষয়টি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছিল। কিন্তু কোম্পানীর বিরোধিতার ফলে এই বিষয়টি কেবলমাত্র বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদ পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'য়ে রইলো।

কোম্পানীর কর্ণধারগণ শীঘ্রই অনুভব করলেন যে এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করতে পারবেন এবং এইভাবে তাঁরা ভারতীয়দের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। তাই তাঁরা ধীরে ধীরে অধিক-সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করতে লাগলেন এবং বিদ্যালয়গুলিকে অধিক পরিমাণে অর্থসাহায্য করতে লাগলেন। হিন্দু সমাজের উচ্চতম বর্ণের ব্রাহ্মণদের ছেলেরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে কোম্পানীর অধীনে কেরাণীবৃত্তি আরম্ভ করে দিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরনের বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কোম্পানীর ব্যয়ে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করলেন। এই মাদ্রাসায় আরবী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। এখানে প্রাকৃত দর্শন, কোরাণের ধর্ম, ব্যবহারবিদ্যা, জ্যামিতি, অংক, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, ইত্যাদি বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। কিন্তু অতি সামান্য সংখ্যক মুসলমান শিক্ষার্থী এই বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই মাদ্রাসাকে সংরক্ষণ মানসে বৎসরে ত্রিশ হাজার টাকা দেবার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মাদ্রাসার জন্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে আর একটি নূতন বাড়ী নির্মিত হ'ল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৯ জনে এবং এদের সবাই মাসিক কিছু কিছু বৃত্তি পেতো।

হিন্দু প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যাতে হিন্দুদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভাবধারা উত্তমরূপে বিকীর্ণ হ'তে পারে তদুদ্দেশ্যে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করান। জোনাথন ডাংকান নামে যে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এই সংস্কৃত কলেজ নির্মাণ ক'রেছেন, তিনি বলেছেন যে এই কলেজ স্থাপনের পশ্চাতে ইংরেজদের এক গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য হ'ল এই যে এদেশে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে যাতে হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের যথাযোগ্য ব্যাখ্যাতা পাওয়া যায় তার সম্যক ব্যবস্থাদি করা। বারাণসীর হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এ-দেশীয় যুবকগণ সেই উদ্দেশ্য সংসাধনে সমর্থ হবে। বারাণসীর এই কলেজে মনু-প্রবর্তিত ব্যবহারশাস্ত্র পড়ানো হ'তো। কলিকাতার মাদ্রাসার ন্যায় এই কলেজকে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে একটি তত্ত্বাবধায়ক সমিতির অধীনে আনা হ'লো। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে বারাণসীর হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৭৭ জন এবং এদের ২৪৯ জন ছিল ব্রাহ্মণ আর ২৮ জন ছিল ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর। এই বিদ্যালয় বৎসরে ২০,০০০ টাকা সরকারী সাহায্য পেতো। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পরবর্তী শাসনকর্তা লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে কোম্পানীর অধীনস্থ বড় বড় চাকুরেদের জন্য অন্য ধরনের একটি কলেজ সংস্থাপিত হ'য়েছিল। এখানকার শিক্ষার্থীরা ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা, হিন্দু ও মুসলমানদের আইন-কানুন, ভারতের ইতিহাস, ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করতো। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি একটু বিশেষ ধরনের ছিল বলেই ভারতে ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের ইতিহাসে এর স্থান ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়; যদিও এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বিবর্তনে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক হ'য়েছিল।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে মিশনারীরা এদেশে যে-সব অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ক'রেছিলেন তাদের সম্বন্ধে এখানে দু'চার কথা

বললে তা কিছু অপ্রাসংগিক হবে না। এই সব বিদ্যালয় অবশ্য কোম্পানী থেকে প্রায় আর্থিক সাহায্য পেতো। এই সব বিদ্যালয় অবশ্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ইউরোপীয় সৈনিকদের পরিত্যক্ত অনাথ বালকদের জন্য এই সব বিদ্যালয় স্থাপিত হ'য়েছিল। তৎকালে ইউরোপীয় জনসাধারণের প্রধান আবাসস্থল কলিকাতায় এই ধরনের তিনটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাংগ্লিকান মিশনারীরা ইংলণ্ড থেকে সংগৃহীত অর্থে 'ক্যালকাটা চ্যারিটেবল্ স্কুল' স্থাপন করেছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি কোন রকমে টিম টিম করে চলেছিল। কয়েকটি মাত্র পরিত্যক্ত ছাত্রদের জন্য এখানে প্রচুর অর্থব্যয় করা হ'তো। এরপর থেকে এই বিদ্যালয়টি একটি বোর্ডের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তারপর থেকে আজও পর্যন্ত এই বিদ্যালয় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালকবালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ ক'রে আসছে। এখন এই বিদ্যালয়টি দুটি শাখায় বিভক্ত—একটির নাম 'ক্যালকাটা বয়েজ্ স্কুল' অপরটির নাম 'ক্যালকাটা গার্লস্ স্কুল'। ১৭৮৯ সালে 'ফ্রি স্কুল' সোসাইটি 'ফ্রি স্কুল' নামে অন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এখন এই স্কুলের আর ঐ নাম নেই; এর নাম হয়েছে 'সেন্ট্ টমাস্ স্কুল'। এখানে এখনো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেরা লেখাপড়া শেখে। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা 'বেনেভোলেন্ট ইনষ্টিটিউশান' নামে আর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এখানে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালকবালিকারা শিক্ষালাভ করতো।

ভারতীয় বর্তমান শিক্ষা ইতিহাসের দ্বিতীয় অংকের সূচনা হয়েছিল ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৮৫৪ সালে উড্ সাহেবের ডেস্‌প্যাচে। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ স্বার্থ-সংঘাত ঘটেছিল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ পরীক্ষামূলক ক্রিয়াকর্ম সংসাধিত হয়েছিল। এই অংকের মধ্যে দুটি বিরুদ্ধমুখী চিন্তাধারার সংঘাত সবিশেষ লক্ষ্যণীয়।

এদের একটি ভাবধারার মুখপাত্র ছিলেন লর্ড মেকলে। এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার স্থলে পুরোপুরি ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তিনি চাইছিলেন এদেশে এমন একটি মানব-শ্রেণী সৃষ্টি করতে যারা কেবল দৈহিক বর্ণে এবং শোণিতে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মতবাদ, নীতিজ্ঞান এবং বুদ্ধিতে হয়ে উঠবে একেবারে ইংরেজ। মিশনারীরা এই চিন্তাধারার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। তাঁদের অবশ্য মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার। কোম্পানীর অধীনে অল্প বয়স্ক তরুণ কর্মচারীরাও মেকলে সাহেবের মতবাদকে পূর্ণরূপে সমর্থন করতেন। এই সব তরুণ ইংরেজ কর্মচারীরা ইংলণ্ডের রোমাণ্টিক পুনরুজ্জীবনের ভাবধারায় ভাবিত বলে এদেশের যা কিছু পুরাতন, যা কিছু যুগ-জীর্ণ তা সব কিছুকে বিদূরিত করে তার স্থলে যা কিছু নবীন, যা কিছু সম্ভাবনাময় তাকে প্রবর্তন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। আবার অন্যদিকে রক্ষণশীল ভাবধারার সমর্থকগণ চাইছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষাপদ্ধতির এক অপূর্ব সমন্বয় সংসাধন করতে। এই দলে ছিলেন কোম্পানীর প্রাচীন কর্মচারী-গণ। এঁরা ওয়ারেণ হেষ্টিংস, মিণ্টোপ্রমুখ নেতৃবৃন্দের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত ছিলেন। যে সমস্ত ভারতীয় শিক্ষাপ্রসার বিষয়ে একটু-আধটু মনোযোগ দিতেন, তাঁরাও এই শেষোক্ত দলের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এই শেষোক্ত দল আবার কয়েকটি উপদল সৃষ্টি করেছিলেন নিজেদের মধ্যে। একটি উপদল বাংলায় তাদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। বাংলার উপদলের সমর্থকরা বিশ্বাস করতেন যে প্রতীচ্যের জ্ঞানগরিমা ও বিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাধারার সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হতে পারে ; কিন্তু তা করতে গেলে এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যময় ভাষাকে করে তুলতে শিক্ষার হবে প্রধান বাহন। আর একটি শাখার কেন্দ্র ছিল বোম্বাই প্রদেশে। এই শাখার পৃষ্ঠ-পোষকরা বিশ্বাস করতেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাধারার

অপূর্ব মিলন ঘটাতে গেলে প্রতীচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান তো এদেশে প্রচার করতেই হবে। কিন্তু সেই প্রচারের বাহন হবে স্থানীয় কথ্য ভাষা অথবা প্রাদেশিক কথ্য ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে গেলে ভারতের প্রাচীন ভাষাগুলির অনুশীলন একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এ দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রসার বিষয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ কোন একটা বিশেষ নীতি যে মেনে চলতেন তা নয়। কিন্তু কোম্পানীর কতিপয় মুখ্যস্থানীয় ব্যক্তির প্রভাবে কোম্পানী প্রাচ্য বিদ্যার সমর্থন-নীতি গ্রহণ করেছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই আরবী, ফারসী অথবা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রাচ্য ভাষার অনুশীলনে তাঁরা সম্যক বুঝতে পারলেন যে এই সব ভাষার মধ্যে নিহিত রয়েছে অমূল্য সম্পদ। এই নীতি গ্রহণের পক্ষে একটি যুক্তিও ছিল। এঁরা ভেবেছিলেন যে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা এদেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীর লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন। অতএব যদি শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেই হয় তাহ'লে প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য কোম্পানীর অর্থব্যয় করাই যুক্তিযুক্ত এই মনোভাব নিয়েই কোম্পানীর তদানীন্তন কর্তৃপক্ষস্থানীয়রা শিক্ষাক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই নীতি অনুসরণ ক'রে সরকারী পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরবী, ফারসী অথবা সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়াস চলছিল। লর্ড আমহার্ষ্টের শাসন-কালে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করবার কথা উঠে। কিন্তু রাজা রামমোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বিরোধিতায় প্রস্তাবটি রূপায়িত হবার সুযোগ পেল না। এই সময় থেকে এক আন্দোলন বেশ দানা বেঁধে উঠলো। যাঁরা ছিলেন সংস্কৃত, আরবী অথবা ফারসীর অনুরাগী তাঁরা এক পক্ষ গ্রহণ করলেন। প্রথমে অবশ্য এই দলই ছিল সংখ্যাগুরু। বিরুদ্ধদলের সমর্থকরা

চাইছিলেন যে সরকার অগ্রণী হয়ে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ও প্রসার করুক এবং এই সময়ই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময়। কালের অগ্রগতির সংগে সংগে বিরুদ্ধ দলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। যখন দুই দলে সংঘর্ষ চলেছে তখন সেই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন লর্ড মেকলে। তখন বেন্টিঙ্ক ছিলেন এদেশের গভর্ণর জেনারেল, আমাদের ভাগ্যের নিয়ামক।

শিক্ষাপ্রসার ব্যাপারে তখন দেশে যে আন্দোলন চলছিল, তাতে কয়েকটি বিষয় ছিল লক্ষ্য করবার মত। প্রথমত, ধরা যেতে পারে, নবপ্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তির মনে একটা বেশ স্পষ্ট ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছিল। এ-বিষয়ে তাঁদের অবশ্য কোন মতদ্বৈধ ছিল না। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে আমাদের দেশের দর্শন ও ন্যায়ের চুল-চেরা বাকবিতণ্ডায় সময় কাটালে আমাদের চলবে না; প্রতীচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের রত্নগর্ভ ভাণ্ডার আমাদের দেশের জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে হবে। কিন্তু তা করতে গেলে তাঁদের পথ তো সমস্যাকীর্ণ হ'বেই। জনসাধারণের নিকট সেই রত্নভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে গেলে কোন ভাষার মাধ্যমে তা করা উচিত—বিদেশী ইংরেজী ভাষা, না প্রাচীন সংস্কৃত, আরবী অথবা ফারসী ভাষা, না প্রাদেশিক কথ্য ভাষা? সকলের কাছে যেন একটি বিষয় অবধারিতই ছিল যে এদেশের প্রাদেশিক কথ্য ভাষায় পাশ্চাত্যের জ্ঞানগরিমার অনুপরমাণুও বোধ হয় আমাদের দেশে জনসাধারণের দ্বারে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। তাই তখনকার চিন্তাশীল মনীষীরা ধরে নিয়েছিলেন যে এই কাজটিকে সহজ ও সুন্দর ক'রে তুলতে গেলে তা শুধু সম্ভব হবে হয় ইংরেজী নয় আরবী, নয় ফারসী, নয় সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে।

এই সময়ে আর একটি ব্যাপারও বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করার ছিল। এই ব্যাপারে বিদেশী শাসকশ্রেণী এবং এ-দেশের মুখ্যস্থানীয়রা প্রায় একমত ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে যদি এ-দেশে

পাশ্চাত্য শিক্ষার উদার আলোক বিকিরণ করতে হয়, তা'হলে তা প্রথম করতে হবে উচ্চবর্ণের লোকেদের মধ্যে। উচ্চবর্ণের লোকেদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাবধারা বিকীর্ণ হ'লে কালক্রমে সেই শিক্ষা অন্যান্য শ্রেণীর মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে সর্বশেষে নিম্নশ্রেণী অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এই মতবাদ আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাধারার ইতিহাসে 'Filtration Theory' নামে খ্যাত। এই মতবাদের সমর্থকরা বলেন শিক্ষাপ্রসারের প্রারম্ভিক স্তরে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের দিকে মনোযোগ অথবা দৃষ্টি দেবার কোন সার্থকতা নেই। প্রথম দিকে উচ্চবর্ণের লোকেদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করতে হয়, তারপর প্রকৃতির অলংঘ্য নিয়মে সেই শিক্ষাধারা আপনা হতেই জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারলাভ করে।

দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের পক্ষে এই সময় আমাদের দেশে কয়েকটি সমর্থনকারী দলের সৃষ্টি হ'য়েছিল। প্রতিটি দলের অনুসৃত পন্থার পশ্চাতে সমর্থনযোগ্য যুক্তিও ছিল। বিদেশী ধর্মপ্রচারকগণ ভেবেছিলেন যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বহুল প্রচলন হ'লে তাঁদের ধর্মপ্রচারের সুবিধা হবে। তাই তাঁরা ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন রায় প্রমুখ এদেশের নেতৃস্থানীয়রা ভেবেছিলেন, আমরা যদি আমাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চাই, তাহ'লে এদেশে নব্য শিক্ষার প্রবর্তন একান্ত আবশ্যক। এই অভিলাষ নিয়েই তাঁর মত ব্যক্তিগণ ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কলিকাতার আশেপাশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আর একটি দল সৃষ্টি ক'রেছিলেন। তাঁরা নিজেদের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করবার জন্য ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের কামনা করছিলেন। সরকারী পক্ষও ধীরে ধীরে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন যে এদেশীয় ব্যক্তিগণকে তাঁরা যদি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারেন, তাহ'লে

তাঁদের শাসনকার্য চালাতে স্বল্প বেতনের অনেক মসিজীবী জুটবে। আর তা ছাড়া ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের সাহায্যে বিদেশী শাসকশ্রেণী নিজেদের অধিকার এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

সরকারী পক্ষ যখন তাঁদের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কোনরূপ স্থিরনিশ্চয় হ'তে পারছেন না, তখন মেকলে সাহেব এদেশে এলেন এখানকার আইনসচিব হয়ে। তাঁরই উপর সরকারী শিক্ষানীতি স্থিরীকরণের ভার অর্পিত হ'লো। তদানীন্তন ভারতের শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে মেকলে সাহেব এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লিখে সেই সময়কার বড়লাট বেন্টিংকের সম্মুখে উপস্থাপন করলেন। এই মন্তব্যে মেকলে সাহেব আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবশ্য তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে ইংরেজীর সাহায্যে প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারই হবে এখন থেকে সরকারী শিক্ষানীতির চরম ও পরম লক্ষ্য। এদেশে শিক্ষাপ্রসারে পরিস্রুতি-নীতি অপরিবর্তিত রয়ে গেল। বেন্টিংক মেকলের পক্ষ সমর্থন করলেন। সরকারী শিক্ষানীতি স্থিরীকৃত হয়ে গেল। সরকারী সমর্থনলাভ করলো নবতম শিক্ষাব্যবস্থা। এখন থেকে অন্ততঃ অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এই নীতির অগ্রগতি রইলো অব্যাহত।

এই প্রকারে আমাদের দেশে যখন ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি প্রোথিত হচ্ছিল, তখন সরকারী পক্ষের সম্মুখে দুটি পথ ছিল উন্মুক্ত। তাঁরা ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রতীচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার ভারতীয়দের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করতে পারতেন; অথবা এদেশের চিরাগত শিক্ষাব্যবস্থার সংগে কোন প্রকার সম্পর্ক না রেখে নবতম ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থাকে এদেশে কায়েমী করতে পারতেন। প্রাচীন পাঠশালাগুলির সংস্কারসাধন করে তাদেরই সাহায্যে ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজ বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্প শ্রমসাধ্য হ'তো এবং এরই ভেতর দিয়ে ভারতীয়দের সহানুভূতিলাভে সমর্থ হ'তো সরকারী

পক্ষ; আর তাছাড়া এই পন্থা অবলম্বন করলে এদেশের চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতি অব্যাহত থাকতো। সেই সংগে শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেতো। এই সময়ই অ্যাডাম সাহেব বড়লাট বেন্টিংকের নির্দেশে তাঁর সুবিখ্যাত বিবরণী প্রস্তুত করছিলেন। তাঁর পুংখানুপুংখ বিবরণ ও সন্ধানী তথ্যাদি দ্বারা সেই সময়ে প্রচলিত সরকারী পরিস্রুতি-নীতির অসারতা প্রতিপন্ন ক'রেছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালা, টোল, মাদ্রাসা, প্রভৃতি ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে সুসংস্কৃত করে তাদেরই সাহায্যে কি প্রকারে প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতীয়দের নিকট সহজলভ্য করে তুলতে পারা যায় তার ইংগিত দিয়েছিলেন অ্যাডাম সাহেব। কিন্তু সরকারী পক্ষ তাঁর নির্দেশের দিকে কোন প্রকার মনোযোগ দিলেন না। এদেশের চিরাচরিত শিক্ষাপ্রণালীকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের উপর নব্য শিক্ষার সৌধ গঠন করবার সংকল্প গ্রহণ করলেন সরকারী পক্ষ। কিন্তু দেশের পক্ষে এর ফল আদৌ মংগলদায়ক হ'লো না। শিক্ষাকৌলীন্যই সামাজিক সম্মানের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ালো। সমগ্র দেশ যেন দুইটি শ্রেণীতে হয়ে গেল বিভক্ত—একদল হ'লেন ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অপরদল হ'লো ইংরেজী শিক্ষাবঞ্চিত। এতদিন যাঁরা প্রাচ্য বিদ্যায় ছিলেন জ্ঞানবৃদ্ধ, তাঁরাই ছিলেন সমাজের বরেণ্য ও শীর্ষস্থানীয়। এখন তাঁরা আর তাঁদের আসনে সমাসীন থাকতে পারলেন না। নব্য শিক্ষিতের দল এখন দেশপূজ্য হয়ে উঠলেন। ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রগত জীবনে ধীর অথচ অবিচলভাবে এক যুগান্তকারী বিপ্লবের ইংগিত দেখা যাচ্ছিল। উপর থেকে চাপানো এই নবতম শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জাতীয় জীবনে কোন স্পন্দন জাগাতে পারলো না। জনসাধারণের মনে অসন্তোষ বহ্নি ধূমায়িত হ'য়ে উঠছিলো। জনসাধারণের দাবী উপেক্ষিত হয়ে রইলো।

ভারতের বর্তমান শিক্ষাধারার ইতিহাসের তৃতীয় অংকের যবনিকা উত্তোলিত হ'লো ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উড্ সাহেবের ডেস্প্যাচ প্রকাশিত হবার সংগে সংগে এবং এই অংকের পরিসমাপ্তি ঘটলো বিংশ শতাব্দীর ঠিক সূচনায়। এই অধ্যায়ে দেখা যায় যে ভারতীয় বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি বহুলাংশে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে গেল। যা কিছু ভারতীয় তা যেন কোথায় বিলীন হয়ে গেল। কিন্তু এই শিক্ষাবিতরণের ব্যবস্থাপকগণ ভারতীয়ই রয়ে গেলেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর যখন বেন্টিংকের শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়ে গেল, তখন অবশ্য ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হতে লাগলো। এদেশের প্রতি জেলায় সরকারী পক্ষ থেকে জেলা স্কুল খোলা হলো। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সরকারী তহবিল থেকে যে সব টাকা শিক্ষাবাবদে ব্যয়িত হয়েছে তার বেশীর ভাগই ব্যয়িত হয়েছে এই সব জেলা স্কুলের পশ্চাতে অথবা কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্যে। ইংরেজী শিক্ষা-প্রসারের ব্যাপারে দেশের লোকের মনে এমন এক অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিল যে মনে হতে লাগলো যেন দেশ থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা বুঝি লোপ পেয়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা-জীবনের প্রাথমিক স্তরেই দেশীয় আক্ষরিক জ্ঞানের সংগে ইংরেজী বর্ণমালা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে লাগলো। নবপ্রবর্তিত এই শিক্ষাধারার চাহিদা এমত বর্ধিত হলো যে প্রথম যেদিন হুগলী কলেজ খোলা হ'য়েছিল, সেদিনই সেই কলেজের প্রবেশার্থীদের আবেদন পত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২০০ এর কাছাকাছি। বহু প্রার্থীকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার অর্থকরী দিকটার কথা সকলেই বেশ ভালভাবে বুঝেছিল। তাই ইংরেজী বিদ্যালয়ের চাহিদা বাড়তে লাগলো। চাহিদার তুলনায় যে সব বিদ্যালয় স্থাপিত হ'তে লাগলো, তাদের সংখ্যা অতি অল্পই বলে প্রতিপন্ন

হ'লো। এইভাবে সমস্যাকুটিল পথে আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার যাত্রা হ'লো সুরু। সমস্যা অবশ্য আজও বিদূরিত হয়নি।

এই সময় এক বেশ মজার ব্যাপার ঘটলো। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট নব্য শিক্ষা প্রসারে উৎসাহ দেবার জন্য এক ঘোষণা জারি করলেন যে যারা সরকারী বিদ্যালয় হ'তে উত্তীর্ণ হবে, তাদের মধ্য থেকে যোগ্যতা অনুসারে সরকারী রাজকর্মচারী নিযুক্ত হবে। এই ঘোষণার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার উৎসাহ এবং আগ্রহ বহুলপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লো। কিন্তু এর ফল ভাল হ'লো না ; কারণ, ইংরেজী শিক্ষা অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত হলো। চাকুরী লাভ বা অর্থ-লাভ হয়ে দাঁড়ালো শিক্ষার চরম এবং পরম লক্ষ্য, জ্ঞান পড়ে রইলো দুয়োরানীর মত উপেক্ষিত হয়ে।

এদিকে কোম্পানীর সনদ নতুন করে নেবার সময় এসে গেল। তাই ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আর একবার বিশদ আলোচনা হ'য়ে গেল। এই আলোচনার ফলে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী পরিচালক-মণ্ডলীর পক্ষ থেকে সার চার্লস উড্ ভারতীয়দের শিক্ষাবিষয়ে এক নির্দেশনামা ভারত সরকারের নিকট পাঠালেন। এই বিধানপত্রের নির্দেশানুসারে এখন থেকে ভারত সরকার তার শিক্ষানীতি পুনর্গঠিত করে নেবেন। আমাদের দেশে উত্তরকালে শিক্ষাক্ষেত্রে যা কিছু সংসাধিত হয়েছে তার মূলে ছিল উড্ সাহেবের এই বিধানপত্র। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় উড্ সাহেবের শিক্ষাবিষয়ক এই নির্দেশনামা ভারতের বর্তমান শিক্ষাধারার গোড়াপত্তন করেছিল।

ভারতে বর্তমান শিক্ষাধারার ইতিহাসে উড্ ডেস্প্যাচ্ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে বসে আছে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বস্তরের সব সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল এই

ডেস্‌প্যাচ্ এবং সেই সব সমস্যা সমাধানের ইংগিতও ছিল উড্ সাহেবের এই নির্দেশনামায়। এদেশে যাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যাতে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাবিভাগ গঠিত হয় তার স্পষ্ট নির্দেশ হয়েছিল উড্ সাহেবের ব্যবস্থাপনায়। এই ডেস্‌প্যাচেই সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয় এদেশে প্রাথমিক ও লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং মাতৃভাষা অনুশীলনের আবশ্যকতা। বিদ্যার্থীদের বৃত্তিশিক্ষা এবং শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থারও উল্লেখ ছিল এই ডেস্‌প্যাচে। এতদিন সরকারী প্রচেষ্টাই ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে বলবতী। কিন্তু উড্ সাহেবের বিধানপত্রে বেসরকারী শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াসকে উৎসাহিত করবার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি স্থির ক'রে দেওয়া হলো। বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারী আর্থিক সাহায্যদাননীতি হ'লো প্রবর্তিত। এদেশে শিক্ষাবিস্তারের কর্মে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অগ্রণী হ'য়ে এলে তাদের কার্যে উৎসাহিত করবার জন্য যথাযোগ্য অর্থসাহায্য করা হবে এই আশ্বাস দেওয়া হলো। এমনকি এও পর্যন্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে যদি বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো এদেশে শিক্ষাপ্রসারে সন্তোষজনক কাজ করে তাহলে ধীরে ধীরে সরকারী শিক্ষায়তনের ব্যবস্থাপনার ভার সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হস্তেই সমর্পণ করা হবে। এহেন ক্ষেত্রে সরকার পক্ষ থাকবে অন্তরালে ; সরকার পক্ষ শুধু প্রয়োজনমত এবং সংগত পরিমাণ অর্থসাহায্য ক'রেই শিক্ষাপ্রসার কর্মে নিরত থাকবেন। সরকারী পক্ষ থেকে এরূপ নীতি অবলম্বনের অর্থ হ'লো এই যে ভারতীয়রা দেশের শাসন ও শিক্ষা ব্যাপারে সরকারী পক্ষের সংগে অধিক পরিমাণে সহযোগিতা করে। আদর্শের দিক দিয়ে পন্থাটি যে অতি উত্তম ছিল সে কথা সবাই স্বীকার করবে। প্রকৃতপক্ষে উড্ সাহেবের শিক্ষাবিষয়ক এই বিধানপত্র রচিত হ'য়েছিল উদারপন্থী আদর্শবাদের ভিত্তিতেই।

এই বিধানপত্রের নির্দেশানুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে

স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগ হলো প্রতিষ্ঠিত এবং এই সব শিক্ষাবিভাগের পুরোধা হয়ে রইলেন এক একজন "ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌সান"। এই বিধানপত্রে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয়রা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। বাংলাদেশে তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় "মডেল" বিদ্যায়তন স্থাপন করে এ-দেশীয় প্রাচীন পাঠশালা ব্যবস্থাকে সুসংস্কৃত ক'রে তার মধ্যে নবতম প্রাণস্পন্দন সঞ্চার করবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। অ্যাডাম্ সাহেবনির্দেশিত পথে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার ও পুনর্গঠনের চেষ্টা সরকারী পক্ষ থেকেও কিছু কিছু হয়েছিল। কিন্তু কোথায়ও আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। এই বিফলতার কারণের জন্য সরকারপক্ষকেই দোষী সাব্যস্ত করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষা এবং জনশিক্ষা বিষয়ে ভারত সরকার যে খুব বেশী সচেতন ছিলেন এমন নয়; বরং এ বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট ঔদাসীন্য এবং সহানুভূতির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ডেস্‌প্যাচে প্রাথমিক শিক্ষা এবং লোকশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেবার নির্দেশ থাকলেও সরকার পক্ষের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল উচ্চশিক্ষার প্রতি; তাই তাঁদের মনোযোগ ও প্রয়াস সেদিকেই ছিল কেন্দ্রীভূত। সরকারী পক্ষ এখনও পরিস্রুতি-নীতির উপর বিশেষভাবে আস্থাশীল ছিলেন।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন উড্ ডেসপ্যাচের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এতদিন দেশে উচ্চ ও মধ্যশিক্ষার একটা প্রকৃষ্ট রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা অথবা মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কোন কোন বিদ্যার্থীকে সরকারী কাজে যথোপযুক্ত বিবেচনা করা যাবে তার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাই এই সব শিক্ষার্থিগণকে পরীক্ষা করে তাদের যোগ্যতার তারতম্য নির্ধারণের একটা মাপকাঠির উপযোগিতা অনুভব হচ্ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করে তুলতে গেলে পক্ষপাতশূন্য এমন

একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন যার উপর সবাই নির্ভর করতে পারে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীতা সবিশেষ অনুভূত হলো। উড্ ডেসপ্যাচের কয়েক বছর আগে কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা উঠেছিল। কিন্তু কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু উড্ সাহেবের প্রস্তাবানুযায়ী কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা উঠলো। স্থির হলো এই বিশ্ববিদ্যালয় তিনটির উদ্দেশ্য হবে পরীক্ষা গ্রহণ এবং উপাধি বিতরণ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে কৃতী বিদ্যার্থীদের মধ্যে উপাধি বিতরণ করা। উড্ ডেস্প্যাচে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপনার বন্দোবস্তের কথা গৌণভাবে উল্লিখিত ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপনার ব্যবস্থাদি ছিল না। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মূল্য ছিল অনেকখানি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রাপ্ত উপাধিগুলিই ছিল সরকারী চাকুরিলাভের একমাত্র ছাড়পত্র। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তিদের সরকারী পদের অভাব ঘটতো না। পরীক্ষায় অকৃতকার্য ব্যক্তিরা সহজে কোন সরকারী পদলাভে অসমর্থ হতো। আমাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে নিছক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য নিয়ে সে যুগে কোন বিদ্যার্থী লেখাপড়া করতো কিনা সন্দেহ। বিদ্যালাভই যেন অর্থলাভের একমাত্র পথ বলে বিবেচিত হলো। অর্থই হ'লো তখন উচ্চশিক্ষার মাপকাঠি। প্রকৃত জ্ঞান, যথার্থ বিদ্যা পড়ে রইলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরের অন্তরালে; আর অর্থলাভ হ'য়ে দাঁড়ালো শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ্য।

এই সময় উচ্চশিক্ষার একমাত্র বাহন ছিল ইংরেজী ; ইংরেজী ভাষাতেই আবার পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে হতো। প্রথম দিকে

মাতৃভাষা পরীক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হ'তো এবং তার পরীক্ষা নেবারও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কয়েক বছর পরে এই প্রথা রহিত হয়। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়-বস্তুর মধ্যে মাতৃভাষার কোন স্থান ছিল না। মাতৃভাষার অনাদর তখন যেন উচ্চশিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পঠিতব্য বিষয় যেমন অংক, ইতিহাস, ভূগোল, ইত্যাদি সব কিছুই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই শিখতে হতো। মনস্তত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে এই পদ্ধতিকে কোন প্রকারেই সমর্থন করা যায় না। কারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপথ বাধাবহুল হ'য়ে দাঁড়াতো। দু'টো দুস্তর বাধাকে শিক্ষার্থীদের অতিক্রম করতে হতো। প্রথমে ছিল বিষয়প্রবেশের বাধা; দ্বিতীয়ত, ছিল বিদেশী একটা ভাষা শিক্ষার বাধা। এতে শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম দ্বিগুণ হ'তো। তাই শিক্ষাকে অল্পায়াসলভ্য করবার উদ্দেশ্যে এবং সহজে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পথকে এড়িয়ে স্মৃতিশক্তির অনুশীলনের দিকেই বিদ্যার্থীদের সহজ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বিদ্যার্জন শ্রম যাতে লঘু হয় সেদিকে পুস্তক-কাররা দৃষ্টি দিলেন বেশী। ফলে অর্থ-পুস্তক বাজার ফেললো ছেয়ে। নকল এসে আসলের স্থান জোর করে কেড়ে নিল।

উড্ সাহেবের শিক্ষাপদ্ধতিতে অন্য একটি ত্রুটি বিশেষ করে লক্ষ্য করবার ছিল। এই শিক্ষায় বিদ্যার্থীরা কেবল পুঁথিগত শিক্ষালাভ করতো। এই শিক্ষার সংগে বাস্তব জীবনের কোন যোগাযোগ ছিল না। এই শিক্ষা নিছক জ্ঞানমুখী ছিল বলে একে কর্মমুখী করে তোলার প্রয়াস করা হয়নি তখন। সব দেশেই বেশীর ভাগ লোকই হয় কর্মী; হাতেকলমে কাজ করে তারা তাদের জীবিকানির্বাহ করে। এই শ্রেণীর লোক পুঁথিগত বিদ্যার ধার ধারে না। সুতরাং জনসাধারণের শিক্ষা মুখ্যতঃ ব্যবহারিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যবহারিক শিক্ষা যে সব সময় বৃত্তিমূলক হবে এমন কোন কথা নেই। তবে অধিকাংশ বৃত্তিশিক্ষার মূলে আছে ব্যবহারিক শিক্ষা।

হাতেকলমে কাজ শেখার মধ্য দিয়ে বিদ্যার্থীরা যে জ্ঞান অর্জন করে, পুস্তকের সাহায্যে তত অল্পায়াসে তা কখনও সম্ভব হয় না। তাই প্রগতিশীল দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী করার প্রয়াস হয়েছে, বিদ্যালয়গুলিকে সমাজদেহ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন না করে তাকে বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ করার প্রয়াস করা হয়েছে। উড্ সাহেবের বিধানপত্রের নীতি অনুসারে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একটা প্রকৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করলো বটে, কিন্তু তার মধ্যে ব্যবহারিক শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার ফলে ইংরেজী শিক্ষাই খানিকটা বৃত্তিমূলক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কোন-না-কোন বৃত্তির ব্যবস্থা সে কালে হয়ে যেতো। একটা বিদেশী ভাষা আমাদের দেশের শিক্ষার বাহন হওয়ার ফলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীনতার অবকাশ ছিল না। শিক্ষা-ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপকগণ দেশোপযোগী ও ছাত্রোপযোগী পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করতে পারতেন না; আর তাছাড়া শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের কোনপ্রকার স্বাধীনতা ছিল না। তাই আমাদের দেশের তৎকালপ্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা নিছক জ্ঞানমুখীই রয়ে গেল। তাকে কর্মকেন্দ্রিক ও জীবনানুগ করে তোলার প্রয়াস প্রথমদিকে পরিলক্ষিত হয়নি।

উড্ সাহেবের ডেস্‌প্যাচ্ যে বৃত্তিশিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একেবারে নীরব ছিল এ-কথা বললে খানিকটা ভুল করা হবে। ডেস্‌প্যাচে আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রভৃতি শিক্ষার উল্লেখ অবশ্য ছিল। কিন্তু এ-সব বৃত্তি তো সর্বসাধারণের বৃত্তি নয়; এগুলো হ'লো তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেদের জন্য, অর্থাৎ ভদ্রলোকদের জন্য। এই ডেস্‌প্যাচের অনেক আগেই ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে দেশে আইন-শিক্ষার ব্যবস্থাদিও করা হ'য়েছিল। সরকারী পূর্তবিভাগের কাজের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেবার বন্দোবস্তও করা হ'লো।

কিন্তু এ-সব বৃত্তির পরিসর ছিল সীমাবদ্ধ। তখন আমাদের দেশের অবস্থা এমন ছিল না যে এই সব বৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করা যায়। আইন ব্যাপারে অবশ্য সে অবকাশ ছিল। কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যায় অথবা ইঞ্জিনিয়ারিংতে স্বাধীনভাবে কাজ করার মত অবস্থায় দেশ তখনও পৌঁছয়নি। তাই এই দুই ক্ষেত্রে চাকুরি করাই অনেকের কাম্য হ'য়ে দাঁড়ালো। উচ্চ শিক্ষালাভ করে মসীজীবীর জীবন গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। সে যুগে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার পথ ছিল আমাদের কাছে রুদ্ধ। তা ছিল বিদেশী বণিকদের করতলগত। আমরা তখন ছিলাম কৃষিজীবী। আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্প তখন একেবারে ধ্বংসোন্মুখ। বিদেশী শাসকবর্গ- আমাদের শোনালেন কৃষিই আমাদের জাতীয় জীবনের সাধনা। আমরা ভূমিদাসই হ'য়ে গেলাম। ভূমিলক্ষ্মী আমাদের প্রতি প্রসন্না হ'লেন কি না তখন জানা যায়নি। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে আমরা দুনিয়ার অগ্রগতির সংগে সমান তালে পা ফেলে চলতে অসমর্থ হ'লাম। ইউরোপ যখন নব নব যন্ত্রের আবিষ্কার ক'রে নব নব শিল্প গ'ড়ে তুলছে, তখন ইউরোপীয় বণিকরা ভারতকে তাদের শিল্পের রসদ ও কাঁচামাল যোগাবার কেন্দ্র ক'রে রেখে ছিল। আর আমরা কিছু কিছু বিলাতী শিক্ষালাভের আত্ম- প্রসাদে বিভোর হ'য়ে রইলাম। এইভাবে প্রায় বছর তিরিশ গেল কেটে। আমাদের জাতীয় প্রয়াস তখন ঠিক দানা বেঁধে ওঠেনি। ভারত সরকার অবশ্য তখন নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে ছিলেন না। তাঁরা ভারতীয়দের শিক্ষাব্যবস্থায় উড্ সাহেবের নির্দিষ্ট নীতির একটু-আধটু অদল-বদল ক'রে এদেশে শিক্ষাপ্রসারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। উড্ সাহেবের নির্দেশিত পথে ভারতীয় শিক্ষানীতি যথারীতি চলছে কি না, এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় কোন প্রকার ত্রুটি প্রবেশ ক'রেছে কি না ইত্যাদি বিষয় স্থিরীকরণ এবং সে সব দূরীকরণের জন্য ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার এক

শিক্ষা কমিশন বসালেন। এই কমিশনে উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়রা স্থান পেয়েছিলেন। কমিশনের ভারতীয় সভ্যদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জাষ্টিস্ তেলাং প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই কমিশনে ভারতীয় সভ্য গ্রহণ করার নীতির পশ্চাতে একটি উত্তম আদর্শ কাজ করছিল। এই সময় ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন উদারপন্থী লর্ড রিপণ। এদেশের লোকেদের সংগে সহযোগিতা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এদেশে লোকহিতকর কার্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। উডের ডেস্‌প্যাচে শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতার আদর্শ প্রথম স্বীকৃত হ'য়েছিল। এই আদর্শানুযায়ী বিদ্যায়তনগুলিতে সাহায্যদান নীতি প্রবর্তিত হ'য়েছিল। সরকারী সাহায্যে দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রসার হচ্ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল। এদিক দিয়ে অবশ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও শিক্ষাপ্রসারে বিশেষ তৎপর হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই সময়কার সব চেয়ে গুরুতর সমস্যা ছিল প্রাথমিক শিক্ষার স্থিতিশীল অবস্থা। তখনকার জনসাধারণের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক কোন সার্থকতা ছিল না। সেই সময় নিরক্ষর জনসাধারণের স্বাধিকার বোধকে প্রতিষ্ঠা করার দাবীকে সরকার-পক্ষের কাছে উপস্থাপন করবার শক্তি, সামর্থ অথবা বুদ্ধি ইত্যাদি কিছুই ছিল না। শিক্ষার উদার আলোক তখনও তাদের মনের ঘনান্ধকার দূর ক'রতে পারছিল না। তাদের নিজেদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসার বিষয়ে তাদের নিজেদের কোন তাগিদ ছিল কি না সন্দেহ। এদিকে সরকারপক্ষে আবার চিরকালের অর্থাভাবের অজুহাত তো ছিলই। তাই এই সময় প্রাথমিক শিক্ষা ছিল "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায়।

সমগ্র দেশের যখন এই প্রকার অবস্থা তখন উদারপন্থী লর্ড রিপণ এদেশে স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে কিছু কিছু সংস্কারসাধন করবার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের কাউন্টি

কাউন্সিলগুলির অনুকরণে এদেশে জিলা বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিক্ষা-কমিশন বললেন এই সব স্বায়ত্ত-শাসনমূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। শিক্ষা-কমিশন এই অভিমত পোষণ করতেন যদি নবগঠিত এই সব প্রতিষ্ঠানের হস্তে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে আর কোন অন্তরায় থাকবে না। এই সব প্রতিষ্ঠানের শুভ প্রয়াস ও নবীন উৎসাহে এদেশের আপামর জনসাধারণ শিক্ষার অভিনব আস্বাদ পাবে। যাতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার যথাযথভাবে হয় সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষা-কমিশন এই প্রস্তাব করেছিলেন যে দেশের প্রাচীন পাঠশালাগুলির সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। এগুলোকে সংস্কার করে যদি ঠিক ঠিক ভাবে এগুলোকে ব্যবহার করা যায় তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের গুরুতর সমস্যা বহুলাংশে সমাধান হ'য়ে যাবে—এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন শিক্ষা-কমিশন। সরকারী পক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে না রেখে যদি নিজেরাই গ্রহণ করতেন, তাহলে সমস্যাটির একটা সুরাহা হতো। কিন্তু আমাদের দেশ তখন এতখানি অগ্রসর হয়নি যাতে করে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের ওপর এতখানি দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

নিছক জ্ঞানমুখী শিক্ষা থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে যাতে সেটা কর্মমুখী করা যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কমিশন আর একটি সংগত নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা ব'লেছিলেন প্রবেশিকা পাঠ্য-সূচীর পাশাপাশি অনুরূপ আর একটি মাধ্যমিক পাঠ্যসূচী থাকা উচিত যার মাধ্যমে বিদ্যার্থীরা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত হ'য়ে উঠ্‌বে। কমিশন এই পাঠ্যসূচীর নাম দিয়েছিলেন "বি. কোর্স"। এই নবতম পাঠ্যসূচীতে হাতেনাতে কাজ শেখাবার ব্যবস্থা থাকবে; যে কাজ শিখে বিদ্যার্থীরা উত্তর জীবনে জীবন-সংগ্রামে

যেন কোন দিক দিয়ে অপারগ না হয়। যে সব বিদ্যার্থী ব্যবহারিক শিক্ষালাভে অভিলাষী, অথবা যারা সাধারণ শিক্ষার ব্যুৎপত্তি-লাভে অসমর্থ, সেই সব শিক্ষার্থী "বি. কোর্সে" অধ্যয়ন করবে এবং তারাই "বি. কোর্সে"র পরীক্ষা দেবে। কিন্তু "বি. কোর্সের" ব্যবস্থা হ'লে হ'বে কি ? জনসাধারণ "বি. কোর্সের" যথাযথ মর্যাদা দিতে পারলো না। তাদের কাছে এই পাঠ্যসূচী কৌলীন্যে নিকৃষ্ট ব'লে মনে হ'য়েছিল। সূত্রধর অথবা কর্মকারের কাজে যেন সম্মানহানি হয়ে যাবে এই ছিল সকলের আশংকা। শ্রমের মর্যাদাবোধ তখন আমাদের দেশের লোকের মনে ঠিকঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়নি। যতদিন না তারা জীবন-সংগ্রামে ঘা খেয়েছিল ততদিন কোন কাজই যে হীন নয় এ-বোধ তাদের মধ্যে জাগরূক হয় নি। তাই "বি. কোর্সের" ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও এব্যবস্থা জনপ্রিয় হলো না। ফ'লে এই ধরনের বিদ্যালয়ে ছাত্র জুটলো না। তাই শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক ক'রে তোলার যে শুভ প্রয়াস তা যেন অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হলো।

কমিশনের নির্দেশানুসারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞান ও অংকন স্থান পেল। এতে পাঠ্যক্রম একটু গুরুভার তো হলোই ; কিন্তু এর কোন যুগোপযোগী রূপান্তর হ'লো না। কমিশনের সুপারিশে ব্যবহারিক শিক্ষার নির্দেশ থাকলেও যান্ত্রিক শিক্ষার বিষয়ে কমিশন একেবারে নীরব ছিলেন। কমিশন বোধ হয় ভেবেছিলেন যে এ-দেশের লোকের যান্ত্রিক শিক্ষার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে এতাবৎকাল যে মতানৈক্য ছিল তার কোন সুরাহা কমিশন করতে পারেননি। কমিশন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নীতি-শিক্ষা দেবার জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সরকারী বিদ্যালয় ছাড়া, কি মিশনারী, কি বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাপকগণের মনে একটা প্রবল অভিলাষ ছিল। ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে নিরপেক্ষতাই ছিল সরকারী

নীতি। সরকারী বিদ্যালয়ে বাইবেল পড়াবার জন্য মিশনারীদের যে দাবী তা সরকার পক্ষ কোনদিনই সমর্থন করেননি। তাই তখন নীতি-শিক্ষার প্রশ্ন উঠ্‌লো। ধর্মহীন নীতিবর্জিত শিক্ষা দেশের সর্বনাশ সাধন করবে এই আশংকায় অনেকে আতংকিত হয়ে উঠ্‌লেন। তাই বোধ হয় কমিশন নীতি-শিক্ষার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার তাঁদের পক্ষ থেকে আদৌ বিচ্যুত হলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তির সংগে সংগে এদেশের বর্তমান শিক্ষা-ইতিহাসের তৃতীয় অংকের উপর এইভাবে যবনিকাপাত হলো।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই হলো ভারতের বর্তমান শিক্ষাধারার ইতিহাসের চতুর্থ অংকের উদ্বোধন। এই অংকের ঘটনা কাল কুড়ি বছরের মধ্যেই ছিল বিস্তৃত। এর সূচনা হলো ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটলো ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা কমিশনের পর থেকে বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। আগের মতই এ-দেশে মধ্যশিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার প্রসার হ'তে লাগলো এবং প্রাথমিক শিক্ষা তেমনই উপেক্ষিত হ'য়ে রইলো। শিক্ষা ব্যাপারে এই সময় সরকারী ব্যয়-সংকোচনীতি হ'লো অবলম্বিত। দেশের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের ওপর দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সরকার দূরে সরে যেতে চাইলেন। তাঁদের অভিমত হ'লো এই যে পথ তো দেখানো হ'য়েছেই; এখন দেশবাসী নির্দেশিত পথে তাদের শিক্ষাভিযান চালিয়ে থাক।

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যখন এই প্রকার অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হ'য়েছে তখন এদেশে রাজনৈতিক আকাশের এক কোণে নব-জাগরণের একখণ্ড মেঘ দেখা দিল। তখন কি কেউ বুঝেছিল যে ঐ এক খণ্ড মেঘ একদিন ভারতের সারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে? এই সময় ইলবার্ট বিলের আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রথমে

কংগ্রেস সম্বন্ধে সরকার পক্ষ উদার মনোভাব পোষণ করলেও তাদের এই মনোভাব পরিবর্তিত হতে বেশী দেরী হ'লো না। ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তার এই উন্মেষকে সরকারপক্ষ সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌তে লাগলেন। দেশের শিক্ষা-সংস্কারের দিকে কংগ্রেসের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হ'লো। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ নিরন্তর দাবী জানাতে লাগলেন যে এদেশে আরও শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন; জাতীয় ভাবধারার ওপর এদেশের শিক্ষা-পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে; শিক্ষাকে নিছক জ্ঞানমুখী না ক'রে তাকে ক'রে তুলতে হবে কর্মমুখী এবং সেই সংগে যান্ত্রিক শিক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে ভারতের চিন্তাশীল শিক্ষাবিদেরা মাতৃভাষাকে শিক্ষার প্রধানতম বাহন করবার জন্য আন্দোলন স্থুরু ক'রেছিলেন। এই আন্দোলনে কংগ্রেসেরও পূর্ণ সমর্থন দেখা গেল।

এই সময় জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আমাদের দেশেরই কতিপয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি প্রাণপাত পরিশ্রম করে দেশের বিভিন্ন স্থানে নূতন ধরনের কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, লাহোরে স্থাপিত হ'লো দয়ানন্দ এ্যাংগলো-বেদিক কলেজ এবং বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত হলো সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার আদর্শের মধ্যে ধর্মকে স্থান দেওয়া হ'য়েছিল। বেশী দিন যেতে না যেতেই হরিদ্বারে স্থাপিত হলো গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়। এর কিছুকাল পরে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় স্থাপিত হ'য়েছিল, যা উত্তরকালে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়েছে। গুরুকুলে এবং বিশ্বভারতীতে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের উপর নির্ভর করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার সমন্বয়ে নবপন্থায় শিক্ষা দেবার প্রয়াস চলতে লাগলো। এই সময় থেকে ভারতীয় শিক্ষাকে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর শ্রদ্ধাশীল করবার শুভ প্রয়াস পরিলক্ষিত হলো; শিক্ষাদর্শের সংগে ধর্মকে তার যথাযোগ্য

স্থান দেওয়া হলো এবং এদেশের শিক্ষাকে জাতীয় ভাবাপন্ন ক'রে তোলার দিকে দেশের সকলেরই একটা বেশ প্রবল আগ্রহ দেখা যেতে লাগলো।

সারাদেশে যখন এইভাবে জাতীয় জাগরণের সাড়া পড়ে গেল; তখন আমাদের দেশের গভর্ণর-জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। এদেশে এসেই সিমলায় প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের ডাইরেকটরদের এক গোপন সভা আহ্বান করলেন। শিক্ষাবিষয়ে যে সব ভারতীয় বিশেষ উৎসাহী ও অগ্রণী ছিলেন, তাঁরা ভাবলেন কার্জন এই সভায় তাঁদের আহ্বান না করে তাঁদেরকে অপমান করেছেন। সুতরাং প্রথম থেকেই এই সভার প্রতি এঁদের মন বেশ বিরূপ ছিল। যাইহোক এই গোপন সভায় এদেশে প্রচলিত শিক্ষানীতি নিয়ে নানাবিধ আলোচনা হলো। সভায় বড়লাট লর্ড কার্জন তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষানীতির বিশদ আলোচনা করলেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে শিক্ষাব্যাপারে সরকার পক্ষ যদি দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, তাহলে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হবে না। পরন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে যাতে সরকারী প্রভাব বেশী অনুভূত হয় সেই ব্যবস্থাই অবলম্বিত হওয়া উচিত। শিক্ষা বাবদ সরকারী ব্যয়সংকোচ না করে বরং সে দিকে অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা সরকারী তরফ থেকে একান্ত আবশ্যক। নবজাতীয়ভাবোবুদ্ধ শিক্ষিত ভারতীয়রা ভাবলেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার অর্থ হ'লো যে দেশের মধ্যে যে জাতীয়তা বোধের উন্মেষ হ'য়েছে তাকে মুকুলেই বিনাশ করা। লর্ড কার্জন কর্তৃক নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিবরণী প্রকাশিত হবার পর এই সংশয় আরও বদ্ধমূল হ'লো।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর এদেশে ইত্যবসরে পাঞ্জাব ও এলাহাবাদে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। লর্ড কার্জন যখন এদেশের গভর্ণর জেনারেল; তখন এখানে পাঁচটি

বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে নানাবিধ ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। সেগুলোকে যথাবিধি সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা ছিলই। তাই লর্ড কার্জন এইগুলির পরিশোধন মানসে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসিয়েছিলেন। তৎকালীন মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি মস্ত বড় ত্রুটি ছিল এই যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বিধিবদ্ধ ছিল না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছিল যেন পাঠ্যক্রম নির্দেশ করে দেওয়া এবং পরীক্ষাদির ব্যবস্থা করা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অথবা কলেজে কিপ্রকারে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সে সবের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হাত ছিল না। লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা এবং তার কার্যাদির নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এক অভিনব ব্যবস্থার নির্দেশ দিলেন। 'এই নির্দেশানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী প্রভাবের কোন প্রকার হ্রাস তো হ'লোই না, বরং তা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। নবতম ব্যবস্থায় স্থিরীকৃত হ'লো যে একশত সদস্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি গঠিত হবে। এই সদস্য-গণের;মধ্যে ৮০ জনই সরকার কর্তৃক হবেন মনোনীত। উচ্চশিক্ষা ব্যাপারে দেশবাসীর স্বাধীনতা যে এই ব্যবস্থায় বহুলাংশে ক্ষুন্ন হবে এই ছিল সেই সময় শিক্ষিত ব্যক্তিদের আশংকা। গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ কমিশনের অধিকাংশ ভারতীয় সভ্যই এই নীতির বিরুদ্ধে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই আপত্তি শেষ পর্যন্ত টিকলো না। এই ব্যাপার নিয়ে দেশে কম আন্দোলন ও আলোড়ন হলো না; কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হলো না। লর্ড কার্জনের অভিলাষানুযায়ী এ-দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার হতে চললো। ইউনিভার্সিটি বিল শীঘ্রই আইনে পরিণত হলো।

লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শিক্ষানীতি ঘোষণা করলেন। এ-দেশের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যে সব ত্রুটি ছিল সেগুলির যথাযথ

বিশ্লেষণ করে সেগুলির আশু দূরীকরণের নির্দেশ দিয়ে দিলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মাতৃভাষার অবহেলা, পরীক্ষার প্রাধান্য, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি এ-দেশের শিক্ষিত জনসমাজের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। লর্ড কার্জনের সমালোচনা যে বহুলাংশে সত্য সে-বিষয়ে কারো মতদ্বৈধ ছিল না। এদেশের শিক্ষিত জনমত এসব বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট সজাগ এবং সচেতন ছিল। কিন্তু দেশ ছিল তখন অনগ্রসর। দ্রুত পরিবর্তন অথবা সংস্কার সংসাধন নানাকারণে তখন সম্ভব ছিল না। লর্ড কার্জন যে-প্রকার ক্ষিপ্র-গতিতে তাঁর শিক্ষা সংস্কারের কাজ চালাতে সুরু করেছিলেন, তাতে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে এই আশঙ্কা এবং সংশয় উদ্রেক হলো যে এই সব সংস্কারের পশ্চাতে নিশ্চয়ই সরকারের কোন গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে; লর্ড কার্জন শিক্ষা-সংস্কারের নামে এদেশে শিক্ষাপ্রসারের কাজটিকে বন্ধ করে দিতে চান।

এই সময় লর্ড কার্জন বংগব্যবচ্ছেদ ঘোষণা করলেন। এতে দেশময় একটা অভাবনীয় বিক্ষোভ দেখা দিল। বংগভংগ আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো। সারা দেশে এক অদৃষ্টপূর্ব আলোড়ন দেখা দিল। এই আন্দোলনের প্রভাব ছাত্রদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়লো। সরকারপক্ষ অবশ্য এই ব্যাপারটিকে খুব সুনজরে দেখলেন না। সরকারী পক্ষ থেকে নানাস্থলে এই ইস্তাহার জারি করা হলো যে ছাত্ররা যদি রাজনৈতিক আন্দোলনে অথবা সভাসমিতিতে যোগদান করে, তাহলে তাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। ছাত্রদল এতে উন্মত্তপ্রায় হয়ে গেল। কারাবরণ ইত্যাদি ব্যাপার তখন বিদ্যার্থীদের নিকট গৌরবের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের শাখা আন্দোলন হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রে আবার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সুরু হলো। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ বাংলা দেশের নেতৃবৃন্দ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের

পুরোভাগে দাঁড়িয়ে এই আন্দোলনকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করার ভার নিলেন। তাঁদেরই চেষ্টায় বংগীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ সংগঠিত হলো। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে এ-দেশের অন্যান্য ব্যক্তিগণ লক্ষ লক্ষ টাকা দান করলেন। নিম্নতম শ্রেণী থেকে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীগতভাবে কোন স্তরে কি পড়ানো হবে তার একটা পুংখানুপুংখ বিস্তৃত খসড়া প্রস্তুত হলো। কলিকাতায় নাশ্যান্যাল কলেজ স্থাপিত হলো। শ্রীঅরবিন্দ এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। যন্ত্রশিক্ষার জন্য টেকনিক্যাল কলেজ খোলা হলো। এ-দেশে যন্ত্রশিক্ষায় জাতীয় প্রয়াসের মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাদবপুরের "কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেক্‌নোলজি।" এই সময় বাংলা দেশের নানাস্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য এই জাতীয় আন্দোলন বেশীদিন স্থায়ী হলো না। ন্যাশান্যাল কলেজ এবং জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে উঠে গেল। কিন্তু টেকনিক্যাল স্কুলগুলো রয়ে গেল। ফলে এটা বোঝা গেল যে দেশে যন্ত্রশিক্ষার তাগিদ রয়েছে, এর পর থেকে দেশে একটির পর একটি ক'রে যন্ত্রবিদ্যাশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে লাগলো।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এদেশে আপামর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিকিরণের বিশেষ করে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা করা হ'য়েছিল। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হ'তে লাগলো। দেশের শিক্ষিত জনমত জাতিগত নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে পড়লো। এই গুরুতর সমস্যার একমাত্র সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিকার ছিল এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বহুল বিস্তার। সরকারী পক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও কার্যক্ষেত্রে কোথায়ও বেশীদূর অগ্রসর হতে পারছিলেন না। এমন সময়ে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মহামতি গোখেল ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষা-সম্বন্ধে একটি বিল উত্থাপন করলেন। বিলের দাবী যে খুব বেশী

ছিল তা নয়। যদি কোন প্রাদেশিক সরকার মনে করেন যে কোন বিশেষ স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাহলে সেখানে কেবলমাত্র ছেলেদের জন্য আবশ্যিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করবার অনুমতি দেওয়া হবে। দেশ নাকি তখনও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা লাভের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয় ইত্যাদি নানা অজুহাতে সরকারপক্ষ গোখেলের যুক্তিসম্মত দাবীকে অগ্রাহ্য করলেন। গোখেলের শিক্ষা বিল নিয়ে দেশময় একটা তুমুল আন্দোলন সুরু হলো। সরকারী পক্ষের স্তাবকরা ছাড়া সকলেই এই বিলের পক্ষে ছিল। সরকারী পক্ষের বিরোধিতায় গোখেলের শুভ প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এই সময় দিল্লীতে এক দরবার হলো। ভারত সম্রাট এদেশে এলেন, দেশের কল্যাণ-কামনা করে তিনি তাঁর ভাষণে এ-দেশে শিক্ষাবিস্তারের উল্লেখ করলেন। গোখেলের যুক্তির বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ একটা সাফাই গাইবার সুযোগ পেয়ে গেল যেন। গোখেলের বিলের বিরোধিতা করলেও তাঁরা এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে অভিলাষী ; তাই এখন থেকে তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করলেন এবং এই অর্থের বেশীরভাগ ব্যয় করা হবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি এবং প্রসারকল্পে।

এই সময়ে বিঘোষিত সরকারী শিক্ষানীতির মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার বিষয়ে দুচারটে নোতুন কথা শোনা গেল। পরীক্ষা অনুমোদন ইত্যাদি ব্যাপারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্তভাবে অধীন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবিভাগ তখন পর্য্যন্ত সরকারী আওতায় ছিল। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের কল্যাণে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠলো এবং সরাসরি সরকারী আওতার বাইরে চলে এলো। সরকার পক্ষ থেকে এই অভিযোগ উত্থাপিত হ'লো যে অনেকক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় অন্যায়ভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপর কর্তৃত্ব করছে। অনেক সময় তারা অযোগ্য মাধ্যমিক

বিদ্যালয়কে অনুমোদন দান করে তারা অনুমোদনের অধিকারের অপব্যবহার করছে এবং শিক্ষার অগ্রগতিকে তারা করছে ব্যাহত। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অনুমোদন অধিকার না রেখে এই ভার অন্য কোন যোগ্যতর প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করা বিধেয়। সরকারী পক্ষের এই যুক্তির সমর্থনে আরও সাফাই গাওয়া হ'লো; বলা হ'লো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধানতম কাজ হবে উচ্চশিক্ষা নিয়ে। মাধ্যমিক শিক্ষার সংঙ্গে তার বিশেষ কোন সংশ্রব নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা উপেক্ষিত হচ্ছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাত থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন, পরীক্ষা ইত্যাদি গুরুভার ব্যাপারের দায়িত্ব সরিয়ে নিয়ে যোগ্যতম অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিতে হবে। প্রসংগত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের কথা নোতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা উঠ্‌লো। লণ্ডন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণেই আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি গঠিত হয়েছিল। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ন্যায় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথাও উঠলো। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থলে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সেগুলি যেন যথার্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। সেগুলি যেন নিছক পরীক্ষা-কেন্দ্রে পর্যবসিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যথাযথভাবে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ক'রে তুল্‌তে গেলে তাদের অধিকারের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যথাযথ রূপ কি প্রকার হওয়া উচিত তা নিয়ে এই সময় প্রসংগতঃ নানাবিধ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। কথা উঠলো প্রাচীন ভারতের আদর্শানুযায়ী নালন্দা, বিক্রমশীলা অথবা বর্তমানের আদর্শানুযায়ী অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের মত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে মন্দ হয় না। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীরা জ্ঞানাহরণ করবে। এখানকার প্রাত্যহিক সামাজিক জীবন পুরাকালের গুরুগৃহেরই মত সুসংহত ও

সুনিয়ন্ত্রিত হবে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপকগণের নিবিড় স্পর্শ লাভ করবে এবং সেই সান্নিধ্যের ফলে এবং সেই পরিগমে বাস করেই তাদের শিক্ষা পূর্ণাংগ হয়ে উঠবে। এই তো ছিল ভারতের সনাতন প্রাচীন আদর্শ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অনুরূপ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি এবং সেগুলি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকৃতি মাত্র। এ সব বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ-কেন্দ্র মাত্র। এখানকার বিদ্যার্থীদের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাব সুপরিস্ফুট। কারণ তারা স্ব স্ব গৃহে বাস করে এবং দিবসের এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে এবং পাঠ-সমাপনান্তে প্রতিদিন তারা যে যার গৃহে ফিরে যায়। এ সব বিদ্যালয় অনাবাসিক বলে এখানকার শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না এবং সেই প্রকার প্রভাববিস্তারে কোন প্রকার প্রয়াসও করা হয় না। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিতের মধ্যে যে নিবিড়-মধুর যোগাযোগ থাকে, সেইপ্রকার ঘনিষ্ঠ সংযোগ উপর্যুক্ত বিদ্যালয়ে বিরলদৃষ্ট। আর এক ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা যেতে পারে যেখানে সাক্ষাৎভাবে পাঠদানের কোন ব্যবস্থাদি থাকেই না। সেখানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিভিন্ন কলেজে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় শুধু অনুমোদন, পাঠ্যনির্ধারণ, পরীক্ষাগ্রহণ এবং উপাধি-বিতরণ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এগুলোকে বিদ্যাকেন্দ্র না বলে ব্যবসায়-কেন্দ্র বললে বোধ করি কিছু অত্যুক্তি করা হ'বে না। কলিকাতা এবং ভারতের অন্যান্য আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে এই পর্যায়ে ফেলা যায়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কারের চেষ্টা হয়েছিল। এতে অবশ্য আইনগতভাবে কিছু সংস্কার আনা হলো বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তেমন কোন ফল পাওয়া গেল না। তাই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী শিক্ষানীতিতে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের কথা

ওঠে। সরকারী নীতিতে এই ঘোষণা করা হলো যে প্রতিটি প্রদেশে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কাজে উৎসাহ দিতে হবে এবং মফঃস্বল সহরে যে সব কলেজ আছে সেগুলোকে কালক্রমে শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে। উপরের শেষোক্ত শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার-ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে ভালো ভালো কলেজগুলিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদান কার্য পরিচালিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কেবলমাত্র পরীক্ষাকেন্দ্র করে না রেখে সেগুলিকে প্রকৃত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র করে তুলতে হবে। কিন্তু এই সময়কার শিক্ষানীতিতে প্রাদেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার দুষ্ট কীট প্রবেশ করলো। আলিগড়, বারাণসী ও ঢাকায় সম্প্রদায়ভিত্তিতে নোতুন নোতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো আর প্রদেশগত ভাবে পাটনা ও নাগপুরে নব নব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো।

এই সময় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সাধনের জন্য ভারত-সরকার এক য়্যুনিভার্সিটি কমিশন নিয়োগ করলেন। এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হলেন বিলাতের লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও উপাচার্য মাইকেল স্যাডলার। তাই এই কমিশনের নাম হয়েছিল স্যাডলার কমিশন। কমিশনের ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। অনেকে এই অভিমত পোষণ করেন যে কমিশনের ক্রিয়াকলাপ নাকি স্যার আশুতোষের মতামতের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। যদিও মুখ্যত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে এই কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল, তথাপি একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে কমিশনের শিক্ষা-সংস্কারের পরিকল্পনা কেবলমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই হয়নি, তা হয়েছিল ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রতি দৃষ্টি রেখে। কমিশনের সদস্যগণ ভারতের প্রায় সর্বত্র ঘুরেছিলেন, ভারতীয় নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কি ছোট কি বড়, পরিদর্শন করেছিলেন ; ভারতীয় শিক্ষাবিদদের সংগে নানাবিধ আলাপ-আলোচনা করেছিলেন এবং এই সব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা শিক্ষা-সংস্কারের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন।

স্যাডলার কমিশন তাঁদের কাজ সুরু করার আগেই এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের প্রাণপাত পরিশ্রমে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় একটু ভিন্ন ধরনের হলো। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থীদের এম. এ. পর্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা এখানে করা হলো। এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আংশিকরূপে আবাসিক করা হলো। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের জন্য ছিল বলেই উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার নীতিকে যেন মেনে নেওয়া হলো। এর আগে দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছে সরকারী প্রচেষ্টায়। এ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল নিছক বেসরকারী প্রয়াস এবং সরকারী অনুমোদন। এতদিন অবশ্য ব্রিটিশ ভারতেই কেবল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলিতে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূরে ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে এখানে উর্দু ভাষাই হলো শিক্ষার বাহন। এতে যে মাতৃভাষার মর্যাদা দেওয়া হলো তা নয় ; কারণ হায়দরাবাদ রাজ্যের কথা ভাষা উর্দু ছিল না। তবে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে যে এ-দেশের ভাষা ব্যবহৃত হতে পারে, তা অবশ্য প্রমাণিত হয়ে গেল।

এই সময় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শুভ প্রেরণায় ও নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান

বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলা হলো। এর আগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পড়বার ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন কলেজে; এখন থেকে তা অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলার ফলে এদেশে একটি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থই শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হলো। এখন থেকেই এখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণার সুযোগ কৃতী বিদ্যার্থিগণ পেতে লাগলো।

বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা, অনুসন্ধান ও গবেষণার পর স্যাডলার কমিশন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের বিবরণী প্রকাশ করলেন। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এতখানি ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ এর আগে আর প্রকাশিত হয়নি। দেশের প্রথমিক শিক্ষার সমস্যা ব্যতীত সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার সমস্যা এই বিবরণীতে আলোচিত হয়েছে এবং সমস্যাগুলির সমাধান-সাধনের প্রয়াস করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে কমিশনের নীরবতার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রাথমিক শিক্ষার সংগে উচ্চশিক্ষার প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ নেই। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত উচ্চশিক্ষা অংগাংগীভাবে বিজড়িত। তাই উচ্চশিক্ষার সংস্কারের কথা আলোচনা করতে গিয়ে কমিশন প্রসংগতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কারের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে কমিশন যে সব মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের জ্ঞানার্জনস্পৃহার জন্য যে দারিদ্র ও অভাব-অনটনের সহিত সংগ্রাম করতে হতো কমিশন তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কমিশনস্বীকার করলেন যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানস্পৃহা পরিপূর্ণ করতে গেলে এদেশে অধিকসংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তার আগে দেশে যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল তাদের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন কমিশন। এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার মূলগত

ত্রুটি হলো যথাযোগ্য শিক্ষকের অভাব। সংগত বেতন তৃপ্ত গুণবান শিক্ষক না থাকলে কোন স্তরের শিক্ষাই ফলপ্রসূ হতে পারে না। আর্থিক অনটনই শিক্ষাপ্রসারের প্রধানতম অন্তরায়। তাই কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অধিক পরিমাণ অর্থ সাহায্যের সুপারিশ করেছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালন ব্যাপারে কমিশন একটি সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। উচ্চ শিক্ষার গুরুভার দায়িত্বের সংগে যদি মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সব দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কন্ধে চাপানো হয়, তাহলে কি মাধ্যমিক শিক্ষা ও কি উচ্চশিক্ষা কোন শিক্ষার ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব নয়। তাই কমিশন নির্দেশ দিলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষার সব কিছু দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে স্বয়ং-শাসিত কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পণ করা হবে। এই প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক সংস্থার গঠন, কার্যাবলী ইত্যাদির পুংখানুপুংখ নির্দেশ কমিশন দিয়েছিলেন। এই সংস্থার সভ্যসংখ্যার অধিকাংশেরই বে-সরকারী প্রতিনিধি হওয়াই বিধেয়। জনসাধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির স্বার্থসংরক্ষণ মানসে এদের মধ্য থেকে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এই কমিশন। কোন সাম্প্রদায়িক বিভেদ-নীতি কমিশনের মতবাদকে কলুষিত করতে পারেনি। মাধ্যমিক বোর্ডের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকলেও যাতে বোর্ডের এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সংগত পরিমাণে স্বাধীনতা থাকে সে-বিষয়ে কমিশন যথারীতি নির্দেশ দিয়েছিলেন। বোর্ড যদি সরকারী বিভাগের শাখারূপে পরিগণিত হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের আস্থাভাজন হতে পারবে না।

প্রাক্-স্নাতক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিশন এই অভিমত পোষণ করেছিলেন যে এই দুই বৎসর যে ধরনের শিক্ষা প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থীদের দেওয়া হয় তা মাধ্যমিক শিক্ষার অনুরূপ; সুতরাং তাকে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংগে সংযোজিত

করাই যুক্তিযুক্ত। এই শিক্ষাব্যবস্থার নাম ছিল ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা। প্রস্তাবিত বোর্ডের হাতেই মাধ্যমিক ও ইণ্টার-মিডিয়েট শিক্ষা অর্পণ করার সুপারিশ ক'রেছিলেন স্যাডলার কমিশন। তাই এই বোর্ডের নাম দেওয়া হয়েছিল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এ্যাণ্ড ইণ্টারমিডিয়েট এডুকেশন। স্কুলগুলোর হাতে ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ভার না দিয়ে স্বতন্ত্র দুই বছরের কলেজের প্রস্তাব হ'লো এবং এই সব কলেজের শিক্ষারীতির পরিবর্তন ও সংস্কারের প্রসংগও উত্থাপিত হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার বিষয়ে স্যাডলার কমিশন তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের প্রস্তাব করেন। তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স করার পক্ষে তাঁরা এই যুক্তি দেখালেন যে এই সময়ের কমে যথাযথ পড়াশোনা হয় না, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ আন্তরিক যোগাযোগ সম্ভব নয়, আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দিকেও কমিশন বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ঢাকায় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন স্যাডলার কমিশন। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণও পরিচালনার জন্য নবতম প্রস্তাব ক'রেছিলেন এই কমিশন। পুরাতন সেনেট সেণ্ডিকেটের পরিবর্তে কোর্ট, এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও কার্যনির্বাহক সমিতির ব্যবস্থা হলো। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে এতাবৎকাল অধ্যাপকগণের বিশেষ কোন হাত ছিল না। এদিকে যাতে তাঁদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়, সেই উদ্দেশ্যে পরিচালক সমিতিতে তাঁদের প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ এতদিন অবৈতনিক ছিল ; এখন কমিশন সেই পদকে বৈতনিক করার প্রস্তাব করলেন।

স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাবের ফলে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থায় খুব একটা আলোড়ন খেলে গেল। দেশের নানাস্থানে নোতুন নোতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের হিড়িক পড়ে গেল যেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আলিগড়, রেঙ্গুন, লক্ষ্ণৌ,

ঢাকা, দিল্লী, নাগপুর, অন্ধ্র, ও আগ্রা প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। কিন্তু চিরকালের আর্থিক অনটনের অজুহাত কমিশনের প্রস্তাবরাজিকে বাস্তবে রূপায়িত করার পথে প্রধানতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। শিক্ষা-সংস্কারের আন্দোলন ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকারী ঔদাসীন্যের জন্যই এদেশের শিক্ষার অগ্রগতি বহুলাংশে ব্যাহত হয়ে গেল।

এর পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সুরু করে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের বর্তমান শিক্ষাধারার ইতিহাসে পঞ্চম অঙ্ক অভিনীত হতে লাগলো। এই অঙ্কের সূচনায় ভারতীয়দের উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব ছিল না। ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পিত হতে লাগলো এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বহুদিনের অভীপ্সিত পরিবর্তন দেখা যেতে লাগলো। পূর্ববর্তী যুগের রাজনৈতিক আন্দোলন এতদিনে অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এসেছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে সমগ্র দেশ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। সুতরাং দেশের শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য দেবার সুযোগ ও সুবিধা যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছিল।

প্রথম বিশ্বসংগ্রাম অবসানের পর ভারতবর্ষে শাসন সংস্কারের কথা উঠলো। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের পরিকল্পিত সংস্কার প্রবর্তিত হলো। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হলো। শাসন সংস্কার প্রবর্তন ব্যাপার নিয়ে দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। অধিকাংশ নেতাই বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন। দেশের কতিপয় মুষ্টিমেয় নেতা নবতম সংস্কার ব্যবস্থা স্বীকার ক'রে নিলেন এবং তাঁরা নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভায় যোগ দিয়ে অনেকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন। এই সময় যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক মন্দা অনেকখানি প্রশমিত হয়েছে। দেশে আর্থিক অনটনটা কিছু কিছু ক'মে এসেছে। সুতরাং মনোগত আদর্শকে বাস্তব রূপ দান করবার জন্য দেশের নানা স্থানে নবোৎসাহের এক অভাবিত হিন্দোল খেলে গেল। নব-

নির্বাচিত মন্ত্রিগণ নবতম আদর্শে দেশকে নোতুন ক'রে গড়ে তোলবার কাজে সর্বাগ্রে দেশের শিক্ষাসংস্কারের কাজে ব্রতী হলেন। শিক্ষাসংস্কারের কাজে হাত দিতে গেলে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার আগে হওয়াই উচিত। নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভার প্রথম কাজ হ'লো প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারকল্পে বিধান প্রস্তুত করা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ হ'তে লাগলো। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সব প্রাথমিক শিক্ষা বিধিবদ্ধ হ'লো, সেগুলি মোটামুটি প্রায় একই রকমের। এই সব আইনের বলে প্রদেশগুলির প্রত্যেক জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য এক ধরনের গণতান্ত্রিক পর্যদ স্থাপিত হয়েছে। এই পর্যদগুলি নিজেদের এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন স্থির করবেন এবং তদনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাদি করবেন। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যদগুলির ওপর কর ধার্য করবার অধিকার দেওয়া হ'লো। ছয় থেকে এগার বছর বয়সের ছেলেদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হলো। এই শিক্ষাব্যবস্থা আবার পর্যদের ইচ্ছানুযায়ী বৈতনিক অথবা অবৈতনিক উভয় প্রকারের হতে পারবে। এতদিন বিভিন্ন প্রদেশে জেলা বোর্ডের ওপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পিত ছিল। এখন জেলা বোর্ডের হাত থেকে সে ভার তুলে নিয়ে নব-গঠিত জেলা স্কুল বোর্ডের হাতে অর্পিত হলো। জেলা স্কুলবোর্ড তাদের কার্যাবলীর ব্যয়ভার সংকুলান করবার জন্য শিক্ষাকরের অর্থ পাবে এবং সেই সংগে তারা সরকারী সাহায্যের অংশ পাবে এবং এইভাবে আহৃত অর্থ দিয়ে জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষক বিনিয়োগ, শিক্ষক-শিক্ষণ ও বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপার জেলা স্কুলবোর্ডের হাতে থাকবে। আগেকার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ছিল

মোট পাঁচ বৎসর ব্যাপী। নোতুন প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলোতে তার প্রসার কমিয়ে চার বৎসর করা হলো। এর জন্য অবশ্য নোতুন ধরনের পাঠ্যসূচী করতে হলো। নবতম ব্যবস্থায় ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। জেলায় জেলায় শিক্ষাকর বসাবার প্রয়াস চললো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থাও করা হতে লাগলো। মনে হ'লো আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুরুতর সমস্যার এই বুঝি সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল আশানুরূপ কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য ইত্যবসরে নব প্রবর্তিত ব্যবস্থায় কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়ছিল। নির্ধারিত পাঠ্যক্রম চার বছরের না হ'য়ে পাঁচ বছরের হলে ভাল হতো। সাম্প্রদায়িকতার ও স্থানীয় রাজনীতির দুষ্ট কীট জেলা স্কুলবোর্ডের ক্রিয়াকল্পের মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত শুভ প্রয়াসকে বানচাল করে দিচ্ছিলো। সাম্প্রদায়িক অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ করতে গিয়ে শিক্ষকতার মান গেল নেমে। কিছুদিন পরে বোঝা গেল একদিকে যেমন শক্তি ও সুযোগের অপচয় ঘটছে, অন্যদিকে তেমনি অর্থের অনটন তো বেড়েই যেতে লাগলো।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে-সব আইন করা হয়েছিল সেগুলোর দাবী অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের দাবীর তুলনায় একেবারে অল্পই। প্রগতিপরায়ণ দেশগুলিতে দেখা যায় যে শিক্ষাকে আট বৎসর ব্যাপী বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই স্থলে আমাদের দেশে সেই শিক্ষাকে মাত্র চার বৎসরের জন্য আবশ্যিক করতে বলা হয়েছে। সব চেয়ে বড় দুঃখের কথা হ'লো এই—যে বয়সে শিক্ষার সব চাইতে বেশী প্রয়োজন, ঠিক সেই বয়সটাতেই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষা সমাপন ও বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই সময় প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি বড় ত্রুটি সকলের চোখে পড়েছিল। সেটি হলো এই—আমাদের দেশের যে সব ছেলে প্রাথমিক শিক্ষা সুরু করে,

তারা শেষ পর্যন্ত তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে না। হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে যদি প্রথম শ্রেণীতে একশত জন ছাত্র ভর্তি হয় তবে তাদের মধ্যে মাত্র কুড়ি জন চতুর্থ শ্রেণীতে গিয়ে পৌঁছুতে পারে। এর ফল হতো এই যে শতকরা ৮০ জনের পিছনে যে অর্থ ও শ্রম ব্যয়িত হয়, তা কেবল অপচয় হয়। আমাদের দেশের জনসাধারণের দুরপনেয় দারিদ্র এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রাণহীন শিক্ষাব্যবস্থাই এই অপচয়ের মূলীভূত কারণ। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার আর একটি প্রধানতম ত্রুটি হ'লো যথোপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। উপযুক্ত বেতন দিতে না পারলে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়ার আশা বাতুলতা মাত্র। এই সব ত্রুটির জন্য আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার ঘটেনি আলোচ্য সময়ের মধ্যে। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার যুক্তিসংগত সমাধান করতে গেলে এদেশে আবশ্যিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হওয়াই যুক্তিসংগত। কিন্তু এই পথে আর্থিক অনটনই পর্বতপ্রমাণ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে অভাব তখনও ঘোচেনি এবং আজও ঘুচলো না। প্রাথমিক শিক্ষার কোন সুসংগত সমাধান তখন হ'লো না।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও সংস্কারের প্রয়াস চলছিল। মন্টেগু চেমস্-ফোর্ড কল্পিত শাসনসংস্কার প্রবর্তন করার ব্যাপারে দেশে তখন মতদ্বৈধ ছিল। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদকল্পে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর অধিনায়কত্বে দেশময় অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী বিদ্যালয় ত্যাগ করে অনেকেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এই সব শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আবার একবার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সুরু হ'লো। এই আন্দোলনের ফলে ১৯২১খ্রীষ্টাব্দে আবার দেশের নানাস্থানে জাতীয় বিদ্যালয় গঠিত হলো। ছাত্রদল এই সব বিদ্যায়তনে যোগ দিতে লাগলো। স্বদেশী যুগের মত এবারও কিছুদিনের মধ্যে জাতীয়

শিক্ষা আন্দোলনের উৎসাহ মন্দীভূত হয়ে এলো। রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎসাহ কখনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। তাই সেই আন্দোলনের সহায়তায় স্থায়ী কিছু সংসাধন করা অতি সুকঠিন।

এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রধানতম দাবী ছিল যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। এদেশে এমন সময় গেছে যখন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত সব শিক্ষাই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হতো। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে ইংরেজী ভাষা এখনো মুখ্যতঃ শিক্ষার বাহন হয়ে আছে বললেই চলে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষাই এখন শিক্ষার প্রধান বাহন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে দেখা যায় যে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বড্ড বেশী পুঁথি-ঘেঁষা ছিল। মাঝে মাঝে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী ও যন্ত্রমুখী ক'রে তোলার যে প্রচেষ্টা হয়নি তা' নয়। প্রাদেশিক ভিত্তিতে একে কোথায়ও কোথায়ও আংশিক বৃত্তি-মুখী করা হ'য়েছে। কিন্তু এই সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থীদের মধ্যে দেশ-জোড়া যে বেকার-সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তাতে সবাই মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যকারিতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠলো। জাতীয় জীবনে এই সমস্যার যে গুরুত্ব কতখানি তা সকলেই অনুভব করেন। শিক্ষিতের মধ্যে বেকার-সমস্যা দেখা দিলে সব দোষ গিয়ে পড়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। এই সময় আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ছিল যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাওয়া। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা সবায়ের ছিল না। তাই যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেতো না, তাদের মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াই বিধেয়। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে জীবনোপযোগী কৃত্যালী শেখার ব্যবস্থা থাকলে এই স্তর শেষ করার পর দেশের তরুণ সম্প্রদায় জীবন-সংগ্রামে অন্ততঃ ভীত হবে না এটুকু বলা যেতে পারে। ঐ সময়কার বৈচিত্রবিবর্জিত মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সাধন করে সেখানে

বিচিত্র কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এই ছিল তখনকার প্রগতিবাদী শিক্ষাবিদদের অভিমত। মাধ্যমিক শিক্ষায় জ্ঞান-মুখী বিদ্যার্জনের সংগে বিদ্যার্থীদের জন্য যন্ত্র, কৃষি, ব্যবসায়, শিল্প ইত্যাদি শেখার ব্যবস্থা থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। বিদ্যার্থীরা আপন আপন অভিপ্রায়, রুচি ও জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী যার যে রকম শিক্ষার প্রয়োজন সে সেই রকম শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষা সার্থক হ'য়ে উঠবে, অন্যদিকে তেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও বহু ব্যর্থতার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে ; তখন যারা কেবল যোগ্যতম এবং যাদের যথেষ্ট আর্থিক সংগতি আছে তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাবে। অনেকে ভাবলেন এই পন্থা অবলম্বিত হলে দেশ থেকে বুঝি বেকারসমস্যা বিদূরিত হবে। ব্যাপারটা একটু অনুধাবন করে দেখার প্রয়োজন। আসলে আমাদের দেশের বেকার-সমস্যাটা কাজের অভাব ইংগিত করে না, তা ইংগিত করে পেশার অভাবকে। বস্তুতঃ সমস্যাটা কাজের অভাব নয় ; আসল সমস্যাটা হ'লো দেশের অনটন। সব দেশেরই পেশা নির্ভর করে একান্তভাবে তার অর্থনৈতিক জীবনের সর্বাংগীণ বিকাশের ওপর। যন্ত্র-শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা দেবার পরও যদি দেশে সংগত পরিমাণে যান্ত্রিক, ব্যবসায়িক ও শিল্পের প্রসার না ঘটে তাহলে সকল প্রকার শিক্ষাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর প্রদেশে ও পাঞ্জাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সুসংস্কৃত করে তাকে কর্মমুখী ও যন্ত্রমুখী করবার প্রয়াস করা হ'য়েছিল। উত্তর প্রদেশের তদানীন্তন সরকার স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর অধিনায়কত্বে বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করেন। সপ্রু কমিটি প্রস্তাব করলেন যে বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার একটু-আধটু অদলবদল ক'রে সেখানে কিছু কিছু ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'বে। ইন্টারমিডিয়েট স্তরের একটি শ্রেণীকে নিয়ে মাধ্যমিক স্তরের সংগে

সংযোজিত করার প্রস্তাব দেওয়া হ'লো। সেই সংগে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীর অন্য একটি বৎসরের পাঠ্যক্রম স্নাতক শ্রেণীর সংগে যোগ করে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হবে এগার বছরের আর স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্যক্রম হবে তিন বৎসর-ব্যাপী। বিদ্যালয়ের এগার বছরের অবস্থিতি দুইভাগে বিভক্ত হবে—প্রাথমিক অধ্যায় থাকবে পাঁচ বৎসরব্যাপী আর মাধ্যমিক বিদ্যাশিক্ষাকাল থাকবে ছয় বৎসর বিস্তৃত। ছয় বৎসরব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষায় আবার দুইটি বিভিন্ন স্তর থাকবে—একটি হ'বে নিম্ন মাধ্যমিক, অপরটি হ'বে উচ্চ মাধ্যমিক। উভয় স্তরের প্রত্যেকটিই আবার তিন বছর ক'রে বিস্তৃত থাকবে। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষের তিন বছরে সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত কৃষি, শিল্প, যন্ত্র, ব্যবসায় ইত্যাদি নানা বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই সময় ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতিও অনুরূপ পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে এই প্রস্তাবকে কার্যকরী ক'রে তোলবার জন্য যথাযথ প্রয়াস কোথায়ও করা হয়নি। ব্যবহারিক ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতে না পারলে সমগ্র দেশ যে দুনিয়ার অগ্রগতির সংগে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারবে না তা সবাই বুঝলো বটে ; কিন্তু তাকে বাস্তব রূপ দেবার সাধু ও শুভ প্রয়াসের অভাব রয়েই গেল। যান্ত্রিক নাগর সভ্যতার যুগ থেকে আমরা তপোবনের অনাড়ম্বর সরল-মধুর জীবনে ফিরে যেতে পারবো না, আর তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। এদিকে আবার যন্ত্রযুগের অগ্রগতির সংগে যদি আমাদের জীবনকে নবভাবে রূপায়িত করতে না পারি, তাহ'লে যন্ত্রদানবই আমাদেরকে গ্রাস ক'রে ফেলবে—মানবের সৃষ্টির চেয়ে মানব মহীয়ান না হ'য়ে, সে তার সৃষ্ট বস্তুর দাস হ'য়ে পড়বে। এর থেকে গ্লানিকর আর কি হতে পারে! এই হ'লো বর্তমান যুগের জটিলতম সমস্যা। সমস্যা-কুহেলির ঘনান্ধকারেই ভারতের শিক্ষা ইতিহাসের পঞ্চম অংকের উপর যবনিকা পাত হ'লো।

এর পর ষষ্ঠ অংকের অভিনয় সুরু হ'লো ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। এ-অংকের অভিনয় আজও চলেছে। আমাদের দেশে যখন থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হ'লো ভারতের শিক্ষা ইতিহাসে যেন একটি নবযুগের সূত্রপাত হ'লো। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের শিক্ষার ইতিহাস অত্যন্ত ঘটনাবহুল। এই কম সময়ের মধ্যেও সরকারী পক্ষ থেকে শিক্ষাখাতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ হ'য়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, তাকে আবশ্যিক করার প্রয়াস, জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করবার শুভ প্রয়াসের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা প্রস্তুত হ'তে লাগলো। এই সময় দেশে মহাত্মা গান্ধী-পরিকল্পিত ওয়াধা শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার চেষ্টা হ'লো। শারীর শিক্ষা এবং বৃত্তিশিক্ষায় যথেষ্ট কর্মপ্রেরণা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হ'লো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হ'লো এই যে এই সময় বাধলো দ্বিতীয় বিশ্বসমর। ভারতের সমস্ত কর্মপ্রয়াস যুদ্ধের দিকে নিয়োজিত হ'লো। প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলো। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের অনুসৃত নীতিকে কোন-প্রকারে জোড়াতালি দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু এই সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের দিকে ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা-সমিতি ভারতের যুদ্ধোত্তর কালের এক শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। এই পরিকল্পনা শিক্ষার ইতিহাসে সার্জেন্ট পরিকল্পনা নামে পরিচিত। যুদ্ধবিরতির পর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস আবার প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন এবং সেই সংগে তাঁরা এদেশের শিক্ষার সংস্কার ও প্রসারের কাজকে যুগপৎভাবে চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু পরের দুই বছরে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পেলো যে শিক্ষাসংস্কারের কাজ রইলো পিছনে পড়ে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করলো এবং সেই সংগে অবসান হয়ে গেল দীর্ঘ পরাধীনতার অমারাত্রি।

এখানে প্রসংগক্রমে গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির

ও সার্জেন্ট পরিকল্পনার কথা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হবে। প্রাথমিক শিক্ষার যে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল, তা দেশের সবাই বুঝলেও প্রয়োজনের তাগিদে ঠিক ঠিক কাজ কেউ করতে পারছিল না। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী যেমন রাজনৈতিক তমসার মধ্যে পথের দিশা দিয়েছেন, শিক্ষাক্ষেত্রের ঘনান্ধকারের মাঝে তেমন তিনি আলোর দীপবর্তিকা তুলে ধরলেন। মহাত্মা গান্ধী বুঝেছিলেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মৌলিক রূপান্তর ঘটাতে না পারলে, শিক্ষার ভিত্তিকে নোতুনভাবে গড়ে তুলতে না পারলে আমাদের জাতীয় জীবনকে নোতুনভাবে গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। তাই ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী শিক্ষা-সংস্কারের এক নোতুন খসড়া তৈরী করলেন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও উৎসাহে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বুনিয়াদী শিক্ষার এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত হ'লো। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হ'লো।

সাত থেকে চৌদ্দ বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য সাত বছরের শিক্ষা-পরিকল্পনা বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে করা হ'য়েছে। এই সাত বছরের মধ্যে হয়তো বিদ্যার্থীদের আক্ষরিক জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এদিয়ে প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি যথাযথরূপে স্থাপিত হবে কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বুনিয়াদী পরিকল্পনায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সমাপ্তি ঘট্‌ছে। তাদের বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষাসমাপন মনস্তত্ত্বের দিক থেকে আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। এই সময় তাদের যতক্ষণ বিদ্যালয়ের পরিবেশে রাখা যায়, ততই তাদের পক্ষে মংগল। বুনিয়াদী পরিকল্পনায় সাধারণ-বিষয়াদি শেখাবার সংগে সংগে হাতে-কলমে নানারকমের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করা হ'লো। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা আর শিক্ষার বাহন হ'য়ে রইলো না। সেখানে প্রাদেশিক ভাষা অথবা মাতৃভাষা নিজের আসন প্রতিষ্ঠা ক'রে নিল। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করলে

অল্প সময়ের মধ্যে আগের চেয়ে অধিকতর বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাবে।

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় মানব-জীবনের প্রতিযোগিতা-নীতি স্বীকৃত হয় না। বরং সেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা-নীতি স্বীকৃত হয়েছে। সামাজিক সহযোগের ভিত্তিতে নবতম সমাজের পুনর্গঠন বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ। জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্ধর্তন নীতি বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় স্বীকৃত হয় না। নবতম এই আদর্শের কথা সুকুমারমতি শিশুদের সম্মুখে তাদের জীবনের বিকচোন্মুখকালে উপস্থাপিত করতে হ'বে। প্রাথমিক শিক্ষালয়ে এই সহযোগিতার বীজ বিদ্যার্থীদের মনে বপন করতে হ'বে। ছোটবেলা থেকে তাদের মনে এই ভাব জাগিয়ে তুলতে হ'বে যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই মানব সমাজ আজ এই উন্নত পর্যায়ে আসতে পেরেছে—সংগ্রাম ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে নয়। সংগ্রাম ও সংঘর্ষ যদি আমাদের জীবনের যাত্রাপথের একমাত্র নীতি হ'তো তাহ'লে মানবসমাজ এতদিন ধরণীপৃষ্ঠ হ'তে কবে যে অবলুপ্ত হয়ে যেতো তার কোন স্থিরতা নেই।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কর্ম ও চিন্তার সমন্বয়সাধনের প্রয়াস করা হ'য়েছে। বিদ্যালয়-সমাজে শিক্ষার্থীরা শুধু জ্ঞানমুখী বিদ্যার্জনে লিপ্ত থাকবে না; তাঁরা সেখানে কর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজ জীবনের একটা পরিচয় পাবে। সেখানে বিদ্যার্থীরা কাজ তো করবেই এবং সেই সংগে আনন্দময় ক্রীড়াকৌতুকে যোগদানও করবে। সেখানে শিক্ষা পুঁথিকে আশ্রয় ক'রেই চলবে না; সেখানে শিক্ষা দেওয়া হবে কর্মকে কেন্দ্র ক'রে। বুনিয়াদী শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হ'লো যে কোন একটি বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে এখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। তাঁতশিল্প অথবা চরকা, চাষের কাজ অথবা ছুতোরের কাজ যে কোনটাকেই কেন্দ্র ক'রে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কাজ চলবে। যদি কৃষিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কেন্দ্রগত বিষয় করা হয় তাহ'লে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়-জীবনের বেশী সময়

কৃষিকেই কেন্দ্র ক'রে শিখবে নানা বিষয় এবং সেই সংগে তারা শিখবে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। বুনিয়াদী শিক্ষা বৃত্তিশিক্ষার একটি রূপান্তর মাত্র। অবশ্য এই শিক্ষার মাধ্যমে সারা দেশে তাঁতী, ছুতোর ইত্যাদি তৈরী করা হ'বে না বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তকরা এ-কথা ভাল করেই জানেন। তাঁদের পরম উদ্দেশ্য হ'লো কর্মপ্রেমিক শিক্ষা এবং সক্রিয় শিক্ষা। শ্রমের প্রতি যাতে শিক্ষার্থীদের মনে একটি মর্যাদাবোধ উদ্বুদ্ধ হয়, সেদিকেও এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তকদের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। বিদ্যার্থীরা যাতে তাদের জীবনের প্রারম্ভ থেকে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে সেদিকে এই শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশেষ জোর দেওয়া হ'য়েছে। তাই গান্ধীজী চেয়েছিলেন যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যে সব হাতের কাজ করবে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আংশিক ব্যয়ও সংকলিত হ'য়ে যাবে। শিশু-শ্রমকে বিদ্যালয়ে পণ্য-দ্রব্যের পর্যায়ে ফেলার ব্যাপার নিয়ে এই স্বাবলম্বনের নীতির বিরুদ্ধে অনেক শিক্ষাবিদ আপত্তি তুলেছেন। আর তা ছাড়া শিশুদের তৈরী হাতের কাজ বয়স্কদের কাছে কতখানি রুচিসম্মত হবে এবং সেই হাতের কাজ কি পরিমাণ অর্থ বহন করে আনবে, সে বিষয়ে বহু শিক্ষাবিদ সংশয় পোষণ ক'রেছেন।

মানুষের জীবনে যে হাতের কাজের প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করে না। পুঁথিই বিদ্যার্জনের প্রশস্ততম পথ নয়। সুনিপুণ অঙ্গুলিচালনার সংগে সংগে আমাদের বুদ্ধির প্রাখর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সেই সংগে আমাদের মানসিক বৃত্তির বিকাশ সংসাধিত হয়। হাতের কাজের উপায়গুলিকে যত বেশী পরিমাণে আমরা কাজে লাগাতে পারবো, ততই আমাদের বুদ্ধির স্ফুরণ হ'বে। কিন্তু তা হ'লে হবে কি? আমাদের দেশের সামাজিক কাঠামো এমন হয়ে গেছে যেখানে পুঁথিগত জ্ঞানকে আমরা প্রাধান্য দিই। হাতের কাজ শেখা

অথবা যান্ত্রিক বা বৃত্তিশিক্ষা যেন কৌলীন্যে নিকৃষ্ট। বুদ্ধিজীবীরা চিরকালই শ্রমজীবীদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা তো সামাজিক ঐক্যের পরিপন্থী। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই বিভেদ নীতি সবিশেষ প্রকট। তাই শিশুবয়সে আমাদের দেশের সুকুমারমতি বিদ্যার্থীদের মধ্যে এই ভাবটি জাগিয়ে তোলা উচিত যে মর্যাদার দিক থেকে কোন কাজই হীন নয়; বুদ্ধিজীবী আর শ্রমজীবীদের মধ্যে সম্মানগত কোন পার্থক্য নেই। তখনই আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা একে অন্যকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে শিখবে এবং তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে।

আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থায় পুঁথির চাপে বিদ্যার্থীরা পঙ্গুপ্রায় হ'য়ে পড়তো। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় অনাবশ্যক পুস্তকের জগদ্দল পাথর ছাত্রদের পৃষ্ঠ থেকে নামানো হ'য়েছে। ফলে তারা আর নুাজদেহ ও কুব্জপৃষ্ঠ হয়ে পড়বে না। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যার্থীরা স্বাধীনতার ও সৃষ্টি করবার আনন্দের আস্বাদলাভ করবে হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে। মানুষের সৃষ্টিশক্তি সহজাত। মানুষ তার সৃষ্টির মধ্যেই আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। তাই সে আপন শক্তি ও সুযোগ অনুযায়ী নিজেকে নানা-ভাবে প্রকাশ করছে। একেই বলি আমরা ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আমাদের মনোগত ভাবপুঞ্জের বিকাশ যদি সহজ এবং সাবলীল হয়, তাহ'লে মানুষের জীবন অনাবিল আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সেই আত্মবিকাশের পথ যদি কোন কারণে অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে মানবের মনোগত ভাবনিচয় স্বাভাবিক প্রকাশের পথ না পেয়ে মনোজগতে নানা বিপ্লবের সৃষ্টি করে। ফলে মানুষের জীবনে নেমে আসে অপ্রকাশের অতৃপ্তি ও আত্মগ্লানি। ব্যক্তির জীবন তো এতে বিষময় হয়ই। উপরন্ত সেই বিষ মানুষের সমষ্টিগত জীবনে সংক্রামিত হয়। তখন মানুষের অতৃপ্ত ক্ষুধিত যাতনা সমগ্র সমাজকে টেনে নিয়ে যায় আত্মক্ষয়ী ধ্বংসের পথে। বুনিয়াদী

শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের আত্মার বিকাশের নানাবিধ পথ উন্মুক্ত আছে বলেই বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশের বহু শিক্ষাবিদের কাছে সমাদরের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার পক্ষে এবং বিপক্ষে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি এই পরিকল্পনার মূল নীতিগুলির প্রায় সবই স্বীকার করে নিয়েছেন। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীদল যখন শাসনভার গ্রহণ ক'রেছিলেন, তখন বোম্বাই, বিহার, উত্তর-প্রদেশ ও উড়িষ্যার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হ'য়েছিল। পরীক্ষামূলক ভাবে নানাস্থানে কাজ সুরু হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় হ'লো এই যে যখন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে পদত্যাগ করলেন, তখন বুনিয়াদী শিক্ষার আন্দোলন মন্দীভূত হ'য়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্যবশতঃ বিহার প্রদেশের সরকার সেই প্রদেশের আরব্ধ বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চালাবার সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়েছিলেন। বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া মহকুমায় গত দশবছর ধরে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বেশ ব্যাপকভাবে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এই পরীক্ষামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণও প্রকাশিত হয়েছে। সেই বিবরণী থেকে জানা যায় যে সেই শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকারিতার দিক দিয়ে তো সার্থক হয়েছেই এবং তা এটুকু প্রমাণ করে দিয়েছে যে তা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার থেকে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। বুনিয়াদী পরিকল্পনায় যে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাপ্রণালীর নির্দেশ দেওয়া আছে, তার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে সে কথা এর বিরোধী সমালোচকরাও অস্বীকার করবে না। যদি আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় তা গ্রহণ করা যায়, তাহলে আমাদের দেশের শিক্ষাসমস্যার যে কতখানি সমাধান হ'য়ে যাবে সে-কথা বলাই বাহুল্য। তবে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যকরী করে তুলতে

গেলে যে ধরনের শিক্ষকের প্রয়োজন, সেই ধরনের শিক্ষক আমাদের দেশে একান্ত দুর্লভ। দেশের কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ নিঃস্বার্থ অক্লান্তকর্মী শিক্ষকের প্রয়োজন এখানে। তা শুধু দু একজন হ'লে চলবে না। এই ধরনের লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। তবেই এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী ক'রে তোলার সম্ভাবনা আছে।

এর ওপর আছে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যয়ের দিক। ব্যয়ের সমস্যা নিরাকরণের জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রিগণের আমলে মধ্যপ্রদেশে বিদ্যামন্দির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'য়েছিল। এই পরিকল্পনায় স্থির হ'য়েছিল যে প্রত্যেক গ্রামে একটি করে বিদ্যামন্দির থাকবে আর তার সংগে থাকবে কিছু জমি। সেই জমির আয় থেকে চলবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন এবং বিদ্যালয়ের চালু খরচা। বিদ্যামন্দির পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে এতে বিদ্যালয়কে গ্রাম্য শাসন ও অর্থনীতি ব্যবস্থার অংগীভূত করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। গ্রামের সর্বসাধারণের সম্পত্তি হবে এই বিদ্যামন্দির। তাতে থাকবে সকলের অধিকার এবং তা পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠবে সর্বসাধারণের সেবায়। এই ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষালয়ের মনোজ্ঞ রূপ। শ'খানেক বছর আগে এ্যাডাম সাহেব এই ভাবে আমাদের গ্রাম্য পাঠশালাগুলোকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী বিরোধিতায় তা তখন সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। বিদ্যামন্দিরের পরিকল্পনা গ্রামে গ্রামে অনুসৃত হ'লে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুরুতর সমস্যার নিরাকরণ হ'য়ে যাবে এই আমাদের স্থির বিশ্বাস।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা এদেশে প্রবর্তিত হবার পর এর প্রসার ঘটেছে বটে, কিন্তু তা আশানুরূপ হয়নি। বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল সাত থেকে চোদ্দ বছরের বিদ্যার্থীদের জন্য; তার চেয়ে বেশী বা কম বয়সের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়ে এই পরিকল্পনা একেবারে নীরব। গান্ধীজী তাঁর পরিকল্পনার ত্রুটির সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি তাঁর বুনিয়াদী পরিকল্পনার

পদ্ধতিগুলো দূর করবার জন্য ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর "নয়ী তালিম" পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। "নয়ী তালিম" বুনিয়াদী পরিকল্পনার সম্প্রসারণ মাত্র। উভয় পদ্ধতিই মূলতঃ এক। নয়ী তালিমে চারিটি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।—যথা, (১) প্রাক-বুনিয়াদী শিক্ষা, (২) বুনিয়াদী শিক্ষা, (৩) উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা, (৪) বয়স্ক শিক্ষা। এই পরিকল্পনায় প্রতিটি স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মকেন্দ্রিক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ব-বুনিয়াদী স্তরের বিদ্যার্থীদের সাবলীল ক্রীড়া-কৌতুকই কর্মেরই রূপান্তর মাত্র। কারণ, শিশুর কাছে খেলাও যা কাজও তা। প্রাক-বুনিয়াদী স্তরে তিন থেকে ছয় বছরের শিশুদের জন্য শিক্ষার বিবিধ ব্যবস্থা থাকবে। বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার কথা আগেই আলোচিত হ'য়েছে। উত্তর-বুনিয়াদী স্তরে মুখ্যতঃ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাদি থাকবে এবং এখানকার শিক্ষাব্যবস্থাও প্রধানত কর্মকেন্দ্রিক হবে। নয়ী তালিমের সর্বশেষ স্তরে বয়স্ক শিক্ষার নির্দেশ দেওয়া আছে। বুনিয়াদী স্তরে যেমন শিক্ষার্থীদের উপযোগী বিস্তৃত পাঠ্যসূচী আছে, নয়ী তালিমেও সেই প্রকার স্তরগতভাবে বিস্তৃত পাঠ্যক্রম আছে। নয়ী তালিমে মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাদর্শের একটি সমগ্র রূপ মূর্ত হ'য়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পাদে ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারসাধনের জন্য এক অভিনব পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। ইংলণ্ডের ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-আইনের অনুকরণে এই পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছিল। এই সময় ভারত সরকারের শিক্ষাব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতির কর্ণধার ছিলেন সার্জেন্ট সাহেব। তাঁরই নামানুসারে এই পরিকল্পনা সার্জেন্ট-পরিকল্পনা নামে শিক্ষাজগতে প্রখ্যাত। এর আগে এদেশের সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য এত বড় ব্যাপক পরিকল্পনা আর কখনো রচিত হয়নি। এই পরিকল্পনার সব চাইতে বড় কথা হ'লো এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার

একটা সম্পূর্ণ কাঠামো প্রস্তুত করার প্রয়াস এতে করা হয়েছে। জাতির সকল শ্রেণীর ও সর্বস্তরের শিক্ষার কথা এতে উল্লিখিত হয়েছে। এই পরিকল্পনানুসারে শিক্ষার সূচনা হবে আট বৎসর ব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় এবং এর পূর্ণ পরিণতি ঘটবে এদেশের বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থায়। এই পরিকল্পনায় নানাবিধ মাধ্যমিক শিক্ষা নবপদ্ধতিতে তিন বৎসরব্যাপী কলেজীয় শিক্ষা, বস্ত্র ব্যবসায়, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ-ছাড়া শিশুশিক্ষা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, অবসর-বিনোদন অল্পবয়স্ক শ্রম-শিল্পীদের কাজের সংগে সংগে আংশিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষণ এবং শিক্ষকগণের বেতনের হার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এই পরিকল্পনায়।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় বিদ্যার্থীদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের শিক্ষাকালকে দুইটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হ'য়েছে। এই উভয় স্তরেই অবশ্য শিক্ষা হবে আবশ্যিক। প্রথমে শিক্ষার্থীরা জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর ধরে লেখাপড়া শিখবে। এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী তাদেরকে সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হবে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সমাপন করার পর তাদের আবশ্যিক শিক্ষাজীবনের অবসান ঘটবে। এর পর কিছু কিছু ছাত্র তাদের অভিরুচি অনুযায়ী জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলে দু'তিন বছরের জন্য শিক্ষালাভ করবে। উচ্চস্তরের মাধ্যমিক বিদ্যালয় আবার দুই ধরনের হবে—এক ধরনের বিদ্যালয়ের নাম হবে টেকনিক্যাল হাই স্কুল ; সেখানে নানান ধরনের যন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে ; আর এক রকম বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীরা এগার থেকে সতের বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষালাভ করবে—অর্থাৎ তারা এখানে ছয় বৎসর লেখাপড়া শিখবে। বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েরই লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে এখানেই। এর পরও যারা

উচ্চশিক্ষা লাভে অভিলাষী তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে। স্নাতক শ্রেণী তিন বৎসর ব্যাপী হবে। ইন্‌টারমিডিয়েট শিক্ষা-ব্যবস্থা রহিত হ'য়ে যাবে। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের জন্য নার্সারি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। নার্সারি স্তর থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে এমন ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে আর কোন বিবরণীতে পরিদৃষ্ট হয়নি। এর পশ্চাতে শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্বাংগসুন্দর করে তোলার সদিচ্ছা এবং সাধুপ্রয়াস পরিকল্পনার প্রর্বতকদের মধ্যে কাজ করছিল।

ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির তথ্যপূর্ণ পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরাপুরি কাজ করতে গেলে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতেই শুধু জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটির ওপর গিয়ে দাঁড়াবে এবং সিনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখা প্রায় পৌনে দু'কোটির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবে। সর্বসাকুল্যে এই সওয়া পাঁচ কোটি বিদ্যার্থীদের পড়াতে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই প্রায় আঠার লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। এর পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৭২ লক্ষের কাছাকাছি। এদেরকে শিক্ষা দিতে হ'লে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। সমগ্র ভারতের কথা ধরলে এই সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা ভাবলেই মাথা ঘুরে যাবে আমাদের। অগণিত জনসাধারণের শিক্ষার দায়িত্ব যে কতখানি তা এই পরিসংখ্যান থেকেই আংশিক অনুমান করা যায়।

শূন্যোদর অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত শিক্ষকদের দিয়ে শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির সদস্যগণ সকলেই এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যাতে এদেশের শিক্ষকবৃন্দ সংগতবেতনে তৃপ্ত থাকে সেদিকে সমিতি তাঁদের জাগর দৃষ্টি রেখেছিলেন। আমাদের

দেশের শিক্ষকগণের দারিদ্র্য প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হ'য়েছে। তাঁরা বলেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের সর্বনিম্ন মাসিক বেতন ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যদি সমগ্র ভারতে আট বৎসরব্যাপী আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে কত শিক্ষক চাই এবং উপযুক্ত হারে তাঁদের যদি বেতন দিতে হয় তাহ'লে বা কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সার্জেন্ট পরিকল্পনায় তার একটা হিসাব দেওয়া হ'য়েছে। সেই হিসাবে দেখা গেছে যে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই দুই শত কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। আর এই পরিকল্পনাকে সার্থক ক'রে তুলতে গেলে যত সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন, তা তো আর একদিনেই তৈরী হয়ে যাবে না। সেইজন্যই সার্জেন্ট সাহেব দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা করেছিলেন—পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্যকরী করতে প্রায় ৪০ বৎসর লেগে যাবে। প্রথম পাঁচ বৎসর যাবে তোড়-জোড় করতে। ইত্যবসরে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করবার জন্য কিছু সংখ্যক শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক তৈরী হয়ে যাবে। তারপর প্রতি বৎসরে যেমন শিক্ষক তৈরী হতো সেই অনুপাতে কাজের পরিসরও ধীরে ধীরে বেড়ে যাবে। চল্লিশ বৎসর পরে যখন পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণাংগ হ'য়ে আসবে তখন সমগ্র ব্যবস্থার জন্য বৎসরে তিনশত কোটি টাকার মতন লাগবে। এত টাকার পরিমাণের কথা শুনলে চোখ তো কপালে উঠবেই। মনে হয় এত টাকা ব্যয় করা আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে সারা ভারতে তখন লোকসংখ্যা ছিল ৪০ কোটির মতন তাদের আপামর জন-সাধারণের শিক্ষার জন্য ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করা এমন কিছু বেশী নয়। এতে মাথা পিছু শিক্ষাখাতে ব্যয়ের দিকটা যদি তুলনা-মূলকভাবে আলোচনা করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের এই ব্যয় তাদের তুলনায় অনেক অল্প। আলোচ্য সময়ে ইংলণ্ডের সরকারের মাথা পিছু শিক্ষাবাবদ ব্যয় ছিল প্রায় তেত্রিশ

টাকার কাছাকাছি। সুতরাং সমগ্র দেশের স্বার্থের দিকে চাইলে তিনশত কোটি টাকা তো কিছুই নয়। এত টাকা কোথা থেকে আসবে তা ভেবে যদি আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি, তাহ'লে শিক্ষা-সংস্কারের আলাপ-আলোচনা, তার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা আমাদের কাছে চিরকাল কল্পনা-বিলাস হ'য়েই থাকবে। জাতির সর্বাংগীণ উন্নতির জন্য যে সব সংস্কারের একান্ত আবশ্যক শিক্ষা-সংস্কার তাদের মধ্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষাসংস্কার আবার রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সংস্কারের সংগে অংগাংগিভাবে বিজড়িত। যদি আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থার যথাযথ সংস্কার হয়, যদি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের আমূল পরিবর্তনের ফলে এদেশের যন্ত্রশিল্পের এবং ব্যবসায়ের বহুল প্রসার ঘটে, তাহ'লে আমাদের দেশের আর্থিক অনটন বিদূরিত হবে। তখন আমরা আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য তিনশ কোটি কেন, তার চেয়ে ঢের বেশী খরচ করতে পারবো এই আমাদের স্থির বিশ্বাস।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনা অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী এরূপ অভিযোগ এর বিরুদ্ধে আনা হ'য়েছে। কিন্তু পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে যে অনেক দিন সময় লাগবে এতে অধীর হবার কিছু নেই। দীর্ঘদিনের সর্বজনীন নিরক্ষরতা দূরীকরণ এক-আধ বৎসরের অথবা দু-দশ বছরের কাজ নয়। আর তা ছাড়া যে ধরনের শিক্ষা আমরা দিতে চাইছি তার জন্য বহু শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন। তাদেরকে প্রস্তুত করতে গেলে আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

ধর্মশিক্ষা নিয়ে যাঁরা বেশি মাথা ঘামান তাঁরা এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এই বলে সমালোচনা করেছেন যে সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় ধর্মশিক্ষার কোন স্থান নেই। এদেশের যাঁরা ধর্মভীরু লোক তাঁরা প্রায়ই বলে থাকেন আমাদের দেশের ধর্মহীন শিক্ষা কুশিক্ষার নামান্তর মাত্র, ঈশ্বরজ্ঞানহীন শিক্ষা সমগ্র দেশকে দিন দিন

অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা আরও বলেন ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষা দেওয়া যায় না। সমগ্র মানুষকে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে গেলে বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া একান্তভাবে আবশ্যক। কথাটা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন উঠ্‌বে—কোন ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে, কেমন ক'রে তা শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কোথায়ই বা, শিক্ষা দেওয়া হবে? এই সংগে আর একটি প্রশ্ন এসে পড়ে ধর্ম কি বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্য বস্তুর মত শ্রেণীতে শ্রেণীতে শেখানো যায়? ধর্ম মানুষের একান্তভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার। মানুষ আর অন্তরের দেবতাকে নিয়ে ধর্মের কাজ কারবার। এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে অন্য মানুষ বা সমাজের কোন ঠাঁই নেই। ধর্ম যেখানে রাষ্ট্র বা সমাজের সংগে একীভূত হ'য়ে গিয়েছে সেখানেই ধর্মের নামে বহু অধর্ম প্রশ্রয় পেয়েছে; সেখানেই ধর্মের অজুহাতে মানব সমাজে বহুতর অত্যাচার অবিচার প্রবেশ করেছে। তাই রাষ্ট্র আর ধর্মকে কোথায়ও একাকার ক'রে দিতে নেই। সত্যি কথা বলতে কি সমাজ তো ধর্মাতীত। রাষ্ট্র হবে সর্বজনীন, সকল সম্প্রদায়ের সর্বস্বার্থের পরম আশ্রয় স্থল। সেখানে বিশেষ কোন ধর্মকে টেনে আনলে বিরোধ অনিবার্য। যেখানে শিক্ষাধারা রাষ্ট্রায়ত্ত, সেখানে ধর্মশিক্ষা দেবার চেষ্টা করলে, কোন ধর্ম কতখানি শেখানো উচিত এবং কিভাবে শেখানো উচিত এ নিয়ে প্রশ্ন ও সমস্যার অন্ত থাকবে না। যদি ধর্মশিক্ষা রাষ্ট্রগত শিক্ষানীতি ব'লে বিবেচিত হয়, তাহ'লে প্রত্যেক ধর্মের সব কিছুই শেখান বিধেয়। এ করতে গেলে বিদ্যালয়ের পাঠ্যকাল ধর্মশিক্ষায় নিঃশেষ ক'রে দিতে হবে; সেখানে অন্য কিছু শেখাবার সময় বা অবসর থাকবে না। এখানে অনেকে হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন যে সকল ধর্মই তো মূলগতভাবে এক। সুতরাং বিদ্যার্থীদেরকে তো সেটুকু বোঝালেই যথেষ্ট। সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত জীবনদর্শনের মধ্যে অনেকখানি সামঞ্জস্য

আছে। কিন্তু সুকুমারমতি শিশুরা ধর্মের পশ্চাতে যে জীবন-দর্শন আছে, তাদের মধ্যে যে মূলগত ঐক্য আছে, তা কি হৃদয়ংগম করতে পারবে? তারা হয়তো বিভিন্ন ধর্মের বাইরের আচার-অনুষ্ঠানগুলি কোন প্রকারে বুঝতে পারে। আবার এই আচার-অনুষ্ঠানগত পার্থক্য নিয়েই ধর্মে ধর্মে যত গোল বাধে। ধর্মশিক্ষা নিয়ে যদি কোথায়ও বিরোধের সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে সেখানে ধর্মশিক্ষা না দেওয়াই ভাল। সত্য কথা বলতে কি ধর্ম কখনো বিদ্যালয়ে পড়িয়ে শেখান যায় না। এটা হ'লো সম্পূর্ণ অনুভূতির আর উপলব্ধির ব্যাপার। আর তা ছাড়া বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে থাকে কতক্ষণই বা! আমাদের জীবনের যত কিছু শিক্ষা তো বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই হয় না। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত নানাবিষয়ে শিক্ষালাভ করছি। বিদ্যালয়ে লব্ধ জ্ঞানের তুলনায় সে শিক্ষার উপযোগিতা ও মূল্য কোন অংশে কম তো নয়ই বরং বেশী। আমরা আমাদের পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়ে পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়-পরিজনের নিত্য সাহচর্যে, সহযোগিতায় এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে যে শিক্ষা অলক্ষ্যে লাভ করছি তার তুলনা মেলে না। গৃহ এবং পরিবারই ধর্মশিক্ষার প্রশস্ততম ও অনুকূলতম ক্ষেত্র হওয়া উচিত। সেখানে পিতামাতার অথবা অন্যান্য গুরুজনদের জীবনাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের স্নেহময় স্পর্শে সন্তান যে ধর্মে দীক্ষালাভ করবে, তেমনটি আর অন্য কোথায়ও পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস হয় না। প্রাচীনকালে ভারতের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন এমন সুসংবদ্ধ ও সুসংহত ছিল যে সেখানে বাস করেই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ধর্মব্যাপারে আপনা হ'তেই শিক্ষালাভ করতো। আজকাল আমাদের মনোভাব এই প্রকার দাঁড়িয়েছে যে বিদ্যালয়ের উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে আমরা অনেকখানি নিশ্চিত আরামে কাটাতে চাই। বিদ্যালয়ের উপর ধর্মশিক্ষার ভার দেওয়া কি বিদ্যার্থীদের দিক থেকে, কি সমাজের

দিক থেকে, কোন দিক থেকেই কল্যাণকর নয়। তাই সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় ধর্মশিক্ষাকে যদি বিদ্যালয়ের কৃত্যালীভুক্ত না করা হ'য়ে থাকে, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে বলে তো মনে হয় না।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মোটামুটি একটা কাঠামো ঠিক ক'রে দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু সেই প্রাণহীন কাঠামোতে প্রাণসঞ্চার করবার লোকের অভাব আমাদের দেশে যথেষ্ট। যে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয়করণের অর্থ হ'লো এই যে তা দেশের সর্বশ্রেণী সর্বলোকের প্রয়োজনমত ব্যবস্থা থাকবে। কোন একটা বিশেষ বয়সের উপযোগী বা বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা থাকলেই তাকে জাতীয় শিক্ষার পর্যায়ে ফেলা যায় না। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি, রুচি ও প্রয়োজন ভিন্নতর। তাই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের প্রকৃতি, রুচি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। সাধারণ শিক্ষার সংগে ব্যবহারিক শিক্ষা, বয়সানুপাতে শিশুশিক্ষা থেকে বয়স্ক শিক্ষা পর্যন্ত সকলপ্রকার স্তরগত বা শ্রেণীগত শিক্ষার আয়োজন থাকা উচিত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায়। আমাদের দেশ থেকে সর্বজনীন নিরক্ষরতা দূর করাই হ'লো আমাদের প্রধানতম সমস্যা। আমাদের দেশের সমগ্র জনসংখ্যার পাঁচভাগের চারভাগ লোক অক্ষরজ্ঞানবর্জিত। দেশ স্বাধীন হবার পরও যে আমরা এ-দিক দিয়ে বিশেষ অগ্রসর হতে পেরেছি তা নয়। দুর্ভাগ্যের কথা পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের শিল্প ইত্যাদি বৃদ্ধির দিকে জাতীয় সরকারের যে প্রকার মনোযোগ আছে, দেশের শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির দিকে ততখানি মনোযোগ দেওয়া হয়নি। সমগ্র দেশে আবশ্যিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়নি এখনো; কবে যে হবে তা সঠিকভাবে নিধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। আমাদের দেশের নিরক্ষর অগণিত বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো হয়নি। মাতৃজাতি এখনো যে তিমিরে সেই তিমিরে। ভারতীয় ললনারা

শতকরা ৫ জন অক্ষরজ্ঞানসমৃদ্ধ। এ-হেন অবস্থায় জাতীয় শিক্ষার কথা না তোলাই ভাল। ইংরেজ আজ ভারত ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তাদের অন্ধ অনুকরণ আমরা ক'রেই চলেছি। প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আমাদের যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নেই, আকর্ষণও নেই। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি পদে পদে ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্ছে।

আমরা যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি; জ্ঞান আহরণের কি নির্দিষ্ট সময়-রেখা আছে? বিদ্যালয়ের শিক্ষাই জীবনের সব কিছু নয়। প্রাচীন ভারতের লোকশিক্ষার ব্যবস্থা আজ লুপ্ত প্রায়। মাত্র শতাব্দী খানেক আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে লোক-শিক্ষা দেবার চমৎকার ব্যবস্থা ছিল যাত্রা, কথকতা, কবিগান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে—সেগুলো ছিল যেন সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অংগস্বরূপ। কিন্তু লোকশিক্ষার সেই প্রাচীন পদ্ধতি আজ নষ্টপ্রায়। সরকারী বয়স্কশিক্ষা ব্যবস্থায় এই পদ্ধতিটিকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়াস হ'চ্ছে। কিন্তু আধুনিক যুগে সে ব্যবস্থা যেন বেমানান ব'লে মনে হচ্ছে। অথচ বয়স্কশিক্ষার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা না করতে পারলে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি একেবারে ব্যাহত হয়ে থাকবে। মাধ্যমিক শিক্ষার কথাই ধরা যাক, অথবা উচ্চশিক্ষার কথাই ধরা যাক, এ-সব শিক্ষা দেশের সর্বসাধারণের জন্য নয়। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং বয়স্ক শিক্ষা-ব্যবস্থাই হলো সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা। দেশের কতিপয় লোক উচ্চশিক্ষিত হবে এবং সংখ্যাগুরু জনসাধারণ অজ্ঞানতাপংকে নিমজ্জিত থাকলে সে-দেশকে কেউ শিক্ষিত বলবে না। শরীরের সব অংগ প্রত্যংগ শীর্ণ ক্ষীণ হ'য়ে গেল আর মুখে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দেখা দিলে, সে-শরীরকে কেউ সুস্থ বলবে না। আমাদের সমাজ দেহেরও অনুরূপ অবস্থা। প্রাথমিক শিক্ষায় যার সূচনা হয় মাত্র; বয়স্ক শিক্ষায় তার পরিণতি হওয়া উচিত। পূর্ণাবয়ব সব কিছু আয়োজন আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় থাকা উচিত।

গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের ভার এখন জাতীয় প্রতিনিধিগণের উপর ন্যস্ত। কিন্তু তাঁরা এখন কি ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতির মোহময় নিগড় থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পেরেছেন? তাঁরা কি এপর্যন্ত আমাদের শিক্ষার্থীদিগকে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ক'রে তুলতে পেরেছেন? আমাদের জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি কি জাতীয়ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত? জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপোষক হলো জাতীয় শিক্ষা তার প্রধান বাহন হ'লো জাতীয় সংস্কৃতি এবং তার মুখ্য উপজীব্য হ'লো জাতীয় জীবনের আদর্শ। আমাদের দেশে শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা তার স্বকীয় আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। যদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কোনদিন জাতির সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন করতে পারে, তাহ'লে সেদিন একে জাতীয় শিক্ষার পর্যায়ভুক্ত করা যাবে, তার আগে নয়। আমাদের সমগ্র দেশকে এক জাতীয় আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলতে হ'বে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে। দেশকে অন্ধভাবে ভালবাসবো বা ভক্তি করবো—এ কখনো জাতীয় শিক্ষার আদর্শ হতে পারে না। এখন জাতীয় আদর্শের কথা নিয়ে মতভেদ হতে পারে। জাতীয় আদর্শের একটা প্রকৃষ্ট রূপ দেওয়া হয়তো সুকঠিন ব্যাপার; কিন্তু তার সম্বন্ধে আমাদের সকলের মনে একটা মোটামুটি ধারণা আছে—সেখানে আমরা সবাই বোধ হয় একমত। রাষ্ট্রগত স্বাধীনতাই আমাদের জাতীয় আদর্শ, আমাদের সকলের কাম্য বলতে পারি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কোন দল বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বাধীনতা নয়—সর্বসাধারণের সর্বক্ষেত্রে মুক্তিই আমাদের কাম্য—অভ্যন্তরের ও বাহিরের শোষণ-বিমুক্তিই আমাদের একান্ত কামনা। আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবন উদার সাম্য-নীতির উপর হবে প্রতিষ্ঠিত। সর্বজনীন ঐক্যের উপর আমাদের জাতীয় শিক্ষার অক্ষয় সৌধ রচনা করতে হবে। আমাদের জাতীয় শিক্ষার আদর্শ হবে ত্রিকালব্যাপী—অতীতের গৌরবের প্রতি তা হবে একান্তভাবে শ্রদ্ধাশীল, বর্তমানের সমস্যার প্রতি থাকবে তার

সদাজাগ্রত প্রখর মনোযোগ আর ভবিষ্যতের জাতির মংগলসাধনে তা হবে সম্ভাবনাময়, জাতীয় আদর্শ হবে প্রাণবান—কালের অগ্রগতির সংগে সংগে তার হবে পরিবর্তন এবং রূপান্তর। গণতান্ত্রিক ভারতে স্বাধীন ভারতীয় জনসমাজ গঠন করতে গেলে জাতীয় শিক্ষাকে জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষার কোন মনোজ্ঞ রূপ এখনো নির্ধারিত হয়নি। সেদিন কবে আসবে তার জন্য আমরা উন্মুখ ও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছি ; আর শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাকিয়ে আছি জাতির নির্মাতাদের দিকে এই আশায় যে তাঁরা নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে পথের দিশা দিয়ে আমাদের অনাগত ভবিষ্যতকে সাফল্যে সার্থক করে তুলবেন।

বিদ্যাসাগর

(১৮২০-১৮৯১)

বিদ্যাসাগরের জীবন এবং তাঁর শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। বিদ্যাসাগর জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের যুগের প্রাথমিক অধ্যায়ে। ইংরেজী যুগে যে সব ব্যক্তি নিজেদের প্রতিভাবলে স্বনামধন্য হয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদ্যাসাগরের জীবন আদ্যন্ত আলোচনা করলে একটি বিষয় আমাদের নিকট সবিশেষ প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে, ইংরেজী স্কুলে বা কলেজে যোগদান না করে, কেবলমাত্র টোলের ছাত্র হয়েও সে যুগে মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে এবং সেই সংগে জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারে। বিদ্যাসাগরের জীবন আমাদের নিকট সর্বদাই এই বাণী ঘোষণা করে যে, সে যুগের টোলের ছাত্রও সমাজ ও স্বদেশের সেবা

করতে পারে এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞানী ও গুণী হয়ে দেশের আদর্শস্থানীয় হতে পারে।

বাংলার তথা ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এবং বিশেষ করে এদেশের বর্তমান শিক্ষাধারার ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী একাধিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ অধ্যায়। ইংরেজ বণিকদের এদেশে রাজ্যবিস্তার রাতারাতির ব্যাপার নয়। যেদিন প্রথম ইংরেজ বণিক মোগল-সম্রাট জাহাংগীরের রাজসভায় এদেশে বাণিজ্য করবার জন্য আবেদন করেছিল এবং যেদিন পলাশীর আম্রকাননে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভের সৌভাগ্য সূর্য ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল, তখন কি কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল যে এই ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায় একে একে সমগ্র ভারতকে অক্টোপাসের মত গ্রাস করে শতাব্দী দুই বসে থাকবে এবং তাকে অন্তঃসারশূন্য করে ছেড়ে দেবে? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অন্তর্দ্বন্দ্বে মসীলিপ্ত। কেন্দ্রীয় মোগল শাসন হতবীর্য। প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃগণের অনৈক্য ও আত্মকলহ, বৈদেশিক আক্রমণে উদীয়মান মারাঠাশক্তির পতন এবং সেই সংগে ইউরোপীয় বণিকগণের এদেশে ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপনে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ব্যাপারে ঘটনাবহুল হয়ে আছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখা যায় যে ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায় এদেশে তাদের রাজনৈতিক অধিকার কায়েমী করবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত। ধীরে ধীরে ভারতে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হলো প্রতিষ্ঠিত। এর ফলে এতাবৎকাল প্রচলিত ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও মধ্যযুগীয় অর্থনীতি এক বিষম আঘাত খেলো। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের তরংগ এদেশেও এসে আঘাত হেনেছিল। ভারত হ'লো ইংলণ্ডের কাঁচামাল সরবরাহের একটি বিরাট উৎস এবং কেন্দ্র। এ দেশের নিজস্ব শিল্প ধীরে ধীরে লুপ্ত হ'তে লাগলো। আমাদের দেশের প্রাচীন অর্থনীতির ইমারতে ধ্বস নামলো, অথচ পরম পরিতাপের বিষয় এই হ'লো যে এদেশে কোন শিল্প-বিপ্লব ঘটলো না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে ভারতে সৃষ্টি হ'লো

একপ্রকার ভূম্যধিকারী এবং এ-দেশীয় বেনিয়া-সম্প্রদায় যারা সব-সময় ছিলেন ইংরেজদের অনুগ্রহভোজী। লুপ্তপ্রায় দেশীয় শিল্পের কর্মবিচ্যুত কর্মী ও মহাজন অনন্যোপায় হয়ে দিনে দিনে ভূমিদাস হয়ে যেতে লাগলো। কোম্পানীর যুগে ইংরেজদের কৃপাকণাভিখারী ভূম্যধিকারী এবং বেনিয়া-সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত হ'লো উনবিংশ শতকের বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কিন্তু তখনই লোকলোচনের অন্তরালে বাংলার মানসলোকে এক অভিনব আলোড়ন শক্তিসঞ্চয় করছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রয়োজনে বাংলাদেশে যে-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল ভারতের যুগজীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা আর সনাতনী সমাজের মনোজগতের সংঘাত ও অর্থনৈতিক সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত হলো উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব-জাগৃতি। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় ঔপনিবেশিক বিদেশী শাসন-ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও প্রতীচ্যের শিক্ষাধারার ঘাতপ্রতিঘাতে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব জাগরণ দেখা দিয়েছে। এই নব-জাগৃতির বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে, এ প্রথমদিকে অন্ধানুকরণ হ'লেও পরবর্তীকালে অনুকরণের মোহপাশ কাটিয়ে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ইংরেজদের দ্বারা সৃষ্ট, ইংরেজদের অনুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভরশীল নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত ভারতীয়গণ কেবলমাত্র যে ইংরেজ-প্রদর্শিত পথে বিচরণ করছে তা নয়। বরং তাঁরা সেই পথ হতে আংশিকভাবে বিচ্যুত হয়ে তাঁদের কর্ম, তাঁদের চিন্তা এবং তাঁদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা ছড়িয়ে পড়ছিল ধীরে ধীরে শিক্ষাপ্রাপ্ত জনসাধারণের মধ্যে। তাঁরাই নব-জাগৃতির এই মন্দাকিনী ধারাকে বইয়ে দিয়েছিলেন এই দেশে। এই সময় এ দেশে যাঁরা এই নব-জাগৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন, তাঁরা প্রতীচ্যের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ভাবধারায় ভাবিত ছিলেন। আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সংগে সংগে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অমোঘ বাণী বিপুল বেগে প্রবেশ করলো আমাদের দেশের শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের মনোরাজ্যে। সেই সংগে প্রতীচ্য-সম্ভব সংস্কারহীন বিবেক-বুদ্ধি, স্বাধীন চিন্তাধারা, গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ এবং নবতম জাগতিক পরিবেশের দাবী জানাতে লাগলো নব্যশিক্ষিত নবোদ্ভূত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আমাদের জড়তাগ্রস্ত সমাজের জাতিভেদ, নারী-পরাধীনতা, বহু-বিবাহ, বাহ্য আচরণ-নির্ভর নানাবিধ সামাজিক বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে নব্য-শিক্ষিতের দল বিদ্রোহের বৈজয়ন্তী তুললেন। অন্ধ বিশ্বাসের স্থলে দেখা দিল বুদ্ধি-নির্ভর যুক্তিবাদ। তীক্ষ্ণ যুক্তির নিকষে পরীক্ষিত হ'লো তদানীন্তন সমাজের ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ঐতিহ্য। এঁরা প্রতীচ্যের বিজ্ঞানকেও এদেশে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হ'য়েছিলেন। এই নব-জাগরণের বিজয়াভিযান চলেছিল এক অভিনব জীবনবোধ ও মানবতাবোধকে কেন্দ্র করেই।

পতনোভ্যুদয়ভরা বন্ধুর পথে চলেছিল এই নব-জাগৃতির জয়যাত্রা। এই যাত্রাপথের অগ্রদূত ছিলেন যুগপ্রবর্তক রামমোহন। রাম-মোহনের উত্তরসাধক ছিলেন দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার, কালীপ্রসন্ন, তারাচাঁদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। নব-জাগৃতির প্রাথমিক যুগে আন্দোলনটি প্রগতিমুখী হলেও তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব সমন্বয়। এ যুগের বৈশিষ্ট্য হ'লো পৌত্তলিকতা-বিরোধী একেশ্বরবাদ, কর্মফল ও দেহান্তরবাদে অনাস্থা, বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা ও কর্মের স্বাধীনতা। নব-জাগৃতির প্রথম যুগে প্রগতিবাদ তেমন উগ্ররূপ পরিগ্রহ করেনি। এর গতিপথ ছিল সমন্বয়ের খাতে। পরবর্তী কালে রাজা রাধাকান্ত দেব, ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল শীল, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাবিনোদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীরা হলেন বাংলার নব-জাগৃতির ধারক ও বাহক। এই যুগে নব-জাগৃতির ধারা রাধাকান্ত-ভূদেবের একদিকে যেমন ধর্মের গোঁড়ামি এবং সেই সংগে হৃদয়বত্তা ও উদারতার মধ্যে পর্যবসিত হয়েছিল অন্যদিকে তেমন আবার তা রামকৃষ্ণের প্রাকৃতিক মানবতাবোধ এবং বিবেকানন্দের ধর্ম ও সমাজবোধ, শাস্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরাট অনুভূতির মধ্য দিয়ে আরও ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করছিল। এই সময়কার আন্দোলনের

বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে পাশ্চাত্য ভাবধারার অভিনবত্ব, তার চুল-চেরা বিচার-বুদ্ধি এবং তার বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভংগী যে সনাতন ঐতিহ্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় তা এর পৃষ্ঠপোষকরা স্বীকার করতে কিছুতেই রাজী ছিলেন না। এর পরবর্তী যুগের নব-জাগৃতির সমর্থক হলেন নব্য বংগের দল। এদলে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তিগণ। এ-যুগের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এই সংস্কারক-গোষ্ঠির মধ্যে রামমোহনের যুগের সমন্বয়বাদ আরও চরমভাবে এবং ব্যাপকভাবে প্রকাশলাভ করেছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারাকে নিঃশেষে উপলব্ধি করে তাকে সমীকরণ করার দুঃসাহসিক প্রয়াস ছিল নব্যবংগের আন্দোলনের মধ্যে। সমস্ত মিথ্যা ধর্মবিশ্বাস, দেশাচার জনশ্রুতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরা তাঁদের অভিযান চালিয়েছিলেন। নব্য বংগের হোতারা ছিলেন উগ্র পাশ্চাত্যবাদী। কিন্তু প্রাচ্যকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করতে গিয়ে প্রাচ্যের সংগে তাঁদের হয়ে গেল ঘোর মিতালি।

লোকোত্তর-প্রতিভা বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হয়েছিল নব-জাগৃতির এই বিশাল পটভূমিকায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, প্রবীণ ও নবীনের চিন্তাধারার দ্বন্দ্বে বাংলার মানসলোক যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখন বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। উদারপন্থী সংস্কারধর্মী মনোভাবের তিনি ছিলেন মূর্ত বিগ্রহ। তিনি প্রাচ্যের মহিমাকে কোনদিন অবহেলা করেননি। আবার যখনই প্রয়োজন-বোধ ক'রেছেন তখনই প্রতীচ্যের যা কিছু বরণীয় তাকে গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর এই বীর্যবত্তার উৎসের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বলেছেন, "সাধারণ মেরুদণ্ডহীন বাঙালী চরিত্রের সহিত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের এতখানি পার্থক্য যে, সহসা সন্দেহ হয়, ইউরোপীয় প্রভাবে বিদ্যাসাগর মানুষ হিসাবে অত বড় হইয়াছিলেন কিনা ? কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আচারে ব্যবহারে বিদ্যায় তাঁহার আত্মভোলা সহানুভূতির মধ্য দিয়াই বাঙালীই ছিলেন। যদিও পুরুষকার আজ বাঙালী চরিত্রে দুর্লভ বস্তু, তবুও পুরুষানুক্রমে

ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ বহনকারী তাঁহার পিতৃ-পুরুষগণের অস্থিমজ্জা হইতেই তিনি এই পৌরুষ লাভ করিয়াছিলেন।” তিনি নব্য বংগের সমর্থকদের ন্যায় উগ্র প্রতীচ্যপন্থী ছিলেন না; আবার প্রাচ্যের ঐতিহ্যের প্রতি তিনি ছিলেন সশ্রদ্ধভাবে আস্থাশীল। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি কোনদিনই মোহগ্রস্ত ছিলেন না। যেখানেই তিনি কোন অনাচার দেখেছেন সেখানেই তিনি হেনেছেন তীব্র কশাঘাত। তাঁর এই মনোভাব সম্বন্ধে ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত এক মনোজ্ঞ মন্তব্য প্রকাশ ক’রেছেন। “একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয়শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুনীতির ফল, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব নিশ্চল তেজোহীন বংগসমাজ, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।” তদানীন্তন কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্জীব সমাজের শুভবুদ্ধি ফিরাতে চেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির নির্মম কশাঘাতে। এককভাবে লড়েছেন তিনি সারাজীবন।

বিদ্যাসাগরের কর্মক্ষেত্র ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। নিছক সমাজসেবায় এবং পরোপকারে তিনি উৎসর্গীকৃত ছিলেন না। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা সংস্কারের দিকেও তাঁর দৃষ্টি প’ড়েছিল। তাঁর জীবনের কর্মপথ কোনদিনই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না প্রতি পদে ছিল বাধা বিঘ্ন; কিন্তু তিনি সেগুলিকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করেছেন। পথে তাঁর আক্রমণ ও আঘাতের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তিনি সেগুলিকে নিজ বীর্যবত্তা ও চরিত্র-মহিমা দিয়ে শুধু যে জয় করেছিলেন তা নয়, প্রয়োজনবোধে প্রতি-আক্রমণেও কোনদিন পরাঙ্মুখ হননি। সংস্কারাচ্ছন্ন অতীতকে তিনি শুধু ধ্বংস করেননি; সেই ধ্বংস-স্তূপের উপর তিনি সৃষ্টির অভিনব সৌধ রচনা করেছিলেন। তাঁর নানাবিধ সংস্কারের মধ্যে আমরা এখানে তাঁর শিক্ষা-সংস্কারের কথা নিয়ে বিশেষভাবে

আলোচনা করবো। ইংরেজ শাসনের আদিযুগে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারে শাসক-শ্রেণী একেবারে অনিচ্ছুক ছিল বললেই চলে। সরকারী তহবিল থেকে যৎসামান্য যা ব্যয়িত হতো, তা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত স্বল্প এবং তাও আবার সংস্কৃত অথবা আরবী শিক্ষার জন্যই। দেশের জনসাধারণের জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ তখন আদৌ মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু সেই সময়কার নবোদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রকাশের সংগে এবং ইংরেজী শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত নব্য বংগের প্রবল দাবীর ফলে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক তাঁর শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছিলেন এই মর্মে যে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রতীচ্যের জ্ঞান-গরিমার প্রচার এবং প্রসারই ব্রিটিশ সরকারের মহদুদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষা বাবদ মঞ্জুরী সমস্ত সরকারী অর্থ কেবলমাত্র শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। শিক্ষাবিষয়ে সরকারী এই নীতির ঘোষণা জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সমাজের সর্বসাধারণ এর ফলভোগ হতে একেবারে বঞ্চিত ছিল। সেই সময় দু'চার লাইন ইংরেজী ভাষা বলতে অথবা লিখতে পারলে সরকারী চাকরি অথবা কোম্পানীর কুঠিতে বড় মাইনের চাকরি পাওয়া অসম্ভব ছিল না। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালপ্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষার সংশোধনের সংগে সংগে সংস্কৃত ভাষার সংস্কারও চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। এতদিন সংস্কৃত কলেজের দ্বার অ-ব্রাহ্মণদের নিকট অবরুদ্ধ ছিল। তিনি অধ্যক্ষ হবার পর ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর জন্য সংস্কৃত কলেজের অর্গল খুলে দিলেন। দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষা যাতে সবায়ের কাছে সহজবোধ্য হয় সেইজন্য তিনি রচনা করলেন "উপক্রমণিকা" এবং "ব্যাকরণ-কৌমুদী"। আধুনিক যুগের অগ্রগতির সংগে সংগে সংস্কৃত শিক্ষা যাতে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে, এবং যাতে এর অর্থকরী দিকটা একেবারে অবহেলিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি কলেজে ইংরেজীকে অবশ্য পাঠ্যরূপে প্রবর্তন করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে পূর্বে

প্রাচীন পদ্ধতিতে গণিত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। তার স্থলে তিনি ইংরেজী গণিতের প্রচলন করলেন। প্রাচীন পদ্ধতির ভাস্করাচার্যের লীলাবতী ও বীজগণিত শিক্ষা রহিত হয়ে গেল। সুলভে যাতে সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি 'সংস্কৃত ডিপোজিটরী প্রেস' স্থাপন ক'রেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং এই ভাষার প্রসার এবং প্রচারের দিকে লক্ষ্য থাকলেও জনসাধারণের দাবীর প্রতি আদৌ অমনোযোগী ছিলেন না। দেশের সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য সেই সময় একান্ত প্রয়োজন ছিল এক সর্বজনগম্য সহজবোধ্য ভাষা এবং স্বভাবতই তা মাতৃভাষাই হওয়া বিধেয়। এই সময় আমাদের দেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া থেকে বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনের সংগে বিজড়িত ছিলেন। কিন্তু সেই সময় এই আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার পথে অন্তরায় ছিল বহু। প্রথমে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল একটি দুস্তর বাধা; তারপর যথাযোগ্য শিক্ষকের অভাবও যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করেছিল। প্রয়োজনীয় পুস্তক ও যথাযোগ্য পুস্তক দিয়ে এ-ব্যবস্থাকে চালু করবার প্রয়াস করলেও এই প্রয়াসের প্রথম স্তরে সুযোগ্য পরিচালক এবং তত্ত্বাবধায়কের অভাব অনুভূত হয়েছিল। তাই এই শুভ প্রয়াস তেমন ফলপ্রসূ হ'তে পারলো না। দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার এবং উন্নতির বিষয়ে এই সময়ে সরকারী রাজস্ব-বোর্ড এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে বাংলা দেশের পাঠশালাগুলির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত এবং তার সফলতা একেবারে অসম্ভব। সরকারী পক্ষ থেকে এই সময়ে এ দেশে শিক্ষা প্রসারের সম্ভাবনা বিষয়ে নানাবিধ তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ দেশের তদানীন্তন শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এ্যাডাম ও টম্‌সন্ সাহেব নানা তথ্যসমন্বিত বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ ক'রেছিলেন। বাংলার তৎকালীন লেফ্‌টন্যান্ট গভর্ণর হ্যালিডে সাহেব তাঁদের তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে এক সরকারী নীতি

নির্ধারণ করেন। এই নীতি-নির্ধারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুচিন্তিত ও মূল্যবান অভিমত গ্রহণ করা হ'য়েছিল। বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন যে এদেশে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিসংসাধন করতে হলে শিক্ষা-ব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, অর্থাৎ সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত বাংলা শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া উচিত; কারণ একমাত্র এই উপায়েই জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। দ্বিতীয়ত, তিনি অভিমত পোষণ করতেন যে আমাদের দেশের তদানীন্তন শিক্ষা-ব্যবস্থা নিছক সংস্কৃতনির্ভর করে রাখলে চলবে না; তাকে অধিকতর ব্যাপক ও যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। তা করতে গেলে আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইতিহাস, ভূগোল, জীবন-চরিত, গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতি, পদার্থ-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, শারীর বিদ্যা ইত্যাদি পঠন-পাঠনের সুসংগত ব্যবস্থা একান্তভাবে বিধেয়। তৃতীয়ত, তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, এ-দেশের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে গেলে তার জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পঠিতব্য গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত করা উচিত। এই সংগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমহাশয়ের সর্বনিম্ন বেতনের হার নির্ধারণ এবং ভদ্রজীবনোপযোগী সংগত বেতনের মান স্থিরীকরণ আবশ্যিকরূপে যুক্তিযুক্ত। চতুর্থত, তিনি এই প্রস্তাব করেছিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে পথপ্রদর্শনের জন্য কয়েকটি জেলায় আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-পটু ও কর্মকুশল শিক্ষক নিয়োজিত হওয়া উচিত এবং এই সব বিদ্যালয়ে যাতে সুদক্ষ ও সুযোগ্য তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকে সে-বিষয়ে সরকারের সদাজাগ্রত প্রখর দৃষ্টি রাখা উচিত। যাতে শিক্ষণ-বিশারদ শিক্ষকের অপ্রতুলতা না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্র খুলতে চেয়েছিলেন। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান এবং পরিদর্শন কি প্রকার হওয়া উচিত সেই বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, পরিদর্শকগণ অযোগ্য শিক্ষকদের বিদ্যায়তন পরিদর্শন করবেন এবং

সেখানকার গুরুমহাশয়গণকে শিক্ষণ-রীতি সম্বন্ধে সহানুভূতিসূচক নির্দেশ ও উপদেশ দেবেন। সর্বশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রস্তাব ক'রেছিলেন, যে-সব এলাকায় পাঠশালা বা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, সেই সব এলাকার স্থানীয় অধিবাসীরা যাতে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সে-বিষয়ে তাদেরকে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করতে হবে। বিদ্যাসাগরের সুচিন্তিত এই অভিমত ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী বিবরণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। দেশের নানাস্থানে যাতে মডেল স্কুল অথবা আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং যাতে সেই বিদ্যালয়গুলি সুপরিচালিত হয় তার ভার হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। এর কিছুদিন পরেই কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবার উপায় স্থির করবার জন্য এক বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি গঠিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সমিতির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় বিদ্যাসাগর এর "ফেলো" মনোনীত হয়েছিলেন।

দেশে এই সময় যে-সব আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, তা সবের প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। আদর্শ বিদ্যালয়গুলির স্থান নির্বাচন সমস্যার বাস্তব দিকগুলির সংগে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন সুযোগ্য শিক্ষাবিদ্। তাই তিনি প্রথমেই বুঝেছিলেন যে এ-দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সার্থক করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষণপ্রাপ্ত সুযোগ্য শিক্ষক-মণ্ডলী। তাই অনতিবিলম্বে তিনি সংস্কৃত কলেজেই শিক্ষক শিক্ষণোদ্দেশ্যে নর্মাল স্কুলের উদ্বোধন করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর—এই চারিটি জেলায় কুড়িটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিশ্রমের পরিশেষ ছিল না। সংস্কৃত কলেজের নর্মাল স্কুল, চারটি জেলার ২০টি আদর্শ বিদ্যালয়গুলির পরিচালন ও পরিদর্শন ছাড়া সেই সময়ে প্রচলিত বাংলা পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধানের ভার তাঁর

ওপর ছিল ন্যস্ত। এই সময় তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ভারত সরকার সে পদের নাম পরিবর্তন করেন—তিনি এই সময় দক্ষিণবংগের বিদ্যালয়সমূহের বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সেই সময়কার এই বিদ্যালয়গুলির ক্রিয়াকর্মের এক বিবরণ তিনি রেখে গেছেন। এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে তিনি এই কাজে যথেষ্ট সফলতালাভ করেছিলেন। বিবরণে তিনি এই লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে "অল্প-সময়ের মধ্যেই স্কুলগুলি সন্তোষজনক উন্নতিলাভ করিয়াছে। ছাত্রগণ সকল বাংলা পুস্তকই পাঠ করিয়াছে, ভাষার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়; প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছে।" প্রথমে যখন এই সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন এগুলির ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনেকের মনে সংশয় ছিল। কিন্তু বিদ্যালয়-গুলির সার্থকতা জনসাধারণের সে-সন্দেহের নিরসন করে দিয়েছিল।

ভারতীয় ললনার শিক্ষা-আন্দোলনের সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নারী জাতির যোগসূত্র মুসলমান যুগ থেকে ক্ষীণ হতে আরম্ভ করে শেষে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছিল। এদেশের প্রাক্ ইংরেজ যুগে সামন্ত-তান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোতে ভারতীয় নারীরা যে স্থান অধিকার করেছিল, তাকে ঠিক স্বাধীনতা বলা চলে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তদানীন্তন সমাজের দৃষ্টিভংগী নারীর স্বাধীনতা বিষয়ে অতিশয় সংকীর্ণ ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে যখন নব-জাগৃতির তরংগ স্পন্দিত হচ্ছিল, তখন এদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল প্রোথিত হচ্ছিল এবং নারী শিক্ষা আন্দোলনও ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল। এই সময় শাসকশ্রেণী অবশ্য নারী শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু সংস্কার-বিমুক্ত বিদ্যাসাগরের এদিকে উৎসাহের অন্ত ছিল না। বিদ্যাসাগর জানতেন যে সনাতনী প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ এই আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করবে।

কিন্তু বিদ্যাসাগর সব বাধাকেই সাহসের সংগে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্ত্রী-পরাধীনতা অনগ্রসর সমাজের একটি প্রধান লক্ষণ। বিদ্যাসাগর দেশের এই কলংককে অপনোদন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার পথে দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে-যুগের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ, হিন্দুদের অর্থহীন জাত্যভিমান আর সরকারী ঔদাসীন্য। প্রাক্ বিদ্যাসাগরীয় যুগে যে এই কলংক অপনোদনের কোন চেষ্টা হয়নি তা নয়। বিদেশী মিশনারীরা এবং রাধাকান্ত দেব প্রমুখ এদেশীয় নেতারা এদিক দিয়ে কিছু কিছু চেষ্টাচরিত্র করে-ছিলেন; কিন্তু সে শুভ প্রয়াস ছিল অন্তর্নিহিত দোষে কালের বিপরীতগামী। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জন্য যেন কাল আগে থেকেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। কালের ইংগিত তাঁর প্রাণশক্তিকে করেছে দুর্জয়, তাঁর কর্মের মধ্যে এনে দিয়েছে দুর্বার গতি এবং তাঁর হৃদয়কে করেছে অবারিত। এদেশে নারী শিক্ষা প্রসারের তিনিই ছিলেন জনয়িতা। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন বীটন নারী বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নারীশিক্ষা পরিষদের মহাপ্রাণ সভাপতি বিদ্যাসাগরকে এই বিদ্যায়তনের সম্পাদকরূপে নিযুক্ত করেন। বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র বিরোধিতা দূরীকরণ মানসে এবং তদানীন্তন সমাজের দীর্ঘদিনের মানসিক আচ্ছন্নতা দূর করবার জন্য বিদ্যাসাগর হিন্দুশাস্ত্র থেকে বহু নজীর উপস্থিত করেছিলেন। "কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ"—মহানির্বাণ তন্ত্রের এই মনোময় বাণী বিদ্যায়তনের গাড়িতে খোদাই করে দেওয়া হয়েছিল। এই সময় বিরুদ্ধবাদীরা অবশ্য নীরব ছিলেন না। ঈশ্বরগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের শ্লেষ, বিদ্রূপ ও কটূক্তি বিদ্যাসাগর নীরবে সয়েছিলেন। বিরুদ্ধ দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও নারীবিদ্যালয়ের দ্বার অবারিতই রয়ে গেল। উন্নতমনা ভারতের কল্যাণকামী ইংরেজ বীডন যোগ্যতম ব্যক্তিকেই বীডন বিদ্যায়তনের সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আদর্শ বিদ্যালয়ের অনুকরণে বিদ্যাসাগর সারা বাংলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যালয়গুলির

জন্য তখন সরকারী মাসিক ব্যয় হতো ৮৪৫ টাকা। ঐ সময়ে বিদ্যালয়গুলিতে সর্বসাকুল্যে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০। উত্তর-জীবনে বিদ্যাসাগর যখন সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, তখনও তিনি নারীশিক্ষামূলক বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিলেন। নারীশিক্ষা আন্দোলন যে এই সময় কি প্রকার বিস্তৃতিলাভ করেছিল তা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের এক বিবরণী থেকে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। নারীশিক্ষা পরিষদ বিবরণে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, "১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া কমিটি বিশ্বাস করেন যে যাহাদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত, সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ক্রমেই ইহা সমাদরলাভ করিতেছে। বড়লোকেরা কখনও সাক্ষাৎভাবে বীটন বিদ্যালয়ের সুবিধা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় নাই; এই শ্রেণী হইতে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রীই স্কুলে প্রবেশলাভ করিয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ধনীগৃহেই কিন্তু মহিলাদিগের জন্য গৃহশিক্ষার আয়োজন হইয়াছে। বিশেষ-ভাবে বীটন স্কুলের হিতকর প্রভাবই ইহার কারণ, ইহাই সমিতির বিশ্বাস।"

এ দেশের শিক্ষার প্রসার এবং তাহার উন্নতির দিকে যে কেবল বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাহা নয়; বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রকৃষ্ট রূপ দিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক ছিলেন মহাত্মা রামমোহন। কিন্তু বাংলা ভাষাকে স্থায়ী, সুষ্ঠু ও স্বীয় সৌন্দর্যে সুষমান্বিত করে তোলেন বিদ্যাসাগর। বাংলা সাহিত্যের ভাষা ইতিপূর্বে ছিল সংস্কৃত অলংকারবহুল; ভাষার অগ্রগতি অলংকার উপমার বাধায় ব্যাহত হতো। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত অলংকার উপমার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে তার মধ্যে প্রয়োজন-বোধে মাত্রা ও যতির প্রবর্তন করে তিনি তাকে অনেকখানি আধুনিক যুগোপযোগী করে তোলেন। প্রাক্ বিদ্যাসাগরীয় যুগের সমাজ যেমন ছিল জড়তা-জটিল, সেই সময়কার বাংলা ভাষাও ছিল তেমনি

শ্লথগতি পংগুপ্রায়। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে যখন নব-জাগৃতির স্পন্দন শব্দিত হচ্ছিল, তখন বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাকে সহজ সাবলীল প্রকাশভংগীর স্তরে নামিয়ে আনার প্রয়াস লক্ষিত হচ্ছিল। সর্বজনবোধ্য মাতৃভাষার প্রয়োজন সকলেই মনেপ্রাণে উপলব্ধি করছিল। সমাজ-বিবর্তনের সংগে সংগে ভাষা-বিবর্তন সংসাধিত হচ্ছিল। এই সময় বাঙালী সমাজ এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছিল যেখানে বাঙালী সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য এক সর্বজনীন ভাষা ও সাহিত্যের তীব্র অভাব অনুভূত হচ্ছিল। সর্বজনগ্রাহ্য ভাষার সংগে বিজড়িত হয়ে আছে জাতির সর্বাংগীণ উন্নতি। বাঙালীর সামগ্রিক জাতীয় জীবন গঠনের ইতিবৃত্তে প্রথম কয়েকটি সোপান গড়ে দিলেন বিদ্যাসাগর এবং এইভাবে তিনি সমগ্র বাঙালী জাতিকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন। সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত শ্রেণীর ভাষা সংস্কৃতের বদলে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচলন করে এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যকে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সহজবোধ্য ক'রে তিনি সমগ্র বাঙালী জাতিকে চিরঋণে আবদ্ধ করে রেখে গেছেন।

ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সংস্কার-সাধন বিদ্যাসাগরের জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। পরিবর্তনশীল মহাকালের অলক্ষ্য সংকেত তিনি সম্যক উপলব্ধি ক'রেছিলেন। কালের অন্তর-প্রেরণা তিনি সব সময় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন এবং এই শুভ প্রেরণাই তাঁকে তাঁর কর্মে চিরকাল গতিদান করেছে। তাই গুরুভার কর্মের বোঝা তিনি বার বার তুলে নিয়েছেন অকাতরে নিজের স্কন্ধে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলো। হিন্দু বিধবা প্রত্যক্ষ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল বটে ; কিন্তু সমাজ তাকে ধীর ও স্থির মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল নানা সামাজিক বিধি-নিষেধের মাধ্যমে। কিন্তু অসহায়া বিধবাদের পক্ষে দেশাচার ও কুসংস্কারের দুস্তর বাধা অতিক্রম করা আদৌ সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এই সময় তারা পথের দিশা হারিয়ে ফেলছিল। তাদের জীবনের চরমতম মুহূর্তে আশার

দীপ-বর্তিকা নিয়ে বিদ্যাসাগর এসে দাঁড়ালেন তাদের জীবন-পথের পুরোভাগে—তিনি হলেন তাদের পথ-প্রদর্শক। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বহু-বিবাহ ও বাল্য-বিবাহ নিরোধ করবার জন্য বিদ্যাসাগরের প্রাণপাত পরিশ্রমের মূলে ছিল সেই সময়কার সমাজের বর্বরোচিত মনোবৃত্তির বিনাশসাধন। এর সংগে তিনি অনুভব করেছিলেন যে জীবনের কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার আছে—মানুষ হিসাবে নারীর স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং তাকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার মধ্যে কোন অপমান নেই। বরং নারীর গৌরব ও সম্মান বৃদ্ধির সংগে সংগে নরের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সংশ্লিষ্ট। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি যে তুমুল আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তা সেই সময়কার তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এবং ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রেছিল। সেই সময়কার হিন্দু সমাজ অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে গিয়েছিল। ধর্মের সনাতনত্ব, অক্ষম পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রের ভুয়োবচন উদ্ধৃতি ক'রে কু-সংস্কারজীর্ণ যে সমাজে বহু-বিবাহের অন্যায় অধিকার সমর্থিত হয়, সেখানে একই কারণ দেখিয়ে বালবিধবাদের বিবাহের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নীতিগতভাবে অসমর্থনীয়—এই কথা বিদ্যাসাগর মনপ্রাণ দিয়ে হৃদয়ংগম করেছিলেন। সেই সময়কার সমাজের ধর্মধ্বজীদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সুনিপুণ লেখনী ধরলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, "তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রী জাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ একেবারে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে,"—এইভাবে তিনি দেশাচারকে এবং সমাজের কুসংস্কারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। প্রসংগত, তিনি আবার ঘোষণা করলেন, "সর্বধর্মবহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারীরাও কেবল লৌকিক রক্ষাগুণে সর্বত্র সাধু বলিয়া আদরণীয় হইতেছে; আর দোষ-স্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও প্রচলিত আচারের অনুগত না

হইলেও সর্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গনণীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন।” প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র থেকে তিনি দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে বিধবা-বিবাহের পক্ষে অকাট্য যুক্তির অবতারণা করেছিলেন এবং তা দিয়ে তিনি বিরোধীপক্ষের কণ্ঠকে অবরুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। নব্যবংগ জাতি ও ধর্মকে নিন্দনীয় ব'লে ত্যাগ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের পথ অবশ্য বর্জনের পথ ছিল না ; তাঁর নীতি ছিল সংস্কারের নীতি। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে, দেশাচারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রতিনিয়ত ; অবশ্য তাকে ক্ষুরধার যুক্তি ও তর্কের পথে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহকে আইনসম্মত করে তোলবার জন্য তিনি আন্দোলন আরম্ভ ক'রেছিলেন, তখন বাংলার রক্ষণশীল সমাজও তাঁর বিরুদ্ধে উদ্যতখড়্গ হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মধ্বজীদের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন প্রবলতম বাধা। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন কর্তব্যে অটল এবং মন্ত্রসাধনে অনড়। কুলিশকঠোর এই সাদাসিধে মানুষটিকে তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি করবার শক্তি সেই সময় বাংলা-দেশে কারো ছিল না। তখন বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্যাসাগর আর তাঁর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহের কথা। জনশ্রুতি আছে যে শান্তিপুরের তাঁতীরা শাড়ীর পাড় বুনে বিদ্যাসাগর ও বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে জানিয়েছিল তাদের আন্তরিক অভিনন্দন। সেই সময় সহস্র সহস্র নারীর নীরব কণ্ঠ তাদের মুক্তির অগ্রদূত বিদ্যাসাগরকে জানিয়েছিল পরমাশীর্বাদ।

বিদ্যাসাগর তো বিদ্যার সাগর ছিলেনই ; সংগে সংগে তিনি ছিলেন দয়ার সাগর। তিনি ছিলেন দরিদ্র-বান্ধব ও আর্তত্রাতা। উদারহৃদয় দাতা এবং জনসেবক হিসাবে তাঁর তুলনা বিরল। প্রতীচ্যের ভাবধারার সংগে বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ ছিল না। প্রতীচ্যে ঐ সময় যে মানবিকতার আন্দোলন চ'লেছিল, তার ফলে সে দেশের সমাজে অতি দ্রুত রূপান্তর সাধিত হচ্ছিল। এই প্রসংগে একটি ব্যাপার আমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে যে তিনি প্রতীচ্যের ভাবধারায় ভাবিত না হয়েও, কেমন ক'রে তিনি ইতিহাসের অমোঘ

নির্দেশ অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন! বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যে অলোকসামান্য দূরদর্শিতা ছিল তা এই ব্যাপার থেকেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সরল অনাড়ম্বর জীবনের সংগে মহত্তম চিন্তার অপূর্ব সমন্বয় খুব কম ব্যক্তিরই জীবনে পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর ব্যক্তিগত আয়ের অধিকাংশই দুর্গতদের জন্য ব্যয়িত হতো। শত শত অনাথ বালকের মানুষ করার ভার এবং তাদের শিক্ষার গুরুদায়িত্ব তিনি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অমিত সাহসের আধার এবং তাঁর দাক্ষিণ্য ছিল অশ্রুতপূর্ব। বিধবাদের সমস্যা অথবা নারীর অধিকারের প্রশ্নকে অন্যান্য সামাজিক প্রশ্নের সংগে মানবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এদেশে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য তাঁর যে নিরলস পরিশ্রম ও প্রচণ্ড প্রয়াস তা সে যুগে সত্যই বিরলদৃষ্ট। তিনি ছিলেন জাতিগত অথবা ধনগত ভেদাভেদের বহু ঊর্ধ্বে। সামাজিক আচরণেও তাঁর কোন গোঁড়ামি বা কোন সংকীর্ণতা ছিল না। ক্ষুরধার যুক্তির কষ্টিপাথরে সবকিছু যাচাই করে নিতেন তিনি। কোন শাস্ত্রের আচারগত বিধি-নিষেধকে তিনি চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতেন না। তাঁর মতামত ছিল তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট। এক এক সময় বেদান্তকে ভ্রান্তদর্শন বলতে তিনি কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নি। বংগদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষার জন্য আর কোন পথিকৃৎ তাঁর মত নিঃসহায়ভাবে নিরবসর এত পরিশ্রম করেন নি। সর্বোপরি, আর একটি বিষয়ে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। তিনি দীর্ঘ এক যুগ ধরে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন; তিনি সারা জীবন তাঁর "চটিজুতাকে" একেবারে নিজস্ব করে রেখেছিলেন। অথচ সে যুগের প্রগতিপন্থীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য এবং সর্বাপেক্ষা আধুনিক মন নিয়ে তিনি দেশের সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাপ্রসারের কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন।

পরিণত বয়সে যখন তিনি সরকারী কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি শিক্ষাজগতের সংগে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিন্ন করতে পারেন নি। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলার

প্রথম বেসরকারী কলেজ মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। সরকারী প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউ-শনের সংগে ছিল তাঁর প্রাণের যোগাযোগ।

বিদ্যাসাগর ছিলেন ইংরেজ-আনীত বিপ্লবাবর্তের উৎকৃষ্ট ফসল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে তিনি না হলেন উগ্র পাশ্চাত্যবাদী, না বা হলেন প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল, না বা সংস্কার-বাদী রক্ষণশীল, না বা নবতম কোন ধর্মব্রতী। তিনি পুরাপুরি প্রাচ্য-ভাবাপন্ন রয়েই গেলেন। এখানেই নিহিত রয়েছে তাঁর অলোক-সামান্য বৈশিষ্ট্য এবং এইজন্যই তাঁহার সামাজিক সংস্কারের অসীম গুরুত্ব। বিদ্যাসাগর কোনদিনই রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান নি। রাজনীতিকে সর্বদা বর্জন ক'রে কি ক'রে পরিস্রুত সমাজ নির্মাণ করা যায়, কি করে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি করা যায়, সেদিকেই তাঁর জীবনের কর্মপ্রয়াসকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি নারীমুক্তি আন্দোলনকে খানিকটা সার্থক করে তুলেছিলেন; কিন্তু পরিশেষে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। নারী-শিক্ষার গোড়াপত্তন তাঁর সময়ে হয়েছিল বটে; কিন্তু এই কর্মপ্রয়াস সমাজে সুদূরপ্রসারী হতে পারে নি। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হলো বটে, কিন্তু তা শুধু আইনেই নিবদ্ধ হয়ে রইলো —বিধবা-বিবাহ সমাজে হয়ে রইলো সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে বিদ্যাসাগর এই ব্যর্থতার জন্য কোনক্রমেই দায়ী ছিলেন না। আমাদের এদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নব-জাগৃতির আলোড়নের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ ছিল, সেখানেই নিহিত ছিল এসবের বিফলতার কারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে নব-জাগরণের তরংগ যে বন্যা এনেছিল, তা ছিল মুখ্যত মানসিক। ইউরোপে এই নব-জাগৃতির পটভূমিকা ছিল অর্থনৈতিক। এদেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবজগতে পরিবর্তন এলো বটে, কিন্তু সেই সময়কার অর্থ নৈতিক সমাজ-ব্যবস্থা

মুখ্যত সামন্ততান্ত্রিক রয়েই গেল। ইউরোপে যেখানে শিল্প-বিপ্লবের ফলে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা মাথা তুলে দাঁড়ালো; ভারতবর্ষে সেখানে বিদেশী-শাসকবর্গের কারসাজিতে কোন শিল্প-বিপ্লব হলো না, অথচ এখানকার সমাজ মুখ্যত সামন্ততান্ত্রিক রয়ে গেল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল এদেশের সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা চুরমার করে দিয়ে সেখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সৃষ্টি করা। রাজনীতির বিবর্তনের সংগে দেশের অর্থনীতি এবং সেই সংগে দেশের শিক্ষা ও সমাজ কি গভীর ভাবে যে জড়িত সেটা বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু নব্যবংগের নব-জাগৃতির ইতিহাসে তাঁর দান চিরদিন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ

(১৮৬১—১৯৪১)

অনেকেরই মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে, দেশে দেশে আজ যে নোতুন শিক্ষাযুগের প্রবর্তন হয়েছে, তার গোড়াপত্তন হয়েছিল ইউরোপ ও আমেরিকায়। এই ভ্রান্ত ধারণার পশ্চাতে রয়েছে শিক্ষা-জগতে রবীন্দ্রনাথের অবিনশ্বর দান সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা। বিদেশের লোকেরা তো এ কথার সন্ধান রাখে না; আমাদের দেশের কয়জনই বা একথা জানে! রবীন্দ্রনাথকে জেনেছি আমরা কবিকুল-শ্রেষ্ঠ হিসাবে। তাঁর অলোকসামান্য কবি প্রতিভায় সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়াভিভূত; তাঁর চারুকলার খ্যাতি আজ দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা, সূক্ষ্মানুভূতি ও সৃজনীশক্তি যে শিক্ষাক্ষেত্রে সমভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে এ ব্যাপারটি মানুষের চক্ষে সহজে ধরা পড়ে নি। অথচ যদি একটু খতিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যে সব শিক্ষাবিদ ও

মনীষিগণ নবযুগের ডমরু বাজিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। তাঁরই প্রায় সমসাময়িক আমেরিকার জন ডিউয়ি এবং ইতালীর মাদাম মন্টেসরি সারা বিশ্বে যে সম্মান পেয়েছেন, সে সম্মান রবীন্দ্রনাথেরও প্রাপ্য, হয়তো আরও কিছু বেশী। শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্লেটো, রুশো, পেস্টালট্সি ও ফ্রেবেলের সংগে সমান আসন পাবার সম্পূর্ণ অধিকারী। এঁরা এঁদের গভীর ও দূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে পথের সন্ধান জগতকে জানিয়েছেন, সে পথে আছে আনন্দ, মুক্তি এবং মানবমনের উন্মেষণ। আজও জগৎ সে পথ দিয়ে তার লক্ষ্যস্থানে বা গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে পারছে না। তার পক্ষে পুরাণো পথের মায়া কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না—তারই কুহকে পড়ে মুক্তিপথের ইংগিত সে দেখেও দেখ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা-জগতে যে বাণী প্রচার করেছেন ও তাঁর কর্মজীবনে তাকে যে মূর্ত রূপ দিয়েছেন, তাতে আছে শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মানবশক্তির মুক্তি। এদিক দিয়ে বিচার করলে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর দান অতুলনীয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক J. J. Findlay তাঁর "*Foundation of Education*" (1930) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের একস্থানে যা উল্লেখ করেছেন তা সবিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তিনি সেখানে বলেছেন—"আমাদের বর্তমান যুগে দুইজন প্রথিতযশা মানবের আবির্ভাব হয়েছে; প্রাচীর জন ডিউয়ি আর প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁদের দুজনের অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় সারা বিশ্ব আজ চমৎকৃত ও মুগ্ধ। এই দুই মণীষীর আরও বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তাঁরা দুজনেই শিশু মনোরাজ্যে প্রবেশ করে তার অলিগলির সন্ধান দিয়েছেন আমাদের সবাইকে। দুজনেই বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন, কিন্তু দুজনেই নিযুক্ত রয়েছেন বিদ্যালয় পরিচালনায়।"

ঐ পুস্তকের অন্যত্র তিনি বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথের মতে আশ্রম, তপোবন, নক্ষত্র, আকাশ, সংগী ও প্রতিবেশী—এই সামগ্রিক

পরিগমের মাধ্যমেই আমাদের অন্তরে বিকশিত হয়ে ওঠে এক অনাবিল আনন্দ। ডিউয়ি বোধ হয় আমাদের মনন রাজ্যের অবচেতন স্তরে এমন একটি প্রভাব সৃষ্টি করতে চান যাতে শিশুচিত্তের অনুসন্ধিৎসা হয়ে ওঠে প্রখর এবং তাদের বুদ্ধি হয়ে ওঠে ক্ষুরধার এবং এই সংগে তারা জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে উঠ্‌বে। প্রসংগত, ডিউয়ি যে সব বস্তু ও উপকরণের ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন সে সব আমরা ব্যবহার করেছি মানব সভ্যতার আদিমতম যুগে; কিন্তু সে সব উপকরণ বর্তমান যুগের প্রয়োজন মেটাতে অপারগ। রন্ধনশালায়, উদ্যানে এবং কর্মশালায় নানাপ্রকার কাজের মাধ্যমে শিশুরা পরস্পরের প্রতি প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হবে; এতে তাদের মনে মনুষ্যত্ব বোধ জাগ্রত হবে এবং তাদের বিবেচনা শক্তিও বাড়বে।…তুলনামূলকভাবে আলোচনা করতে গেলে আমেরিকার সংস্কৃতি বাংলা দেশের সংস্কৃতির চেয়ে অনেক নীরস এবং বাস্তবধর্মী। আমেরিকার নামজাদা বংশের মানুষেরা ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে নির্বাসিত মানুষের বংশধর। আমেরিকায় তাদেরকে নোতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হয়েছে, এবং নোতুন করে তাদের জীবন ও শিল্পের মূল্য নির্বাচন করতে হচ্ছে।

তবুও দেখা যায় সিকাগো সহরের লেবরেটরী স্কুলের শিক্ষকদের সংগে বোলপুরের শান্তিনিকেতনের সমব্যবসায়ীদের মধ্যে যেন একটা ঐক্যের যোগ রয়েছে—কারণ উভয়েই ঐশ্বর্যের লোভ ও আড়ম্বরকে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে অস্বীকার ও পরিহার করেছেন এবং তাঁদের প্রাত্যহিক কৃত্যালীর মধ্যে শিশুজীবনের প্রতি নিজেদের গভীর মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। উভয়েই বর্তমান শতাব্দীর জড়বাদী সভ্যতার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্তি চেয়েছেন।” প্রসংগত, অন্য একটি বিষয় এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার কথা স্মরণ করে এবং বিশেষ করে তাঁর শিক্ষক-জীবনের কথা স্মরণ করে অধ্যাপক ফিণ্ডলে তাঁর পুস্তকখানি উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের নামে। “কবি দার্শনিক ও বোলপুরের

আমাদের প্রত্যেককে অতিক্রম করে তিনি তাঁর সর্বময় সত্তায় অধিষ্ঠিত। তাঁর বিরাট সংকল্পের অনুযায়ী চিন্তাগুলি বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সারিবদ্ধ হয়ে কেবলি চলেছে পূর্ণ সত্যের দিকে। তাঁর সংগঠনের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই স্থান আছে। কিন্তু তাঁর সংকল্পের সংগে সজ্ঞান সামঞ্জস্য রাখা আমাদের ইচ্ছাধীন। এমন কি আমরা নিজেদের সর্বনাশ স্বীকার করে তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারি। কিন্তু যখন আমরা তাঁর সহযোগিতা করি তাঁর সংগে তখনি কেবল লাভ করি আমাদের সত্যধর্ম।"

"*The Religion of Man*" নামক গ্রন্থের "A Poet's School" শীর্ষক অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শনের সারমর্ম লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি মনে করতেন তাঁর শিক্ষাদর্শন সাধারণ দর্শনের একটি বিশেষ অংগ। তিনি সেখানে বলেছেন,—"তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সংগে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।" এই অধ্যায়ের অন্যত্র তিনি আবার বলেছেন—"আমি একান্তভাবে দুটি জিনিষকে মিলিত করবার আকাংক্ষা করেছি : প্রাচ্য সাধকের অন্তর্ময় দৃষ্টি, যার দ্বারা মনের নির্জনে সে দেখা পায় বিশ্ব-আত্মার ; আর সেবাকর্মে সে ধ্যানেরই বহিঃপ্রকাশ—যা ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা সংকোচের জড়িমার মধ্য থেকে জাগিয়ে তোলে সম্পদকে, সৌন্দর্যকে, কল্যাণকে।"

এই বিশ্ব-আত্মার সংগে নিবিড় সংযোগ স্থাপনের জন্য কবির চিত্ত বোধ করি মাঝে মাঝে আকুল হয়ে উঠতো। তাই তিনি বিশ্বমিলনের বার্তা গেয়েছিলেন—

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ভালো করে বোঝবার আগে তাঁর জীবনদর্শন সম্বন্ধে আমাদের সম্যক পরিচয় থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদ যে তাঁর শিক্ষাদর্শকে বহুলাংশে

প্রভাবান্বিত করেছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর কাব্য, প্রবন্ধ, আলোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতির মাঝে তিনি লুকিয়ে রেখে গেছেন তাঁর জীবনবাদ। সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সেটাকে খুঁজে বার করতে হবে। সুপ্রাচীন যুগের দ্রষ্টা ঋষিরা সে সত্য উপলব্ধি ক'রেছিলেন, উপনিষদে যা তাঁরা লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন উত্তরসাধকগণের জন্য, রবীন্দ্রনাথ সেই পরম সত্যের ছিলেন একাগ্র পূজারী। একটি নিবিড় ঐক্যবোধ এই সত্যকে মহিমান্বিত করে; সুমহান ত্যাগে আবার এই সত্য সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জীবনের প্রতি পরম আস্থার দ্বারা এই সত্য মানুষকে তার সর্ব কর্মে করে পরিচালিত। বিচ্ছেদের আবর্তে, ভোগ ও লোভের মোহে, এবং অবিশ্বাসের কুহেলিতে সেই সত্য খণ্ডিত হয়। কবির জীবন-দেবতাই তাঁর এই সত্যোপলব্ধির পথে প্রধান সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা তাঁর নিজস্ব জীবন-বোধের দ্বারা হ'তো নিয়ন্ত্রিত। রূপ-রস-গন্ধে-ভরা এই দৃশ্যমান জগতের অপরূপ সৌন্দর্য যখন কবি তাঁর নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন, তখন তিনি এ সবের মাঝে নিজের জীবনদেবতার অপূর্ব লীলাকে ক'রেছেন প্রত্যক্ষ। তাঁর জীবনদেবতা নির্গুণ নিরুপাধি পরমব্রহ্ম নয়। তাঁর জীবনদেবতা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন সমগ্র বিশ্বে। তাঁর অসীম "সীমার মাঝে" "আপন সুর" বাজান। কবির জীবনদেবতা চলমান, গতিশীল এবং বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির সংগে ওতোপ্রোতভাবে বিজড়িত। উপনিষদের "চরৈবেতি" মন্ত্র তাঁর জীবন-দেবতার উদাত্ত কণ্ঠে উদ্গীত হ'য়েছে। কিন্তু কবির এই গতির নেশা আত্মমুক্তির জন্য নয়। তিনিই ব'লেছেন—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" তিনি চেয়েছেন—"অনন্ত বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।" "তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া" তিনি সমস্ত বিভেদকে অপসারণ করে "একটি বিরাট হিয়া" জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের লক্ষ্য ছিল—বিবিধের মাঝে মহামিলন সংগঠন অথবা বহুত্বের মধ্যে একত্বের উপলব্ধি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গীত" হয়েছিল তাঁর পুস্তকখানি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ আলোচনা করার আগে তাঁর জীবনদর্শন সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; কারণ, তাঁর জীবন-দর্শনের পটভূমিকায় আমাদের বুঝতে হবে তাঁর শিক্ষাদর্শকে। তাঁর নিজের জীবনদর্শনের কোন অস্তিত্ব ছিল না একথা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বারবার স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলে হবে কি? তাঁর দীর্ঘ রচনাজীবনের বিভিন্ন সময়ে ও প্রসংগে তাঁর মানসলোকের যে সব ধারণা ও অনুভূতির উল্লেখ করেছেন, তা সব আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও তাদের মধ্যে একটি ধারা-বাহিকতা এবং সংহতি আপনা হতেই সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাঁর জীবনদর্শন স্বতোসারিত হয়েছে তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র মৌলিক অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁর জীবনের আপাতবিরোধী ভাবগুলিকে তিনি তাঁর হিবার্ট বক্তৃতায় সুসংহত করার প্রয়াস করেছিলেন। "*The Religion of Man*" গ্রন্থখানিতেই তাঁর জীবনদর্শন সম্বন্ধে তাঁর স্বকীয় বিবৃত্তি পাওয়া যায়। যে দর্শন জীবনানুগ, সেখানে বিভেদ-বর্জিত বিষয়-নিরপেক্ষ সমগ্রতা স্বাভাবিক। তাঁর জীবনদর্শন এবং তাঁর শিক্ষাদর্শনের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক রচনার প্রাচুর্য কম নয়। সেই সব রচনার মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা তাঁর জীবনদর্শনের ইংগিত তো পাবোই এবং সেই সংগে তাঁর শিক্ষাদর্শনের আভাসও পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো মানুষের অন্তর্লীন ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ পরিণতি; কিন্তু তা করতে হবে বিশ্বসত্য বা বিশ্বমানবের সংগে সামঞ্জস্য রেখে এবং তারই প্রভাবে ব্যক্তিতার সুনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানুষের তনু, মন, প্রাণ ও আত্মা এক অপরূপ বিশ্বচেতনার সংগে একসূত্রে গ্রথিত; মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তারই মধ্যে সমাহৃত। কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী সত্তার প্রমাণ

কোথায়? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন যে আজ পর্যন্ত বিশ্বের মানবের সভ্যতাগুলির সমস্ত প্রয়াস, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে, তার বৈচিত্র্যময়, কর্মসাধনা ও বিচিত্র মানবসম্বন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে তার আত্মোন্নতি ও আত্মপ্রকাশের সমস্ত চেষ্টাই হয়ে আছে ভূমামুখী—অর্থাৎ তার সব কিছুই চেয়ে আছে বৃহতের দিকে। তার চেতনশীল মন হয়তো সব সময় এই বিশ্বমানবকে স্বীকার করতে চায় না, কিন্তু তার জীবনের চরম ও পরম মুহূর্তে তার মগ্ন চৈতন্যের প্রবণতার মধ্যে এই অনুভূতির ইংগিত পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *"The Religion of Man"* নামক গ্রন্থে এই বিশ্বমানবের যথার্থ স্বরূপটিকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই ধারণার প্রকৃত রূপটি কি এবং তার সংগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পর্কই বা কোথায় তা আমরা নীচের দুটি উদ্ধৃতি থেকে হৃদয়ংগম করতে পারবো।

"মানুষের ঐক্যকে যুক্তির ভাষায় যাই নাম দেওয়া যাক না, অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমরা শ্রেষ্ঠ আনন্দলাভ করি যখন অপরের মধ্যে নিজেকে পাই—আর এই হলো ভালবাসার সংজ্ঞা। এই প্রেমই সমগ্রের সাক্ষ্য বহন করে আনে—যা মানুষের পূর্ণ ও শেষ সত্য। এরই দ্বারা উন্মোচিত হয় আমাদের বৃহত্তম মুক্তির ক্ষেত্র এবং সেখানেই মানব-আত্মার অতুল ঐশ্বর্য অর্জিত হয়েছে সহানুভূতি ও সহযোগিতার দ্বারা, জাতিবর্ণনির্বিশেষে জনসেবার জন্য বুদ্ধির কঠোর তপস্যার দ্বারা। আমাদের জীবনে যা অতিরিক্ত তারই অন্তহীন দেশে থাকেন প্রেমের দেবতা, তিনি আমাদের চেতনাকে বিচ্ছেদবোধের মায়া থেকে মুক্ত করেন, মানুষের জগতে তিনিই চিরকাল করেছেন দীপ্তিবিস্তারের আয়োজন…আর সেই হলো সভ্যতার মূল প্রেরণা।"

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র আবার বলেছেন—"কল্পনার দ্বারা আমরা দর্শনলাভ করতে পারি এই বিশ্বপুরুষের, কিন্তু তিনি আমাদের মনের সৃষ্টি নন। ব্যক্তিমানুষের চেয়ে তিনি অনেক বেশী সত্য,

আমাদের প্রত্যেককে অতিক্রম করে তিনি তাঁর সর্বময় সত্তায় অধিষ্ঠিত। তাঁর বিরাট সংকল্পের অনুযায়ী চিন্তাগুলি বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সারিবদ্ধ হয়ে কেবলি চলেছে পূর্ণ সত্যের দিকে। তাঁর সংগঠনের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই স্থান আছে। কিন্তু তাঁর সংকল্পের সংগে সজ্ঞান সামঞ্জস্য রাখা আমাদের ইচ্ছাধীন। এমন কি আমরা নিজেদের সর্বনাশ স্বীকার করে তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারি। কিন্তু যখন আমরা তাঁর সহযোগিতা করি তাঁর সংগে তখনি কেবল লাভ করি আমাদের সত্যধর্ম।"

"*The Religion of Man*" নামক গ্রন্থের "A Poet's School" শীর্ষক অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শনের সারমর্ম লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি মনে করতেন তাঁর শিক্ষাদর্শন সাধারণ দর্শনের একটি বিশেষ অংগ। তিনি সেখানে বলেছেন,—"তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সংগে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।" এই অধ্যায়ের অন্যত্র তিনি আবার বলেছেন—"আমি একান্তভাবে দুটি জিনিষকে মিলিত করবার আকাংক্ষা করেছি: প্রাচ্য সাধকের অন্তর্ময় দৃষ্টি, যার দ্বারা মনের নির্জনে সে দেখা পায় বিশ্ব-আত্মার; আর সেবাকর্মে সে ধ্যানেরই বহিঃপ্রকাশ—যা ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা সংকোচের জড়িমার মধ্য থেকে জাগিয়ে তোলে সম্পদকে, সৌন্দর্যকে, কল্যাণকে।"

এই বিশ্ব-আত্মার সংগে নিবিড় সংযোগ স্থাপনের জন্য কবির চিত্ত বোধ করি মাঝে মাঝে আকুল হয়ে উঠতো। তাই তিনি বিশ্বমিলনের বার্তা গেয়েছিলেন—

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ভালো করে বোঝবার আগে তাঁর জীবনদর্শন সম্বন্ধে আমাদের সম্যক পরিচয় থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদ যে তাঁর শিক্ষাদর্শকে বহুলাংশে

প্রভাবান্বিত করেছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর কাব্য, প্রবন্ধ, আলোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতির মাঝে তিনি লুকিয়ে রেখে গেছেন তাঁর জীবনবাদ। সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সেটাকে খুঁজে বার করতে হবে। সুপ্রাচীন যুগের দ্রষ্টা ঋষিরা সে সত্য উপলব্ধি ক'রেছিলেন, উপনিষদে যা তাঁরা লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন উত্তরসাধকগণের জন্য, রবীন্দ্রনাথ সেই পরম সত্যের ছিলেন একাগ্র পূজারী। একটি নিবিড় ঐক্যবোধ এই সত্যকে মহিমান্বিত করে; সুমহান ত্যাগে আবার এই সত্য সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জীবনের প্রতি পরম আস্থার দ্বারা এই সত্য মানুষকে তার সর্ব কর্মে করে পরিচালিত। বিচ্ছেদের আবর্তে, ভোগ ও লোভের মোহে, এবং অবিশ্বাসের কুহেলিতে সেই সত্য খণ্ডিত হয়। কবির জীবন-দেবতাই তাঁর এই সত্যোপলব্ধির পথে প্রধান সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা তাঁর নিজস্ব জীবন-বোধের দ্বারা হ'তো নিয়ন্ত্রিত। রূপ-রস-গন্ধে-ভরা এই দৃশ্যমান জগতের অপরূপ সৌন্দর্য যখন কবি তাঁর নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন, তখন তিনি এ সবের মাঝে নিজের জীবনদেবতার অপূর্ব লীলাকে ক'রেছেন প্রত্যক্ষ। তাঁর জীবনদেবতা নির্গুণ নিরুপাধি পরমব্রহ্ম নয়। তাঁর জীবনদেবতা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন সমগ্র বিশ্বে। তাঁর অসীম "সীমার মাঝে" "আপন সুর" বাজান। কবির জীবনদেবতা চলমান, গতিশীল এবং বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির সংগে ওতোপ্রোতভাবে বিজড়িত। উপনিষদের "চরৈবেতি" মন্ত্র তাঁর জীবন-দেবতার উদাত্ত কণ্ঠে উদ্গীত হ'য়েছে। কিন্তু কবির এই গতির নেশা আত্মমুক্তির জন্য নয়। তিনিই ব'লেছেন—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" তিনি চেয়েছেন—"অনন্ত বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।" "তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া" তিনি সমস্ত বিভেদকে অপসারণ করে "একটি বিরাট হিয়া" জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের লক্ষ্য ছিল—বিবিধের মাঝে মহামিলন সংগঠন অথবা বহুত্বের মধ্যে একত্বের উপলব্ধি।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক উপলব্ধি কোথায়ও দ্বন্দ্ববিনির্মুক্ত নয়, তিনি তাঁর "আমার ধর্ম" প্রবন্ধে তাঁর আত্মোপলব্ধির পশ্চাতে এই দ্বন্দ্বময় গতিশীলতার কথা ব্যক্ত ক'রেছেন। তিনি বলেছেন—"যখন আমার বয়স অল্প ছিল, তখন নানা কারণে লোকালয়ের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না; তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সংগেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়। কেননা, এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সংগে মনের, ইচ্ছার সংগে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সভ্য অবস্থা···কিন্তু এই মিলনটিতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেননা, আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটা বড় মিল চায়। এ মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে সম্ভব। যে শ্রেয়ঃ মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে, সেই শ্রেয়ঃকেই আশ্রয় ক'রেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রার" 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।···এর পর থেকে বিরাট চিত্তের সংগে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগলো। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন।···তারপর আমার রচনায় বার বার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে—জীবনে এই দুঃখ বিপদ বিরোধ মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব।" রবীন্দ্রনাথ আবার অন্যত্র বলেছেন—"এই যে দ্বন্দ্ব—মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ; এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পায়—যে সমাধানে পরম শান্তি, পরম মংগল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বার বার আমি ব'লেছি।"

রবীন্দ্রনাথ এই অনন্তের সংগে মিলনে একান্ত অভিলাষী। কিন্তু তা সম্ভব হবে কি করে? তিনি বলেন, তা সম্ভব হ'তে পারে

একমাত্র জীবনের সংঘাতের মধ্য দিয়েই। হৃদয়ে আনন্দের অভিব্যক্তি হয় এই মিলনের মাধ্যমে। তাই দুঃখের বেশে তাঁর জীবনদেবতা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন, তখন তিনি থাকেন অকুতোভয়। তিনি বলেছেন—"আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সব চেয়ে বড় কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রযান্ত্যতি সংবিশন্তি; আনন্দ হ'তেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।...যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকে চলিয়াছে, ধুকিতে ধুকিতে রাস্তার ধুলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার জন্য নহে।" কিন্তু সেই পরমানন্দকে হৃদয়ে কেমন ক'রে উপলব্ধি করা যায়? কবি বলেছেন —বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই তার আবির্ভাব। "যখন সেই সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্মকে এই অসীম আকাশস্থিত জগতের শোভা সৌন্দর্যের মধ্যে দেখি, তখন দেখি যে আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।"

কিন্তু কেমন ক'রে বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্রতা-ভরা রূপের মাঝে সেই রূপহীন অপরূপকে উপলব্ধি করা যায়? একমাত্র ঐকান্তিক তপশ্চর্যার দ্বারাই তা সম্ভব হ'তে পারে। তপস্যাকঠোর সাধনার দ্বারা একাগ্র উপাসনার মাধ্যমেই পরাবিদ্যা ও পরমজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। তপস্যাই হ'লো জ্ঞানলাভের একমাত্র সরণী। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"সেই তাঁর তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই, সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্ব মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমন করিয়া বহন করিতেছি।" মানুষ তো আর চেতনহীন জীব নয়। মনুষ্যেতর প্রাণীকে তো আর সাধনা তপস্যার দ্বারা মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয় না। মানুষের সংগে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য হলো

এখানেই। তার জীবনের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়—সে-পথে আছে বহু বিঘ্ন—সে-পথ কংকরময় কণ্টকময়। "অতএব প্রভাতে যখন বনে উপবনে পুষ্পপল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা তাহাদের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ আপন দুঃসহ দুঃখ আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না ?···সেই শিশির ধৌত জ্যোতির্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার—তাহার সংগ্রাম-ক্ষেত্র, সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকে বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখ দুঃখের উত্তাল তরংগের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে, কারণ মনুষ্যত্ব সুকঠিন এবং মানুষের যে পথ—"দুর্গং পথস্তৎ করয়ো বদন্তি।"

রবীন্দ্রনাথের উপরিলিখিত জীবনদর্শনের পটভূমিকায় আমাদের আলোচনা করতে হবে তাঁর শিক্ষার লক্ষ্যকে। কবি সারাজীবন ব্রহ্মের বৈচিত্র্যময় বিকাশে ছিলেন পরম আস্থাশীল। সেই বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মকে স্ব স্ব জীবনে উপলব্ধি করাই মানব-জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য হওয়াই উচিত। যাতে মানুষের আত্মা বিচিত্রতা-ভরা বিশ্বের বিভিন্ন বিকাশের সাথে তার মিলন ঘটাতে পারে, সেদিকে মানুষের শিক্ষার প্রয়াস কেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত আত্মিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে অপাপবিদ্ধ আত্মা আছে প্রসুপ্তির ক্রোড়ে, তাকে জাগিয়ে তোলা, তাকে পূর্ণ অভিব্যক্তি দেওয়াই হলো শিক্ষার লক্ষ্য। এখানে স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছেন—"Education is the manifestation of the perfection already in man"। এখন মানুষের এই আত্মিক বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠবে যখন মানুষ বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্টির মহিমাকে উপলব্ধি করতে পারবে। উপনিষদের একটি সুমহতী বাণী রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তা হলো এই—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতে যা কিছু বিত্তমান তার সব কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত।" উপনিষদের বাণীর সুরের সংগে সুর মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—"যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্বাংগে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলেছে, যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অভ্রভেদী রহস্য নিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে, গন্ধে, বর্ণে, ভাবে মানুষের চৈতন্যকে প্রতি-নিয়ত জাগ্রত ক'রে রেখে দিয়েছে, ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত ক'রে প্রসারিত করে দিয়েছে।" রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যময় বহুর মধ্যে পরম একের পরিপূর্ণ বিকাশ উপলব্ধি করেছেন। বিশ্বের সর্বত্রই তাঁর অপরূপ লীলা মনোহররূপে প্রতিভাত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের এই মতবাদের অনুরূপ অভিব্যক্তির সন্ধান পেয়েছি আমরা শিক্ষাবিদ ফ্রেবেলের শিক্ষা সম্বন্ধীয় মতবাদের মধ্যে। ফ্রেবেলের জীবনবাদ এবং জীবনদর্শনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও জীবনবাদের অনুরণন পাওয়া যায়। ফ্রেবেল তাঁর "*Education of Man*" নামক গ্রন্থে বলেছেন "Nature and all existence are a manifestation, a revelation of God *raison d'etre* of all existence is to reveal God. Everything is divine by nature ; its essence is divine. Everything is relatively a unity. Since God is unity complete and perfect in itself··· From every point, from every object of nature and from every form of life there is a way to God." ফ্রেবেলের এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের মুখেও অসংগত হতো না। রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষা" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে আমরা তাঁর শিক্ষা বিষয়ক মতবাদ অবগত হই। এই গ্রন্থেই তিনি বলেছেন "ভারতবর্ষের

সাধনা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংগে চিত্তের যোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ—কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।" এই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলেছেন, "ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হইয়া থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি। ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ কেন? না ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সংগে আমাদের যোগসাধন হয়। কিন্তু সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ; কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু, জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যেই তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা। অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, তবে ইহা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ, কেবল কল-কারখানায় দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয়। আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সংগে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।"

ফ্রেবেলের কণ্ঠেও অনুরূপ সুর ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন—"The proper destiny and vocation of man, as a being endowed with understanding and reason, is to bring to clear consciousness his nature, that is, the Divine in him, to exercise self determination and freedom thus to make manifest in his own life, the Divine Nature."

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূল বক্তব্যটিকে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ

করা যায়। তাঁর শিক্ষাদর্শনের গোড়াকার কথা হলো—শিক্ষা কেবলমাত্র মেধার বিকাশসাধন নয়, হৃদয়ের বিকাশসাধনও বটে। মানুষের সামগ্রিক সত্তার বিকাশের সংগে রয়েছে এর নিবিড় যোগ। গ্রীক শিক্ষাদর্শের মূলগত কথা ছিল—"*Mens sana in corpore sano.*" অর্থাৎ সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বিকাশই হলো শিক্ষার চরমতম আদর্শ। কিন্তু মানুষের এই সমগ্র সত্তার বিকাশ কি একান্ত সহজ? মানুষের জীবনে এই সমগ্র সত্তার বিকাশ সম্ভব হতে পারে ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও সামাজিক সুযোগের অপূর্ব সামঞ্জস্যে। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত হলো এই যে আমাদের মানসিক বিকাশের পথ যদি হয় বাধাহীন, আমাদের জীবন যদি হয়ে ওঠে অস্পষ্টতা-বিনির্মুক্ত, আমাদের হৃদয় মন যদি বলিষ্ঠ আশার দ্বারা পূর্ণ হয়ে ওঠে, তবেই আমাদের সামগ্রিক বিকাশের পথ হয়ে ওঠে সাবলীল। জীবনে আশার দীপ্তিকে অনির্বাণ রাখবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শিক্ষা" নামক গ্রন্থে প্রসংগক্রমে বলেছেন যে "আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া ওঠে।···কোন সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিষ যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড় আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সকলের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেক শক্তি তাহাব নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে।"

লক্ষ্যহীন জীবনের কথা ভাবা যায় না। জীবনের লক্ষ্য যখন স্থিরীকৃত হয়ে গেল, তখন সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার উদগ্র আশা বুকে তুলতে হবে জাগিয়ে। এ করতে পারলে বুকে অমিত সাহসের সঞ্চার হবে এবং আমরা আত্মিক বিকাশের পথে চালনা করবার দুর্জয় শক্তি পেয়ে যাবো। তাই রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষা"র অন্যত্র বলেছেন, "এইজন্য যখন প্রশ্ন শুনি—আমরা কি শিখিব, কেমন করিয়া শিখিব, শিক্ষার কোন প্রণালী কোথায় কি ভাবে কাজ

করিতেছে,—তখন আমার এই কথাই মনে হয়, শিক্ষা জিনিষটা তো জীবনের সংগে সংগতিহীন একটি কৃত্রিম জিনিষ নহে। আমরা কি হইব, এবং আমরা কি শিখিব, এই দুটি কথা একবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড় জল তাহার বেশী ধরে না।……জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবতই মনে আসে না।"

আশার এই অনির্বাণ শিখাকে প্রদীপ্ত রাখাই হলো রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার অন্যতম আদর্শ। অনন্ত আশার অমর দীপ জ্বালা থাকবে সব সময় হৃদয়ের মাঝে। এই গ্রন্থের অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তুমি কেরানীর চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো। তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা কোন ক্রমে ইস্কুল মাষ্টারি পর্যন্ত উঠিয়া তাহার পর পেনসন ভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে—এই মন্ত্রটিকে জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশের সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা। …এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড় মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ-শিক্ষা নাই।"

অমিত আশা এবং দুর্দমনীয় আত্মপ্রয়াস এই উভয়ের সামঞ্জস্যে মানুষ নিজেকে আত্মবিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারে—এতদু-ভয়ের সামঞ্জস্যে মানুষ তার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে। "মানুষের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী তাহা কখনও অসাধ্য হইতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষা 'দুর্জয় প্রাণ-চেষ্টার' উদ্বোধন করে মানুষকে অসাধ্য সাধন করিতে সচেষ্ট করে। কিন্তু মানুষের যে এই লক্ষ্যে পৌঁছানর চেষ্টা ইহা যেন হৃদয়ের আনন্দের দ্বারা উৎসাহিত হয় এবং তা সম্ভব যদি আশা আকাঙ্ক্ষা মানুষের ধর্মবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ ধর্মবোধের জাগরণের মত এতবড়ো জাগরণ জগতে আর কিছু নাই। ইহা মূককে কথা বলায়, পুংগুকে পর্বত

লংঘন করায়।...আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে মনে রাখি, তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোন লক্ষ্য নাই, অথচ শিক্ষা আছে—ইহার কোন অর্থ নাই।"

তাহলে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো- মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে জাগিয়ে রাখা। সুদৃঢ় ইচ্ছাই মানুষের প্রাণ শক্তিকে জাগ্রত করে —মানুষকে শ্রেয়োময় গৌরবের পথে চালিত করে। কিন্তু কি প্রকারের শিক্ষার দ্বারা মানুষের মনে একটি সুমহান গৌরব বোধ এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয় সৃষ্ট হতে পারে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—এক মাত্র সুশিক্ষার দ্বারা তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সুশিক্ষার লক্ষণ কি? প্রসংগত, রাবীন্দ্রনাথ বলেছেন—সুশিক্ষার লক্ষণ হলো এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি, তাহা সম্পূর্ণভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল। এখানে আমার উপনিষদের ঋষিগণের বাণীর অনুরণন শুনি —"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।"

উপনিষদের "অভীঃ" মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। "শিক্ষা"য় রবীন্দ্রনাথ ভয়হীন হবার এই কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে "শিক্ষিত মানুষকে বলতে হবে আমার অন্তরে সম্পদ আছে। সে যেন বলতে পারে, আমি সব পারি, সব পারব।" তিনি আরও বলেছেন—'আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। সে বলে আমি সব পারি, সব পারব। তার আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করার অন্ত নেই। সেই শ্রদ্ধার দ্বারা সে নির্ভীক হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হ'য়েছে, আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি। সেইজন্য বহু শতাব্দী ধরে আমরা দৈব কর্তৃক প্রবঞ্চিত।" রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, "আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয় মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটাই শিক্ষা সাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে।"...

"সকল অবস্থার জন্য নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায় নিরলস আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধন করায়; অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্য চর্চায় নয়, পৌরুষ চর্চায়—চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মঠ করায়—শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।"

শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন যে আমাদের বর্তমান শিক্ষা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের সংস্কৃতির প্রতি একেবারে বিমুখ। আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে কোন এক বিশেষ বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জনে সহায়তা করে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এর উপযোগিতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই কৃতিত্ব শিক্ষা অত্যাবশ্যক হ'লেও এই যে যথেষ্ট নয়, একথা মানতে হবে।...আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিষ কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়েছে। সে হচ্ছে সংস্কৃতি, চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে।" সুতরাং সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করা সুশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শিক্ষার্থীর মনে যাতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা স্বতোৎসারিত হয় সেদিকে শিক্ষার একান্ত অভিনিবেশ থাকা প্রয়োজন। আধুনিক যুগে দেখা যায় মানুষ প্রকৃতির দুলাল হয়েও সে প্রকৃতির উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইছে। এইভাবে সে ধীরে ধীরে আত্মস্থ হয়ে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পার্থিব সুখও সহজলভ্য নয়—তার জন্য মানুষকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়—বহু অতন্দ্র নিশি যাপন করতে হয়। ভারতবর্ষ এখনও তার যুগসঞ্চিত কুসংস্কারের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। তার সেই মুক্তি আনতে গেলে ভারতীয়দের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হ'বে অভিনব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী। তার যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক মতবাদ তার বুকে জাগিয়ে তুলবে অদম্য আশা এবং তার অন্তরে প্রসুপ্ত আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ;

আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সংগে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে ; এই জন্যে এই নিয়মের পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত—একথা জেনেই তবে আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। "বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকস্মিকতাকে মানে, সে নিজেকে মানতে সাহস করে না।" বর্তমান যুগে শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটা আমরা কোনক্রমেই অবহেলা করতে পারি না। যাঁরা ধর্মধ্বজী তাঁরা আবার বিজ্ঞানের প্রাধান্যকে স্বীকার করতে নারাজ। জড় বস্তু-জগতের উপর কর্তৃত্ব করতে গেলেই বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে—সেখানে ধর্ম আমাদের বিশেষ সহায়ক হ'বে না। এতে আত্মশক্তি বিকাশের পথে অন্তরায় আসবে। "শিক্ষা" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটির উল্লেখ করেছেন—"বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি, তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না। এইজন্যই আমাদের উপনিষদ্ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেছেন : যথাতথ্য তোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্য। অর্থাৎ অর্থের বিধান তিনি যা করেছেন সে বিধান যথাযথ, তাতে খামখেয়ালি একটুকুও নেই এবং সে বিধান শাশ্বত কালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়।……তিনি অনন্ত কাল থেকে অনন্তকালের জন্য যে অর্থের বিধান করেছেন, তা যথাযথ। তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন, বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, এখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম। একদিকে রইলো আমার বিশ্বের নিয়ম, আর একদিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম, এই দুই-এর যোগে তুমি বড় হও, জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক।—এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।"

বর্তমানে মানুষের জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে একান্তভাবে বিজ্ঞানমুখী।

বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জড় জগত ও প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারি। উপনিষদ্ অবশ্য এই বিদ্যাকে বলেছে "অপরা বিদ্যা।" রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিজ্ঞানের বিদ্যাটাকে বলেছেন "আধিভৌতিক রাজ্যের বিদ্যা।" "শিক্ষা"তে তিনি বলেছেন, "সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যকরূপে জীবন রক্ষা হয়, জীবন পোষণ হয়, জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যাই যথাযথ বিধির বিদ্যা। এ যখন আমাদের বুদ্ধির সংগে মিলবে, তখনই স্বাতন্ত্র্য লাভের গোড়াপত্তন হবে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষার লক্ষ্যের কথা বলেছেন, তার দুটো দিকই আমাদের কাছে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা যেমন একদিকে মানসিক বিকাশ সংসাধন করবে, অন্যদিকে তেমন তা জাগতিক পূর্ণতা এনে দেবে। রূপময়, রসময়, গন্ধময়, স্পর্শময়, এই বিশ্বকে ভোগ করতে পারে তারা যারা বীর্যবান ও শক্তিমান। কিন্তু এই ভোগের পশ্চাতে যেন ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি না থাকে; এই ভোগ-বাসনার পশ্চাতে থাকবে বস্তুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আমাদের আত্মার বিকাশসাধন। ভোগের দ্বারা কখনও ভোগলিপ্সা নিবৃত্ত হয় না। ভোগকে জয় করার একমাত্র পথ হলো ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "তপোবন" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়টি অতি মনোজ্ঞরূপে প্রকাশ করেছেন—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে।"…"ত্যাগের সংগে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সংগে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব; সেই শৌর্যেই মানুষ নানাপ্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।" অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলছেন,—"ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়েছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই। বিদ্যারই কি আর বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে আচ্ছন্ন করে, চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকে লাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে

হইবে—নানা তথ্য নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে।"

ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক বিদ্যাকে ভারতের সনাতন সত্যের সংগে মিলিয়ে দেখেছেন। যে জীবনদর্শন তাঁর সমস্ত কর্মপ্রয়াসের মূলে অবিরাম অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তা তাঁর শিক্ষাদর্শনকেও অবিসংবাদিতরূপে প্রভাবান্বিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী হলেও শিক্ষার বৈষয়িক অথবা ব্যবহারিক দিকটাকে তিনি কোনদিন অবহেলা করেন নি। রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হলো শিক্ষার্থী সমাজ-দেহের একটি সক্রিয় অংগ হিসেবে পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে—সে ব্যক্তির জীবন হয়ে উঠবে জাতীয় সংস্কৃতিসমৃদ্ধ, সে জীবন হবে ধর্মবোধে উদ্দীপ্ত, সে জীবনের ভিত্তি হবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, সে জীবনের পশ্চাতে থাকবে এক অদম্য বাসনা যা মহান লক্ষ্যের পথে এগিয়ে দেবে এবং সে জীবনে অনির্বাণভাবে জ্বলবে অনন্ত আশা এবং অমিত বলিষ্ঠতা যা সৃষ্টির রহস্য-জাল ছিন্ন করে সত্যের যথার্থ রূপ প্রকাশ করবে। এককথায় শিক্ষার্থীর সত্তার বিকাশই হলো রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের চরম এবং পরম লক্ষ্য।

এখন দেখা যাক, কবি-কুলশিরোমণি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বপ্নময় কাব্যলোক থেকে নেমে এসে জগতের অন্যতম শিক্ষাগুরু হিসেবে ভারতে তথা বিশ্বে কি অবদান রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সে-কালের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনরূপ শিক্ষা পান নি। তাঁর জীবনের সব কিছু শিক্ষা লাভ হয়েছিল তাঁর গৃহের পরিবেশে। কিন্তু তাহলেও তদানীন্তন শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি তাঁর ছিল প্রখর দৃষ্টি। উত্তরকালে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত "শান্তিনিকেতনে" তিনি সে-সব ত্রুটি দূরিকরণে যথেষ্ট প্রয়াসী হয়েছিলেন।

শিক্ষার ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীকে বলা হয় শিক্ষার 'নবযুগ' বা 'শিশু-শতাব্দী'। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কোন প্রাধান্য ছিল না। সেখানে নীরস বিষয়বস্তু জগদ্দল পাথরের মত শিক্ষার্থীর বুকে চেপে থাকতো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে মনস্তত্ব ও

মনোবিদ্যার দ্রুত অগ্রগতির ফলে শিশুর প্রতি মানবমনের আন্তরিক সহানুভূতি জেগে উঠেছে। এ-যুগে পূর্বকৃত সকল অপরাধ ও নির্মম অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শিশুমনের অলিগলির মধ্যে প্রবেশ করে স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে, অনাবিল আনন্দের ভেতর দিয়ে, তার মনোবিকাশের স্বাভাবিক ছন্দের সংগে তাকে আজ নবতম পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার প্রয়াস চলেছে। "বিশ্বভারতীর" বিশাল বিদ্যায়তনে আমরণ শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোমত শিক্ষা সম্বন্ধে বহু আলোচনা ক'রেছেন এবং বহু প্রবন্ধাদি লিখে রেখে গেছেন। তাঁর সেই লেখাগুলো পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় যে শিক্ষার একেবারে গোড়াকার কথা নিয়ে তিনি কি সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন। এবিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল কি গভীর, তাঁর চিন্তাশক্তি কি নিগূঢ়, কি সীমাহীন তাঁর কল্পনাশক্তি ও শিশুর প্রতি তাঁর সুগভীর স্নেহ। এখন থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে রাজসাহীতে রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষার হেরফের" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩১ বৎসর। কিন্তু তাঁর এই রচনাটি অল্প বয়সের হলেও, তা এমনি সারগর্ভ ও তথ্যসমৃদ্ধ ছিল যে এ-দেশের শিক্ষায় লিপ্ত ব্যক্তিরা আজও পর্যন্ত তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা নিঃশেষে প্রয়োগ ক'রে উঠতে পারে নি। সেই সময়কার শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে এমনিভাবেই ধরা পড়েছিল যে তাঁর অননুকরণীয় ভাষাচিত্রে তার মূর্তি অত্যন্ত বীভৎস ও কুৎসিত বলে প্রতিভাত হচ্ছিল—সমগ্র দেশ তার শিক্ষা-ব্যবস্থার সে মূর্তি দেখে আতংকিত হয়ে উঠেছিল। সেই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছিলেন, আমাদের সেই সময়কার শিক্ষা একেবারে আনন্দহীন, মানসিক স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং মানসিক শক্তির অপচয়কারী। তিনি আরও দেখিয়েছিলেন, বিদেশী ভাষার ভেতর দিয়ে শিক্ষা হওয়ায় ভাষাশিক্ষার সংগে ভাবশিক্ষার বা ভাবের সংগে জীবনের কোন সম্পর্ক থাকে না। এতে ফলও ভাল হয় না। জীবনের সংগে শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় না; উভয়ের মাঝখানে থেকে যায় একটা দুস্তর ব্যবধান; সেখানে নিবিড়

মিলন হবার কোন আশাই থাকে না। প্রসংগক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে ; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।" তিনি আবার বলেছেন, "শিক্ষা যদি জীবন্ত মাতৃভাষার মধ্যে বিগলিত না হইয়া চিরস্থায়িত্ব লাভ না করে তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক, তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎসব হইতে পারে না।" রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে এই কথাটি প্রবন্ধে বলেছিলেন যে আনন্দ ও স্বাধীনতা ছাড়া ছেলেদের মানসিক শক্তি হয় পংগু, শরীর হয় অপটু, বাল্য-প্রকৃতির মেটে না ক্ষুধা, কল্পনা রাজ্যের দ্বার চিরদিন থেকে যায় রুদ্ধ।

শিক্ষার মধ্যে যে সব ত্রুটি ছিল, সেগুলো দূরিকরণ মানসে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করলেন বোলপুরে "শান্তিনিকেতন" বিদ্যালয়। এই অভিনব বিদ্যালয়ে আনন্দ ও স্বাধীনতার আকর্ষণ তো ছিলই ; তা ছাড়া তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীর জীবনে অপর একটি নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। শিশুপ্রকৃতি ও বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যে একটা ভাবঘন মিলন ও ঘনিষ্টতম আন্তরিকতা হতে পারে, তা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে গিয়েছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত "শান্তিনিকেতন" বিদ্যালয়ে। বনানীর স্নিগ্ধছায়া, নদীর কলোচ্ছ্বাস, বিস্তীর্ণ উদার নীলাকাশ, কাশবনের শুভ্রহাসি, অবারিত প্রান্তর, শস্যশ্যামল ধান্যক্ষেত্র, বর্ষার ঘনঘটা—প্রকৃতির বিচিত্র এই লীলাক্ষেত্রে যে শিশুমন গড়ে ওঠে তাতে লোকলোচনের অন্তরালে বেড়ে যায় বিশ্বের সহিত মানুষের যোগাযোগ, প্রকৃতির সহিত স্থাপিত হয় অচ্ছেদ্য মিতালি। এই ভাবটি তিনি বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর তপোবন নামক রচনায়। সেখানে তিনি বলেছেন, "কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ সহরে নয়, বনে। ভারতের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই

সেখানে মানুষের সংগে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা, নদী, সরোবর মানুষের সংগে মিলেমিশে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল।...... বন তাদের ছায়া দিয়েছে, ফলফুল দিয়েছে, কুশসমিধ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম, অবকাশ ও প্রয়োজনের সংগে এই এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের সংগে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন।......নিখিল চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সংগে আত্মীয়রূপে একবার পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।....... আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে প্রকৃতির সংগে মিলিত হয়ে, অর্থাৎ কেবল স্কুল কলেজের পরীক্ষায় পাশ করা নয়, বা কারখানায় দক্ষতা শিক্ষা করা নয়।" তাই দেখা গেছে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীরা ব্রহ্মচর্যের কঠোরব্রতে উত্যক্ত হয়ে ওঠে নি। তারা বেশ সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে এই কঠোরতাকে নিয়েছে নিজেদের জীবনে বরণ করে। তাদের অধ্যয়ন, ক্রীড়াকৌতুক, উপাসনা, সবই হয় উন্মুক্ত প্রাংগণে, অথবা ছায়াঘন বৃক্ষের তলদেশে। শান্তিনিকেতনে বিশ্বপ্রকৃতির সংগে নিবিড় সংযোগস্থাপনের কি অপরূপ অভিনব ব্যবস্থা! বাহিরের প্রকৃতির সংগে নিজের স্বরূপটির নিত্য পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এই যে শিক্ষার ব্যবস্থা তাতে জীবনের অনুপরমাণুগুলো আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে—তাই সেখানকার শিক্ষার্থীরা প্রাণ খুলে গাইতে পারে—

আমাদের শান্তিনিকেতন
আমাদের সব হতে আপন।
তার আকাশভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্য নূতন।
মোদের তরু মূলের মেলা
মোদের খোলা মাঠের খেলা
মোদের নীল গগনের সোহাগ মাখা সকাল সন্ধ্যা বেলা।

বর্তমানে পাশ্চাত্যে প্রগতিশীল সব দেশেই এই আনন্দনীতির ওপর ভিত্তি করে কত না অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। "The playway in Education," "The project method," The Dalton plan," "The children's Art" ইত্যাদি পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকেই সেখানে এই সব নীতির মূলমন্ত্রের প্রয়োগ হয়ে আসছে দৈনন্দিন। বাইরের জগৎ ধীরে ধীরে এ-সবের সন্ধান পাচ্ছে এবং এক দরদী শিক্ষাব্রতীর প্রতি সকলের মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসছে।

রবীন্দ্রনাথের যুগে আমাদের দেশের শিক্ষার প্রধানতম বাহন ছিল একটি বিদেশী ভাষা—ইংরেজি ভাষা। এই প্রকার শিক্ষাদান পদ্ধতি যে কতখানি ত্রুটিবহুল ছিল তা রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে অনুভব করতেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর প্রথম কথা এই যে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করা উচিত। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে কখনোই যথার্থ শিক্ষালাভ করা যায় না। কারণ, অপরিচিত বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করতে এবং একবারে নিজস্ব করে নিতে আমাদের উদ্যম ও উৎসাহের প্রধানতম অংশ অপব্যয়িত হয়। অথচ মধ্যবর্তী এই বাধাটি না থাকলে মাতৃভাষার সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষণীয় বিষয়টিকে অনেক সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। তাঁর সময়ে পরানুকরণের মোহে অথবা দাসসুলভ মনোবৃত্তির বশে যাঁদের ইংরেজি ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল প্রবল, তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করে "শিক্ষার বিকিরণ" নামক প্রবন্ধে কৌতুকছলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিক্ষা সরস্বতীকে সাড়ী পরালে আজও অনেক বাঙালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে সাড়ী-পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।"

আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্য একটি বিশেষ ত্রুটির দিকে রবীন্দ্রনাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে-ছিলেন। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি অতিমাত্রায় যান্ত্রিক হয়ে

উঠেছিল এই ছিল তাঁর অভিযোগ। আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা পড়বার জন্যই পড়ে, চক্ষু বুজে মুখস্থ করে। কিন্তু শিক্ষার সংগে তাহাদের কোন আনন্দের সম্পর্কই থাকে না। পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহংগের মতো তাহার শেখানো কৃষ্ণ নাম আওড়াতে থাকে। মুক্তির উল্লাসে জ্ঞানের অনন্ত আকাশে পক্ষ বিস্তার করে দিতে পারে না। রবীন্দ্র-নাথ তাই দুঃখ করে বলেছেন, "বাঙালির ছেলের মত এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে তখন স্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচা সমেত দুইখানি শীর্ণ চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুধুমাত্র বেত হজম করিতেছে।" এই শিক্ষার মধ্যে আতংক আর যান্ত্রিকতা ছাড়া আর কিছুই নাই। অথচ "আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণ শক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।"

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা একান্তভাবে পুঁথিগত। তাই শিক্ষার্থীদের মন পুঁথির সীমার বাইরে যেতে নারাজ। তাই রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন—"পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যেই ছাত্রদের মনকে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। তাহাদের কেবল শিক্ষাদান করলেই হইবে না। তাহাদিগকে যথার্থ বিদ্যাদান করিতে হইবে। কিন্তু এ-বিদ্যা তো কেবল গ্রন্থ-কেন্দ্রিক নয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ থেকে, বাস্তব জীবন হইতে, প্রকৃতি পাঠের মধ্য দিয়াই তাহার সম্পূর্ণ রূপটি আয়ত্ত করিয়া লইতে হয়। জীবন ও বাস্তবতাবিমুখ শিক্ষিতেরা প্রচুর ডিগ্রী ডিপ্লোমা লাভ করিতে পারে; কিন্তু জাতির কোন প্রকৃত প্রয়োজনেই তাহারা আসে না।" অতএব রবীন্দ্রনাথের মতে "উপস্থিত মত আমার যেটুকু বক্তব্য সে এই, বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধ সংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে যে-বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত, এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ-কথা পদে পদে জানানো চাই।" মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ই তাহার জ্ঞানের দ্বার।

এই সব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সে বাইরের জগৎ থেকে বৈচিত্র্যময় জ্ঞান আহরণ করে। সে জ্ঞান ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে ঘেরা সংকীর্ণ বিদ্যালয়-সীমায় আহরণ করা একেবারে অসম্ভব। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই সচেতন ছিলেন বলেই বোধ হয় প্রকৃতির রম্য পরিবেশেই তাঁর শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রায় প্রতিটি প্রগতিপরায়ণ দেশে যে শিক্ষাধারা প্রচলিত থাকে, তা হয় মুখ্যত জাতীয়তাবাদী। দেশে দেশে শিক্ষায় সর্বজনীন ভাবধারার একান্ত অভাব বলেই সমগ্র বিশ্ব আজ শান্তি-বারির জন্য যেন তৃষিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ দেশ কাল পাত্রের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী হবার অভিলাষী। এই শিক্ষায় এই সর্বাংগীণতাসাধনের জন্যই তাঁহার "বিশ্বভারতীর" পরিকল্পনা। তাঁর অন্তরের একান্ত কামনা এই ছিল যে ভারতবর্ষের সহিত বিশ্বের অন্তরকে যুক্ত ক'রে দিয়ে ভারতীয় ভাবধারার অমৃত স্পর্শে নিখিল জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানকে অভিষিক্ত ক'রে আমরা সার্থক ও পূর্ণ শিক্ষালাভ করবো। এই প্রকার আদর্শ যে অতি মহান তা অস্বীকার করার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ এই মহত্তম আদর্শ সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত ক'রেছেন প্রসংগত তার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "দেশ-দেশান্তর হইতে যুগ-যুগান্তের আলোক-তরংগ আমাদের চিন্তাকে নানা দিক দিয়া আঘাত করিতেছে—জ্ঞান সামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল।…এখন সময় আসিয়াছে, যখন…ভারতবর্ষের মন লইয়া…তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহার যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে। সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি, নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইবে।" শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জাতীয় বিদ্যালয়" নামক সুচিন্তিত নিবন্ধে উপযুক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইহা হইল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "বিশ্বভারতীর"

মর্মবাণী। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমিলনের বার্তা দেশে দেশে প্রচার করেছিলেন। তাঁর বাণীতে পাশ্চাত্য মুগ্ধ হ'লো, প্রাচী আপন দ্বার খুলে দিল। "ভারততীর্থে" তাই কবিগুরু গেয়েছিলেন—

"পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।"

বিশ্বমিলনের যে অভিনব এবং অপরূপ কল্পনাটি শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র হৃদয়খানি জুড়ে ছিল, তা একটা মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করলো তখন, যখন কবি তাঁর "শান্তিনিকেতনে" ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে "বিশ্বভারতী" প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রকৃতির রমণীয় পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হলো এক নূতন শিক্ষাকেন্দ্র। এর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এর দ্বার অবারিত রাখা হ'লো সকল জাতির সকল শিক্ষার্থীর জন্য। শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের অমোঘ আকর্ষণে "বিশ্বভারতীর" মিলনকেন্দ্রে মিলিত হ'তে লাগলো বিশ্বের বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী। এখানে বিশ্বের নানা ভাষা তাদের যথাযথ মর্যাদা লাভ করলো। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সম্পূর্ণ আবাসিক ক'রে তৈরী করা হয়েছিল প্রথম থেকে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিত্য মধুর সাহচর্যে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা যে শিক্ষালাভ করে তা সত্যই বিরল। "বিশ্বভারতীর" অন্তর্গত "চীনভবন" চৈনিক সংস্কৃতির একটি অপরূপ কেন্দ্র। এখানকার "কলাভবন" ভারতীয় শিল্পকলার একটি মহাপীঠ স্থান। বিশ্বভারতীতে রয়েছে একটি অমূল্য গ্রন্থাগার। এ সবকিছুর পশ্চাতে ছিল কবিগুরুর সদাজাগ্রত দৃষ্টি। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক মহিমা এবং বহুমুখী প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে এখানকার শিক্ষার্থীরা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতো।

বর্তমান জগতে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন শৃংখলা রক্ষা বিষয়ে

শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট স্বাধীনতা পাবে, আভ্যন্তরীণ শৃংখলা, নিয়মনিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যার্থীরা নিজেরাই সব কিছুর ব্যবস্থা করবে। শিক্ষকমহাশয়গণ অলক্ষ্য থেকে শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করবেন মাত্র। জগতে বোধ হয় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-নীতি প্রবর্তন ক'রেছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি এই নীতির প্রবর্তন ক'রেছিলেন শান্তিনিকেতনে। বাঙালীর চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব ও তার নির্জীব মন রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই মর্মে মর্মে আঘাত হেনেছে। তাই তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসনের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কর্মকুশলতা, চারিত্রিক বল এবং সংযমের বাঁধন। ইউরোপে এবং আমেরিকায় কোন কোন শিক্ষাবিদ এই নীতির আলোচনা ক'রেছিলেন অবশ্য ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে। কিন্তু এই অভিনব প্রথাকে বিদ্যায়তনে প্রবর্তনের সাহস প্রথম হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই।

আদর্শগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত ভাববাদী হলেও, তিনি নিছক কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে জ্ঞানমুখী শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষার্থীরা যাতে উত্তর-জীবনে আত্মনির্ভরশীল হয়, সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। শিক্ষার ব্যবহারিক ও বৃত্তিমূলক দিকটাকে তিনি কোনদিন অবহেলা করেন নি। তাই বোলপুরের সংলগ্ন সুরুলে তিনি যে "শ্রীনিকেতন" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে কর্মমুখী শিক্ষা যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। এখানকার শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে কৃষি, গোপালন, তাঁতবোনা, কাপড় ছাপানো, ট্যানিং, চামড়া মাটি ও বেতের সুদৃশ্য নিত্য ব্যবহার্য জিনিস তৈরী ইত্যাদি নানারকম কাজ হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। গ্রামবহুল ভারতে পল্লীসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তাঁর প্রখর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। শ্রীনিকেতনে তিনি পল্লীসংস্কারের আদর্শ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। গ্রামবাসীর অভাব-অভিযোগের সংগে নিবিড় পরিচয়সাধন ক'রে তাদের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিকিরণ

করা, তাদের নিরানন্দ জীবনের মাঝে প্রাণের স্পন্দন জাগানো ইত্যাদি ছিল তাঁর গ্রাম-সেবার আদর্শ। তাঁরই উদ্দীপনায় এবং দূর-দৃষ্টিতে সমগ্র গ্রাম-সেবার আদর্শ শিক্ষায় সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনের প্রতিটি কাজকর্মের প্রতি তাঁর মহানুভূতিশীল জাগর দৃষ্টি ছিল। অর্থের অভাবে মাঝে মাঝে তাঁর ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হয়েছে। অলোকসামান্য প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর আরব্ধ কর্ম বন্ধ হয়ে যায় নি। "বিশ্বভারতী" সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের আওতায় আসার ফলে এর কাজ দিন দিন বহুমুখী হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা দিন দিন সার্থক হয়ে উঠ্ছে। তাই দেখা যায় মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বোলপুরের রাঙামাটির ঊষর ভূমির উপর সারা বিশ্বের শিক্ষাব্রতীদের এক মহাপীঠস্থান গড়ে উঠেছে। এখানকার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সন্ধান পাওয়া যায় আত্মার সংগে বিশ্বের যোগ, কর্মের সংগে আনন্দের যোগ, ব্যবহারিক জীবনের সহিত চারুকলার নিবিড় সম্পর্ক, তপোবনের শান্তরসের সংগে গভীর যোগ রয়েছে জ্ঞানের। তাই বিশ্বভারতী আজ মহামানবের মিলনতীর্থে হয়েছে রূপান্তরিত।

মহাত্মা গান্ধী

সাধারণ লোকে মহাত্মা গান্ধীকে জানে একজন অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে। ভারত যে আজ জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে সমর্থ হয়েছে, এর মূলে ছিল মহাত্মা গান্ধীর অলোক-সামান্য আত্মত্যাগ ও আপোষহীন অবিরাম সংগ্রাম। অহিংসা মন্ত্রের জাগ্রত বিগ্রহ মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সমগ্র ভারতীয় জাতির জনক। সমগ্র জাতিকে তিনিই সর্বপ্রথম মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর অসহযোগ

আন্দোলনের কথা আজ সর্বজনবিদিত। কটিবাসপরিহিত অর্ধ-নগ্ন ফকির অখণ্ড ভারতের বুকে যে শ্রান্তিহীন আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তাতে ব্রিটিশ শাসনের উদ্ধত মস্তক অহিংসা মন্ত্রের নীরব পূজারীর পায়ে আপনা হতেই অবনত হয়েছিল। নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারত আজ পরাধীনতার নিগড়কে করেছে ছিন্ন। অতীত ঐতিহ্যসমন্বিত ভারত আবার বিশ্বমাঝে তার আসনকে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতের এই বর্তমান অবস্থার পিছনে রয়েছে শত শত শহীদের নীরব আত্মাহুতি—কত-না নাম-না-জানা দেশসেবক তাঁদের বুকের তপ্ত শোণিত ঢেলেছেন শৃঙ্খলিতা দেশমাতার পরাধীনতার নিগড় মোচনে ; ঠিক তেমনি বহু প্রখ্যাত দেশ-পূজ্য মহামানব তাঁদের আত্মবিসর্জন দিয়ে ভারতমাতার কনক কিরীটে অত্যুজ্জ্বল মণিমুক্তা বসিয়ে দিয়েছেন। এঁদের কারোরই দান কোন অংশে কম নয়। ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে আরম্ভ ক'রে এতাবৎ কাল পর্যন্ত বহু দেশসেবক মাতৃভূমি ও জনসাধারণের সেবায় আত্মোৎসর্গ ক'রেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সবায়ের মধ্যে গান্ধীজী যেন তাঁর মহান আত্মত্যাগ, ঐকান্তিক স্বদেশপ্রেম, সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা দিয়ে দেশবাসীর হৃদয়ে অক্ষয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সময়কার প্রায় অধিকাংশ স্বদেশসেবী মনেপ্রাণে অনুভব ক'রেছিলেন যে ভারতের অগণিত জনসাধারণের মুক্তির পথ নিহিত রয়েছে সর্বজনীন শিক্ষায়। এতদিন ভারতবর্ষ যেন নিরক্ষরতার নিঃসীম তমসার মধ্যে পথের দিশা পাচ্ছিল না। দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি যেমন মর্মে মর্মে তাঁকে আঘাত হেনেছে, তেমনি দেশবাসীর সর্বগ্রাসী নিরক্ষরতার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তাঁর অন্তরকে বেদনাতুর করে তুলেছিল। তাই বোধ হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রায় শেষ দিকে দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ও তাদের বিষময় ফল যথাযথ উপলব্ধি করে তিনি তাঁর ওয়ার্ধা পরিকল্পনার উদ্ভাবন করেন। এখন দেশের কল্যাণকামী যাঁরা তাঁরা সবাই স্বীকার করেন যে দেশকে দ্রুত অগ্রসর হতে হ'লে ব্যাপক গণ-

শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন এবং সেই সংগে দেশে এমন শিক্ষার প্রচলন হওয়া উচিত যা থেকে হ'বে দেশের চাহিদা পূরণ, যা স্পর্শ করবে দেশের প্রাণকে, যা নিজেকে মুক্ত করবে দীর্ঘ দুই শতাব্দীর ঠুনকো বিলিতি নিছক জ্ঞানমুখী শিক্ষার মোহময় নিগড় থেকে। জাতির জনক ঠিক এই সময় তাঁর সুচিন্তিত ওয়ার্ধা পরিকল্পনা দেশের সর্বসমক্ষে তুলে ধরলেন। এতদিনের পরিপক্ব রাজনীতিবিদ সহসা শিক্ষাবিদে হ'লেন রূপান্তরিত। সমগ্র দেশ বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেল।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ভারতের জাতীয় শিক্ষার ইতিহাসে এক স্মরণীয় সময়। ঐ সময় ওয়ার্ধায় মাড়োয়ারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে মাড়োয়ারী শিক্ষাসমিতির রজত উৎসব উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী শিক্ষাবিদগণের একটি নাতিবৃহৎ সম্মেলন আহূত হয়েছিল। সেই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীজী। সমগ্র ভারত থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত কয়েকজন শিক্ষাব্রতী ও সেই সময়কার কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলির শিক্ষামন্ত্রিগণ সেই শিক্ষা-সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এই সভায় মহাত্মা গান্ধী সর্বপ্রথম তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক নবতম পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই সম্মেলনে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এই প্রস্তাবগুলিতে ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল তথ্য ও নীতিগুলি সন্নিবদ্ধ হয়েছিল। এই সভার দশজন সভ্য নিয়ে এক সমিতি গঠিত হয়। কথা হয় যে, এই সমিতি এক মাসের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত ক'রে তাঁরা তা মহাত্মা গান্ধীর নিকট পেশ করবেন। ডাঃ জাকির হোসেন, অধ্যাপক খাজা গোলাম সাহিউদ্দীন, শ্রীবিনোবা ভাবে, শ্রীকাকাসাহেব কালেলকার, শ্রীকিশোরলাল মাশুরুওয়ালা, শ্রীআশা দেবী, শ্রীকৃষ্ণদাস জাজুজু, অধ্যাপক কে. টি. সাহা, শ্রী জে. সি. কুমারাপ্পা এবং শ্রী ই. ডাবলিউ আর্য-নায়কম প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই সমিতির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সমিতি দুটি বিবরণী পেশ করেছিলেন। প্রথমটি ছিল একটু

অস্পষ্ট এবং অপরিস্ফুট ; তাই দ্বিতীয় বিবরণীতে উহার বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিবরণী থকে গান্ধীজী পরিকল্পিত ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজীর মনোগত ভাবধারার ও আদর্শের একটি যথাযথ রূপ পাওয়া যায়। পাঠ্যসূচী, পাঠনপদ্ধতি, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ভূমিকা, বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় ও আর্থিক সংস্থা, বিদ্যালয়ের ভূমি ও গৃহ, শিক্ষায়তনের সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি মূল্যবান তথ্য সন্নিবদ্ধ হয়েছে দ্বিতীয় বিবরণীতে। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার বিষয়ে দ্বিতীয় বিবরণীটি তথ্যসমৃদ্ধ একটি মহামূল্য গ্রন্থ।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-সম্মেলনের সভাপতিরূপে মহাত্মা গান্ধী এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণে তাঁর নব-প্রবর্তিত শিক্ষা-পরিকল্পনার সার মর্মটি নিহিত আছে। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ছিল এই যে তৎকালে প্রচলিত দেশের শিক্ষাপদ্ধতি দেশের চাহিদা মেটাতে একেবারে অসমর্থ। শিক্ষার উচ্চ স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার একমাত্র বাহন ছিল বিদেশী ইংরেজী ভাষা। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজের মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি মাত্রই শিক্ষাকৌলীন্যে সমাজের মধ্যমণি হয়ে থাকতেন। এদিকে অগণিত জনসাধারণ হয়ে থাকতো হয় অর্ধ-শিক্ষিত না-হয় একেবারে নিরক্ষর। ফলে শিক্ষার মাপ-কাঠিতে সমাজে ছুটো শ্রেণীকে মাপতে গেলে এতদুভয়ের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান ও বাধা পরিলক্ষিত হতো। ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করার বাধা থাকাতে জ্ঞানধারা শিক্ষিত উচ্চশ্রেণী থেকে অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারতো না। ইংরেজী ভাষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল বলে তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ওপর এমন এক গুরু ভার চেপে বসেছিল যা তাদের মননশক্তিকে চিরতরে পংগু করে দিয়েছিল এবং তারা যেন "নিজ বাস-ভূমে পরবাসী"র মত জীবন যাপন করতো। প্রচলিত শিক্ষাধারার মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদা বোধ জাগিয়ে তোলার কোন প্রকার ব্যবস্থা ছিল না। এতে বৃত্তিকরী কোন প্রকার শিক্ষার

ব্যবস্থা ছিল না। তাই তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় উৎপাদনমূলক যে কোন কাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল ; তার ফলে তারা স্বাস্থ্য হারিয়ে বসে ছিল। ঐ সময় দেশে যে প্রকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত ছিল তা একেবারে নিরথক বল্‌লে কোন প্রকার অত্যুক্তি করা হয় না। প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ যে পরিমাণ অর্থ ঐ সময় ব্যয়িত হ'তো তা অপব্যয়ের নামান্তর মাত্র। এর পশ্চাতে অবশ্য কারণও ছিল। শিক্ষার্থীরা তাদের চার বৎসরের ছাত্র জীবনে যৎসামান্য যা কিছু শিখতো, তা তারা অতি কম সময়ের মধ্যেই বেমালুম ভুলে যেতো ; সুতরাং তাদের লব্ধ শিক্ষা কি গ্রাম্য জীবনে কি সহরের জীবনে কোথাও কার্যকারী হ'তো না। গান্ধীজী বলতেন—প্রাথমিক শিক্ষা অন্তত সাত বৎসরব্যাপী হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে ইংরেজীকে একবারে বাদ দিয়ে দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে জীবনোপযোগী কোন একটি বিশেষ বৃত্তি শেখাবার ব্যবস্থা থাকবে এবং সেই সংগে অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দেবার ব্যবস্থা থাকবে। প্রবেশিকা স্তরের পূর্ব পর্যন্ত এই শিক্ষাবিধি বাহাল থাকবে। বালক-বালিকাদের সর্বাংগীণ বিকাশের উদ্দেশ্যে সমস্ত শিক্ষাই যথাসম্ভব একটি অর্থকরী বৃত্তির মাধ্যমে দিতে হবে। বিদ্যার্থী নিজের শ্রমজাত শিল্পের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা আপনার বেতন আপনিই রোজগার করবে এবং বিদ্যালয়ে আয়ত্তীকৃত বৃত্তির সাহায্যে ও মাধ্যমে নিজের সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নতি সাধনে তৎপর হবে। শিক্ষার্থীর শ্রমকে পসরা ক'রে বিদ্যালয়ের ভূমি, গৃহ ও সাজ-সরঞ্জামাদির মূল্যাদি মেটান এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নয়। প্রথমেই স্বল্প মূলধন নিয়োগ করে তুলা, রেশম ও পশম শিল্প, দর্জির কাজ, কাগজ তৈরী, বই-বাঁধান, আসবাব পত্র নির্মাণ, খেলনা ও গুড় তৈয়ারী ইত্যাদি কারু শিল্প হাতে-কলমে অতি সহজেই শিক্ষা করা সম্ভব।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে-সব ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করবে, তাদের শিক্ষাসমাপনে তাদের কর্মে নিয়োগের দায়িত্ব ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ছাড়া সাহিত্য-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি জাতীয় প্রয়োজনের বিবিধ বিষয়ে উচ্চ এবং বিশেষ শিক্ষা দেবার দায়িত্ব বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্রটির ওপর নজর রাখার ভার ও শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে পাঠ্যনির্বাচন ও অনুমোদনের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বসম্মতি ব্যতীত কোন বে-সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের ন্যায় কাজ চালিয়ে যাবে এবং এতৎসংক্রান্ত সমস্ত ব্যয়ভারই রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।

হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে মানুষ করে তোলা গান্ধীজীর পক্ষে অবশ্য নবোদ্ভাবিত পন্থা নয়। তাঁর আগে রুশো-প্রমুখ শিক্ষাবিদ ও মনস্তাত্ত্বিকগণ এর কথা নানাভাবে বলেছেন। বৃত্তি-কেন্দ্রিক অথবা কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষা বিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতজনের অনুমোদিত পন্থা। এতে দেহ-মনের অবসন্নতা কেটে গিয়ে আসে সৃষ্টির আনন্দ, আত্মশক্তিতে জাগ্রত চেতনা, মানসিক বুদ্ধির সম্যক স্ফূরণ, দু-পাতা বই পড়ার চাইতে এ-যে কত বড় সম্পদ জাতির দিক থেকে তা নিতান্ত অপরিণামদর্শী ছাড়া সবাই বুঝতে পারবেন। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার প্রকৃষ্ট রূপ শিক্ষাজগতের চিরারাধ্য মূর্তি; এই আদর্শের পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছে শিক্ষাজগতের অপরিতৃপ্ত অন্বেষী মন বহু যুগ যুগান্তর ধরে। গান্ধীজী পরিকল্পিত শিক্ষার এই নবরূপ দেখে আমাদের মন আপনা হতেই হয়ে ওঠে উল্লসিত ও আনন্দদৃপ্ত।

গান্ধীজীর শিক্ষাবিষয়ক ভাবধারাকে কম কথায় লিপিবদ্ধ করতে গেলে তার রূপ দাঁড়াবে নিম্নোক্তভাবে।

তৎকাল প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিসমাকীর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষায় যে কেবল আর্থিক অপচয় হতো তা নয়; বিরাট বালশক্তিরও অপচয় ঘটতো। প্রাথমিক স্তরের অধিকাংশ বিদ্যার্থী পিতামাতার বা পৈতৃক বৃত্তির শত্রুস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে কতকগুলি

কদভ্যাস ও কৃত্রিম সহুরে ভাব মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং তাদের কাছে "অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী" হয়ে দাঁড়ায়।

অধিকাংশ শিক্ষাবিদ এই অভিমত পোষণ করেন যে শিশু ও বয়স্কের শরীর, মন ও আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাংগীণ বিকাশই হলো শিক্ষা। কেবলমাত্র আক্ষরিক জ্ঞান শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ্য নয়—উহা শিক্ষার একটি উপায় মাত্র। মানুষের সামগ্রিক বিকাশই হলো যথার্থ শিক্ষা। শারীর ব্যায়াম, হস্তশিল্প, অংকন ও সংগীত—এগুলো শিক্ষার অপরিহার্য অংগ, মানবের সামগ্রিক বিকাশের পথে ইহারা যথেষ্ট সহায়ক। ইহাদের মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি অনুরাগও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

গান্ধীজীর সমসাময়িক শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল প্রাণহীন, নির্জীব ও নিষ্ক্রিয়। বহুসংখ্যক বিষয়বস্তুর গুরুভার শিক্ষার্থীদের নিকট অসহনীয় মনে হতো এবং শিক্ষা তাদের কাছে আনন্দদায়ক ও প্রাণবান না হয়ে, হয়ে পড়তো বিরক্তিকর ও বৈচিত্র্যহীন। বিদ্যার্থীরা যখন আত্মচেষ্টায় নানাবিধ কর্মের, পর্যবেক্ষণের, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার, বাস্তব অভিজ্ঞতা, জনসেবা ও প্রেমের মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে পারে, তখন তাদের শিক্ষা হয়ে ওঠে সজীব, প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়। যে শিক্ষা কেবলমাত্র গ্রন্থকেন্দ্রিক, যে শিক্ষা কেবলমাত্র তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ, যে শিক্ষা নিছক জ্ঞানমুখী, তা দিয়ে মানুষের বিচার-বুদ্ধির সম্যক স্ফুরণ এবং আত্মার যথাযথ বিকাশ কখনো হতে পারে না। এ হেন শিক্ষা মানুষের অগ্রগতিকে করে ব্যাহত এবং এই শিক্ষা মানুষের জীবনের যাত্রাপথে এক মহা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

একটি কথা অবশ্য বিশেষ মনে রাখা প্রয়োজন। গান্ধীজী যে শিক্ষা-পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেছিলেন, তা এদেশের শিক্ষার সর্ব স্তরকে স্পর্শ করে নি। একে মুখ্যত প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনা বলা যেতে পারে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার অভিনবত্ব হলো শিশুর বা কিশোরের সামাজিক ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনী এবং কোনো একটি বৃত্তিকে কেন্দ্র করে

সর্বতোমুখী শিক্ষা দেওয়ার প্রয়াস। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার বিস্তৃত পাঠ্যসূচী থেকে এই অভিনব শিক্ষাধারার একটি সুষ্ঠু ও সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষায়তনগুলোর পাঠ্যতালিকার সংগে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কোন সংযোগ নেই বললেই চলে। আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিকের দৃশ্যমান কোন ঘটনার কারণ দর্শাতে পারি না। আমাদের চারিপাশের প্রকৃতির অপরূপ নিকেতনে যে জ্ঞানসম্ভার আছে লুকিয়ে তার কোন সন্ধান রাখি না আমরা। কাছে যদি ঘড়ি না থাকে, তাহলে আমরা সময় বলতে পারি কি ? রাত্রে পথ হারালে যথাযথ দিঙ্‌নির্ণয় কি আমরা করতে পারি ? আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ জাগাবার কোন ব্যবস্থাই নেই। তাই আমাদের গৃহগুলি কদর্যতার আকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সত্যিকার মানুষ হচ্ছি কি না, তা কোন দিন ভেবে দেখি না এবং তা ভেবে দেখতে আমাদেরকে শেখানোও হয় না। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে বাহিরের বিশ্বের সংগে যোগসূত্র স্থাপনের কোন ব্যবস্থাই নেই। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে আমরা যখন বিরাট বিশ্বের বাস্তবতার সম্মুখীন হই, তখন দেখি যে বিদ্যালয়ে লব্ধ শিক্ষা আমাদের কর্মজীবনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক নয়। সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর আমাদের কি করা উচিত, আমাদের জীবিকাই বা কি হবে, আমাদের নাগরিক অধিকারই বা কি অথবা নাগরিক কর্তব্যই বা কি, সমাজের প্রতি বা রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের দায়িত্বই বা কতখানি ইত্যাদি বিষয়ে বোধ জন্মাবার কোন ব্যবস্থাই নেই আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে অর্থাৎ যে শিক্ষা আমাদের জীবন সংগ্রামের রসদ জোগাবে, যা আমাদের চরিত্র গঠনে প্রধান সহায়ক হবে, সেটাই হয় প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা হবে এমন যা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের অন্তর্নিহিত বুদ্ধিকে শাণিত ও ক্ষুরধার করে দেবে ; শিক্ষা আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে সুসংগত রুচি বোধ, যা সংগীত, চিত্র ও নৃত্যকলার ভেতর দিয়ে আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে সুকুমার

সৌন্দর্যবোধ; শিক্ষা আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে সংবেদনশীল সামাজিকতা, যা শুধু গৃহ, গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না, যা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বমানবের মধ্যে; শিক্ষা জাগ্রত করবে আমাদের মনে শান্ত সমাহিত সংযমকে যা প্রতিপদে আমাদের অন্তর্নিহিত যত কিছু অসৎ তাদের মূলোৎপাটন করে, স্বকীয় সংকীর্ণ স্বার্থকে দেশ ও দশের কল্যাণে বহু জনহিতায় নিয়োগ করতে শেখাবে; শিক্ষা আমাদের মধ্যে বিকশিত করে তুলবে একটি পবিত্র ধর্মবোধকে যা ফুটে উঠবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের শান্ত, শুদ্ধ, পুণ্যময় প্রতিটি আচরণে; শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যা দিয়ে শিক্ষার্থীরা লাভ করবে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য যা নিয়মিত মাংসপেশী চালনায় ও চারু দেহভংগীতে হয়ে উঠবে দীপ্তিমান ও ভাস্বর; পরিশেষে শিক্ষা-ব্যবস্থায় থাকবে কোন-না-কোন বৃত্তি যা আমাদের মনে জাগিয়ে তুলবে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধকে, যে বৃত্তি কর্মকুশলতার মাধ্যমে এনে দেবে মুখের অন্ন, দেহের বস্ত্র এবং নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা কি আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ছিল? রাজনৈতিক পরাধীনতার বেদনা যেমন গান্ধীজীর বুকে তীব্রভাবে আঘাত করেছিল, দেশের পুঞ্জীভূত যুগসঞ্চিত নিরক্ষরতার গ্লানি তাঁকে ঠিক তেমনি ভাবে বিদ্ধ করেছিল। তাই তিনি দেশে প্রচলন করতে চেয়েছিলেন এমন এক শিক্ষাপদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। গান্ধীজী-পরিকল্পিত ওয়ার্ধা শিক্ষা-ব্যবস্থায় উপরের গুণাবলী স্থান পেয়েছে। এ-কথা অবশ্য আজ সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র মানুষটিকে গড়বার প্রথম প্রয়াস হলো এখানেই। পুংখানুপুংখ আলোচনায় হয়তো এই পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরিপূর্ণতা দেখা যাবে, কিন্তু এমন ব্যাপক ও সূক্ষ্মভাবে প্রকৃত শিক্ষার দৃষ্টিভংগীতে শিশু ও কিশোর-কিশোরীর জীবনকে যেন এই সর্বপ্রথম দেখা হলো ভারতে। এখানেই নিহিত রয়েছে ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা যে মুখ্যত বৃত্তিকেন্দ্রিক এ-কথা বোধ করি আজকাল আর কাউকে বলে দিতে হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে বৃত্তি ছিল যেন এতদিন অনাদৃতা হয়ে। পূর্বে শিক্ষার সংগে যদি কোন বৃত্তির সংশ্রব থাকতো তবে তাকে কৌলীন্যে হীন ব'লে গণনা করা হতো। নিছক জ্ঞানমুখী শিক্ষাই ছিল সকলের কাছে আদরণীয়। শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থান পাবার জন্য বৃত্তি এতদিন বৃথা মাথা খুঁড়ে মরেছে। কিন্তু আজকালকার শিক্ষাবিদদের ভুল ভেঙেছে। বৃত্তি-দুয়োরাণীর সমাদর বেড়েছে। মানুষ আজকাল বেশ বুঝতে পারছে, যে শিক্ষায় মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যবস্থা নেই, সে শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত মানুষ গড়া যায় না শিক্ষালাভের সংগে সংগে বিদ্যার্থীদের মনে যাতে যে কোন শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর এই অবদান নবতম নয়। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একটি মৌলিক নীতি। আমেরিকায় অনুসৃত বিশেষ সমস্যা-সমাধান-প্রণালী (Project Method) ও রাশিয়ায় প্রচলিত মিশ্র প্রণালী এই নীতিরই ব্যবহারিক প্রয়োগ। মনোবিজ্ঞান-বিদদের সুচিন্তিত অভিমত হ'লো এই যে শিশুরা কৈশোর লাভের পূর্ব পর্যন্ত গ্রন্থ-মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা ভাঙতে, গড়তে, টুকিটাকি করতে, খেলতে, নানান জিনিষ পরখ করতে ভালবাসে। তার মাঝে চলে তখন উদ্দাম কর্মপ্রেরণা, সে তখন অতিমাত্রায় কর্মচঞ্চল। সেই কর্মচাঞ্চল্যকে সুষ্ঠু শিক্ষার খাতে বইয়ে দিতে পারলে আর কোন প্রশ্নই উঠবে না। শিশুর স্বভাবের সংগে শিক্ষাকে কৌশলে সুসম্পৃক্ত করে দিতে পারলে এবং তার স্বাভাবিক কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাকে সুনিয়ন্ত্রিতরূপে পরিতৃপ্ত করতে পারলে শিশু সানন্দে শিক্ষায় দ্রুত উন্নতি করতে থাকে। কিন্তু বৃত্তি-শিক্ষা দেবার সময় আমাদের খুব সতর্ক হ'তে হবে যে বৃত্তি-শিক্ষা যেন যান্ত্রিক না হয়ে পড়ে। প্রতিটি পদে এবং প্রতিটি স্তরে বিদ্যার্থীকে কার্যকারণ বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান দিতে হবে। বৃত্তি-শিক্ষা যেন কোনদিন পণ্যে পর্যবসিত

না হয়; বৃত্তির মাধ্যমে যাতে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির বিকাশ সাধন হয় সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। গান্ধীজীর সুচিন্তিত অভিমত হলো এই যে এক বা একাধিক বৃত্তির মাধ্যমে বালকবালিকার সর্বাংগীণ বিকাশ সাধিত হয় সর্বাধিক। কোন এক বিশেষ বৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে সমস্ত পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হওয়াই বিধেয়। সাধারণ শিক্ষার সব কিছু কোন বিশেষ বৃত্তির আনুকূল্যে ও উহার অগ্রগতির সংগে যুগপৎ অগ্রসর হতে থাকবে। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, ভাষা, অংকন, সংগীত, মূল বৃত্তির সংগে অনুবন্ধ বা সহ-সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। কোন একটি বিশেষ হাতের কাজকে এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রাণকেন্দ্ররূপে গণনা করা হয়; তাই একে বলা হয় "বুনিয়াদী" শিক্ষা। কোন একটি বিশেষ হাতের কাজকে কেন্দ্র ক'রে অনুষংগ প্রণালীতে অপরাপর জ্ঞানমূলক ও রুচিসম্মত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হ'লো এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় যে পাঠ্যতালিকা স্থিরীকৃত হ'য়েছিল, তার মধ্যে নিম্নোক্ত পাঠ্যবিষয়গুলি সন্নিবেশিত হয়েছে :

১। মাতৃভাষা
২। স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষা
৩। সাধারণ বিজ্ঞান
৪। বৃত্তি
৫। অংক
৬। সংগীত, নৃত্য ও অংকন।

এই পরিকল্পনায় পাঠ্যসূচী থেকে এতাবৎকাল প্রচলিত ইংরেজী বাদ পড়েছে। বিদেশী ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এতে অধিকার বোধ আনতে যে পণ্ডশ্রম হয়, তারপর অন্য বিষয়ে মন দেবার কোন উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে না। আর তা'ছাড়া বিদেশী একটা ভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার দীনতা এবং অক্ষমতার হাত কিছুতেই এড়ানো যায় না। এর ফলে আত্ম-

প্রকাশের শক্তি ও উৎস আপনা হতেই শুকিয়ে যায়। এটা হ'লো, কি শিক্ষার দিক থেকে, কি ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিক থেকে অপরিপূরণীয় ক্ষতি। তাই মাতৃভাষাকে এই শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষার বাহন করায় আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণের যে কি প্রভূত উপকার হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য মাতৃভাষা শেখার সংগে সংগে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানীও শিখতে হ'বে। এতে অবশ্য বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করার কোন প্রয়োজন নেই; সাধারণভাবে কাজ-চালানো-গোছের জ্ঞান অর্জন করলেই চলবে, যেমন সাধারণভাবে কথাবার্তা চালানো ও ছোটখাটো বক্তৃতা করা, ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠিপত্র লেখা; সহজ সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি পাঠ। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজীকে বাদ দিয়ে মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকে কি কি বিষয় সন্নিবেশিত করা যাবে? এই স্তরের পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায় যে শ্রেণীগত উপযোগিতা অনুযায়ী মহাপুরুষ, দেশপূজ্য নেতা বা শিক্ষাবিদগণের জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, রূপকথা, গল্প, হাস্যকৌতুক, জাতীয় উৎসবাদি, স্বাস্থ্য ও খেলাধূলার কথা, প্রকৃতি পরিচয়, পরিগমের মাধ্যমে সামাজিকতা বোধ প্রবুদ্ধ করার প্রয়াস, নাগরিক কর্তব্য ও অধিকার, বিজ্ঞানের নবতম দান, নানা রকমের কবিতা অর্থাৎ নানা বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে সুকুমারমতি শিশুগণের মনকে আকৃষ্ট করে তার সর্বতোমুখী বিকাশের চেষ্টা করা হয়। অনেকের মনে এই সন্দেহ আছে যে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা বৃত্তি-কেন্দ্রিক বলে, এবং ঐই পদ্ধতিতে অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে এর পাঠ্যপুস্তকে বিচিত্রতার অভাব হবে। কিন্তু এরূপ সন্দেহ অমূলক। প্রাথমিক অবস্থায় অবশ্য মাতৃভাষায় মনোমত ভাল পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাবে না। কিন্তু শিক্ষাবিদরা এ-বিষয়ে একটু অবহিত হলেই প্রয়োজনানুরূপ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হ'তে বেশী সময় লাগবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পশ্চিমবংগে প্রাথমিক স্তরে প্রচলিত "কিশলয়" পুস্তকটি দেশের চাহিদা মেটাতে সমর্থ হয়েছে।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় আর্থিক স্বাবলম্বনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই আর্থিক স্বাবলম্বনের অবশ্য দুটো দিক আছে, প্রথম দিক হ'লো এই যে বিদ্যার্থী কোন একটি বিশেষ শিল্প শেখা ও জ্ঞানার্জন করার সংগে সংগে কিছু কিছু অর্থ উপার্জনও করবে। এইরূপ আশা করা হয়েছে যে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শ্রমলব্ধ অর্থ দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এই পরিকল্পনা চালু করার প্রথম দুই এক বছর হয়তো কোন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ব্যয়ের দিক থেকে স্বাবলম্বী হতে পারবে না। কিন্তু গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে সমগ্র বিদ্যালয় জীবনের সাত বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়গুলো আর্থিক আত্মনির্ভরতা লাভ করবে। গান্ধীজী ভাবতেন যে শিক্ষার্থীরা যদি প্রতি ঘণ্টায় দু'পয়সা রোজগার করতে পারে তাহলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলোর স্বাবলম্বী হওয়ার পথে নাকি অন্তরায়ের আশংকা নেই। এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় দিক হ'লো এই যে বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যার্থী তার ভবিষ্যৎ জীবনে অর্থগত ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে শিখবে ; তার ভরণপোষণের জন্য শিক্ষাসমাপনান্তে তাকে আর পরের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না। এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করার পশ্চাতে অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল ব'লে মনে হয়। কারণ, গান্ধীজী মনেপ্রাণে বুঝতেন যে ভারতের মত গরীব দেশে চমকপ্রদ কোন বিরাট পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী হ'বে না। আর্থিক অনটনের অজুহাতে বহুবিধ পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাচ্ছে। দুর্গত দেশের শিক্ষার ব্যয় সংকুলান ও শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান চোখের সামনে রেখেই গান্ধীজী এই শিক্ষা-পরিকল্পনা ক'রেছিলেন। এখানেই নিহিত রয়েছে এই পরিকল্পনার সার্থকতা।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার ব্যাপ্তি স্থিরীকৃত হয়েছিল সাত বৎসর। গান্ধীজীর অভিমত ছিল এই যে এই পরিকল্পনার শিক্ষাকাল বাধ্যতা-মূলকভাবে অন্তত সাত বৎসর বা ততোধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি অবশ্য বয়সের কোন সীমা নির্ধারণ করে দেন নি। কিন্তু ওয়ার্ধা

শিক্ষা-পরিকল্পনা সমিতির সদস্যগণ উহা ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছিলেন।

ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার পাঠ্যতালিকা আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে স্বাস্থ্য, সমাজ ও সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যে পাঠ্য-বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই পরিকল্পনার নির্মাতারা সুকুমারমতি শিশুদের প্রাত্যহিক জীবনের সংগে যাতে তাদের পরিগমের একটা নিবিড় যোগাযোগ সংস্থাপিত হয় সেদিকে জাগর দৃষ্টি রেখেছিলেন। এই পাঠ্যসূচীতে এমন সব বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে যাতে বিদ্যার্থীরা ছোটবেলা থেকেই বুঝতে শেখে যে সে তার চারিপাশের বৃহত্তর সমাজের একটি বিশিষ্ট অংগ; সমাজের নিকট তার যেমন অধিকার আছে, সমাজের প্রতি তার দায়িত্বও কোন অংশে কম নয়। ব্যষ্টি-জীবন যদি আত্মকেন্দ্রিক হয়, যদি তা কেবলমাত্র স্বার্থসন্ধ হয়ে ওঠে, তাহলে সে জীবন দিয়ে কোনদিনই সমাজের কল্যাণ হবে না; বরং তাতে সমাজের অধঃপতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। পাঠ্যসূচীতে জীবনের এমন কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, যাতে বোঝা যায় এই পরিকল্পনার পশ্চাতে যথার্থ জাতীয় জীবন গঠনের শুভ প্রয়াস নিহিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে এই পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তরেই যাতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াতে শেখে, যাতে তারা অন্যে কথা বলার সময় কথা না বলে, যার যার পালার জন্যে অপেক্ষা করে, যাতে স্কুলে বা বিদ্যালয়ের মধ্যে কোথাও সামান্য কাগজের টুকরো অথবা কোন নোংরা জিনিষ পড়ে না থাকে, যাতে প্রতিটি কাজের পর যেখানকার জিনিষপত্র যোগাযোগ্য স্থানে গুছিয়ে রাখা হয়, যাতে বিদ্যার্থীরা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সবিশেষ যত্নশীল হয়, ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় এ সবের অভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। আপাত দৃষ্টিতে এই সব বিষয় ছোটখাট মনে হতে পারে; কিন্তু এগুলোই হলো জাতীয় জীবনতরুর অংকুর। এসব শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের দেশের বর্তমান

শিক্ষাপ্রণালী থেকে বাদ পড়েছে বলেই আমাদের জাতীয় জীবনের গতি শ্লথ হয়ে গিয়েছে। বিশ্বের সভ্যতা যে আজ উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে, তার মূল রয়েছে অপরের অধিকারের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান-বোধ ও পরমতসহিষ্ণুতা। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই সত্যটিকে কেন্দ্র করে পাঠ্যস্থচী স্থিরীকৃত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির এ হলো বাস্তব রূপায়ণ। এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে আদর্শ-দীপ্ত একাগ্রমনা শিক্ষকদের উপর, তাঁদের স্বার্থশূন্য নিরলস কর্ম ও সাধু প্রয়াসের উপর।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় ইতিহাস ভূগোলকে পৃথক্ পাঠ্যবিষয় হিসেবে ধরা হয়নি। তাদেরকে ধরা হয়েছে সমাজ বিজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবে। ইতিহাস এতদিন ছিল সময়, সংগ্রাম, রাজ-রাজড়ার কাহিনী-বিশেষ; তা হয়ে দাঁড়াতো নীরস ঘটনাসম্ভার ভূগোল ছিল এতদিন নদীগিরিসাগর প্রভৃতির সংজ্ঞার মধ্যে নিবদ্ধ। তাই এই সব বিষয় পাঠে বিদ্যার্থীরা কোনপ্রকার আগ্রহ অনুভব করতো না। নানাবিধ গল্প, নাটক ও শিশুমনস্তত্বের সাহায্যে এ-গুলোকে আজকাল শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপন করার প্রয়াস চলেছে। বিশ্বের বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর পটভূমিকায় এ-গুলোকে শিখতে হবে, জানতে হবে, মানুষকে কেন্দ্র করেই বিশ্বের যতকিছু কর্মপ্রয়াস এই বোধটি যাতে শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হয় সেদিকে এই পরিকল্পনার বিধায়কগণ সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তাঁরা চেয়েছেন ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ যেন নীরস ও ভীতিপ্রদ না হয়, বরং তা যেন সরস, প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে

এই পরিকল্পনায় বিজ্ঞান শিক্ষার পর্যবেক্ষণ, চিন্তাশক্তি ও অভিযানের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ, এ ছাড়া আমাদের জগৎ ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থেকে যায় অত্যন্ত অস্পষ্ট। শিক্ষা-পরিকল্পনায় যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির স্বল্পতা থাকে, তাহলে কোন দেশেই উদ্ভাবনী শক্তির যথাযথ স্ফুরণ হবে না। ভারত যে এককালে জ্ঞান-গরিমায় বিশ্ববরেণ্য হয়ে

ছিল, তার মূলে ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ প্রাচীন ঋষিগণের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও চিন্তা। আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে গ্রহনক্ষত্রাদি ও সামাজিক সংস্কারের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এবং এই পারিপার্শ্বিকের প্রভাব ছাড়িয়ে উঠবার ক্ষমতা কি করে আমাদের গড়ে ওঠে, সে-পন্থাও এই শিক্ষা-পরিকল্পনায় বিশেষ করে দেখানো হয়েছে। সামাজিকতা বোধ ও সাধারণ বিজ্ঞানের মাধ্যমে দেশে যথার্থ মানুষ তৈরী করার প্রয়াস হলো এই প্রথম।

গান্ধীজীর মনে এই অভিলাষ ছিল যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে-বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে, সেটি এমন হওয়া চাই যাতে করে তাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের নানা বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করা যায়; যার মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে; বিশেষ করে যে-বৃত্তিকে কেন্দ্রগতভাবে বেছে নেওয়া হবে তার সংগে গ্রাম্য পরিগম অথবা নগর পারিপার্শ্বিকের যেন একটা নিবিড় সংযোগ থাকে। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল মন্ত্র হ'লো "সমগ্র গ্রাম সেবা"। কাজেই যে-বৃত্তিকে কেন্দ্র করে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হবে, তার সংগে পল্লীজীবনের যদি সুনিবিড় সংযোগ না থাকে তাহলে সে-শিক্ষা হ'বে একবারে ভুয়ো। এই মাপকাঠিতে জাকির হুসেন সাহেবের কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় কয়েকটি বৃত্তির অনুমোদন করেছেন—(১) সুতো কাটা ও তাঁতের কাজ; (২) কৃষি; (৩) কাঠের কাজ, কার্ডবোর্ডের কাজ ও ধাতুর কাজ। সুতো কাটা ও তাঁতের কাজের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পঠনীয় বিষয়-গুলোর অনেক তথ্য জানা যায়। সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের জীবনের সংগে এতদুভয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে বলেই গান্ধীজী এই বৃত্তিকেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সম্মানের আসন দিয়েছিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক তো কৃষিজীবী —এই কৃষির মাধ্যমেই হয় তাদের অন্নসংস্থান। কাজেই আমাদের জাতীয় জীবনে এই বৃত্তির উপযোগিতা যে কতখানি তার আর ইয়ত্তা নাই। কৃষির কাজকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রাধান্য দিলেও

এখানকার শিশু শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়ে কৃষিকর্মে নিযুক্ত হয় না। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম কয়েকটি শ্রেণীতে শ্রমবহুল কৃষির কাজে অপরিণত দেহ শিশুদের লাগানো হয় না। তারা ছোটখাট বাগান অথবা "ক্ষেতি" ইত্যাদি অল্পায়াসসাধ্য কাজে লিপ্ত হয়। শিক্ষার্থীদের বয়স অন্তত বার বছর না হলে তাদেরকে শ্রমসাপেক্ষ কোন কৃষিকাজে নিয়োগ করা হয় না। তবে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সুতো কাটা অথবা কৃষিকাজের উপযোগিতা যেখানে অনুভূত হয়, সেখানে এ-গুলো অবলম্বনের কোন বাধা নেই। এই সব বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে শুধু বাইরের প্রকৃতির সংগে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয় তা নয়; এ-সবের মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে তো পারেই, উপরন্তু এসব বৃত্তির মধ্য দিয়ে তারা স্রষ্টা বা উৎপাদকের আনন্দ, আত্মপ্রসাদ ও গৌরব অর্জন করতে পারে। দেশের বর্তমান শিক্ষাধারায় স্বাবলম্বন শেখানোর কোন ব্যবস্থাই নেই; কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিদ্যার্থীরা যাতে শিক্ষার্থী জীবনের প্রারম্ভ থেকেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে, তার যথেষ্ট বন্দোবস্ত হয়েছে। স্থানীয় পরিগম অনুযায়ী পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন করার সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই পদ্ধতিতে।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় বৃত্তি-শিক্ষার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য অবশ্য এই নয় যে এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা শুধু শ্রেষ্ঠ কারিগর, তাঁতী বা মিস্ত্রী হয়ে উঠবে এবং এই বৃত্তিকে পসরা করে তারা নিজেদের জীবিকা অর্জন করবে। বরং বৃত্তিশিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা নানা বিষয়ে সহজ নৈসর্গিক উপায়ে জ্ঞান আহরণ করে, বৃত্তির বিভিন্ন অংশের যথাযথ অর্থ ও কার্যকারণ সম্বন্ধ উপলব্ধি করে এবং সেই সংগে কর্মতৎপরতা ও উচ্চাংগের সৃজনীশক্তি আয়ত্ত করে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করাই ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার বৃত্তিশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ আদর্শ আদৌ সহজলভ্য নয়—এই আদর্শ অনুসরণের পথ অত্যন্ত দুরূহ। অবশ্য

একাগ্র মনে পরিকল্পনানির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করলে যে ছাত্রছাত্রীরা এর দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই এই পরিকল্পনায় দেখা যায় যে অনুবদ্ধ প্রণালীতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানকার শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে কোন একটা বিশেষ বৃত্তিকে কেন্দ্র করে বিদ্যার্থীদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সুতা কাটা ক্লাসে শেখানো হয়, তুলো আসে কোথা থেকে, কোন্ দেশে কোন্ প্রকার মাটিতে এবং কি প্রকার জলবায়ুর দেশে তুলোর চাষ ভাল হয়, কতটুকু তুলো থেকে কতখানি সুতো বার হবে; তুলোর জন্য ইতিহাসে কি কি সংগ্রাম হয়েছে, তুলো থেকে বস্ত্র জামা ইত্যাদি কেমন করে তৈরী করা হয়, এ-সব আলোচনা, তুলো গাছ, তার পাতা ও ফুল এবং বীজ-কোষের ছবি আঁকা ইত্যাদি বিষয়। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেক সময় একটা আপত্তি তোলা হয় যে এইভাবে তুলোকে কেন্দ্র করে ভূগোল, ইতিহাস, অংক, সমাজ-বিজ্ঞান, অংকন প্রভৃতি যে-সব পাঠ্যবিষয় শেখানো হয়, তার সীমা হয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে বহুল ব্যবধান থেকে যায়। কিন্তু এই আপত্তির পশ্চাতে বিশেষ কোন যৌক্তিকতা নেই; কারণ এই পদ্ধতিতে অনুবন্ধ প্রণালীতে যতটুকুন শেখানো যায় তার বাইরে জ্ঞান আহরণ করার কোন বাধা নেই। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রধান প্রধান পাঠ্যবিষয়গুলির (যেমন মাতৃভাষা, সমাজ-বিজ্ঞান, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, অংকন, ইত্যাদি বিষয়ে) পৃথক্ পৃথক্ পাঠ্যসূচী আছে এবং তাতে অনুষংগ প্রণালীতে নিবিড়তম সম্পর্কে যা আনা যায় তার চাইতে অনেক বেশী তথ্যরাশি রয়েছে। হয়তো সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে যেমন আছে, ততখানি বিশদভাবে নেই, কিন্তু তাতে ক্ষতি না হয়ে বরং লাভই হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যবিষয়ের ভারে আমাদের দেশের বিদ্যার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তির সাবলীল স্ফুরণ হচ্ছে না; তারা অযথা নিষ্পেষিত হচ্ছে।

না বুঝে মুখস্থ করার দিকে তাদের ঝোঁক বেশী হয়ে যায়; এতে কোনদিনই যথার্থ জ্ঞান আহরণ হয় না। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় বহির্জগতের কাজ এবং মানুষের সমাজগত জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠতম যোগ সংসাধনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী আহরণ করবার একটা সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এই পদ্ধতিতে চারুকলার প্রতি যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। সমবেত সংগীত, চারু অংগ সঞ্চালন, নাচ, গান, অংকন ইত্যাদি বিষয়কে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদান বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতির এক বিশিষ্ট অবদান। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় আনন্দময় শিক্ষাদান বিধি একটা মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। সংগীত মানুষকে কামনার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জাগতিক সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে মানুষকে নিয়ে যায়। মানুষ তখন ভগবানের সংগে নিবিড় মিলনের সুযোগ পায়। ওয়ার্ধা শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাই সংগীতের প্রাধান্য রয়েছে বেশ।

পাশ্চাত্যের ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার মোহময় নিগড়ে আমরা আজ বিভ্রান্ত, আমরা আজ ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের কথা ভুলে বসে আছি। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীর বা আমাদের চারিদিকের সমাজের লোকের কি হচ্ছে বা না হচ্ছে সেদিকে তাকাবার মত সময় বা অবসর আজ আমাদের নেই। আমরা আজ স্ব স্ব স্বার্থে বিমূঢ় ও অন্ধ হয়ে গেছি। এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সুষ্ঠু সমাজধর্মের ও সেবাধর্মের আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ওয়ার্ধা শিক্ষাপদ্ধতিতে ভারতের সনাতন সেই আদর্শের নবরূপ দেওয়া হয়েছে। নীচ স্বার্থে অন্ধ হয়ে তাকে গ্রহণ করবার অভিলাষ, শক্তি, সাহস এবং স্বার্থত্যাগ হয়তো আজ আমাদের নেই; কিন্তু জাতিকে সর্বাংগীণ উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে গেলে এই আদর্শকে আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা করে নিতে হবে।

ওয়ার্ধা শিক্ষাপদ্ধতিতে ধর্ম ও সমগ্র গ্রাম-সেবার যে আদর্শকে রূপ

দেওয়া হয়েছে তা সত্যই মনোজ্ঞ। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজে ও বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক জীবনে এই আদর্শের প্রভাব অপরিসীম। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজের মধ্যে ধর্ম, সেবা ও সমবায় প্রণালীর ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ স্নুরু হয় সমবেত প্রার্থনা দিয়ে আর তার পরিসমাপ্তি ঘটে সান্ধ্য উপাসনায়। বিদ্যালয়ের সমস্ত কৃত্যালীই সাধিত হয় যৌথ ও সমবায় প্রণালীর মাধ্যমে। বিদ্যালয় সেবা অথবা তার পরিগমের সেবাই ওয়ার্ধা শিক্ষাপদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য নয়। তার প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয়ের আশে পাশের গ্রামের সেবা।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে গেলে এক বিশেষ ধরনের শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। যে-কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সর্বাংগসুন্দর হতে পারে, তার শিক্ষা-পদ্ধতি আদর্শস্থানীয় হতে পারে, তার পাঠ্য পুস্তক অতি যত্নে রচিত হতে পারে, বিদ্যালয়ের সাজ-সরঞ্জাম পর্যাপ্ত হতেও পারে, কিন্তু সেই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য প্রয়োজন হয় দক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষকের। গান্ধীজী-পরিকল্পিত ওয়ার্ধা শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই তথ্যটি আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই পরিকল্পনার পাঠনপদ্ধতি অত্যন্ত কঠিন। এই পদ্ধতিতে জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভংগীর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তা একেবারে অভিনব। একে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে গেলে সম্পূর্ণ নোতুন ধরনের শিক্ষকের একান্ত আবশ্যক। যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করতে পারবেন তা নয়। ওয়ার্ধা বিদ্যায়তনের অনুরূপ শিক্ষাকেন্দ্রে যে-সব শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করবেন, তাঁদেরকে হতে হবে বিশেষ ধরনের শিক্ষক, বুনিয়াদী আদর্শে তাঁদের বিশেষ জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন; দক্ষতা, উৎসাহ, স্বদেশপ্রেম, সেবাবোধ প্রভৃতি গুণাবলীতে তাঁদেরকে গুণশালী হতে হবে। শিক্ষকতা কাজে যোগ দেবার আগে তাঁদেরকে যথারীতি প্রস্তুত ও শিক্ষিত হতে হবে। সামাজিক বোধসম্পন্ন ও দেশ-প্রেমোদ্বুদ্ধ ব্যক্তিই কেবল ওয়ার্ধা বিদ্যায়তনগুলিতে শিক্ষকতা করবার

উপযোগী বলে বিবেচিত হবেন। ভারতের যে-সব স্থানে বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই সব এলাকার স্থানীয় ব্যক্তি উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট হলে শিক্ষকতার কাজে তাঁকে দিতে হবে অগ্রাধিকার। আবেদনকারীরা যেন অন্তত প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হন। তবে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকের যে প্রয়োজন যথেষ্ট আছে সে কথা কোথায়ও অস্বীকার করা হয়নি। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষকের বেতন ২০৷২৫ টাকা এবং বি. এ বা বি. এস-সি পাশ করা শিক্ষকের বেতন অন্যূন ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে এই পদ্ধতিতে। এই পরিকল্পনায় নারী-শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়েছে। তবে প্রতিটি শিক্ষক অথবা শিক্ষিকাকেই শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করার পূর্বে শিক্ষণ বিষয়ে যথাযোগ্য শিক্ষালাভ করতে হবে।

এ-বিষয়ে একটি কথা আমাদের বিশেষ করে ভেবে দেখতে হবে। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি দেশে অগণিত বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে যে দেশে অসংখ্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। তবে সেই অগণিত শিক্ষককে যথাযোগ্যরূপে শিক্ষিত করে তোলা এক আধ বৎসরের কাজ নয়, তা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা সমিতির অন্যতম সভ্য অধ্যাপক কে. টি. সাহ প্রসংগত প্রস্তাব করেছিলেন যে বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক-সমস্যার আশু নিরাকরণ করতে গেলে প্রথম প্রথম দেশের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের জোর করে কিছু সময় ওয়ার্ধা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করতে বাধ্য করালে হয়তো এই গুরুতর সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে। কিন্তু অহিংস মন্ত্রের পূজারী মহাত্মা গান্ধী কোনদিনই জোরজবরদস্তির পক্ষপাতী ছিলেন না। গান্ধীজীর মনে এই ধারণা ছিল যে যদি দেশের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদেরকে সেবার মহান আদর্শ হৃদয়ংগম করানো যায়,তাহলে তারা কিছুটা সময় এই মহৎ কাজে স্বেচ্ছায় ব্যয় করতে সম্মত হবে। কিন্তু তার আগে বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়ে তাদেরকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। এই

শিক্ষাগ্রহণের কাল কম করেও দু বৎসর হওয়া বাঞ্ছনীয়, শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য দু রকমের ব্যবস্থার কথা সমিতির বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা এক্ষেত্রে নবাগত এবং যারা স্থায়িভাবে শিক্ষকতা করতে প্রস্তুত তাদের জন্য তিন বৎসর কালব্যাপী ব্যাপক ও পূর্ণাংগ শিক্ষা, আর যারা আগে থেকে শিক্ষকতা কাজে লিপ্ত আছে, তাদের জন্য এক বৎসরব্যাপী জরুরী শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকদের জন্য এই দুই প্রকারের শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া যে-সব শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী স্বেচ্ছায় জাতীয় সেবা ও কর্তব্যের তাগিদে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক তাদের শিক্ষনের জন্য তিন মাসব্যাপী সুতীব্র অনুশীলনের ব্যবস্থার সুপারিশ সমিতি করেছিলেন।

গান্ধীজী-প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার বিস্তৃত আলোচনার পরও জনসাধারণের মনে স্বভাবতই কয়েকটি সংশয় ও প্রশ্ন উদিত হয়। সেগুলোকে নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রশ্ন হলো এই যে বুনিয়াদী শিক্ষার যে কোন হস্তশিল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পাঠ্য সব কিছু বিষয় কি শিক্ষা দেওয়া যায়? এ কথা অবশ্য সকলেই স্বীকার করবেন যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যগুলির প্রতিটি বিষয় বা তার সব কিছু কোন একটি বিশেষ হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যায় না। এ-বিষয়ে অবশ্য গান্ধীজী এই অভিমত পোষণ করতেন যে কোন একটি হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে অনুষংগ প্রণালীর মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পাঠ্য যতগুলি অধিকসংখ্যক বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব তার জন্য সবিশেষ প্রয়াস করতে হবে। যদি এই ব্যবস্থায় কোন কোন বিষয়বস্তুর মধ্যে জ্ঞানগত ব্যবধান থেকে যায় তাহলে বিদ্যালয়ের সময় পত্রিকায় তার জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা থাকা একান্তরূপে বাঞ্ছনীয়।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এই যে, এই পদ্ধতিতে সূতা কাটা ও বয়নশিল্পের উপর যেন আপেক্ষিকভাবে একটু বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ-সম্বন্ধে গান্ধীজী নিজেই উত্তর দিয়ে গেছেন। তাঁর অভিমত হ'লো এই যে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত

জীবনে তকলীর যাদু ও শক্তি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই দুটো বিষয়ে তিনি এত বেশী জোর দিয়েছিলেন। তা'ছাড়া অন্য দিক দিয়ে বিচার করলেও এই দুই শিল্পের গুরুত্ব কম নয়। ভারতের মত দরিদ্র দেশে কাপড়বোনা শিক্ষা দেওয়া সহজ ও অল্পায়াসসাধ্য ; একে সারা দেশব্যাপী কার্যকরী করে তুলতে গেলে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না ; আর ব্যয়ের দিকটাও যথেষ্ট কম। দেশের সামগ্রিক দারিদ্র ও অনটন মোচনে এটা অত্যন্ত সুলভ ও সার্থক উপায় সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। যদি অন্য কোন উপযোগী হস্তশিল্পের অনুরূপ উপযোগিতা থাকে, তাহলে তাকে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় গ্রহণ করায় কোন বাধা বা আপত্তি থাকার কোন সংগত কারণ থাকতে পারে না। তবে এটাও ঠিক, যে হস্তশিল্পকে বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে ধার্য করা হবে তার মাধ্যমে যেন বিদ্যালয়ের অন্যান্য অধিকসংখ্যক জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তুর সংযোগস্থাপন করা যায় ; তবেই সেই হস্তশিল্পটি নির্বাচন যোগ্য ও বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠবে।

অনেকে আবার এমনও প্রশ্ন তোলেন যে ওয়ার্ধা বিদ্যালয়গুলো কি বয়ন-বিদ্যালয়ের অনুকৃতি মাত্র ? এমনও তো হতে পারে যে বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর বয়নের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বা অনুরাগ নেই। তা যদি দেখা যায়, তাহলে এ-বিষয়ে অনিচ্ছুক বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে কি না। প্রত্যুত্তরে গান্ধীজী বলেন—তাদের জন্য নিশ্চয়ই বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা সমিতি ও তাঁদের বিবরণীতে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন—বিভিন্ন শিশুর অনুরাগ ও অভিরুচি অনুযায়ী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভিন্নতর হস্তশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই কাপড় বোনার সংগে সংগে তারা অন্যান্য হস্তশিল্প, যেমন কৃষি, কার্ডবোর্ডের কাগজ, কাঠের কাজ, ধাতুশিল্প প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলোতে, এ ছাড়া দড়ি-তৈরী ও ফিতা-তৈরীর কাজের কথাও উল্লিখিত হয়েছে।

এই সংগে আর একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হয়। একই বিদ্যালয়ে একাধিক বা সব হস্তশিল্পশিক্ষা দেওয়া সম্ভব কি না। এ-বিষয়ে গান্ধীজী এই অভিমত পোষণ করেন যে, একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পঁচিশজনের বেশী শিক্ষার্থী থাকবে না এবং প্রত্যেক বিদ্যালয় একটিমাত্র হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু এতে বাস্তব ক্ষেত্রে বহু জটিলতার সৃষ্টি হবে। হয়তো ছোট ছোট পল্লীগ্রামে একটি মাত্র শিল্পকে কেন্দ্র করে একটি বিদ্যালয় খোলা যেতে পারে। কিন্তু এই ধরনের বিদ্যালয় বড় বড় গ্রামগুলির প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে সমর্থ হবে না। সে-সব ক্ষেত্রে একাধিক শিল্প-ব্যবস্থাসম্পন্ন বিদ্যালয় থাকা একান্তরূপে বাঞ্ছনীয়। সেই সংগে এও দেখতে হবে যে এই সব বিদ্যালয়ে যে-সব হস্তশিল্প প্রবর্তিত হবে, তারা যেন সমগোত্রীয় হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসময় সাত বৎসরব্যাপী বিস্তৃত। এখন প্রশ্ন ওঠে যে এই সাত বৎসর ধ'রে কি এখানকার বিদ্যার্থীরা একটি মাত্র হস্তশিল্প শিখবে? ব্যাপারটি বিচারসাপেক্ষ। সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায় যে জ্ঞানমুখী বিষয়—যেমন ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্যাদি—শেখবার জন্য সাত আট বৎসর তো ব্যয়িত হয়ই। সূতা কাটা, কাপড়-বোনা ইত্যাদি বিষয় উত্তমরূপে শিখতে সাত আট বছর লাগবে কি না সে-বিষয় অবশ্য অনুশীলন ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। কোন শিল্প যান্ত্রিকভাবে শিখতে গেলে হয়তো সাত আট বছর সময় লাগে না। কিন্তু ঐ প্রকার কোন শিল্পকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে পেলে সাত আট বছরের বেশী সময় লাগাও বিচিত্র নয়।

এখন ধ'রে নেওয়া গেল যে দেশে সর্বত্র বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হলো। এখানকার শিক্ষাসমাপনের পর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর কি প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে—এই হলো আর একটি প্রশ্ন। এ-বিষয়ে গান্ধীজীর অভিমত হলো এই যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাসমাপনান্তে কোন শিক্ষার্থী কোন শিল্পে উচ্চতর ও

উন্নততর জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তাকে সে-বিষয়ে সর্ববিধ সুযোগ দিতে হবে। এ-বিষয়ে রাষ্ট্রকেই অগ্রণী হতে হবে। জাতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের উচ্চাংগের বৃত্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই হওয়া উচিত।

অনেকে আবার এমনও প্রশ্ন তুলে থাকেন যে দেশে বুনিয়াদী বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর বিদ্যালয় থাকবে কি না। এ-বিষয়ে গান্ধীজীর অভিমত হলো এই যে দেশের সব লোককে কখনো এক ছাঁচে ঢালা যায় না। তা করতে গেলে, তা হবে অপচেষ্টার নামান্তর মাত্র। দেশের লোকের প্রয়োজন ভিন্নতর। তাই তাদের অভিরুচি ও অনুরাগ অনুসারে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া যুক্তিযুক্ত।

আবার অনেকে এমনও প্রশ্ন তুলেছেন যে দেশে যদি সর্বত্র বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে দেশে যে এতাবৎকাল প্রচলিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলো আছে, তাদের উপায় বা গতি হবে কি? প্রাচীনপন্থী বিদ্যালয়গুলো অবলুপ্তির পক্ষপাতী গান্ধীজী। তিনি বলতেন—এই সব বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের ভার প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। দেশের বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলী যদি নবতম শিক্ষা-ব্যবস্থা মেনে নেন, তবে প্রচলিত বিদ্যালয়গুলোর সংস্কারসাধন করে সেগুলোকে চালু রাখাই যুক্তিযুক্ত। এতে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যয় অনেকখানি কমে যাবে। অবশ্য যে-সব অঞ্চলে কোন শ্রেণীর বিদ্যালয় নেই, সে-সব স্থানে নোতুন ধরনের শিক্ষক সমন্বিত শিক্ষালয় স্থাপন করতে হবে। এইভাবে দেশ যদি অগ্রসর হতে থাকে তাহলে সারা ভারতে ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপিত হতে কুড়ি বছরের বেশী সময় লেগে যাবে। জাতীয় জীবনের সামগ্রিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখলে অবশ্য এই সময় এমন কিছু দীর্ঘ নয়।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা মুখ্যত গ্রাম্য পরিকল্পনা বলা চলে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই পরিকল্পনা কি সহরে ও গ্রামে সমভাবে প্রযোজ্য? গান্ধীজী অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে শুধু যে গ্রামের সর্বাংগীণ উন্নতি হবে তা নয়; এর ভেতর দিয়ে নগরেরও কল্যাণসাধন হবে। এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় নগরকে কেটে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয় নি। সমগ্র ভারতে যাতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হয় সেদিকেই ছিল মাহাত্মা গান্ধীর সদাজাগ্রত দৃষ্টি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের মৃতপ্রায় যুগজীর্ণ গ্রামগুলির সংস্কারসাধন করতে। এখনও গ্রামগুলি নগরের দ্বারা শোষিত হয়; তিনি মনে প্রাণে এই শোষণের বিরোধী ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন গ্রামগুলোর পুনরুদ্ধারের একমাত্র পথ হচ্ছে গ্রামের পণ্যের ও শিল্পের পুনরুজ্জীবন। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় এক নবতম বাস্তবধর্মী বিপ্লবের ইংগিত পাওয়া যায়। গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল এই অহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি গ্রাম-শোষণের পথকে রোধ করবেন। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই তিনি দেশের মধ্যে যে পুঞ্জীভূত অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্য এতদিন গ্রামের প্রাণ-সত্তাকে শোষণ করছিল তার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম ও নগরের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানকে অপনোদন করে, তাদের মধ্যে স্থাপন করবেন সুস্থ ও শিবময় সহযোগিতা, শ্রেণীসংঘর্ষের ভয়াল তিক্ততাকে দূর করে সাম্য ও ন্যায়ের উপর সামাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিস্থাপনের সুপ্রতিষ্ঠা। তিনি চেয়েছিলেন ধনী ও নির্ধনের ব্যবধান মোচন করতে। দেশের সর্বশ্রেণীর সর্বলোকের স্বাধীন জীবনযাত্রার সাম্যশুদ্ধ ও ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অগণিত জনসাধারণ কর্তব্যজ্ঞানসম্বুদ্ধ হয়ে উঠবে—পরমুখাপেক্ষিতার মোহময় নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে তাদের জীবন স্বাবলম্বনের ভাস্বর দীপ্তিতে দ্যুতিমান হয়ে উঠবে—এই ছিল মাহাত্মা গান্ধীর স্থির বিশ্বাস।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে অন্য একটি প্রশ্ন প্রায়ই করা হয়ে থাকে। উচ্চতর কলেজের শিক্ষাবিষয়ে এই পরিকল্পনার

কী বলবার আছে? ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা যে মুখ্যত প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনা এ কথা আজকাল সকলেই উপলব্ধি করেন। তবে গান্ধীজী এই ওয়ার্ধা শিক্ষাপরিকল্পনা বলতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত বুঝেছিলেন। রাষ্ট্রের সর্বাংগীণ কল্যাণের জন্য ও দেশের সর্ববিধ প্রয়োজন মেটাবার জন্য দেশে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কোন বিদ্যার্থী যদি উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য একান্তভাবে উৎসুক থাকে, তা'হলে সে যাতে সর্বোপায়ে সেই সুযোগ-সুবিধা পায় সেরূপ ব্যবস্থা যেন দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে থাকে। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার সংগে সংগতি রেখেই উচ্চতর শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রস্তুত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দেশের উচ্চতর শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত না করে তাকে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ছিল গান্ধীজীর অভিমত। তাঁর অভিপ্রায় ছিল এই যে দেশের বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ও ব্যবসা, বাণিজ্য, কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও বৃত্তির কেন্দ্রগুলি দেশের সর্বজনীন প্রয়োজনানুসারে যথাযোগ্য বিষয়ে উচ্চ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে। তারাই বহন করবে যাবতীয় উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার। দেশের বিত্তশালীদের বদান্যতায় বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ ধরনের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'লে রাষ্ট্রের সাধারণ ধনাগারে তার জন্য আর বেশী চাপ পড়ে না। এই অভিমতের পশ্চাতে অবশ্য যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। ধনবানদের ধন-বন্টনের এ এক অভিনব পন্থা।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কম সমালোচনা হয় নি। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা যে একেবারে দোষত্রুটিবিনির্মুক্ত এ-কথা অবশ্য কেউ বলে না। অনেকে বলেন—প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে স্বাবলম্বী করবার প্রয়াসের অর্থ হ'লো রাষ্ট্রের দায়িত্ব আংশিকভাবে এড়ানো। সমস্ত প্রগতিশীল দেশে দেখা যায় যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার চেষ্টা হয়েছে। ভারতের সর্বত্র বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন হ'লে বিদ্যার্থীর শ্রমলব্ধ

অর্থে শিক্ষাব্যয়ের কিয়দংশ মেটাবার ব্যবস্থা কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। তাই এই পদ্ধতির নিন্দা অনেকেই করে থাকেন। গান্ধীজী অবশ্য শিক্ষাবিস্তারে রাষ্ট্রের দায়িত্বকে স্বীকার করেন। তবে নিজেদের শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা যদি হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষকগণের বেতন-পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারে, তা'হলে রাষ্ট্রের আংশিক সাহায্য হয়। এ-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা হ'য়ে ওঠে স্বাবলম্বী এবং স্বোপার্জিত অর্থে বিদ্যালাভের যে আত্মপ্রসাদ তা বিদ্যার্থীরা উপভোগ করে।

অনেকে এমন অভিযোগও উত্থাপন করেন যে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুশ্রমকে পণ্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ব্যবসায়-বুদ্ধি ও অর্থলোভ উগ্র হয়ে উঠ্লে শিক্ষার্থী পরিণামে কলকারখানার শ্রমিকে পরিণত হবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যার্থী যদি কোনক্রমে শিল্পের অথবা উৎপাদনের দাস হয়ে পড়ে, তাহলে তার চেয়ে নিন্দনীয় আর বোধ হয় কিছুই হতে পারে না। প্রত্যুত্তরে গান্ধীজী বলেছেন, কায়িক পরিশ্রমে কোন অপমান নেই। ঘরে বাপ-মা অথবা অন্য গুরুজনের ফরমাস খাটলে আমরা যদি দাসে পরিণত না হই, তাহলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট শ্রমে বিদ্যার্থীদের দাসত্বপাশে আবদ্ধ হবার কোন আশংকাই নেই। কলকারখানায় শ্রমের পশ্চাতে জ্ঞানমূলক কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিল্পশ্রমের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং তনু, মন ও আত্মার সামগ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় বুনিয়াদী শিক্ষায়তনগুলির কোনদিনই কলকারখানায় পর্যবসিত হবার অমূলক আশংকা নেই। এ সব বিদ্যায়তনের শিক্ষার্থীরা তো শুধু শিল্প শেখে না; সেই সংগে তারা নানান সাধারণ শিক্ষাবিষয়ে জ্ঞানার্জন করে। বিদ্যালয়ের কেন্দ্রগত শিল্পটি কোনদিনই জ্ঞানমুখী অন্যান্য পাঠ্য বিষয়গুলির চেয়ে বড় হয়ে ওঠে না।

অনেকে আবার এমন আপত্তি তোলেন যে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার

ফলে দেশে নাকি শুধু শ্রমিক শ্রেণী গড়ে উঠবে; এই পদ্ধতির মাধ্যমে দেশে সুশিক্ষিত ও কৃষ্টিসম্পন্ন নরনারী গঠন করার প্রয়াস নাকি এই পরিকল্পনায় নেই। কিন্তু যাঁরা এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন, তাঁরা এই অভিযোগকে সর্বৈব মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেন। কারণ, এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান, কলা ও সাহিত্য, রসরুচি এবং অন্যান্য মানবতাবোধক বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশের ভবিষ্যতের নাগরিক যারা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে, তাদের দেহ মন ও আত্মার সামগ্রিক বিকাশ হবে—তাদের ঐকদেশিক বিকাশের কোন আশংকা নেই। ফলে দেশের অগণিত গ্রামগুলি কর্তব্যজ্ঞানসম্বুদ্ধ সুরুচিসম্পন্ন নাগরিকে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে এবং এরই মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের অভাবিত কল্যাণ সাধিত হবে।

বুনিয়াদী পদ্ধতির শিল্প শিক্ষায় অপটু শিশুরা যখন নোতুন নোতুন শিল্প শিখবে তখন অনেক কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির অপচয় হবে এই আশংকা অনেকে করে থাকেন। এই আশংকা যে একেবারে অমূলক এমন কথা বলা যায় না। শিল্প শিক্ষার প্রারম্ভে যে এই প্রকার অপচয় ঘটবে সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে শিক্ষার্থিগণকে যদি সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখা যায়, তাহলে এই অপচয়ের মাত্রা অনেকখানি কমে যাবে। আবার অনেকে এমনও প্রশ্ন করেন অপটু শিশু হস্তের তৈরী মাল কিনবে কে? এর উত্তরে অবশ্য গান্ধীজী বলেছেন যে যারা দেশকে ভালবাসে, তারা শিক্ষার্থীদের তৈরী এই সব মাল কিনে তাদেরকে কাজে উৎসাহ দেবে। রাষ্ট্রও এদিকে বিত্থালয়ের উৎপাদিত দ্রব্যাদি যাতে সহজে বিক্রয় হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে।

বুনিয়াদী বিত্থালয়ে যে কার্যক্রম অনুসৃত হয় এবং তার জন্য যে সময় নির্ধারিত আছে তাতে দেখা যায় যে হস্তশিল্পের জন্যই কেবল ৩ ঘ. ২০ মি. সময় নির্দিষ্ট হয়েছে। বিদ্যালয়ের সমগ্র কার্যকাল হ'লো মোট সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। বিদ্যালয়ের সমগ্র সময়ের বেশীর ভাগ সময়

হস্তশিল্পের জন্য নির্দিষ্ট থাকায় এই প্রণালীর বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি তুলে থাকেন। অবশ্য এই পদ্ধতির সমর্থকদের তো অভাব নেই। তাঁরা বলেন, সমগ্র সময় যদি নিছক জ্ঞানমূলক অথবা ব্যবহারিক শিক্ষায় ব্যয়িত হয় তাহলে শিক্ষা-ব্যবস্থা একেবারে নীরস ও একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেটাকে অংশে অংশে বিভক্ত করে জ্ঞানমুখী ও বৃত্তিমুখী শিক্ষণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিলে এই একঘেয়েমি ও প্রাণহীনতার হাত থেকে অনেকখানি অব্যাহতি পাওয়া যায়। আবার কেউ কেউ আপত্তি করেন—বিদ্যালয়ের সমগ্র সময়ের অধিকাংশ অংশই যদি হস্তশিল্প শিক্ষায় ব্যয়িত হয়, তাহলে বৃত্তিশিক্ষাই যে বেশী প্রাধান্য পায় সে-কথা অস্বীকার করা যায় না এবং সে শিক্ষা যে অনেকখানি নীরস হবে সে কথা বলাই বাহুল্য এবং এতে যে সুকুমারমতি শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গান্ধীজী নিজে অবশ্য এই সংশয় ও আপত্তি দূর করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন—বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষা কোনদিনই নীরস ও আনন্দহীন হতে পারে না। যাঁরা এর বিরোধী ধারণা পোষণ করেন, তাঁরা নিছক কুসংস্কারের বশেই করেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অন্যরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। শিক্ষাপদ্ধতির প্রাণবত্তা নির্ভর করে সুযোগ্য শিক্ষক এবং তাঁর পাঠনপদ্ধতির উপর। দেশে যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু আছে সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জীবন কর্মহীন ও আনন্দশূন্য। সেখানে কেবল জ্ঞানমুখী শিক্ষার কচকচি, শিশুরা সেখানে শিক্ষকের কথা শুনতে শুনতে হাঁফিয়ে ওঠে, শিশুজীবনের স্বতোৎসারিত কর্মপ্রেরণার ব্যবস্থা নেই সেখানে, লাঞ্ছনা, তিরস্কার ও শাসনে সেখানকার শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ অবরুদ্ধ। কিন্তু বুনিয়াদী পরিকল্পনায় দেখা যায় বিদ্যালয়ের সবাই কর্মমুখর ; সেখানে সবাই আপন প্রয়াস ও কৃতিত্বের সফলতায় আনন্দদীপ্ত ; এখানে আলস্যের অবকাশ নেই কোনখানে। এখানে কথার জাল বোনা হয় না ; এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়

কাজের কুসুম এবং তারই মাধ্যমে এখানকার শিশুদের হয় জ্ঞানাহরণ ও আত্মাভিব্যক্তি।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে গেলে, একে সার্থকতা দান করতে গেলে যে ধরনের শিক্ষক প্রয়োজন হবে, তার অপ্রতুলতা সম্বন্ধে অনেকের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের কথা না তোলাই ভাল। এঁদের কাজ শিক্ষকতা জীবনের প্রধান উপজীবিকা নয়; শিক্ষকতা তাঁদের জীবনব্রত নয়। শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, যথাযোগ্য জ্ঞান, গুণ, মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান, ও শিক্ষার প্রতি তাঁদের অনুরাগ নেই বললেই চলে। এঁর জন্য তাঁদেরকে দোষারোপ করা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আমাদের আদর্শচ্যুতি এই অসন্তোষজনক অবস্থার জন্য মুখ্যত দায়ী। বুনিয়াদী পরিকল্পনায় এই ধরনের শিক্ষকের কোন ঠাঁই নেই। এখানে প্রতিটি শিক্ষককে অন্তত প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হতে হবে। এ ছাড়া কোন-না-কোন হস্তশিল্পে তাঁদের নিপুণতা অর্জন করা চাই। শুধু তাই নয়, সেই হস্তশিল্পের সংগে বিদ্যালয়ের পঠিতব্য অন্যান্য বিষয়ের অনুষংগ-বিধানে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করা তাঁদের পক্ষে একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। কর্মনিষ্ঠ, ত্যাগী, দেশপ্রেমিক, শিক্ষকতায় উৎসর্গিতপ্রাণ যে-সব নর-নারী এই মহান কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্য অভিলাষী, কেবল তাঁদের দ্বারাই বোধ হয় এই পরিকল্পনাকে সার্থক সুন্দর করে তোলা যেতে পারে। এখানকার শিক্ষকগণের জীবন আলস্যের জীবন নয়, না বা তা বিলাসের। এই প্রকারের চরিত্রবান যুবক-যুবতী দেশে কয়জন মিলবে এবং এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কয়জনই মিলবে? এ-ছাড়া বুনিয়াদী শিল্প-পরিকল্পনায় শিক্ষক-শিক্ষিকার যে বেতনের হার ধার্য হয়েছে, তা বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক সংকটের দিনে একান্ত যৎসামান্য। কুড়ি পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনে আজকাল চাকরও মেলে না। সুতরাং কিসের লোভে দেশের যুবক-যুবতী এই কাজ বরণ করবে!

গান্ধীজীর মতে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাধারা দেশের পক্ষে অমংগলজনক এবং এতে দেশের অনেক আর্থিক অপচয় ঘটে। বুনিয়াদী শিক্ষাধারা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন শিক্ষাধারা প্রবর্তনে গান্ধীজীর কোন আপত্তি ছিল না। দেশে যে যথাযোগ্য শিক্ষক মিলবে না এ-বিষয়ে তিনি কোনদিন নিরাশ হন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন—দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশের সহস্র সহস্র নরনারী তাঁর আহ্বানে যেমন সাড়া দিয়েছিল,দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে দেশবাসীর প্রাণে নিশ্চয়ই তেমন সাড়া জাগবে। কিন্তু সেই সাড়া জাগাবার লোকেরই আজ একান্ত অভাব। বর্তমান যুগের ঘোর স্বার্থপরতার দিনে আশাবাদী মহাত্মা গান্ধীর এই অভিনব আশা কোনদিন সার্থক হয়ে উঠবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের আশংকা হয়।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনে ধারাবাহিকতার অভাব আছে বলে অনেকে অভিমত পোষণ করে থাকেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা আরম্ভ করা হয় শিক্ষার্থীর সপ্তম বৎসরে। বিকচোমুখ শিশুজীবনে এত দেরীতে বিদ্যারম্ভ করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। বুনিয়াদী শিক্ষা কমিটি অবশ্য প্রাক-বুনিয়াদী শিক্ষাস্তরের উপযোগিতা স্বীকার ক'রেছেন। তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরিচালনা মণ্ডলীর বি. জি. খের পরিচালিত সাব-কমিটি সুপারিশ করেছেন যে বুনিয়াদী শিক্ষা শিক্ষার্থীর পঞ্চম বৎসরে হওয়াই বিধেয় এবং এই শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপ্তি ৭ বৎসরের স্থলে ৯ বৎসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অনেকে এই অভিমতও পোষণ করেন যে মহাত্মা গান্ধী উগ্র স্বাদেশিকতা বশে তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি থেকে ইংরেজি ভাষাকে নির্বাসন দিয়েছেন। কিন্তু এই ধারণা একেবারে অমূলক। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মাতৃভাষার স্থলে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়। কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য দোষনীয় নয়। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় হস্তশিল্প এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় শেখার পর অন্য

একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করার সময়ই বা কোথায়! তাই ইংরেজি ভাষা বর্জনে কোন আপত্তি উঠতে পারে না। যদি কোন উৎসাহী বিদ্যার্থী আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা শিখতে চায়, তাহলে সে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সুযোগ্য পরিবেশে এবং অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে এই ভাষা শিক্ষা করতে পারে।

এই শিক্ষা-পরিকল্পনার বিরোধীরা বলে থাকেন যে এই পদ্ধতিতে ধর্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। গান্ধীজী নিজে অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ ছিলেন। শিক্ষিত ভারতবাসীর ধর্মহীনতা ও ধর্মে ঔদাসীন্য ব্যাপারে তিনি বারবার খেদোক্তি করেছেন। অথচ তাঁরই পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় যদি ধর্মের কোন স্থান না থাকে, তাহলে অদ্ভুত ঠেকে বৈকি। তাঁকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন—স্বাবলম্বন-শিক্ষাই হলো প্রকৃত ধর্মশিক্ষা। তাঁর এই উক্তিতে মনে হয় তিনি মূল প্রসংগকে এড়িয়ে গিয়েছেন। এই ত্রুটিটুকু দূর করবার জন্য অনেকে প্রস্তাব করেছেন যে ঐকদেশিক ভাব-বিবর্জিত নীতি-বিজ্ঞান ও নীতি-চর্চা ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার অংগীভূত হওয়া বিধেয়। কিন্তু শুভ, জাগ্রত অথচ জীবন্ত ধর্মভাবের ভিত্তি না থাকলে কোন নীতি-জ্ঞান বা নীতি-চর্চা প্রাণহীন ও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। তাই স্থলবিশেষে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা-ব্যবস্থা ভিন্নতর হবেই ; স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর এই দায়িত্ব ছেড়ে দিলে ভাল হয়। উপযুক্ত উদারনৈতিক শিক্ষকের উপর ধর্মশিক্ষার ভার অর্পিত হলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিদ্বেষ জাগ্রত হবার কোন অমূলক আশংকা থাকবে না।

কোন কোন সমালোচক আবার এমনও আপত্তি তুলেছেন যে এই শিক্ষা-পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামের বালক-বালিকাদের নাগর সভ্যতার আকর্ষণের প্রতি বিমুখ করার প্রয়াস করা হয়েছে। কিন্তু এই সমালোচনারও কোন ভিত্তি নেই। কারণ, ভারতবর্ষ আজকাল শিল্পমুখী হয়ে পড়েছে বলেই নানান কারণে ভারতের গ্রামগুলি তাদের প্রাক্তন আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে ; এর পশ্চাতে রয়েছে অবশ্য

নানাবিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ। গ্রামবাসীরা আজকাল স্বাভাবিক তাগিদে গ্রাম ছাড়ছে। যারা গ্রাম ছাড়ছে বা ছাড়বে তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করার কোন অপপ্রয়াস এই পরিকল্পনায় করা হয় নি। বর্তমান ভারতের গ্রামগুলির অর্থনৈতিক জীবন আজকাল একেবারে বিনষ্টপ্রায় বললেই চলে। সেই নষ্টপ্রায় অর্থনৈতিক জীবনে আধুনিক যুগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনা অবশ্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। তাই মহাত্মা গান্ধী আশা করতেন যে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক-যুবতী গ্রামাঞ্চলে বসবাস ক'রে গ্রামগুলির সর্বাংগীণ উন্নতিসাধন করবে।

এই পরিকল্পনার সমালোচকগণ এমনও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে মহাত্মা গান্ধী নাকি এই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে সমগ্র জাতির উপর জোর করে চাপাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রকার মতবাদ পোষণ করার পিছনে কোনপ্রকার যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে তিনি দেশের বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিলেন এবং এর ভালমন্দ সব কিছু বিবেচনা করেই একে গ্রহণ অথবা পরিবর্জন করতে বলেছিলেন। জোর করে অথবা তাঁর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস অথবা শ্রদ্ধার বশে কোন কিছুকে গ্রহণ করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন তিনি। পরিকল্পনায় যদি কোন নীতিগত মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় তাহলে তা অকপটে প্রকাশ করার স্বাধীনতা তিনি দিয়েছিলেন। দেশবাসী যদি আজ এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে, তাহ'লে বুঝতে হ'বে এই পরিকল্পনার মধ্যে এমন সব নীতি বা পন্থা রয়েছে যা আমাদের দরিদ্র ভারতের পক্ষে একান্তভাবে উপযোগী। একে সহজে গ্রহণ করা হয় নি; নানাবিধ তীব্র সমালোচনা ও মন্তব্যের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে একে যেতে হয়েছে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই শিক্ষাপদ্ধতি আজকাল সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠ্‌ছে। গবেষণা ও প্রয়োগের নিকষ-পাথরে যদি এই পদ্ধতি নিখাদ সোনা বলে প্রমাণিত হয়, তাহ'লে একে গ্রহণ করায় কোন প্রকার আপত্তি উঠ্‌তে পারে না। একে গ্রহণ

করার পশ্চাতে জাতির জনক মাহাত্মা গান্ধীর প্রতি দেশের জ্ঞানী, গুণী ও বিশেষজ্ঞদের যে এক ধরনের অতি ভক্তি অথবা অন্ধ বিশ্বাস অলক্ষ্যে কাজ করছে—এই অপবাদ একেবারে ভিত্তিহীন। বরং আমরা বলতে পারি—দুর্দশাপ্রপীড়িত দুর্গত ভারতের অগণিত জনসাধারণের জীবন-মরণ সমস্যার শুভ সংকেত আছে এই পদ্ধতিতে।

ডাঃ মারিয়া মন্‌টেসরী

(১৮৭০-১৯৫১)

বিশ্বের শিক্ষা ইতিহাসে ডাঃ মারিয়া মন্‌টেসরী আজ একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী এবং তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি শিশু-শিক্ষার ইতিহাসে যে এক অভাবিত যুগান্তর এনেছে সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিকলমনা শিশু-চিকিৎসায় পারদর্শিনী সারা বিশ্বে শিশু-শিক্ষায় এক অনন্যসাধারণ পথিকৃৎ ব'লে হ'লেন পরিচিতা, কেমন করে তা সম্ভব হলো তা এখানে আলোচিত হবে।

বর্তমান শতাব্দীর একদম গোড়ার দিককার কথা। এই সময় ইউরোপের বড় বড় শহরে অনেক নোংরা বস্তি থাকতো। ইটালীর রোম শহরেও এই ধরনের অনেক নোংরা বস্তি ছিল। এ-গুলো ছিল শহরের গরীব শ্রমিক অধিবাসীদের বাসস্থান। পুঁতিগন্ধময় এই আবাস-স্থলগুলো ছিল যতপ্রকার অনাচারের আকর—নরকের নামান্তর মাত্র। সমাজের মংগলকামী রোমের কতিপয় বিত্তশালী নাগরিক স্থির করলেন যে যদি এই সব শ্রমিকদের কাছ থেকে উন্নত ধরনের কাজ পেতে হয়, তাহলে তারা যে নারকীয় পরিবেশে দিনযাপন করে, তার আমূল পরিবর্তন সাধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

তাদের জন্য সুন্দর স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা হওয়া একান্তই উচিত। এই উদ্দেশ্যে রোম নগরীতে "দি রোম্যান্ এ্যাসোসিয়েশন্ ফর গুড বিল্ডিং" নামে একটি সমিতি গঠিত হ'লো। এই সমিতির প্রথম ও প্রধান কাজ হলো রোম নগরীর যত সব নোংরা বস্তি ছিল, সেগুলোকে কিনে নিয়ে, সেখানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে মনোরম বাড়ী তৈরী করে, শ্রমিক পরিবারের জন্য সেগুলিকে সস্তায় ভাড়া দেওয়া। সমিতি অবশ্য শ্রমিকদের ওপর একটি শর্ত আরোপ করল। তা হ'লো এই যে—তারা যেন এই সব বাড়ী ঘর গুলোকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে রাখে। শ্রমিকরা সানন্দে এই শর্ত মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মুস্কিল বাধলো তাদের ছোট ছোট সন্তান সন্ততিদের নিয়ে। শ্রমিক নরনারীরা যখন কর্মব্যপদেশে গৃহে অনুপস্থিত থাকতো, তখন তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘর বাড়ীগুলোর দেয়াল নোংরা করতে লাগলো এবং বাড়ীর আসবাবপত্রেরও ক্ষতি করতে লাগলো। এতে সমিতির কর্ণধারগণ একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন ; কারণ, এ-সব মেরামতের খরচ নেহাৎ কমও হতো না। সমিতির সর্বাধিনায়ক স্থির করলেন যে এই সব শ্রমিকের ৩ বছর থেকে ৭ বছরের ছেলেমেয়েদেরকে কোন একটা বিস্তৃত-পরিসর গৃহে তাদের খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, অথবা লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করে তাদের পিতামাতার গৃহ হতে অনুপস্থিতির কালটুকু আটকে রাখতে হবে। একজন পারদর্শিনী শিক্ষিকার উপর এই ছেলেমেয়েগুলোর তত্ত্বাবধানের ভার থাকবে। তাঁকে শ্রমিকদের পরিবেশে বাস করতে হবে। তাঁর ভরণ-পোষণের সমস্ত ব্যয়ভার সমিতিই বহন করবে। সমিতির পরিচালকগণ অনুমান করেছিলেন যে বাড়ীঘরগুলো মেরামতের জন্য যে অর্থব্যয় হতো, তা এখন বেঁচে যাবে এবং সেই উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়েই শিক্ষয়িত্রী পোষণের ব্যয় সংকুলান হয়ে যাবে। আরও স্থির হয়েছিল যে বস্তির শ্রমিকদের ৩ বছর থেকে ৭ বছরের ছেলেমেয়েগুলোর সবাইকে এই বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে। তাদেরকে লেখাপড়া শেখানর জন্য

তাদের বাপমাকে কোন বেতন দিতে হবে না। কিন্তু শ্রমিক পিতা মাতা যেন তাদের ছেলেমেয়েকে যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন বেশ-ভূষায় এবং যথানির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীদের পিতামাতা যেন এই শিক্ষিকাকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখায় এবং তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর সহিত সর্বোপায়ে সহযোগিতা করে। যে সব শ্রমিক এ-বিষয়ে সহযোগিতা না করবে অথবা সমিতির সুষ্ঠু কাজে বাধা সৃষ্টি করবে, তাদেরকে তাদের আবাসস্থল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে। এই সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্থাপিত হ'লো ক্যাসা ডি ব্যাম্বিনি অর্থাৎ শিশু-নিকেতন বা বালমন্দির। সমিতির সর্বাধিনায়ক ডাঃ মারিয়া মন্টেসরীকে এই বালমন্দিরের অধিকর্ত্রী নিযুক্ত করলেন। এখান থেকেই সূচনা হলো মন্টেসরী প্রবর্তিত শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা পদ্ধতির।

এই বালমন্দিরের অধিকর্ত্রী হবার পূর্বে ডাঃ মন্টেসরী চিকিৎসা ব্যবসায়ে ছিলেন লিপ্ত। চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের পর রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে সহকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখানে কাজ করবার সময় স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ফরাসী দেশের স্বনামখ্যাত চিকিৎসক এডোয়ার্ড সেগুঁই-এর চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। অতি যত্নের সহিত ইন্দ্রিয় ও পেশী ইত্যাদির পরিচালনা দ্বারা স্বল্পবুদ্ধি শিশুগণকে যে নানাবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায় এ-বিষয় নিয়ে সেগুঁই বহুদিন গবেষণা করেছিলেন এবং এ-বিষয়ে তিনি অনেকখানি সফলকাম হয়েছিলেন। এর আগে অবশ্য এই সব বিকলমনা শিশুদের চিকিৎসা অন্যান্য রোগের মত নানাপ্রকার ঔষধের দ্বারা হতো। ইন্দ্রিয়-গ্রাম পরিচালনার দ্বারা স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের যে শিক্ষিত ক'রে তোলা যায় এই নীতি পরবর্তীকালে মন্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতির মূল উপাদান ব'লে পরিগণিত হয়েছিল। রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন কাজ

করার পর তিনি রোমের অর্থফ্রেনিক্ স্কুলের অধিকর্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখানে তিনি সেগুঁই-এর পদ্ধতির ব্যাপকতর ক্ষেত্র পেলেন। পুংখানুপুংখ পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি সেগুঁই-এর চিকিৎসা প্রণালীর প্রভূত উন্নতিসাধন করেন এবং এই নবতম পদ্ধতিটিকে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে কর্মের অবসরে তিনি দর্শন, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অনুরাগিনী হন এবং এইসব বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যয়ন করেন। এখানেই তাঁর মনে শিক্ষায় নবতর নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিনব ধারণা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। সেগুঁই প্রদর্শিত পথে তিনি যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করেছিলেন তিনি রোমের কয়েকটি বিত্থালয়ে এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তিনি আশাতীত সাফল্যলাভ করেছিলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল যে স্বল্পবুদ্ধি ছেলেমেয়েরা সাধারণ সুস্থ ছেলেমেয়েদের মত সমপারদর্শিতা দেখাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে। এর থেকে তাঁর মনে এই ধারণা দৃঢ়-মূল হ'লো যে অল্পবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের পক্ষে যে পদ্ধতি আশাতীত ভাবে সফল হয়েছে, সুস্থ ও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের পক্ষে অনুরূপ বা একই পদ্ধতি যে অধিকতর কার্যকরী হবে সে-বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

গবেষণা-কালে মন্টেসরী লক্ষ্য করেছিলেন যে বিকলেন্দ্রিয় ও স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের শিক্ষাবিষয়ে সর্বপ্রথম কাজ হ'লো শিশুদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে শেখানো। তাদের নিজেদের টুকিটাকি কাজ যেমন খাওয়া, হাতমুখ ইত্যাদি ধোয়া, জামা-জুতা পরিষ্কার করা, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি কাজ তারা যেন নিজেরাই করতে শেখে। যে সব কাজে জটিল পেশী সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়, সে-সব কাজে প্রথমে তাদের হাত পাকানো সমীচীন হবে না। কারণ সহজ কাজে প্রথমে অভ্যস্ত না হ'লে জটিল কাজ করা দুরূহ

হয়ে পড়ে। আর তা'ছাড়া জটিল কাজ বিকলেন্দ্রিয়দের কাছে অধিকতর জটিল হয়ে পড়ে। তাদের জন্য স্পর্শেন্দ্রিয়ের শিক্ষাই সম্যকরূপে বিধেয়। তাই মন্‌টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতিতে স্পর্শেন্দ্রিয়ের শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে।

ডাঃ মন্‌টেসরীর মতে শিক্ষার গোড়াকার কথা হ'লো ইন্দ্রিয়গ্রামের ব্যবহারের দ্বারা জ্ঞানের উপাদান আহরণ ও পেশী আন্দোলন দ্বারা দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন। উভয় ক্ষেত্রেই বহু শক্তির অপচয় হয়। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পরিচালনার অভাব রয়েছে। ডাঃ মন্‌টেসরীর সুচিন্তিত অভিমত হ'লো এই যে শিশুগণকে যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লালন-পালন করা যায়, তাহ'লে তারা দেহমনে যে অধিকতর সুস্থ ও বলীয়ান হয়ে উঠবে সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি নির্ভর করে সুকুমারমতি শিশুগণের যথার্থ স্বরূপটি জানার উপর,—অর্থাৎ শিক্ষা হওয়া উচিত মনোবিজ্ঞানসম্মত। মন্‌টেসরীর আগে শিক্ষাবিদ পেস্‌টালট্‌সি এই মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রাক্‌-মন্‌টেসরী কালে এবং এখনও শিক্ষা হয়ে আছে মুখ্যত শিক্ষক-কেন্দ্রিক ও বিষয়-কেন্দ্রিক। শিক্ষার্থী শিশু এতদিন অবহেলিত হ'য়ে এসেছে। কিন্তু ডাঃ মন্‌টেসরী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা হবে প্রধানত শিশু-কেন্দ্রিক। প্রতিটি শিশু প্রতিটি শিশু হ'তে স্বতন্ত্র। সে তার নিজের শক্তি, প্রয়োজন এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের স্তর ভেদে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হয়; শ্রেণীগত শিক্ষায় শিশুর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হয় না। প্রতিটি শিশুই বিকাশের স্তর ভেদে স্ব স্ব পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাই তার স্বাভাবিক প্রয়োজন, প্রবণতা ও গতির প্রতি দৃষ্টি রেখে শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার গতি নির্ণীত হওয়া একান্তভাবে বিধেয়। আমরা প্রায় লক্ষ্য করে থাকি যে শিশু যখন বর্ণশিক্ষা অথবা নামতা শেখার বিষয়ে মনের দিক থেকে

আদৌ উপযোগী নয়, তখনই তার উপর চাপিয়ে দিই এক গুরুভার। এতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথ হয় রুদ্ধ। শিক্ষকের তরফেও শক্তির অপচয় কম হয় না। কারণ তরুণমতি অপরিণতবুদ্ধি শিশুদেরকে এই সব বিষয় শেখাতে দস্তুরমত হিমসিম খেতে হয়। শিশুজীবনের বিকাশের স্তরানুসারে শিক্ষা-পদ্ধতির উপর রুশোও জোর দিয়েছিলেন। রুশোর ন্যায় মন্‌টেসরীও বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক শিক্ষারই একটা সুসংগত সময় আছে। শিশুর জীবনে যখন সেই শুভ মুহূর্ত আসে, তখন তার মনে শিক্ষার প্রতি একটি স্বতোৎসারিত আগ্রহ ও অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাজ হলো শিশুমনের সেই স্বাভাবিক বিকাশের দিকে শ্রদ্ধাশীল ও ধীরচিত্তে লক্ষ্য রাখা এবং তাকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে চালিত করা। তাই ডাঃ মন্‌টেসরী শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ করলেন এইভাবে—"শিশুজীবনের স্বাভাবিক বিস্তারের পথে সক্রিয় সাহায্যের নামই হ'লো শিক্ষা।" তাই মন্‌টেসরী তাঁর শিশুনিকেতনের শিক্ষয়িত্রীর নাম দিয়াছিলেন "পরিচালিকা"। তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই হলো সেই শিক্ষা যার মাধ্যমে বিকচোন্মুখ শিশুজীবনের কোন্ স্তরে কোন্ শুভ মুহূর্তে কোন্ ধরনের শিক্ষা শিশু আপনা হ'তেই গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তা খুব ভালো করে জানা এবং সেই অনুসারে শিশুর শিক্ষাপদ্ধতি স্থির করা। অর্থাৎ এর অর্থ হ'লো এই মন্‌টেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষয়িত্রীর অথবা বালমন্দিরের পরিচালিকাকে শিক্ষকতা কার্য-গ্রহণের পূর্বে মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষায় শিক্ষালাভ করতে হবে। শিশুমনের অলিগলির সংবাদ তাকে রাখতে হবে। তবেই তিনি কৃতী শিক্ষিকা হতে পারবেন। শিক্ষানীতির একটি সর্বগ্রাহ্য সত্য যে শিক্ষা যেন শিশুজীবনের উপর বাহির থেকে কোন চাপ বা ভার বিশেষ না হয়, এইটা উপলব্ধি করতে হবে মন্‌টেসরী শিশুনিকেতনের পরিচালিকাকে। মন্‌টেসরী প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি যেমন স্পর্শেন্দ্রিয়ের শিক্ষা, তেমন এ আবার মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক শিক্ষা।

মন্‌টেসরী শিশুনিকেতনে সাধারণত তিন থেকে সাত বছরের ছেলেমেয়েরা স্থান পেতো। ডাঃ মন্‌টেসরী দীর্ঘ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে শিশুদের শিশুনিকেতনে প্রবেশ করার প্রারম্ভে অর্থাৎ তাদের বয়স যখন সবেমাত্র তিন বৎসর তখন তাদের জীবনে কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়া আয়ত্ত করার প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তাদের জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুযায়ীই সেই আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। যে সময় এই প্রয়োজন ও আগ্রহ তাদের জীবনে দেখা দেবে, সেই সময়ই হ'লো তাদের জীবনের শুভ "মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত"। এই শুভ মুহূর্ত হেলায় হারালে শিশু-জীবনের শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয় অনেক। মন্‌টেসরীর নিকট শিক্ষার অর্থ হ'লো স্বতোৎসারিত আগ্রহে প্রকৃতিগত প্রয়োজন মেটানোর ইচ্ছা। তাই মন্‌টেসরীর বালমন্দিরে বক্তৃতার মাধ্যমে পাঠন-রীতি নেই। মন্‌টেসরী নীতির মূলকথা হ'লো এই যে—শিশুনিকেতনের ছেলেরা শিখবে নিজেদের প্রকৃতিগত আগ্রহে এবং নিজেদের স্বাভাবিক প্রয়োজন পরিপূরণের আনন্দে। পরিচালিকা রয়েছেন সব সময় পশ্চাতে—অলক্ষ্য থেকে তিনি প্রতিটি শিশুর কৃত্যালী পরিদর্শন করবেন, সময় সময় তাদেরকে উৎসাহ দেবেন এবং প্রয়োজন বোধে পরিচালনাও করবেন। এই পদ্ধতিতে কোন বহির্চাপ অথবা তাড়নার প্রশ্নই উঠে না। এখানকার শিক্ষার্থীরা শেখাকে নেয় খেলা হিসাবে—খেলাচ্ছলে তারা শেখে অনেক কিছু। খেলার ভিতর মন থাকে ব'লে সময় যে কোথা দিয়ে চ'লে যায় তা তারা বুঝতে পারে না। প্রতিটি শিশু তার স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুসারে আপনা হতেই বিকশিত হ'য়ে উঠে।

মন্‌টেসরী শিক্ষা-পদ্ধতির আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এই যে এই পদ্ধতির মধ্যে শিক্ষার্থীরা তিরস্কার, শাস্তি অথবা পীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি হয়। পুরস্কারের অযথা লোভ দেখিয়ে

ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কাজ আদায় করার কোন অপপ্রয়াস করা হয় না এই শিক্ষারীতিতে। স্ব-নির্বাচিত ক্রীড়াময় কাজের মধ্যে শিশু যে আনন্দ আহরণ করে সেই হলো তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

মনটেসরী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শ্রেণীগত শিক্ষার কোন স্থান নেই। মনটেসরী বলেন—সাধারণ বিত্থালয়ে যে-ভাবে শ্রেণীগত শিক্ষা দেওয়া হয়, তা বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নয়। শ্রেণীগত শিক্ষা শিশুর মানসিক বিকাশের পরিপন্থী। প্রতিটি মানবক অপরটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রতিটি শিশুর জীবনের অভিব্যক্তি, তার গতি ও ধারা ভিন্নতর। শিশুরা এখানে পায় অবাধ স্বাধীনতা। তারা স্বভাবতঃই উৎসুক, গতিশীল এবং চপল। তারা খেলবে, ভাঙবে, গড়বে। প্রশ্নে প্রশ্নে পরিচালিকাকে উত্যক্ত করে তুলবে। তাদের "কি" এবং "কেন"র অন্ত নেই। কারণ এটাই হ'লো তাদের জীবনধর্ম। মনটেসরী শিক্ষা-পদ্ধতিতে এই জীবন-ধর্মকে মেনে নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল শাসন-তাড়ন-মূলক ও বিষয়বহুল। প্রাচীন শিক্ষা-বিধি ছিল শিশুর নিকট একান্তভাবে দুর্ভর—তাই তারা অকালে পংগু হয়ে পড়তো। তাই আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা সর্বজনস্বীকৃত নীতি ব'লে পরিগণিত। আমেরিকার দার্শনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউই ডাঃ মারিয়া মনটেসরির ন্যায় শিক্ষায় স্বাধীনতার একজন মহা-সমর্থক। প্রাচীন-শিক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা প্রসংগে তিনি যে সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা এখানে সবিশেষ প্রযোজ্য। তিনি ব'লেছেন প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি শিশু জীবনের উপর বহির্চাপ মাত্র। প্রাপ্ত বয়স্কদের ধারণা, জ্ঞান এবং আদর্শ সুকুমারমতি শিশুদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। বিত্থার্থী অথবা শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, অভিরুচি এবং প্রয়োজনের দিকে কোন লক্ষ্য রাখা হয় না। শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষণরীতি, সব কিছুই শিশু-জীবনের বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশ ও অভিলাষ-আগ্রহের সংগে

সম্পর্কবিরহিত; তাই এই প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষা শিশুদের নিকট যেমন নিরানন্দ, তেমন বিরক্তিকর। সমস্ত শিক্ষাগ্রহণ কাজটাই যেন শিশুদের কাছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বলে মনে হয়। শিক্ষাটা অনিচ্ছুক ছাত্রদের ওপর জোর ক'রে চাপানো হয় ব'লে এই পদ্ধতিতে শাসন পীড়ন প্রাধান্য লাভ করে। প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতিতে দেখা যায় যে শিক্ষা যেন কয়েকটি নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিক্ষকরা যেন-তেন প্রকারেণ মানব-সমাজের যুগসঞ্চিত জ্ঞানসমষ্টি শিক্ষার্থীদের গলাধঃকরণ করাতে পারলেই বাঁচেন। নোতুন যুগ যেমন প্রাণবন্ত ও গতিশীল, নোতুন যুগের শিক্ষাও তেমনি হবে প্রাণধর্মে জীবন্ত এবং কর্মোন্মাদনায় প্রাণচঞ্চল। প্রাচীন পন্থীরা এ-কথা মানতে চান না। তাই প্রাচীন পন্থীদের শিক্ষাপদ্ধতি একান্তভাবে পুঁথিসর্বস্ব হয়ে পড়তো। বিদ্যালয় যে বাইরের বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র এবং সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণ এ দু'টো কাজই যে বৃহত্তর সমাজের প্রয়োজনের সংগে সুষ্ঠুভাবে সম্পৃক্ত করার জীবন্ত পরীক্ষা—এ-কথা প্রাচীনপন্থীরা মানতে নারাজ। তাই প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি ছিল বাস্তবতাবিবর্জিত।

এখন শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কি? মন্‌টেসরীর মতে এই স্বাধীনতা উদ্দাম অসংযম নয়। মন্‌টেসরীর শিশু-নিকেতনে শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করছে; নিজেদের অভিলাষ, অনুরাগ এবং আগ্রহ অনুযায়ী শিখছে, প্রশ্ন করছে এবং নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করছে; এখানকার শিক্ষার্থীরা পরস্পর পরস্পরের কাজে সাহায্য করছে, সহযোগিতা করছে, এখানকার পরিচালিকা রয়েছেন সবায়ের অলক্ষ্যে পশ্চাতে; প্রয়োজনবোধে তিনি শিক্ষার্থীদের সহায়িকা, নচেৎ তিনি তাদের সংগিনী। এখানকার বিদ্যার্থীরা যে সুরুচি, ভদ্রতা ও সুশৃঙ্খল মনোভাবের পরিচয় দেয়, তা অন্য প্রকার বিদ্যায়তনে একেবারে বিরলদৃষ্ট বললেই চলে। মন্‌টেসরী বলেন—স্বাধীনতার আবহাওয়াতেই

শিশুনিকেতনের ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে ওঠে বলে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে বিশেষ কোন অন্তরায় দুস্তর বাধার সৃষ্টি করে না এবং এই স্বাধীন ক্রিয়া কলাপের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্বের সর্বোত্তম বিকাশ হয়ে থাকে। মন্‌টেসরীর স্থির বিশ্বাস এই যে তৎপ্রবর্তিত শিশুনিকেতনের শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বিদ্যায়তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্যার্থীদের অপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী, সংযত এবং ভদ্র। তাদের শিক্ষার মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রামের যথাযথ ব্যবহার এবং অংগপ্রত্যংগ সঞ্চালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে বলে তাদের জীবনের ক্রিয়াকর্ম সুন্দর হ'য়ে ওঠে। শিশু জীবনের প্রারম্ভ থেকে নিজেদের কাজ নিজেরাই করতে শেখে বলে তারা প্রথম থেকেই স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে; ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস বর্ধিত হয়। ছোটবেলা থেকে শিশুনিকেতনের সতীর্থদের সংগে মিলে মিশে কাজ করতে শেখার ফলে তাদের জীবনের প্রথম থেকেই একটা সুষ্ঠু সামাজিকতা-বোধ তাদের মধ্যে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রাচীন নেতিবাচক শিক্ষার মধ্যে এই ধরনের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল নিষেধবহুল ও শাসনমূলক। ফলে তাদের জীবনের প্রকৃতিগত অভিলাষ, আকাংক্ষা, যা তাদের জীবনের মূল শক্তি, সেগুলোকে শুভ উদ্দেশ্যের দিকে সঞ্চালিত করা সম্ভব হয়ে উঠতো না প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে। মন্‌টেসরীর শিশুনিকেতনে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করবে, খেলা করবে, বাগান করবে; কিন্তু তাদের এই স্বাধীনতা বাধাহীন নয়। কোন শিশু যদি অপর কোন শিশুর কাজে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে পরিচালিকা বাধাসৃষ্টিকারী শিশুকে বুঝিয়ে দেবেন যে তার এই স্বার্থপরতার জন্য বিদ্যালয় জীবনের সামাজিকতা ব্যাহত হচ্ছে। শিশু সস্নেহ ব্যবহারে নিজের ভুল বুঝতে পারবে। নীরস উপদেশ অথবা পীড়নের ভয় দেখিয়ে এই সামাজিকতা বোধকে কোনদিন উদ্‌বুদ্ধ করা যায় না। তরুণমতি শিক্ষার্থীরা একান্তভাবে অনুকরণ-

প্রিয়। তারা তাদের মত অন্য দশজনের কাজকর্ম দেখে অথবা পরিচালিকার নিত্য সাহচর্যে যে স্বার্থলেশহীন সামাজিকতা শিক্ষালাভ করে, তা তার উত্তরজীবনে প্রভূতরূপে সাহায্য করে।

শিশুদের সমগ্র সত্তার সুষম ও সম্পূর্ণ বিকাশই হলো মন্‌টেসরী শিক্ষাবিধির মূল উদ্দেশ্য। তিনি বলতেন—শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হলেই তার শিক্ষা পূর্ণাংগ হলো না। তৎপ্রবর্তিত মনস্তাত্বিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো—এই প্রথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুরা দেহমনে হয়ে উঠবে সুস্থ ও সবল, কর্মে নিপুণ, আচারে ব্যবহারে ভদ্র, জীবনে নীতিবান ও আত্মবিশ্বাসী। তাই তাঁর শিক্ষাপ্রণালী বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে এই শিক্ষাবিধির মধ্যে নানান ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে ;—যেমন ঘরের ছোটখাট কাজকর্ম ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষা, জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির যথারীতি সঞ্চালন শিক্ষা, অংগ প্রত্যংগের যথাযথ সঞ্চালন শিক্ষা, ভাষার লেখন পঠন শিক্ষা, সংগীত, অংকন, বাগানের কাজকর্মের মাধ্যমে রুচি শিক্ষা ও বাইরের বিশ্বের সংগে নিবিড় পরিচয় স্থাপন, নীতিজ্ঞান শিক্ষা এবং ধর্মশিক্ষা।

প্রতিটি শিশু-নিকেতন যেন শিক্ষার্থী শিশুদের নিজেদের ঘর। নিজেদের বাড়ী আর বালমন্দিরের মধ্যে তারা বিশেষ কোন প্রভেদ খুঁজে পায় না। এখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নিজেদের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ কাজই নিজ হাতে করে। নিজেদের হাতমুখ ধোয়া, বালমন্দিরের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা, নিজেদের নিত্যব্যবহার্য টেবিল চেয়ার সাজিয়ে রাখা, খাওয়া হয়ে গেলে নিজেদের ব্যবহৃত বাসনপত্র সরিয়ে ধুয়ে মুছে রাখা, বিছানা করা, জুতো জামা পরা, নিজেদের কাপড় জামা পরিষ্কার করা, বাগানের কাজ করা, বিদ্যালয় গৃহ সাজানো ইত্যাদি কাজ হয় কখনো তারা দল বেঁধে করছে, না হয় কখনো নিজেরাই করছে আবার কখনো বা পরিচালিকার সহযোগিতায় করছে। তাদের এই সব কাজের মাঝে একটি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ আপনা হতেই ফুটে ওঠে।

শিশু নিকেতনের পরিবেশটি সুরুচিপূর্ণ এবং মনোজ্ঞ হওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। এর গৃহটি হবে সুপ্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং উদ্যানসম্বলিত। আলো-বাতাসের প্রাচুর্যই হবে এই বিদ্যালয়-গৃহের বৈশিষ্ট্য, এখানকার পরিবেশ হ'বে এমনতর যাতে ছেলেরা বুঝবে যে এটাঁই হলো তাদের আপনাদের ঘর। এই বিদ্যানিকেতনের ঠিক মাঝখানটিতে থাকে একটি প্রশস্ত হলঘর। এখানেই চলে ছেলেদের লেখাপড়া এবং অন্যান্য টুকিটাকি কাজ। বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সাজসরঞ্জাম সব কিছুই একান্তভাবে শিশুদের উপযোগী করে তৈরী করা হয়। এখানকার টেবিল, চেয়ার বেঞ্চ, সব নীচু এবং হালকা। এগুলো সুন্দর ভাবে রং-করা। এগুলো ছোট করে তৈরী করার কারণ হলো এই যে শিশুরা যাতে অনায়াসে এগুলোকে স্থানান্তরিত করতে পারে এবং প্রয়োজন মত সাজিয়ে রাখতে পারে। এগুলো কখনো নোংরা হয়ে গেলে ছেলেমেয়েরা সাবান দিয়ে এগুলোকে পরিষ্কার করে। এই ঘরে থাকে একটা বড় ঢাকা দেওয়া আলমারী। এই আলমারির দরজা হবে বেশ বড়। এতে সুসজ্জিত করে রাখা হয় মন্‌টেসরি পদ্ধতির "ডিড্যাকাটিক মেটিরিয়্যাল"। এগুলোই হলো মন্‌টেসরী শিক্ষা-নীতির অপরিহার্য উপাদান। এর মধ্যে রাখা হয় নানান মাপের এবং নানান রঙের ও আকারের কাঠের অথবা ধাতুর কাঠি, সিলিণ্ডার, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ এবং আরও নানাবিধ টুকিটাকি জিনিষ। ছবি আঁকার সাজসরঞ্জাম, বড় বড় অক্ষর, বিভিন্ন শব্দযন্ত্রও এখানে থাকে সুসজ্জিত। এ-সব জিনিষ হ'লো শিশুনিকেতনের সাধারণ সম্পত্তি। এই হলঘরে রাখা হয় আর একটু নীচু আলমারি; এতে থাকে অনেক ড্রয়ার। প্রতিটি ড্রয়ারের সংগে সুন্দর রঙীন হাতল দেওয়া থাকে। প্রতিটি ড্রয়ারের গায় এক একজন ছেলে বা মেয়ের নাম লেখা থাকে। এই সব ড্রয়ারে ছেলেমেয়েরা নিজেদের যা কিছু সঞ্চয় তা সব সযত্নে রাখে গুছিয়ে। হলঘরের দেওয়ালে আছে নানান ধরনের সুন্দর সুন্দর ছবি।

প্রয়োজনবোধে এগুলোকে বদলানো হয়। দেওয়ালে এমনভাবে ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো থাকে, যাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সহজে নাগাল পায় এবং যাতে তারা খুসীমত সেই বোর্ডে নানান্ ধরনের চিত্র এবং হিজিবিজি আঁকতে পারে। ফুলদানীতে নানান রঙ বেরঙের ফুল রাখে এখানকার ছেলে মেয়েরা। এখানে নানা-ধরনের পাতাবাহারের গাছ ও রঙীন ফুলের গাছ ছোট ছোট সুদৃশ্য টবে ক'রে ঘরের নানাস্থানে সাজিয়ে রাখা হয়। এই হল-ঘরে ঢুকলে মনে হবে না যে আমরা কোন বিদ্যালয়ে ঢুকেছি—বরং মনে হবে, বুঝি আমরা একটি উদ্যানে প্রবেশ করেছি, যেখানে ফুলের মত শিশুরা ফুলের গাছের সংগে একাকার হয়ে গিয়েছে।

এই ধরনের হলঘর ছাড়া প্রতিটি শিশুনিকেতন থাকে একটি করে বৈঠকখানা। এই বৈঠকখানায় বসে এখানকার ছেলেমেয়েরা নানা গল্পগুজব করে; গানবাজনা করে এবং নানাবিধ খেলায় মগ্ন থাকে। এই বৈঠকখানাটিও এমন ভাবে সাজানো থাকে, সেখানে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। নানা মাপের ছোট ছোট টেবিল, সোফা, হেলান-দেওয়া চেয়ার গুছিয়ে রাখা হয় এই ঘরে। সুদৃশ্য শেল্‌ফ্ অথবা ব্রাকেটের উপর রঙ বেরঙের খেলনা, পুতুল অথবা মূর্তি, ছবি, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি সাজানো গোছানো থাকে। প্রত্যেক ছেলের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে এক একটি ফুলের টব। প্রতিটি ছেলে অথবা মেয়ে নিজের খেয়াল খুশী অনুযায়ী এই টবে ফুলের গাছ লাগায় এবং সযত্নে সেগুলোকে লালন পালন করে। এখানেও নানান ধরনের বাদ্যযন্ত্র রাখা হয়। ছেলেমেয়েরা কোন-না-কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শেখে। বৈঠকখানার মেঝেয় বিছানোর জন্য এখানে রঙীন গালিচা রাখা হয়।

বালমন্দিরের খাওয়ার ঘরটিও শিশুদের উপযোগী করে তৈরী করা হয়। এখানকার চেয়ার-টেবিলগুলোও ও ছোট মাপের। খাবার রাখবার ঢাকা আলমারিটাও নীচু। এখানকার প্লেট, কাপ ইত্যাদি সব চীনা মাটির। খাওয়ার সব সরঞ্জাম যেমন ছুরি,

চামচ, কাঁটা ইত্যাদি শিশুদের উপযোগী করেই তৈরী করা। ছেলেমেয়েরা নিজেদের খাবার নিজেরাই পরিবেশন করে। খাওয়ার পর যে যার বাসনপত্র নিজেরাই পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে আলমারির যথাস্থানে তুলে রাখে।

প্রতিটি বালমন্দিরে আর একটি ঘর থাকে যেখানে ছেলেরা তাদের কাপড়জামা গুছিয়ে রাখে। এই ঘরে তাদের কাপড়জামা রাখবার জন্য ছোট ছোট ঢাকা-দেওয়া আলমারি থাকে। এই ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য তাদের উপযোগী ছোট ছোট ও নীচু জলের কল আছে। তাদের হাত-মুখ ধোবার জন্য সাবান, তোয়ালে ইত্যাদি যথাস্থানে গোছানো থাকে। ছেলেরা নিজেরা স্নান করে, কাপড়-চোপড় ধোয় ও পরিষ্কার রাখে। একবারে ছোট ছোট শিশুদের অবশ্য প্রথম প্রথম একটু আধটু অসুবিধা হয়, কিন্তু পরে এরা তাদের বড় যারা তাদেরকে দেখে অথবা পরিচালিকা কিংবা শিক্ষিকাকে দেখে নিজেরা আনন্দে এই কাজে এগিয়ে আসে। কোন ছেলে এসব কাজ করতে না পারলে অপর ছেলে তাকে সাহায্য করবার জন্য আপনা থেকেই এগিয়ে আসে। ফলে তাদের মনে অতি অল্প বয়স থেকেই একটা সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভাব দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। উত্তরকালে সামাজিক জীবনে এই সহযোগিতা ও সহানুভূতির ভাব যে মানুষের জীবনে কতখানি উপকার করে তা আর বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন।

এখানকার পরিচালিকার যথানির্দিষ্ট কাজের মধ্যে একটি কাজ হ'লো এখানে শিক্ষারত শিশুদের প্রত্যেকটির দৈহিক উন্নতি অথবা অবনতির যথাযথ হিসাব রাখা। যদি তিনি প্রয়োজন-বোধ করেন, তাহ'লে স্বাস্থ্যহীন শিশুদের জন্য যথাযোগ্য খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন। প্রতিটি শিশুনিকেতনে একটি করে ওজন নেবার এবং দৈহিক উচ্চতা মাপবার জন্য যন্ত্র রাখা হয়। এখানকার শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের শরীরের ওজন দেখে এবং নিজেদের দেহের উচ্চতার খবর রাখে।

প্রতিটি শিশুনিকেতনের পরিগম এমনভাবে সুসজ্জিত ও কর্মোদ্দীপক যে এখানকার বিদ্যার্থীরা সব কাজ করবার জন্য আপনা হতেই ভেতর থেকে পায় একটা অনুপ্রেরণা। এখানকার জিনিষপত্র তারা নাড়াচাড়া করে। এখানকার প্রাত্যহিক কাজ হ'লো—নিজেদের হাতমুখ ধোয়া, নিজেদের কাপড়জামা গুছিয়ে রাখা, নিজেদের খাবার নিজেদের পরিবেশন করা, চেয়ার টেবিল বেঞ্চ ইত্যাদি গোছানো, বাগানে তরিতরকারী ফুলগাছ ইত্যাদি উৎপন্ন করতে শেখা। এই সব কাজের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুর হয় স্বাভাবিক অংগসঞ্চালন। এই অংগসঞ্চালনের মধ্য দিয়েই তাদের শরীর গঠিত ও পুষ্ট হয়। এখানকার প্রাত্যহিক কাজ করতে করতে ছেলেমেয়েরা জীবনের প্রথম থেকে স্বাবলম্বী হয় এবং তাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়। এখানে টুকিটাকি চাষবাসের কাজ করবার সময় এখানকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির সংগে পরিচয় ঘটার সুযোগ-সুবিধা পায়। এখানকার যা কিছু শেখা সব কিছুই যেন আপনা হ'তেই হয়—বাইরের কোন চাপ এখানে অনুভূত হয় না। তাই মন্‌টেসরী শিক্ষা-পদ্ধতিকে অনেকেই স্বতঃশিক্ষা বলে অভিহিত করেন। এখানকার কাজ করবার সময় ছেলেমেয়েরা যে কোনপ্রকার ভুল করে না, তা নয়। বরং তারা ভুল করতে করতেই শেখে। তাই তাদের শেখার কাজটা হয় বেশ পাকা। কাজের মধ্যে যখন তারা কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি করে বসে, তখন শিক্ষিকা তাদের সেই ভুল যত্নের সহিত এবং সহানুভূতিশীল চিত্তে শোধরাবার চেষ্টা করেন।

প্রতিটি বালমন্দিরে আবার একটি করে ব্যায়ামাগার থাকে। ব্যায়ামাগারের যা কিছু যন্ত্রপাতি আবার শিশুদের উপযোগী করেই তৈরী করা। এখানকার ছেলেমেয়েরা নানা ধরনের খেলার ছলে শেখে ব্যায়াম করতে। এখানকার ব্যায়াম অথবা খেলা-গুলিকে এমনভাবে চালানো হয় যার পেছনে খুঁজে পাওয়া যায় শিশুদের দেহমনের সুসমঞ্জস গঠনের এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

উদাহারণস্বরূপ এখানকার একটি ব্যায়ামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—যেমন লাইন করে চলতে শেখা। খেলার মাঠের মধ্যে ডিম্বাকৃতি একটি মোটা সাদা রেখা টানা থাকে। তার ভেতর দিকে অনুরূপ একটি সমান্তরাল ডিম্বাকৃতি রেখা থাকে। শিক্ষিকা হয়তো সহাস্য বদনে বাইরের রেখাটির উপর দাঁড়ালেন। দুটি রেখার উপর রাখলেন তাঁর দুটি পা। তিনি তারপর তালে তালে চলতে সুরু করলেন। তাঁর দেখাদেখি ছেলেমেয়েরাও তাঁর পেছনে দুটি লাইনের উপর পা রেখে তালে তালে চলতে সুরু করলো। তাদের চলা কখনো হয় মন্থর কখনো বা দ্রুত। কখনো বা শিক্ষিকা চলতে চলতে গান গায় এবং সেই সংগে আবার বাজনা বাজানো হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট পাগুলি তালে তালে নাম্‌ছে উঠ্‌ছে। ছেলেমেয়েদের মুখে ফুটে উঠছে অনাবিল হাসি, পায়ে তাদের ছন্দোময় গতির অভিব্যক্তি এবং সমস্ত দেহে সাবলীল ভংগী! কি অপরূপ দৃশ্য! খেলাচ্ছলে ছেলেমেয়েরা শিখছে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে। সাবলীল গতি আয়ত্ত করার অন্য একটি পদ্ধতিও এখানে আছে। ব্যায়ামাগারে রাখা হয় একটি গোল ঘোরানো সিঁড়ি। এই সিঁড়ির একদিক রেলিং দিয়ে ঘেরা, আর একদিক খোলা। সিঁড়ির ধাপগুলো নীচু নীচু যাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনায়াসে ওঠা-নামা করতে পারে। ছেলেমেয়েরা এই সিঁড়ির রেলিং না ধরে ওঠা-নামা করতে শেখে। এই খেলার মাধ্যমেও এখানকার ছেলেমেয়েরা শেখে তাদের শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে এবং চলার স্বচ্ছন্দ গতিভংগী আয়ত্ত করতে। ডাঃ মন্টেসরী এই পদ্ধতিটিকে বৈজ্ঞানিক অংগসঞ্চালন পদ্ধতি আখ্যা দিয়েছেন।

মন্টেসরী-প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি যে সারা বিশ্বে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার মূলে রয়েছে সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ইন্দ্রিয় শিক্ষা-ব্যবস্থা। যাতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই প্রণালীকে পরিচালনা করা যায়, তার জন্য ডাঃ মন্টেসরী কতকগুলি একান্ত

আবশ্যক উপাদান উদ্ভাবন করেছেন। এগুলোকে বলা হয় "ডিড্যাকটিক মেটিরিয়াল"। এগুলোই হ'লো মন্টেসরী শিক্ষা-প্রণালীর অপরিহার্য অংগ। এই অপরিহার্য উপাদানগুলোর একটি তালিকা নীচে দেওয়া হ'লো :—

(১) তিন প্রস্ত ঘন ইন্‌সেট্।

(২) তিন প্রস্ত নানান্ রঙের ও নানান্ আকারের ঘন কাষ্ঠফলক।

(৩) নানান্ ধরনের জ্যামিতিক কাষ্ঠফলক (প্রিজম্, পিরামিড্, গোলক, বেলন ইত্যাদি)।

(৪) নানা আকারের চতুষ্কোণ কাঠের খণ্ড—এদের কোনটা মসৃণ আবার কোনটা বা অমসৃণ।

(৫) নানা রকমের কাপড়ের টুকরো।

(৬) বিভিন্ন ওজনের কাঠের টুকরো।

(৭) ছুটি বাক্স তাতে থাকবে ৬৪টি করে নানা রঙের কাঠের টুকরো।

(৮) একটি ড্রয়ারওয়ালা ছোট আলমারি যাতে রাখা হয় নানা প্রকারের সমতল জ্যামিতিক যন্ত্র।

(৯) তিন প্রস্ত কার্ড যার ওপর নানাপ্রকারের জ্যামিতিক আকারের রঙীন কাগজ কেটে এঁটে দেওয়া হয়।

(১০) বিভিন্ন ধরনের স্বর উৎপাদানের জন্য কয়েকটি গোলাকৃতি বন্ধ বাক্স।

(১১) ছু সারি ঘণ্টা যা থেকে বিভিন্ন গ্রামের স্বর বেরিয়ে আসে। এ-সবের সংগে থাকে কাঠের ফলক যাতে সংগীতের স্বরলিপি অংকিত আছে।

উপরিলিখিত উপাদানগুলির সংগে হাতের লেখা এবং অংক শেখাবার জন্যও অনুরূপ কতকগুলি উপাদান আছে। সেগুলির তালিকা নীচে লিপিবদ্ধ হ'লো :—

(১২) দুটি ডেস্ক যার ডালা হবে হেলানো এবং যার ভেতর রাখা হয় নানা আকারের লোহার জ্যামিতিক আকৃতি।

(১৩) কার্ডের ওপর শিরীষ কাগজের বড় বড় অক্ষর আঠা দিয়ে আঁটা।

(১৪) বিভিন্ন আকারের কাঠের রঙীন বর্ণমালা—এগুলো রাখা হয় কার্ড বোর্ডের বাক্সে।

(১৫) কতকগুলি কার্ড তার উপর বিভিন্ন সংখ্যা শিরীষ কাগজে লিখে আঠা দিয়ে আঁটা।

(১৬) কতকগুলি কার্ড যার উপর আগের মত বিভিন্ন সংখ্যা বা বর্ণমালা মসৃণ কাগজে লিখে আঠা দিয়ে আঁটা।

(১০) সংখ্যাগণনা শিক্ষার জন্য রঙীন কাঠের দুটি বাক্স।

(১৮) কতকগুলি রেখাচিত্র এবং রঙ্‌বেরঙের পেন্‌সিল।

(১৯) কাঠের ফ্রেমে কাপড়, চামড়া, বোতাম, ফিতা, হুক ইত্যাদি নানান ধরনের জিনিষ নানা উপায়ে আটকানো।

উপরিলিখিত উপাদানের সমাবেশ থেকে বেশ বোঝা যায় যে মন্‌টেসরী শিক্ষানীতি সুকুমারমতি শিশুদের ইন্দ্রিয়গ্রামের শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখেই স্থিরীকৃত হয়েছে। এই সব উপাদান-সম্ভারের প্রতি শিশুর মন আপনা হতেই আকৃষ্ট হ'বে। তাদের মানসিক বিকাশ ও পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এই সব উপাদান বিশেষ-ভাবে তৈরী। এই সব উপাদান নাড়া-চাড়া করতে করতে, এগুলো নিয়ে খেলতে খেলতে ছেলেমেয়েরা যে জ্ঞান আহরণ করে, তা তাদের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, তেমনই নির্ভুল। বালমন্দিরে উপাদানগুলি নিয়ে খেলাধূলার মধ্যে ছেলেমেয়েরা যে কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি করে না তা নয়; কিন্তু ভুল করলেও শোধরাবার পদ্ধতি লুকানো আছে এই সব উপাদানের মধ্যে। শিক্ষার্থীরা একটু পর্যবেক্ষণ করলেই নিজেরাই আপনাদের ভুল বুঝতে পারে এবং তখনই তারা নিজেদের ভুল শুধরে নেয়। উপর থেকে চাপানো শিক্ষার চেয়ে এই ধরনের শিক্ষা যে কতখানি স্বাভাবিক তা সহজেই

অনুমান করা যায়। এখানকার পরিবেশটিকে যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক ক'রে তৈরী করা। এখানে গেলে মনে হবে না যে বাইরে থেকে কোন জিনিষ শিশুদের ওপর জোর করে চাপানো হয়েছে। শিক্ষিকার তরফে শিশুদের ওপর জোর করে কোন কিছু চাপানোর কোন প্রয়াস নেই। ছেলেমেয়েরা শেখে নিজেদের তাগিদেই। অক্ষর শেখানো, নামতা পড়ানো ইত্যাদি ব্যাপার ছেলেমেয়েদের কাজে খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। তাদের ওপর কোন কিছু মুখস্থ করানোর জন্য কোন প্রকার চাপ দেওয়া হয় না।

বালমন্দিরের ছেলেমেয়েরা কি প্রকারে শিক্ষালাভ করে তা সহজে বোঝা যাবে যদি দু-চারটে উদাহরণ দেওয়া যায়। নীচে এই-ভাবে কয়েকটি উদাহরণ লিপিবদ্ধ হলো :—

ধরা যাক, বালমন্দিরে রক্ষিত এই সব উপাদানের মধ্য থেকে দশটি করে ফুটা করা আছে এই ধরনের তিনটি ঘন কাঠের টুকরা একটি বছর তিনেকের শিশুর সামনে রেখে দেওয়া হলো। ঐ ফুটোগুলোতে ঢুকে যাবে এমন দশটি গোলাকৃতি অথচ লম্বা কাঠের টুকরো বসানো আছে। গোলাকৃতি লম্বা কাঠের টুকরোগুলো যাতে সহজে গর্তওয়ালা ঘন কাঠের মধ্যে ঢোকানো ও খোলা যায় সেইজন্য ঐ টুকরো কাঠগুলির এক দিকে রঙীন বোতাম বা রিঙ লাগানো আছে। প্রথমটির সবগুলো কাঠের টুকরো উচ্চতায় সমান, কিন্তু তাদের বেড় ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে। দ্বিতীয়টির গর্তগুলির বেড় কমে এসেছে এবং এর কাঠের টুকরোগুলির উচ্চতা ও বেড় ক্রমশ কমে এসেছে। তৃতীয় কাষ্ঠখণ্ডের গর্তগুলির বেড় সমান কিন্তু এতে ঢোকাবার কাঠের টুকরাগুলির বেড় সমান হলেও তাদের উচ্চতা ক্রমশ কমে এসেছে। এখন এই বিভিন্ন ধরনের কাঠের টুকরোগুলোকে গর্তওয়ালা তিনটি আলাদা কাষ্ঠখণ্ডে কি প্রকারে ঢোকানো ও খোলা যায়, তা হয়তো শিক্ষিকা একবার দেখিয়ে দিলেন সেই শিশুটিকে। তারপর তিনি সেগুলোকে ছড়িয়ে রাখলেন শিশুর সামনে। শিশু সামনে খেলার উপাদানগুলি পেয়ে মেতে উঠ্‌লো

খেলায়। সে কাঠের টুকরোগুলোকে গর্তওয়ালা লম্বা কাঠগুলোর মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করবে। যার যার স্থানে টুকরোগুলোকে বসাতে গেলে তাকে অবশ্য অনেক বেগ পেতে হবে এবং এতে তার সময়ও লাগবে অনেকখানি। কিন্তু সে নিয়েছে এটাকে খেলা হিসাবে। সে তখন একজন ছোট্ট আবিষ্কারক। তিনটি লম্বা কাঠের গর্তগুলিতে বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরোগুলো বসাতে গিয়ে সে অনেকবার ভুল করবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সে নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পারবে; কারণ, গর্তগুলির সংগে কাঠের টুকরোগুলির এমন সুসমঞ্জস পরিমাপ যে একটি অন্যটির গর্তের মধ্যে ঢুকবেই না। এইভাবে ভুল করতে করতে সে শিখবে অনেক কিছু। এতে তার স্পর্শানুভূতি ও দৃষ্টিশক্তি দুইই হয়ে উঠবে প্রখর এবং এরই মাধ্যমে তার মধ্যে জেগে উঠবে আয়তনের জ্ঞান। বই-পড়া বিদ্যার চেয়ে হাতে-নাতে লব্ধ এই যে জ্ঞান ও শিক্ষা এর দাম যে কতখানি তা সহজেই অনুমেয়।

আর একটি অনুরূপ উদাহরণ নেওয়া যাক। আমরা সবাই জানি যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট ইট, কাঠ, পাথর নিয়ে খেলতে ভালবাসে। তিন বা চার বছরের কোন ছেলে বা মেয়ের সামনে দৈর্ঘ্যে আলাদা দশটি কাঠের চৌকো ফলক দেওয়া হ'লো। এই কাঠের টুকরোগুলো হাল্কা। এগুলো দিয়ে ছেলেটির সামনে একটি মন্দির বানানো হলো। এই কাঠগুলোর সব চেয়ে নীচেরটি হ'লো লম্বায় সব চাইতে বড় এবং উপরেরটি লম্বায় সব চাইতে ছোট। মাঝেরগুলো ক্রমশ নীচেকারটির চেয়ে আপেক্ষিক-ভাবে ছোট। যে-কোন শিশুর সামনে এগুলো রেখে দিলে সে এগুলো নিয়ে খেলা সুরু করবে এবং এগুলো নিয়ে খেলতে খেলতে সে শেষে একটি মন্দির তৈরী করতে সমর্থ হবে। এই কাজের মধ্যে শিশু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করছে, আয়তনের পার্থক্য বুঝছে এবং তারপর সে মন্দির তৈরী করছে। এ খেলার মধ্য দিয়েও শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তি, স্পর্শেন্দ্রিয় ও দৃষ্টিশক্তির প্রাখর্য বর্ধিত

হচ্ছে। শিশু আপন মনে তুলনা করছে, বিচার করছে, ভুল করছে, কিন্তু অবশেষে ঠিক পথটি বার করে নিচ্ছে। এ-সব কাজে শিশুদের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা থাকে না। যখন শিশু কাজে সফলতা অর্জন করে তখন বিজয়গর্বে তার বদনমণ্ডল হয়ে ওঠে সমুদ্ভাসিত। সে শিক্ষিকাকে ডেকে দেখায় তার কৃতিত্বটিকে। এই জয়ের উন্মাদনা, এই সাফল্যের উৎসাহ তাকে যেন পেয়ে বসে। সে একটি ক্রীড়া থেকে ক্রীড়ান্তরে চলে যেতে চায়। এমনিভাবে শিক্ষাটা তার কাছে হয়ে ওঠে আনন্দময়।

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতি মন্‌টেসরী শিক্ষাপ্রণালীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যে-কোন বিকলেন্দ্রিয় অথবা ক্ষীণবুদ্ধি শিশুর পক্ষে মন্‌টেসরী শিক্ষাপ্রণালী যে কতখানি কার্যকরী তা শুধু যাঁরা এবম্বিধ কার্যে লিপ্ত আছেন তাঁরাই সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন। ডাঃ মন্‌টেসরী বিকলেন্দ্রিয় অথবা ক্ষীণবুদ্ধি ছেলে-মেয়েদের উপর তদুদ্ভাবিত পরীক্ষা করেই সুস্থমনা শিশুদের উপর তিনি তাকে পরীক্ষা করে সফলকাম হয়েছিলেন। বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার শেখবার যে পদ্ধতি মন্‌টেসরী উদ্ভাবন করেছেন, তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আজকাল আর কারোর দ্বিমত নেই। ধাতু-নির্মিত বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার শিশুদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। তারা দুই চোখ বন্ধ করে এগুলোর কিনারার উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে যাবে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুদের মনে আকারবোধের ধারণা আপনা হতেই বিকশিত হয়ে ওঠে। মসৃণ ও অমসৃণ কাঠের বোর্ডের সাহায্যেও শিশুদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রখরতাকে বৃদ্ধি করার প্রণালী রয়েছে এই পদ্ধতিতে। তবে হাত বুলোবারও একটা রীতি আছে; শিক্ষিকা প্রথমে কিভাবে আঙুল বা হাত বুলোতে হয়, তা দেখিয়ে দেন।

বিভিন্ন রঙ সম্বন্ধে জ্ঞান দেবার যে পদ্ধতি মন্‌টেসরী শিক্ষা-নীতিতে অবলম্বিত হয়, তা সত্যই অভাবনীয়রূপে কার্যকরী ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। একটি বাক্সে আটটি রঙের কতকগুলি চাক্‌তি

এবং প্রত্যেক রঙের আটটি করে শেড্ আছে। রঙীন জিনিষের প্রতি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। বিভিন্ন রঙের বোধ জাগানো ব্যাপারটা তাদের কাছে রঙের খেলার সামিল হয়। প্রথম দিকে শিক্ষিকা প্রধান প্রধান কয়েকটি রঙের (যেমন লাল, নীল, সবুজ, হলদে) চাক্‌তিগুলো রেখে দেন শিশুদের সামনে। এক রঙের চাক্‌তিগুলোকে সাজিয়ে রাখা হয় টেবিলের ওপরে। তারপর অন্যান্য রঙের চাক্‌তিগুলোকে টেবিলের ওপর ঢেলে দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা এই চাক্‌তিগুলো থেকে নানান রঙের চাক্‌তি আলাদা আলাদা করে বেছে রাখে মিলিয়ে। কোন্‌টি কোন্ রঙ শিক্ষিকা অবশ্য প্রথমে বলে দেন। তারপর শিশুরা কোন্‌টি কোন্ রঙ তা আপনা থেকেই বলতে পারে। শিশুর কাছে কোন বিশেষ রঙের চাক্‌তি চাইলে, সে তা দিয়ে দেয় শিক্ষিকার হাতে তুলে। বিভিন্ন রঙের শেড্ বোঝাতে গিয়ে শিক্ষিকা প্রথমে সব থেকে গাঢ় রঙের চাক্‌তিটি রাখেন টেবিলের ওপরে; তারপর অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা রঙের চাক্‌তিগুলো সাজিয়ে দেন টেবিলের উপর। শিশুও শিক্ষিকার দেখাদেখি অনুরূপ-ভাবে সাজাতে চেষ্টা করে অন্যান্য রঙের চাক্‌তিগুলোকে। এই-ভাবে শিশুর মনে বিভিন্ন রঙের সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলির ছাপ পড়ে যায়। এই রঙের খেলায় শিশুর ভুলের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেই ভুল শুধরে দেবার জন্যই তো রয়েছেন শিক্ষিকা। অতএব, মাভৈঃ।

সুমিষ্ট স্বর ও সুরের প্রতি শিশুদের একটি জন্মগত আকর্ষণ থাকে। মন্‌টেসরী শিক্ষানীতিতে শিশুদের সেই সুরের আকর্ষণকে কাজে লাগানো হয়েছে। শিশুরা যখন একটু বড় হ'তে সুরু করে, তখন তারা সুমিষ্ট শব্দ ও সুর বুঝতে এবং অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। মন্‌টেসরী শিক্ষা-পদ্ধতির সহায়ক উপাদানগুলির মধ্যে কার্ড বোর্ডের মুখবন্ধ গোল কৌটার মধ্যে নানাজাতীয় বিভিন্ন জিনিষের টুকরো পোরা

থাকে। কৌটাগুলি জোরে নাড়া দিলে কোনটা জোরে আবার কোনটা বা আস্তে শব্দ করে। প্রতিটি কৌটার আবার একটি করে জোড় থাকে। শিশুরা কৌটাগুলি নাড়তে থাকে এবং শব্দের ক্রমানুসারে জোড়া জোড়া কৌটাগুলিকে সাজিয়ে রাখে। মন্‌টেসরী পদ্ধতিতে শিশুদেরকে সুর শেখাবার ব্যবস্থাও সুন্দর। আটটি ঘণ্টা পর পর সাজানো থাকে। সেই ঘণ্টাগুলিতে ছোট কাঠের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে ঘণ্টাগুলিতে পর পর 'সা রে গা মা পা ধা নি সা' সুরগুলি বেজে ওঠে। কোন ঘণ্টাটি কোন সুরের শেখা হয়ে গেলে কোন শিশুকে যদি কোন সুরের একটি ঘণ্টাতে ঘা দিতে বলা হয়, তাহলে সে ঠিক স্থানটিতে আঘাত করে। পরে শিক্ষিকার সাহায়তায় শিশু সুরের কড়ি ও কোমলের তারতম্যটাও আয়ত্ত করে নেয়। এইভাবে সুর শিখতে শিখতে শিশুদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা বর্ধিত হয়। বিভিন্ন সুরের ঘন্টা দিয়ে সুর শেখানো ছাড়া শিশুনিকেতনের শিক্ষার্থীদের অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার শেখানো হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে তৈরী পিয়ানো অথবা বীণা এখানে রাখা হয়। সহজ সুরের গানও তাদেরকে শেখানো হয়। গানের সংগে সংগে শিশুরা তালে তালে নাচতে শেখে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুষ্ঠু শিক্ষার সংগে সংগে সাবলীল ছন্দ-সমন্বিত গতিভংগীও শিশুরা আয়ত্ত করে ফেলে।

মন্‌টেসরী শিক্ষা-পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শিক্ষার সহিত ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা। শিশুদের শ্রবণেন্দ্রিয় যখন প্রখরতর হয়ে ওঠে, তখন তাদের পক্ষে ভাষা শিক্ষা সহজ ও সুগম হয়। কারণ, কোন বস্তু বা গুণের নামকরণ শিক্ষার পশ্চাতে রয়েছে শুদ্ধ ও নির্ভুল উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা এবং ভাষা-শিক্ষা তখনই সুকর হয়, যখন শিশুদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুভূতি তীক্ষ্ণতর হয়। শিশুদের সামনে মোটা, সরু, ছোট, বড় কাঠের সিলিণ্ডারগুলো সাজিয়ে রেখে দেওয়া হয়। শিক্ষিকা সবচেয়ে মোটা সিলিণ্ডারটি তুলে নিয়ে স্পষ্ট ও সুশ্রাব্য স্বরে বলেন—"এটি

মোটা-মোটা-মোটা"। এরপর সব চেয়ে সরু সিলিণ্ডারটি তুলে নিয়ে বলেন—"এটি সরু-সরু-সরু"। এরপর শিশুর কাছে যদি মোটা অথবা সরু সিলিণ্ডার চাওয়া যায়, তাহ'লে সে ঠিকমত সিলিণ্ডারটি দেখায়। কোন একটি সিলিণ্ডার নিয়ে শিশুকে যদি প্রশ্ন করা হয় —"এটি ?" শিশু সংগে সংগে উত্তর দেয় হয় "সরু" না-হয় "মোটা"। যদি সে উচ্চারণে ভুল করে, শিক্ষিকা কিছু বলেন না। কারণ, অন্যান্য শিশুদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশু আপনার উচ্চারণের ত্রুটি অপনিই বুঝতে পারে এবং আপনিই তা ঠিকমত শুধরে নেয়। এইভাবে শিশুর "ছোট" "বড়" বা অন্যান্য শব্দের জ্ঞান হয়। শিশু অনন্যমনা হয়ে দেখ্‌ছে, শুন্‌ছে, মনে মনে বিচার করছে, তুলনা করছে, শুদ্ধভাবে প্রতিটি বস্তুর বা গুণের নাম ব্যবহার করতে শিখছে এবং শুদ্ধ ভাষায় নিজ মনের ভাবটিকে প্রকাশ করতে শিখছে। এখানে সে যেন স্বয়ং নিজের শিক্ষক। এইভাবে চলে তার স্বয়ং-শিক্ষা।

ডাঃ মন্‌টেসরী দীর্ঘকাল গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে শিশুদেরকে হাতের লেখা শেখানো এবং বই পড়ানো দুটোই অত্যন্ত জটিল ক্রিয়া। কারণ, এ-দুটোকে যথাযথভাবে শিখতে গেলে শিশুদের সাবলীল পেশী-সঞ্চালনের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং সেই সংগে তাদের মানসিক পরিণতিও হওয়া একান্ত-ভাবে আবশ্যক। মন্‌টেসরী বলেন—শিশুদেরকে পড়া শেখানোর আগে লেখা শেখানোই বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। কারণ বর্ণ বা অক্ষরগুলি যে এক একটি বিভিন্ন শব্দের প্রতীক এই বোধ আগে শিশুর মনে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। সেই সংগে বর্ণগুলির নির্ভুল উচ্চারণের বোধটিও তার মনে আসা উচিত। পড়ার কাজটা লেখা কাজের চেয়ে জটিল। লেখা কাজের মাঝে আছে সাবলীল পেশী সঞ্চালনের ক্রিয়া এবং পেশী-সঞ্চালনের ক্রিয়া শিশুর কাছে একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া। আগে যদি সম্যকভাবে আক্ষরিক জ্ঞান না আসে, তাহলে শিশুরা পড়বে কি করে? যখন আমরা

কিছু লিখি, তখন আমরা বর্ণটি বা বর্ণসমষ্টির আকারকে অনুকরণ করি এবং পরে তদনুসারে লেখনী সঞ্চালন করি। মনটেসরী পদ্ধতিতে দেখা গেছে যে শিশুরা যখন জ্যামিতিক আকৃতির ধাতব ইন্‌সেটগুলির কিনারা দিয়ে আঙুল বুলিয়ে কোন বস্তুর আকৃতিগত জ্ঞান আয়ত্ত করে, এই জ্ঞান শিশুদের অক্ষর জ্ঞানের কাজে খুব সহায় হয়। শিশুরা কাঠের বোর্ডে আঁটা শিরীষ কাগজের বড় বড় অক্ষরের উপর আঙুল বুলাতে শেখে। সেই সংগে শিক্ষিকা কোনটি কোন অক্ষর তা বলে দেন। অক্ষরগুলোর উপর আঙুল বুলোতে বুলোতে তাদের পেশী-সঞ্চালনের ক্রিয়া সহজ হয়ে আসে। পরে লেখনী দিয়ে সেই ক্রিয়ার আক্ষরিক রূপ দেওয়া শিশুর কাছে অনেকখানি সহজ হয়ে আসে। মনটেসরী শিক্ষাপ্রণালীর লেখন-পদ্ধতির সংগে আমাদের দেশে প্রচীন কালে প্রচলিত তাল পাতার ওপর লেখা রীতিকে তুলনা করা যেতে পারে। প্রাচীন কালে ছুঁচালো লোহার কোন যন্ত্র দিয়ে তাল পাতার ওপর বর্ণমালা লিখে দেওয়া হতো। সেই লেখা অক্ষরগুলোর ওপর দিয়ে শিশুকে কি ভাবে হাত বুলাতে হবে তা দেখিয়ে দেওয়া হতো। পরে শিশু লেখা কাজটিকে বেশ আয়ত্ত করতে পারতো।

ডাঃ মনটেসরীর সুচিন্তিত অভিমত হলো এই যে এইভাবে লেখা-শেখাটা আয়ত্ত করতে পারলে, তার অল্প কালের মধ্যেই শিশুকে পড়া শেখানো উচিত। লেখা-শেখার এক পক্ষ কালের মধ্যেই শিশুকে পড়া-শেখালে খুব ভাল হয়। মনটেসরী শিক্ষা-প্রণালীতে পঠনপদ্ধতির যথার্থ স্বরূপটি কি প্রকার তার সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মনটেসরী বলেন—পঠন-ক্রিয়াটি কেবল অর্থবোধহীন ধ্বনি উচ্চারণ নয়। অক্ষরগুলি আর কিছুই নয়, সেগুলি কোন বস্তু বা ভাবের প্রতীক মাত্র। এই বোধ শিশুর মনে থাকলে তবেই তার কাছে পঠন সার্থক হয়। মনটেসরীর শিশু-নিকেতনে শিশুরা নানা দ্রব্যের নামের সংগে

পরিচিত হয়। সেই সব দ্রব্যের নাম বিভিন্ন কার্ডে লিখে শিশুদের সম্মুখে রাখা হয়। লেখার মাধ্যমে শিশুদের আগেই আক্ষরিক জ্ঞানলাভ হয় এবং তাদের যথাযথ উচ্চারণ সে পূর্বেই আয়ত্ত করে নিয়েছে। এখন শিশু অক্ষরগুলির ধ্বনি মিলিয়ে শব্দটি উচ্চারণ করে। শিশুর উচ্চারণ শুদ্ধ হলে শিক্ষিকা শিশুকে দ্রুত পড়তে বলেন। ফলে শিশু সহজেই পঠনে অভ্যস্ত হয়। এর পর শিশুর সামনে একটি সম্পূর্ণ বাক্য একটি কাগজের টুকরোতে লিখে রাখা হয়। এতে হয়তো শিশুকে কোন কাজ করতে বলা হয়েছে অথবা কোন কাজ করার উপায়ের নির্দেশ আছে। যেমন ধরা যাক "আমাকে বইটি দাও"। শিশুটি কয়েকবার এই বাক্যটি পড়ল। তখন তাকে এই কাজটি করতে বলা হলো। ছেলেটি বইটি এনে শিক্ষিকার হতে দিল। যখন শিশুটি ঠিক ঠিক পড়লো এবং সেই সংগে কাজটিও করলো। তখন বুঝতে হবে শিশুর পড়াটা ঠিক ঠিক হয়েছে। এই নীতি অনুসরণে কার্যক্ষেত্রে অভাবনীয় ফল ফলেছে —এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

শিশু-নিকেতনের শিশুদের মনে গাণিতিক বোধ জাগাবার জন্য কাঠের সিলিণ্ডারগুলি যথেষ্ট সাহায্য করে। বিভিন্ন রঙের কাঠের সিলিণ্ডারগুলোর গায়ে সমান দশভাগ করে দাগ কাটা থাকে। দশটি কাঠের সিলিণ্ডার দিয়ে শিশুদেরকে সংখ্যাগণনা শেখানো হয়। প্রথম সিলিণ্ডারটি ১০ সেন্টিমিটার মাপের এবং তার পরের গুলি দশ দশ সেন্টিমিটার অন্তর করে ১০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত মাপের হয়ে থাকে। শিক্ষিকা প্রথমে সব চেয়ে ছোট রডটি নিয়ে বললেন "এটি এক"। তার ঠিক পরের মাপের রডটি নিয়ে শিক্ষিকা শিশুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন—"এটি দুই"। শিশু বিভিন্ন রঙের রড হাতে নিয়ে দেখলো প্রতিটি রডের গায়ে সমান সমান দাগ কাটা আছে। এইভাবে শিশু এক থেকে দশ সংখ্যক পর্যন্ত রড নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। তারপর শিক্ষিকা হয়তো শিশুকে বললেন —"আমাকে ১নং এর রডটি দাও, অথবা তিন নম্বরের রডটি দাও।"

শিশু ঠিক সংখ্যক রডটি শিক্ষিকার হাতে তুলে দিল। এইভাবে সংখ্যাগণনার প্রাথমিক অধ্যায় সমাপ্ত হয়। এরপর শিক্ষিকা একটি ছোট রড তুলে নিয়ে শিশুর মনোযোগ রডে সমান দশটি দাগের প্রতি আকর্ষণ করান। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় রডে ২০ এবং ৩০টি সমান দাগ থাকে। সর্বশেষ রডে এই-ভাবে সমান ১০০টি দাগ থাকে। প্রথমে শিশু দশটি গোনে; তারপরে গোনে কুড়িটি এবং এইভাবে সে ৩০ থেকে ১০০ পর্যন্ত গুনতে শেখে। এই গণনার মাধ্যমে শিশু ধীরে ধীরে যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ আয়ত্ত করে ফেলে। সংখ্যা গণনা শেখা হয়ে গেলে শিশু শিরীষ কাগজের সংখ্যা-সূচক অক্ষরে হাত বুলায় এবং সে যেমন আগে বর্ণমালা লিখতে শিখেছিল অনুরূপভাবে সে গাণিতিক সংখ্যাগুলি লিখতে শেখে। সংখ্যাগণনা শেখা অথবা তা লিখতে শেখার কাজটাও চলে নিছক খেলার ছলে। ফলে শিশুর মনে কোনপ্রকার চাপ পড়ে না। আনন্দময় পরিবেশে এই শেখার কাজ চলে ব'লে শিশুর গাণিতিক জ্ঞান প্রারম্ভ থেকেই বেশ পাকা হয়ে যায়।

বালমন্দিরের শিশুদের মনে ওজন সম্বন্ধে জ্ঞানদানের পদ্ধতিও অভিনব। এখানকার ডিড্যাকটিক উপাদানের মধ্যে কতকগুলি সমান আকারের কিন্তু বিভিন্ন ওজনের চ্যাপ্টা কাঠের চৌকো টুকরো কয়েকটি খোলা কাঠের বাক্সে রেখে দেওয়া হয়। শিশুরা সেগুলি নিয়ে কোন্‌টা ভারী এবং কোন্‌টি হালকা তা অনুভব করতে শেখে। প্রথম প্রথম তারা চোখ খুলে রেখে প্রতিটি কাষ্ঠখণ্ডের ওজনের তারতম্য বোঝবার চেষ্টা করে। পরে তারা চোখ বুজিয়ে এ-গুলোর ওজন ঠিক ঠিক ভাবে বোঝবার চেষ্টা করে। এইভাবে তাদের মনে অতি শৈশব থেকেই ওজনের সূক্ষ্ম তারতম্য বোধ জাগ্রত হয়ে যায়।

মন্‌টেসরী-প্রবর্তিত শিক্ষানীতি আলোচনা করলে দেখা যায় এই শিক্ষাপ্রণালী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখ্যত বস্তুনিষ্ঠ। এই

শিক্ষাপ্রণালীকে একটি যুক্তিসম্মত এবং মনোবিজ্ঞান-সমর্থিত ক্রম-বিকাশের ভিত্তির ওপর স্থাপন করার প্রয়াস করা হ'য়েছে। এই শিক্ষাপ্রণালীকে প্রধানত শিশুকেন্দ্রিক এবং একান্তভাবে শিশুদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যায়। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের (অর্থাৎ আট বা তদূর্ধ্ব বয়সের) শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে এই প্রণালী একেবারে নীরব বললেই চলে। তবে শিশু শিক্ষাক্ষেত্রে এই পদ্ধতির গুরুত্ব ও সার্থকতা অত্যন্ত বেশী, তা বোধ করি, আজ-কাল আর কেউ অস্বীকার করবে না। কোন একটি শিশুনিকেতনে প্রবেশ করলে মনে হতে পারে যে শিশু বোধ হয় উপাদানের মধ্যে গেছে হারিয়ে। কিন্তু তা নয়, এই বিজ্ঞানসম্মত সুচিন্তিত উপাদান-গুলিই হ'লো তার শিক্ষার অপরিহার্য অংগ। তাই বিভিন্ন ডিড্যাকটিক উপাদান-সম্বলিত কোন বালমন্দিরে প্রবেশ করলে মনে হয় আমরা যেন কোন শিশু-তৈরী-করার গবেষণাগারে প্রবেশ করেছি।

শিশুরা কোন্ কল্পলোকে বিহার করে, তার যথাযথ সন্ধান কয়জন মনোবিজ্ঞানবিদই বা রাখতে পারেন! শিশুর জীবনের ক্রমিক পরিণতিতে কল্পনা যে খুব কার্যকরী তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবে না। কখনো সে নিজেকে ভাবছে রূপকথার রাজকুমার। সে চলেছে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে তার অভিলষিত রাজকন্যার সন্ধানে—সে রাজকন্যার রূপ নাকি কুঁচবরণ, চুল নাকি মেঘবরণ। ডাইনী বুড়ীর হাত থেকে অথবা কোন রাক্ষসের হাত থেকে সে তার মনের রাজকন্যাকে করবে উদ্ধার। আবার হয়তো সে ভাবছে যে, সে নিজে যেন রামচন্দ্র। সে বেরিয়েছে অপহৃতা জানকীর খোঁজে। সংগে আছে তার লক্ষ্মণ ভাই। সে রাবণকে নিধন ক'রে তার সীতাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কখনো বা সে আকাশের চাঁদ বা তারা হ'য়ে ফুটে উঠ্‌তে চায়; কখনো বা সে চাঁপা গাছে ফুল হয়ে থাকতে চায়; কখনো বা কুকুরছানা হয়ে মায়ের আঁচল ধরে টানতে তার সাধ যায়। এইপ্রকার কল্পনা-বিলাসের স্থান নেই মন্‌টেসরী শিক্ষাপ্রণালীতে।

এই পদ্ধতি একেবারে বাস্তবতাধর্মী। ডাঃ মনটেসরী শিশুদের কল্পনাশক্তি ও আবেগের যথাযথ বিকাশসাধনে কোনদিন অলীক কোন রূপকথা বা কাহিনীর আশ্রয় নেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ডাঃ মনটেসরী বোধ হয় কল্পনাকে বাস্তবের পরিবর্ত হিসাবে ভেবেছিলেন, তাই তিনি কোন প্রকার অলীক কল্পনার প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু রূপকথা বা রূপকাহিনীর মধ্যে যে কোন জাতির যে সাহিত্যিক ও কৃষ্টিগত ঐতিহ্য লুকিয়ে আছে, তার সম্পদ থেকে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের বঞ্চিত করে রাখার কোন সংগত অর্থ ই হয় না। আর বিশেষ করে শিশুদের ভাবপ্রবণ বয়সে কল্পনা ও বাস্তবের সূক্ষ্ম তারতম্যের বোধই অনুভূত হয় না। শিশুরাজ্যে সব কিছুই যেন সত্য—অলীক বা অবাস্তব বলে কোন কিছু নেই তার কাছে। কিন্তু ডাঃ মনটেসরী বলতেন—যা অবাস্তব ও অলীক, তা মূল্যহীন। শিশুর মনোবিকাশের ক্ষেত্রে অলীক কল্পনা মানসিক শক্তির অপচয় এবং শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই মনটেসরী শিক্ষা-পদ্ধতিতে যা অবাস্তব, যা অপরিমিত তার কোন স্থান নেই।

মনটেসরী শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেকে এরূপও সমালোচনা করেন যে এই প্রণালীতে ধর্ম অথবা নীতিজ্ঞান দেবার কোন পৃথক্ ব্যবস্থা নেই। একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যায় যে এই পদ্ধতির মধ্যে উপদেশ বা নির্দেশের স্থান অতিশয় সীমাবদ্ধ। ডাঃ মনটেসরী অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতিতে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও শক্তির সুস্থ ও সুসঙ্গস বিকাশ সাধন হয় এবং এই স্বাভাবিক বিকাশই নৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ। নীতি বা ধর্ম জীবনের স্বাভারিক ক্রিয়ার বহির্ভূত নয়। মনটেসরী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিশুর রাগ, ভয়, লোভ ইত্যাদি রিপু প্রকাশের অবকাশ নেই। বরং শিশু যাতে আনন্দময় পরিবেশে তার স্বাভাবিক ক্রিয়া করবার সুযোগ-সুবিধা পায়, তার সুব্যবস্থাই আছে এই প্রণালীতে। মনটেসরী শিক্ষা-পদ্ধতি আদৌ নিষেধাত্মক নয়; তাই শিশু কোন

প্রকার বিদ্রোহ করে না। শিশু শান্ত ও সংযতভাবে আপনার কাজ করে যায়—কোন কাজে তার বিরক্তি নেই—কোন কাজে নেই তার ফাঁকি। প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি শিশু জীবনের প্রতি পদক্ষেপে নিষেধ ও বাধার সৃষ্টি করতো। তাই সেই পদ্ধতিতে শিশু অনেক কিছু এড়াতে গিয়ে নানাপ্রকার অসত্যের আশ্রয় নিতো এবং ধর্মবিগর্হিত কাজকর্ম করতো। কিন্তু মন্‌টেসরী শিক্ষা-প্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশু শান্ত, সংযত, ভদ্র, সত্যাশ্রয়ী হয়ে গড়ে ওঠে। নাই বা হলো তার নীতিশিক্ষা; নাই বা হলো তার ধর্মশিক্ষা। তার সামগ্রিক জীবন যে ভাবে গড়ে ওঠে, সেটাই লক্ষ্য করার বিষয়। আমরা যদি দেখি, বালমন্দিরের শিশুরা অলস নয়, অবাধ্য নয়, মিথ্যাবাদী নয়, অপরকে হিংসা করে না—তাহলে এর চেয়ে আর অধিক কি কাম্য হতে পারে?

মন্‌টেসরী শিশুনিকেতনে শিশুর শিক্ষা তার স্বভাব অনুযায়ী চলবে এই নীতি অবলম্বিত হয়। এদিক দিয়ে রুশো হলেন মন্‌টেসরীর পথ-প্রদর্শক। রুশো শিশুর একক শিক্ষায় ছিলেন বিশ্বাসী। রুশো ছিলেন যে-কোন প্রকার পীড়ন অথবা শাসনের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল ছাত্রকেন্দ্রিক। সংসারের পংকিল পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে আদর্শ পরিগমে শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা হওয়াই বিধেয়। মন্‌টেসরীও রুশোর এই সব মূল নীতি মানতেন। রুশো যেমন তাঁর "এমিল"কে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক্‌ভাবে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, মন্‌টেসরী কিন্তু তা চাননি কোন দিন। বালমন্দিরের আনন্দময় পরিবেশে সহযোগিতা, প্রীতি ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে শিশু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবে এই ছিল মন্‌টেসরীর অভিলাষ। রুশো বলতেন যা কিছু কৃত্রিম এবং বিকৃত তা সর্বথা ত্যাজ্য। কিন্তু মন্‌টেসরী কৃত্রিমতাকে পরিবর্জন করেন নি। বরং তাঁর বালমন্দিরের পরিগম কৃত্রিম বললেই চলে; কারণ, সেখানকার দ্রব্যসম্ভার ও উপাদান-বাহুল্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা

অনুযায়ী বাহির থেকে চাপানো হয়। কৃত্রিম পরিবেশে শিশুর জীবনে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হয়।

মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা শিক্ষাক্ষেত্রে একেবারে নোতুন কথা নয়। মন্টেসরী সর্বপ্রথম এ কথা আমাদের শোনান নি। তাঁর আগে শিক্ষাবিদ পেষ্টালট্সি শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির ওপর স্থাপন করবার কথা বলেছেন। অবশ্য তাঁর সময়ে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান তখনো সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করেনি। কিন্তু মন্টেসরীর সময় মনোবিজ্ঞান অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। তিনি মনোবিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর প্রয়াস সার্থক হয়ে উঠেছিল। ডিড্যাকটিক উপাদানগুলি উদ্ভাবনে মন্টেসরী মৌলিকত্ব দেখাতে পারেন নি। কারণ, তাঁর পূর্বে ফ্রেবেল তাঁর Gifts উদ্ভাবন করেছেন। উভয়ের উপাদানের আকারগত তারতম্যই হলো উভয়ের পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্নতা। ফ্রেবেলের উপাদানগুলি আকারে ছোট এবং সংখ্যায় কম; কিন্তু মন্টেসরীর উপাদানগুলি আকারে বড় এবং সংখ্যাও বেশী। ফ্রেবেলের উপাদানগুলির কল্পনার অবকাশ আছে; কিন্তু মন্টেসরী একান্তভাবে কল্পনা-বিরোধী। ফ্রেবেলের উপাদানগুলির পশ্চাতে একটা সূক্ষ্ম ধর্মনীতি অলক্ষ্যে ক্রিয়া করেছে—যেমন একই বহু, আবার বহুই এক। কিন্তু মন্টেসরীর উপাদানগুলি উদ্ভাবনের পশ্চাতে এই প্রকার কোন ধর্মীয় মনোভাব ছিল না। মন্টেসরী শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটার প্রতি লক্ষ্য দিয়েছেন বেশী। ফ্রেবেলের শিক্ষা-পদ্ধতিতে বহিঃপ্রকৃতি অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে; কিন্তু মন্টেসরী প্রণালীতে তার বিশেষ কোন স্থান নেই।

মন্টেসরী-প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির যথাযথ মূল্যায়ন এখনো হয় নি। এই শিক্ষা-পদ্ধতি এখনো পরীক্ষা ও গবেষণার স্তর অতিক্রম করে নি। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মন্টেসরী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষা-মন্দির খোলা হয়েছে। দেশ কাল পাত্র

ভেদে মন্‌টেসরী শিক্ষানীতির উপযোগী পরিবর্তন মন্‌টেসরী নিজেই সমর্থন করে গিয়েছেন। মন্‌টেসরী শিশুনিকেতনের উপাদান-সম্ভার দিয়ে যথাযথভাবে কোন বালমন্দিরকে সুসজ্জিত করা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। ভারতের মত গরীব দেশে এই ধরনের বিদ্যালয় কতখানি কার্যকরী হবে সে বিষয়ে জোর করে কিছু বলা যায় না। অনেকের মনে এই প্রকার ধারণা আছে যে মন্‌টেসরী শিক্ষা-পদ্ধতি কেবলমাত্র সংগতিসম্পন্ন গৃহস্থদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য। মন্‌টেসরী ভারতে এসেছিলেন এবং এখানে তিনি তাঁর বালমন্দিরের নমুনা রেখে গিয়েছেন। তিনি এদেশে যদি বেশী দিন থাকতেন এবং গরীব দেশের উপযোগী করে কোন শিশুশিক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করে যেতে পারতেন, তাহলে হয়তো আমাদের দেশের প্রভূত মংগল সাধিত হতো। মন্‌টেসরী শিক্ষানীতি প্রথমে গরীবদের জন্যই উদ্ভাবিত হ'য়েছিল। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা তাঁর পদ্ধতিটিকে একটু বিকৃত করে ফেলেছিলেন। এর জন্য অবশ্য ডাঃ মন্‌টেসরীকে দায়ী করা যায় না। প্রতি দেশে যদি রাষ্ট্র অগ্রসর হ'য়ে মন্‌টেসরী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, তাহলে শিশুশিক্ষা-রাজ্যে যে অভাবনীয় যুগান্তর আসবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

শিক্ষাব্রতী ও দার্শনিক জন ডিউয়ি

(১৮৫৯-১৯৫১)

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শিক্ষা ও দর্শন গগনে জন ডিউয়ি ছিলেন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। শিক্ষাজগতে যে নবতম ভাব-সম্পদ এবং বহু দেশের শিক্ষাধারার উপর যে অবিস্মরণীয় প্রভাব তিনি রেখে গেছেন, তাতে তিনি অমরত্ব লাভ করবেন। প্রগতিবাদী প্রত্যেকটি দেশে দেখা যায় যে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি হয়েছে একান্ত-ভাবে শিশুকেন্দ্রিক, আনন্দময় ও কর্মকেন্দ্রিক। উনবিংশ শতাব্দীর পাঠ্যবিষয়-ভারবহুল, বাস্তবতা-বিবর্জিত ও বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষা-ধারার মোড় যে সব যুগপ্রবর্তক ঘুরিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে জন ডিউয়িই বোধ হয় কালানুসারে সর্বপ্রথম। এখানেই নিহিত রয়েছে তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।

জন ডিউয়ির মাতৃভূমি আমেরিকা সত্যই এক অভিনব দেশ। প্রাচীন পৃথিবীর নবাবিষ্কৃত ভূগোলার্ধ হ'লো এই আমেরিকা। এখানকার অধিবাসী, বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় পরম আস্থাশীল, নব নব পরীক্ষায় সতত উদ্যোগী এবং যত্নপর, বিজ্ঞান শিক্ষায় অগ্রসর এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে এরা সত্যাসত্য নির্ণয়ে বদ্ধপরিকর। জন ডিউয়িকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মেধার প্রকৃত প্রতীক ও অভি-ব্যক্তি বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে। কথাটা মূলত ঠিক ; কারণ, কর্মপ্রবণ মার্কিন দেশের চিন্তাধারা যথার্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে জন ডিউয়ির দর্শন ও শিক্ষানীতিতে। তাই মার্কিন দেশ অতি সহজভাবে গ্রহণ করেছে তাঁর শিক্ষাদর্শনকে, অনুপ্রাণিত করে তুলেছে তার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সেই মন্ত্রে। ফলে ডিউয়ি কর্তৃক স্থাপিত "পরীক্ষাগার বিদ্যালয়ে" নিরূপিত সত্য আজ শুধু তাঁর মাতৃভূমিতেই নয়, সমস্ত শিক্ষাজগতের অন্যতম আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং চীন, জাপান, রাশিয়া, তুরস্ক, দক্ষিণ আমেরিকা,

আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। ডিউয়ি যে শুধু সমস্ত শিক্ষা ও দর্শন জগতের চিন্তধারাকে প্রভাবান্বিত করেছেন, তা নয়, প্রতিটি প্রগতিশীল ব্যবস্থার প্রতীক হিসাবে তিনি স্বীকৃত হয়েছেন বিশ্বের বিদগ্ধ-সমাজে। ডিউয়ি চিরজীবন প্রগতিপরায়ণ, চরমভাবে আশাবাদী ও পুরোপুরি জীবন-ধর্মী। তাঁর দর্শন ও শিক্ষানীতি সমাজ-জীবনের আদর্শ ও প্রয়োজনের সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে আছে জড়িয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর নিরানন্দ, শাস্তিমূলক, মনোবিজ্ঞান-বিবর্জিত শিক্ষাধারাকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করে যে সব মরমী ও দূরদর্শী শিক্ষাব্রতী প্রাণচঞ্চল শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও অবিরাম কর্মপ্রেরণাকে শিক্ষারীতির কেন্দ্র ব'লে স্বীকার করে নবতম প্রাণপূর্ণ শিক্ষাধারার প্রবর্তন করেছেন, জন ডিউয়ি তাঁদের মধ্যে এক মহাসম্মানের আসন অধিকার করে বসে আছেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভারমণ্ট-এর অন্তর্গত বার্লিন্টনে অতি সাধারণ পরিবারে জন ডিউয়ির জন্ম হয়। যেখানে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানকার পরিবেশ একেবারে গ্রাম্য। বাল্যকালে অথবা কৈশোরে যখন তিনি বিদ্যাভ্যাসে রত ছিলেন, তখন তাঁকে অতি সাধারণ ছেলে বলে মনে হ'তো। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে যখন তিনি ভারমণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর বয়স হবে বছর পনের। এখানকার ছাত্র হিসাবে তিনি বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি স্নাতক শ্রেণীর পাঠ সমাপন করেন এবং পরীক্ষায় এত অধিক নম্বর পেয়েছিলেন যে তাঁর আগে এত নম্বর আর কেউ পায় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনযাপনের সময় তিনি ডারউইনের বিবর্তন-বাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। কিন্তু ডিউয়ির জন্ম হয়েছিল এক ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান পরিবারে। বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব আর ডারউইনের বিবর্তনবাদের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য আছে তা তাঁর চোখে ধরা পড়ে এবং এর দ্বারা তাঁর চিন্তাশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়।

জীবনের পাশ্চাতে কোন রহস্য আছে লুক্কায়িত, জীবন কোন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার পশ্চাতে কোন ঐশী শক্তি কাজ করছে, না তা জড় শক্তির দ্বারা চালিত ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তরুণ ডিউয়ি জীববিদ্যা এবং দর্শন সম্বন্ধে বহুবিধ গ্রন্থ গভীর অভিনিবেশের সহিত পাঠ করতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। কিন্তু এতে তাঁর জ্ঞানস্পৃহা নিবৃত্ত হলো না। তিনি স্থির করলেন দর্শন চর্চাকে জীবনের ধ্যানজ্ঞান করবেন। তাই তাঁর মাসীর কাছ থেকে তিনি ৫০০ ডলার ধার করে নিয়ে বাল্টিমোরে জন্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন পড়বার জন্য আসেন। এখানে তিনি শুধু বৃত্তিই পেলেন না; এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের ইতিহাস পড়াবার জন্য অতি শীঘ্রই তাঁর একটি শিক্ষকের পদ জুটল। এখানে কয়েকজন স্বনামধন্য পণ্ডিতের সংগে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। সুপ্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী স্টান্লী হল্ এবং প্রতিথযশা দার্শনিক চার্লস্ পিয়ার্স এর সংস্পর্শে আসেন; স্টান্লী হলের সমাজতন্ত্রবাদ এবং পিয়ার্সের ফলবাদী অভিমত তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই সময় তিনি জি. এস. মরিসন নামে আর একজন সুবিখ্যাত দার্শনিকের সংসর্গে আসেন। এই দার্শনিকই ডিউয়িকে হেগেলের আদর্শবাদী মতবাদের দিকে তাঁর মতকে আকৃষ্ট করেন। হেগেল বিশ্বাস করতেন জড় ও জীবন, চেতন ও অচেতন একই মূলীভূত চিৎশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। ডিউয়ি ভেবেছিলেন তাঁর মনোগত সংশয়ের সম্পূর্ণ নিরসন হয়ে যাবে বোধ হয় হেগেলীয় মতবাদের মাধ্যমে। কিন্তু তাঁর এই মানসিক ভাবটি বেশী দিন স্থায়ী হ'লো না। তাঁর অন্তর্নিহিত ফল-বাদ জয়ী হ'লো হেগেলীয় ভাববাদের ওপর। ভাববাদীরা বলেন —সত্য হবে স্থির, সনাতন এবং অপরিবর্তনীয়। ফলবাদীরা বলেন, সত্য হবে জীবনের প্রয়োজনের সংগে অংগাংগিভাবে সংযুক্ত। যা কিছু জীবনের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে, তাই সত্য বলে

পরিগণিত হবে। তাই ফলবাদীদের সত্য পরিবর্তনশীল, গতিশীল এবং পরীক্ষার নিকষ-পাথরে যাচাই করা জিনিষ। মানব-জীবনের প্রয়োজন সততই পরিবর্তনশীল; তাই তার সংগে যে জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই, তার কোন মূল্যও নেই।

যখন তিনি জন্ হপকিন্‌সে কাজ করছিলেন তখন তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষকের পদ পান এবং তিনি সেখানে চলে যান। মিশিগান থেকে তিনি চলে যান মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার সেখান থেকে তিনি ফিরে আসেন মিশিগানে। শেষে মিশিগান থেকে তিনি চলে যান শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়কের পদ পেয়ে। এই সময় তাঁর মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁর ভাববাদী মনোভাবের পরিচয় সুপরিস্ফুট ছিল। এই সময় উইলিয়ম জেম্‌সের মতবাদ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। উইলিয়াম জেম্‌স্ ছিলেন হেগেলের তীব্র বিরোধী। হেগেল মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু পরিবর্তন হয়, তা সবই ভগবানের চিন্তার মধ্যেই সম্পূর্ণ। তাই তিনি বলতেন, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে তার মধ্যে নেই কোন অভিনবত্ব। কিন্তু এই সময় আমেরিকায় যে আলোড়ন ও পরিবর্তন সংসাধিত হচ্ছিল তার মূলে ভগবানের ঐশী শক্তি কতখানি ক্রিয়াশীল ছিল তা সহজে বোধগম্য হচ্ছিল না। ডিউয়ি স্বচক্ষে দেখলেন এই সব পরিবর্তনের মূলে রয়েছে মানুষের উদ্যোগ ও কর্মপ্রয়াস। তিনি ধীরে ধীরে বুঝলেন যে হেগেলীয় ভাববাদী মতবাদ একটি নিছক ভাবালুতা মাত্র। মানুষ নিজের উদ্যম ও কর্মপ্রয়াসের দ্বারা নব নব সৃষ্টি করে। মানুষের সৃষ্টি অবিচল নয়; তার মধ্যে রয়েছে গতিশীলতা; মানুষের প্রয়োজনানুসারে তার সৃষ্টিরও রূপান্তর হয়। মানুষের সামাজিক জীবনের প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়েই তার সৃষ্টি এগিয়ে চলে নব নব পথে এবং উন্নতির দিকে। কিন্তু এই উন্নতি ও অগ্রগতির অন্তরালে কতখানি

ব্যর্থতা, কতখানি অশ্রুজল যে আছে লুকিয়ে তা অবশ্য ডিউয়ির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। যারা হ'লো জীবন-সংগ্রামে জয়ী, জয় হোক তাদের! কিন্তু যারা নিষ্পেষিত হয়ে গেল কালচক্রে, তাদের ব্যর্থতার গ্লানি, তাদের পরাজয়ের দীনতা ডিউয়ির বুকে বাজল বেশী। জীবনের যাত্রাপথে যারা রইলো সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে, তাদের জীবনকে কি করে ফুলে ফলে ভরে দেওয়া যায়, কি করে তাদের জীবন-পথের কণ্টক অপনোদন করা যায় এ-নিয়ে তিনি এখন থেকে চিন্তা স্থুরু করলেন। এখানেই তাঁর মনে দর্শন সম্বন্ধে একটি গভীর সন্দেহ জাগে। তিনি বুঝলেন—দর্শন কেবল কল্পনার অলস পাখায় ভর দিয়ে গগনে স্বচ্ছন্দ বিহার নয়। দর্শন মানুষের জীবনের সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। দর্শন কোনদিনই মানুষ অথবা সমাজ-নিরপেক্ষ হতে পারে না। বরং সামাজিক ও সাংসারিক সমস্যা ও সংঘর্ষের সুসমঞ্জস মীমাংসাই হ'লো দর্শন।

জন ডিউয়ি যখন শিকাগোতে অধ্যাপনায় রত ছিলেন, তখন শিক্ষাজগতে তাঁর শাশ্বত অবদান রেখে যাবার অপূর্ব সুযোগ আসে। শিকাগোতে অবস্থানকালে তাঁর নিজের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি একটু বিশেষ অবহিত হয়েছিলেন। এই সময় ফ্লোরা কুকের নোতুন ধরনের বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতায় তিনি এখানে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে একটি নবতম বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। এই বিদ্যালয়ের নাম হ'লো ল্যাবরেটরী স্কুল। তাঁর পরিকল্পিত হাতে-কলমে শিক্ষা অথবা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এখানেই হ'লো বাস্তবে রূপায়িত। অতি সাধারণভাবেই বিদ্যালয়টির সূচনা হয়েছিল। গোড়াতে এই বিদ্যালয়ে ছিল মাত্র ষোলজন ছাত্র ও দু'জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। প্রথম কয়েক বৎসর নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়টিকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। বিদ্যালয়ের এই দুর্দিনে স্বামী-স্ত্রী বহু যত্নে একে রক্ষা ক'রে গিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁরা অবশ্য একজন সুযোগ্য

শিক্ষিকার সহায়তা পেয়েছিলেন—এঁর নাম ছিল এলা ফ্ল্যাগ। এই বিদুষী নারী বহু বৎসর যাবৎ ডিউয়ির গবেষণামূলক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা নিযুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক ডিউয়ি ছিলেন এর সর্বাধিনায়ক বা অধিকর্তা আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন এই বিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষা-বিভাগের প্রধানা। বিদ্যালয় স্থাপনের বৎসরখানেকের মধ্যেই এর ছাত্র সংখ্যা ষোল থেকে বেড়ে প্রায় দেড়শতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং শিকাগো সহরে এই বিদ্যালয় অতি দ্রুত এক অভাবনীয় জন-প্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ডিউয়ির ল্যাবরেটরী বিদ্যালয়ে চার থেকে চোদ্দ বছরের ছেলে-দের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এখানে এতাবৎকাল প্রচলিত অথবা চিরাচরিত প্রথায় লেখাপড়া শেখানো হয় না। এখানকার বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে এখানকার বিদ্যার্থীরা বিভিন্ন কাজ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। এখানকার শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক অনুরাগ ও আগ্রহ অনুযায়ী এখানকার শিক্ষামূলক ক্রিয়াকর্ম হয় নিয়ন্ত্রিত। জীবনের সমস্যা-সমাধানের অংগ হিসাবেই চলে এখানকার শিক্ষার কাজ। পূর্বনির্দিষ্ট কোন পাঠ্যানুসারে এখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ থাকে না। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলে মনে হবে—এটি যেন বাইরের সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিদ্যালয়টি যেন একটি সজীব প্রাণবন্ত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। এখানকার শিক্ষা সেই বৃহত্তর সমাজের অংগীভূত একটি বিশেষ ক্রিয়া। এখানকার শিক্ষা ও ছাত্র সকলেই বৃহত্তর সমাজের সক্রিয় অংশবিশেষ। এখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা কেবলমাত্র উত্তর-জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়—বর্তমান জীবনের সমস্যা-সমাধানই সেখানে অনেকখানি স্থান অধিকার করে বসে আছে। এখানে শিক্ষার্থী কেবল নির্জীব গ্রহীতা নয়; আর শিক্ষক একটি উন্নত স্তর থেকে তাঁর পদপ্রান্তে উপবিষ্ট শিক্ষার্থীদের উপর উপদেশ বর্ষণ করেন না। শিক্ষক শিক্ষিতের সম্মিলিত জীবনপুষ্ট এই বিদ্যালয়।

জীবনের বিবিধ সমস্যা সমাধানের মাধ্যমেই বিদ্যালয়ের সব কাজ পরিচালিত হয়। এখানে বিদ্যালয়ে পঠিতব্য বিষয়গুলি পৃথক্‌ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না। বর্তমানের শিশু এবং ভবিষ্যতের নাগরিক কিভাবে উত্তরকালে সমাজের একজন কুশলী কর্মী হতে পারবে সেই উদ্দেশ্যেই এখানকার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম কেন্দ্রীভূত হ'য়ে আছে। এখানকার সমস্ত কাজকর্ম গোষ্ঠীমুখী হয়ে আছে; ব্যষ্টি গিয়েছে সমষ্টির মাঝে লুপ্ত হয়ে। তাই অনাবশ্যক প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভের প্রয়াস এখানে কোনপ্রকার প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। (এখানকার শিক্ষার বিশেষত্ব হলো এই যে, সমষ্টি জীবনে সহযোগিতার মাধ্যমে জীবন-সমস্যার সমাধান এবং পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বাস্তবের সংগে নিবিড় পরিচয় স্থাপন।) তাই এই বিদ্যালয়কে বিদ্যালয় বলে মনে হয় না; মনে হয় এটা যেন একটা বাইরের বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডিউয়ি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর, মার্কিণ দেশের বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে বহুবিধ সম্মানে ভূষিত করেন। তিনি এই সময় দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক বিজ্ঞানের নানা পরিষদের সভাপতি পদেও বৃত ছিলেন। এই সময়ে তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। তাঁর নবতম শিক্ষা-পদ্ধতি দেশবিদেশের নানা শিক্ষাব্রতীকে নব নব পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে। মেক্সিকো, চীন, জাপান, রাশিয়া, তুরস্ক, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এল তাঁর আমন্ত্রণ সেই সব দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্তন ক'রে দেবার জন্য। তিনি সোৎসাহে এবং আনন্দের সংগে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সেই সব দেশকে নিজের দেশ মনে ক'রে শিক্ষার নবতম নীতি প্রবর্তনের খসড়া তৈরী করলেন সেই সেই দেশোপযোগী। শিক্ষা-সংস্কারের একটা আলোড়ন দেখা দিল চারিদিকে এবং আজ সে-সব দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রগতিশীল ব'লে পরিচিত হ'য়েছে।

এই তো গেল ডিউয়ির বাইরের পরিচয়। কিন্তু এই বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক কি করে দর্শনের সূক্ষ্ম বিচারের ভিতর শিক্ষা-সমস্যা বা শিশুমনের চিরন্তন রহস্যগুলো নিজের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতেন, সে-বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। অন্যান্য দার্শনিকদের মত তিনি ছিলেন একজন আত্মভোলা মানুষ। অনেক সময় অনেক জিনিষ তাঁর খেয়ালে আসতো না। কিন্তু অনেক দার্শনিক যেমন তাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে চিন্‌তে পারতেন না, ডিউয়ির কিন্তু সে-প্রকার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। ডিউয়ির মন ছিল একেবারে শিশুগত ; যে কোন শিশুকে দেখলে তাঁর হৃদয়ের স্নেহের ধারা উদ্বেল হয়ে উঠতো। হয়তো তিনি দর্শনের কোন গূঢ় অথবা জটিল তত্ত্ব নিয়ে গভীর অভিনিবেশের সংগে কোন কিছু চিন্তা করেছেন বা লিখছেন, এখন সময় দেখা গেল তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর কাঁধের ওপর ঝুলে পড়ছে অথবা তাঁর কোলে বুকে ওঠবার জন্য চেষ্টা করছে। দার্শনিক ডিউয়ি তখন সব চিন্তা ভুলে ছেলেমেয়েদেরকে হয়তো আদর করে পাশে বসালেন, তাদের সংগে খানিকটা গল্পসল্প করলেন বা তাদের সংগে হয়তো খেলায় যোগ দিলেন। শত কাজের মধ্যেও তিনি শিশুদের সংগে সব সময়ই সস্নেহ ব্যবহার করতেন এবং এই ব্যবহারের মাধ্যমেই হয়েছিল তাদের শিক্ষার সংগে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ, আর এর ভেতর দিয়েই শিশুচরিত্রের অনুদ্‌ঘাটিত রহস্যের ভেতর তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

শিক্ষার্থীর প্রতি ছিল যেমন তাঁর গভীর সস্নেহ ব্যবহার, শিক্ষকের প্রতিও তেমন তাঁর দরদ ছিল অপরিসীম। সত্যই তাঁর মত মরমী মানুষ একান্তই বিরল। মার্কিণ দেশ প্রভূতরূপে বিত্তশালী হ'লেও সেদেশে শিক্ষকদের বেতন ও সম্মান আজও অরুন্তুদ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি অসংকোচে ঘোষণা করেছিলেন—"শিক্ষার প্রধান সমস্যা হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর অভাব—চাই এমন শিক্ষক যাঁরা শিক্ষাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ ক'রে একটা মহাপ্রেরণায়

অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষকতার কাজ করছেন। কাজেই আমাদের সমাজে প্রয়োজন হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব ছাত্র-ছাত্রী মেধাবী, যাঁদের ধীশক্তি ক্ষুরধার, তাঁদের শিক্ষণ-ব্রতে দীক্ষিত করা, তাঁদের যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া এবং তাঁদেরকে উপযুক্ত আর্থিক পুরস্কার দেওয়া।" শিক্ষার প্রধানতম অংগ হলো তিনটি—শিশু, শিক্ষক ও সমাজ। যথোপযুক্ত শিক্ষক, তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষণপ্রণালী তাঁর কর্মকুশলতা—ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বার বার তাঁর বইয়ে অথবা বক্তৃতায় জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাই তিনি বুঝেছিলেন যে বিদ্যালয়ে পাঠ্যবস্তুর চেয়ে শিক্ষকের স্থান অনেক উর্ধ্বে, তাঁর গুরুত্ব অনেক বেশী। এই মহাসত্যটি আজকাল প্রগতিপরায়ণ সব দেশেই স্বীকৃত হয়েছে। অনুন্নত দেশগুলিতেও এই চেতনা জাগ্রত হয়েছে।

(জন ডিউয়ি প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালীর বিষয় ভাল করে বুঝতে গেলে তাঁর দর্শন সম্বন্ধে মতামত আমাদের জানা উচিত আগে। দার্শনিক ডিউয়ি কোনদিনই শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদ যে আছে তা মানতে রাজি হন নি। তিনি বলেছেন—এ দুটি অংগাংগিভাবে বিজড়িত। মানবের চিন্তাপ্রসূত পথের দিশা দেয় দর্শন; আর শিক্ষা জুগিয়ে দেয় সে-পথে চলবার নানা উপায় উদ্ভাবন করে সে-পথে চলে লক্ষ্যস্থানে উপনীত হবার শক্তি।) (কাজেই দর্শন ও শিক্ষা একই সত্যের বিভিন্ন রূপ—একটি হলো চিন্তার, অপরটি হ'লো কর্মের) এরা সমান্তরাল রেখায় চলে না, এর প্রতিস্পর্শী নয়; বরং এরা চিরদিনই পরস্পরচুম্বী। এই চিন্তা, উদ্দেশ্য ও কর্মের একত্র সমাবেশেই মূর্ত হয়ে উঠেছে ডিউয়ির শিক্ষাদর্শন।

ডিউয়ির দার্শনিক দৃষ্টিভংগী ছিল সামগ্রিক। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হচ্ছে তাকে তিনি কোনদিন আলাদা আলাদা করে দেখেন নি। তিনি বলতেন দর্শনের মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী।

অতীত কালে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে বিভেদ পরিলক্ষিত হ'তো তার একমাত্র কারণ হ'লো দর্শন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। প্রাচীনপন্থীরা বলতেন—দর্শন হ'লো সত্যাশ্রয়ী—সেই সত্য অচল-প্রতিষ্ঠ ও ধ্রুব। তা এক ও অপরিবর্তনীয়। জীবনের উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ সব কিছুই নিতান্ত সাময়িক ও অলীক। যা সত্য তা সব সময়ই আমাদের জীবনের হাসি কান্নার বহু ঊর্ধ্বে; আমাদের কামনা বাসনা তাকে কোনক্রমে স্পর্শ করতে পারে না। এই সত্য কোনকালেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, বুদ্ধি দিয়ে তার পরিমাপ করা যায় না; পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে কোন-দিন উপলব্ধি করা যায় না। ঋষি-দর্শিত পথে গভীর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই সত্যের সম্মুখীন হওয়া যায়। ভারতের তথা প্রাচ্যের সত্যোপলব্ধি সম্বন্ধে এই হ'লো সনাতনী পন্থা। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের এই সত্যের প্রতি ছিলেন পরম আস্থাশীল। এখানে রবীন্দ্র-নাথের সংগে ডিউয়ির দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। ডিউয়ি বলতেন—সত্য কখনো অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। বরং সত্য হবে পরিবর্তনশীল; তা মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ ও নানাবিধ সমস্যার সংগে অতি নিবিড়রূপে বিজড়িত। দর্শন তো আর মানব-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। মানব-জীবনের সংঘর্ষ, সংঘাত ও সমস্যার সংগে রয়েছে তার নাড়ীর যোগ। মানব-জীবনে যদি কোন পরিবর্তন আসে, তাহলে দর্শনের সমস্যা ও আদর্শের অদল-বদল হবেই। দর্শন হবে মানব-জীবনের প্রতিচ্ছবি, দর্শন হবে একান্তভাবে জীবন্ত। দর্শন যদি নিজেকে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্থান, কাল, পাত্রের ঊর্ধ্বে কোন এক কল্পলোকে বিহার করে, তা'হলে তা হয়ে উঠবে অবাস্তব এবং মানব-জীবনের সংগে সম্পর্কবিরহিত। মানব-জীবনের সংগে এই যোগাযোগ হারিয়েছে বলেই দর্শন আজ তার মাহাত্ম্য হারিয়েছে। প্রাচীন দর্শন আজকাল বর্তমান যুগের সমস্যা সমাধানে অপারগ। তাই তার প্রয়োজনও বোধ করি, ফুরিয়েছে।

ডিউয়ি বলতেন—"সত্যের নিকষ-পাথর হচ্ছে তার কার্য-কারিতার বিচার।" ডিউয়ি এদিক দিয়ে মূল্যবাদী বা ফলবাদী দার্শনিক। তিনি কোনদিনই আদর্শবাদের পশ্চাতে অযথা ঘুরে বেড়ান নি। এ-দিক দিয়ে তিনি ফলবাদী জেম্‌সের উত্তরসাধক। তাঁর মতে কোন জিনিষের তাৎপর্য বা মূল্য চিরন্তন কিংবা শাশ্বত সত্যের দোহাই দিয়ে নিরূপিত হয় না। মানুষের জীবনে তার কর্মনিচয়ের উপর কোন জিনিষের কি ফলাফল তার উপর নির্ভর করে তার মূল্য। কাজেই সমস্ত জোরটা গিয়ে পড়ে অভিজ্ঞতার উপরে। শিশু সামজিক পরিবেশে কাজ করতে করতে অপর পাঁচ জন শিশুর নিবিড় সাহচর্য পায়, তখনই সে যথার্থ সত্যের সম্মুখীন হয়। অন্যান্য শিশুদের নিত্য সাহচর্যে যে সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক বোধ তার মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে, তাতেই বোঝা যায় কোন্ কাজটির বা কোন্ ভাবটির কি মূল্য। সততা, দয়া, সত্য কথা, সহানুভূতি ইত্যাদি গুণাবলী মানব জীবনের শাশ্বত সম্পদ বলে উপর থেকে শিশুর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে শিশু তা কোন দিন অন্তর থেকে গ্রহণ করবে না। এখানে তার ব্যক্তিগত জীবনে মূল্যায়নের ঘরে পড়বে বিরাট এক শূন্য। কিন্তু সেই শিশু যখন তার সামাজিক পরিবেশে বাস করে দিনের পর দিন তার প্রাত্যহিক কাজের ভেতর দিয়ে এই গুণনিচয়ের যথার্থ পরিচয় পাবে, সে দিনই সে এ-সবের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারবে, সে দিনই সে সত্যের সম্মুখীন হবে, সে দিনই হবে তার যথার্থ সত্যোপলব্ধি। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার নিকষে প্রকৃত মূল্য দিতে শিখবে এই সব আদর্শকে। ডিউয়ি বলতে চান, যে আদর্শকে জীবনের ভিতর দিয়ে সুফলপ্রসূ হিসাবে শিশু গ্রহণ করতে পারে নি, তাকে তার আদর্শ বলে মানা সুকঠিন, হয়তো অন্যায়ও। জীবনে যে জিনিষের মূল্য বা প্রয়োজন আছে, তাই সত্য, তাকেই জীবনে গ্রহণ করে সে। সুতরাং শিশুর জীবনে যার কোন উপযোগিতা নেই, তা জোর করে শিশুর ঘাড়ে

চাপানোর কোন অর্থই হয় না। তাতে তাদের শিক্ষা বিফলতায় পর্যবসিত হয়। ডিউয়ির এই মূল্যবাদ প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক প্লেটো বা এ্যারিষ্টট্‌লের আদর্শবাদ থেকে একেবারে ভিন্ন। বর্তমান যুগের দার্শনিকদের মধ্যে এই মতবাদের বিরোধীদের অভাব নেই। বার্ট্রাণ্ড্‌ রাসেল এই মতবাদের বিরোধী। তিনি বলেন—মূল্যবাদের উপর নির্ভর করে মানব-সংস্কৃতি কখনো স্থায়ীভাবে গড়ে উঠ্‌তে পারে না। শাশ্বত আদর্শ ছাড়া জীবন পথে চলা সুকঠিন।

বর্তমান যুগে দেখা যায় যে বিজ্ঞান ও দর্শন অথবা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যেন কোথায় একটা বিরোধ বেধে রয়েছে। দর্শন বা ধর্মের সমর্থকগণ বলেন, যে বিজ্ঞানের কাজ কারবার জড় জগৎ নিয়ে, তার বিষয় বস্তু নিম্নস্তরের; তা শুধু জাগতিক সুখলাভের সহায়ক মাত্র। তাঁরা বলেন দার্শনিক অথবা ধর্ম রাজ্যের আদর্শ উচ্চতর, মহত্তর। সে আদর্শ অপরিবর্তনীয় সত্যকে আশ্রয় করে আছে। বৈজ্ঞানিক রাজ্যের গবেষণা, পরীক্ষা ইত্যাদি দর্শন বা ধর্মের আদর্শের নাগাল পায় না। এদিকে কিন্তু ধর্মধ্বজী দার্শনিকরা জড় বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং তজ্জনিত জাগতিক সুখভোগকে অবহেলাও করতে পারছেন না। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানব-জীবনে যে সুখ-সুবিধা, যে স্বাচ্ছন্দ্য, যে আরাম ইত্যাদি সহজলভ্য হয়েছে, সেগুলোকে উপেক্ষা করবার মত দুঃসাহস তাঁদের নেই। সংসার ও লোকালয় থেকে নিজেকে বিনির্মুক্ত করে গিরিগুহার বা অরণ্যের গহন কোনে বসে পরম ব্রহ্মে আত্মস্থ হবার জন্য যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন, তার যথেষ্ট অভাব আছে বহু দার্শনিকের ব্যক্তিগত জীবনে। মানুষের মন আজকাল দোটানায় পড়েছে। সে একদিকে বিজ্ঞানের জয়গানে আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে তুলছে। অন্য দিকে আবার তার সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু মন চিরাচরিত ধর্ম, নীতি, ঈশ্বর ইত্যাদির সম্বন্ধে তার মনে যে বদ্ধমূল ধারণা তাকেও কিছুতেই মন থেকে

দূর করে দিতে পারছে না। ফলে তার জীবনে নেমে এসেছে দ্বন্দ্ব—এই দ্বন্দ্বের এক দিকে আছে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের অনন্ত জিজ্ঞাসা ও সংশয়, আর অন্য দিকে রয়েছে প্রাচীন যুগের ধর্ম ও নীতির প্রতি অটুট বিশ্বাস, প্রশ্নহীন গ্রহণ ও সমর্থন। ডিউয়ির একান্ত স্থির বিশ্বাস এই যে বিজ্ঞান তার প্রশ্ন, আলোচনা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে দর্শনের অচলায়তনকে টলাতে সমর্থ হবে। বিজ্ঞানের রাজত্বে কোন শেষ পরিণতি নেই। বিজ্ঞানীরা জ্ঞান রাজ্যের শ্রান্তিহীন পথিক, অনন্ত ঔৎসুক্যই তাঁদের জীবন পথের একমাত্র পাথেয় ও পসরা। সত্যের পশ্চাদ্ধাবনই হলো জ্ঞান। এ-দিক দিয়ে বিচার করলে ডিউয়িকে উপনিষদের "চরৈবেতি" মন্ত্রের উপাসক বলে আমরা ধরতে পারি। একটু অনুধাবন করে দেখলে আমরা দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে বোধ হয় কোন পার্থক্য খুঁজে পাবো না। কোন বিষয়ে লব্ধ জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে কোন বিশিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহারের নামই হলো "বিজ্ঞান"। আর যদি দেখা যায় যে কোনও জ্ঞানের তত্ত্ব এবং তথ্য কোন বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না, তখন তাকে বলা যাবে দর্শন। তাহলে ফলকথা এই দাঁড়ালো যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ক্ষুদ্রতর এবং দর্শনের ক্ষেত্র ব্যাপকতর।

ডিউয়ি বলতেন—প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা এক নায়কতান্ত্রিক অর্থাৎ টোটালিটেরিয়ান। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেছেন, প্রাচীন গ্রীসের রাজ্যগুলিতে, বিশেষ করে এথেন্সে, দাসদের কর্তব্য ছিল কায়িক পরিশ্রম দিয়ে অভিজাত শ্রেণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা; আর অবসরবিলাসী অভিজাত বংশীয়েরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের চিন্তন ও মননে সময়াতিবাহিত করবেন। ডিউয়ি বলতে চান যে বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এই প্রকার ব্যবস্থা একবারেই অচল। চিন্তার জগতে, জ্ঞানের জগতে, তথা শিক্ষার ক্ষেত্রের এই প্রকার কোন জাতিভেদ তিনি কোনপ্রকারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক শিক্ষাই আজকাল শিক্ষাজগতের আদর্শ বস্তু

হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় উন্নতি এবং মানব সমাজের স্থায়ী কল্যাণ নির্ভর করে সুপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর। প্রগতিশীল সুষ্ঠু শিক্ষা-ব্যবস্থাই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। গণতন্ত্রবাদ একটি নিছক রাজনৈতিক মতবাদ নয়। মানুষ কি করে দিন দিন উন্নততর জীবন-পথে অগ্রসর হবে গণতন্ত্র তারই দিশা দেয়। সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি হ'চ্ছে এই জীবনযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যে উপনীত হ'তে গেলে একমাত্র উপায় হ'চ্ছে অগণিত জনসাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। সুশিক্ষার মধ্যে নিহিত আছে বিরাট গণশক্তি—এই অভিমত সর্বদেশেই আজ স্বীকৃত হয়েছে তা সে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হোক আর এক-নায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রই হোক। যদি কোন রাষ্ট্রে গণ-বিক্ষোভ বা গণ-জাগরণ দেখা যায় তা হলে রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হয় শিক্ষা-ব্যবস্থার শ্বাসরোধ করা। এক-নায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লে বিদ্যায়তনগুলির দ্বার রুদ্ধ করে, বইপত্র পুড়িয়ে ফেলে, শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে কারাগারে অন্তরীণ রেখে, নানাবিধ শাস্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে দেশের স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের সর্ব প্রয়াসকেই করা হয় প্রশমিত। তবে একথা ঠিক যে যদি আমরা সত্যিকারের গণতন্ত্র চাই, যেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা শাসকগোষ্ঠীর চাপে খর্ব হয় না, যেখানে সমাজের অগ্রগতির পথে অযথা বাধা সৃষ্টি হয় না, তবে সে গণতন্ত্র যে প্রচুর যত্ন, সময়, সাধনা ও ত্যাগসাপেক্ষ এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। গণতন্ত্রমূলক স্বাধীন জীবন-ব্যবস্থা যদি আমাদের কাছে মূল্যবান বলে মনে হয়, যদি তা আমাদের নিকট একান্ত কাম্য বলে প্রতিভাত হয়, তাহলে তা লাভ করার পথ যতই দুর্গম হোক না কেন, সেই পথেই মানবের সমস্ত কর্মপ্রয়াসকে নিয়োজিত করতে হ'বে। এই পথ অনেকখানি সুগম হয়ে আসে যদি দেশে সত্যিকারের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

ডিউয়ি এই নীতি ও মতবাদের সার্থকতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন। তাই তাঁর শিক্ষা-দর্শনের একটি মূল সূত্র হলো তাঁর

সমাজবাদ ও গণতান্ত্রিকতা। সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজ গঠন অসম্ভব, তেমনি সমাজকে বাদ দিয়েও ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ, আমাদের নৈতিক বোধই বলি আর সামাজিক দায়িত্ব-বোধই বলি, এসব সমাজ-জীবন থেকেই গড়ে ওঠে। শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বিমেরু তত্ত্ব আজ স্বীকৃত—এক মেরুতে থাকে শিশু আর অপর মেরুতে থাকে শিক্ষক। শিক্ষক, সংস্কৃতি ইত্যাদি সব কিছুই তো সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এক দিকে রয়েছে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি, সংস্কার ও তার শক্তিসামর্থ্য আর অন্য দিকে রয়েছে সমাজের নিত্য পরিবর্তনশীল আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও আদর্শ। সমাজের সংগে সামঞ্জস্য রেখে বা তার তালে তালে পা ফেলে যদি শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্তর্নিহিত শক্তি বা সামর্থ্যের সম্যক বিকাশসাধন হয়, তাহলে বুঝতে হ'বে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হলো। কাজেই শিশুর বিকাশ হবে সমাজের মাধ্যমেই। তাই ডিউয়ি বলতেন—প্রত্যেকটি বিদ্যালয় হবে যেন এক একটি ক্ষুদ্র সমাজ অথবা বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি। এই ক্ষুদ্র সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানই হবে শিশুর কাজ। নানাবিধ সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে নেমে আসবে শিশুর জীবনে কর্মকুশলতা, অভিজ্ঞতা। তাই শিশুর শিক্ষাকে কর্ম-কেন্দ্রিক করলেই চলবে না; তাকে করতে হবে জীবন-কেন্দ্রিক। এক কথায় শিক্ষাই হবে জীবন; জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়। ডিউয়ি এই অভিমত পোষণ করতেন যে মানুষ মাত্রই সমাজের সক্রিয় অংশ। সুতরাং গণতান্ত্রিক যুগে গণতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই গণদেবতার অংগ-বিভূতি, কিন্তু সে সম্পদ, সে সমৃদ্ধি আসে রাষ্ট্রের প্রতি, সমাজের প্রতি তার যে কর্তব্য তার সুষ্ঠু সম্পাদন থেকে—সে কর্তব্য-সম্পাদনের গোড়াপত্তন হয় বিদ্যালয় সমাজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে। সুতরাং ইতিকর্তব্যের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন হবে সমাজের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বিদ্যালয় থেকেই। বিদ্যালয়ের প্রাণ-

খোলা আনন্দময় মিলনের মধ্য দিয়ে সমবায় নীতিতে স্বাধীনভাবে কাজ করার ভেতর দিয়ে, মিলিত শক্তিতে শত সমস্যা সমাধানের ভেতর দিয়ে ভবিষ্যৎ সমাজের মানুষ তার পথ-চলার শিক্ষা গ্রহণ করবে, সেই সংগে নিজের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক কর্মকুশলতাকে উচ্চতর মানে প্রতিষ্ঠিত করবে।

শিক্ষা যে একটি জীবন্ত সামাজিক ক্রিয়া ডিউয়ি মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁদের অভিমত ছিল এই যে "শিক্ষার্থী তথ্য-সংগ্রহের নিষ্ক্রিয় আধার মাত্র ; শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে মানবের যুগ-সঞ্চিত জ্ঞানের অমৃতভাণ্ড উপুড় করে বিদ্যার্থীর ঔৎসুক্য-বিহীন মনকে ভরিয়ে তোলা।" প্রাচীন শিক্ষাধারার বিষয়বস্তু ছিল কতকগুলি তথ্য বা কর্মদক্ষতার সমষ্টি, যা স্মরণাতীত কাল থেকে পুরুষানুক্রমে অনুসৃত ও অনুশীলিত হয়ে আসছে। বিদ্যায়তনের কাজ হ'লো সেই যুগাচরিত কৃষ্টি, ঐতিহ্য প্রভৃতিকে মানুষের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে বিকিরণ করা। স্মরণাতীত কাল থেকে কতকগুলি নীতিগত আদর্শ ও সামাজিক ব্যবহারের সূত্র স্বীকৃত হয়ে আস্‌ছে। প্রাচীন বিদ্যালয়গুলিতে নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, প্রাচীন আদর্শানুসারে বিদ্যার্থীদের ক্রিয়াকর্মের নিয়ন্ত্রণ ও সমাজগত আচার-অনুষ্ঠানের অভ্যাস গঠিত করা। বিদ্যার্থী যদি অলস, অনিচ্ছুক বা অমনোযোগী হ'তো তাহলে তাদের মধ্যে বিদ্যা বিতরণের একমাত্র পন্থা ছিল শাসন-তাড়ন-নিপীড়ন এবং পুনরাবৃত্তি ও অনুকরণের মাধ্যমে প্রাচীন তথ্যসম্ভার তাদেরকে আয়ত্ত করিয়ে দেওয়া। প্রাচীনপন্থীদের মতে বেত্রদণ্ডের স্বল্প ব্যবহারের অর্থ হলো শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট করে দেওয়া। তাই অতীতে দেখা যেতো, যে-শিক্ষক যত বেশী শাসনপটু তিনি ততই বেশী দক্ষ শিক্ষক বলে পরিগণিত হতেন। শিক্ষকরা শিক্ষণে পারদর্শী হোন বা নাই হোন, তাঁরা চাইতেন যে তাঁদের পদপ্রান্তে বসে যারা শিক্ষালাভ করবে তারা যেন সব সময় বাধ্য ও বিনীত

হয় এবং তাঁদের মুখনিঃসৃত বাণী গ্রহণ করবার জন্য যেন তারা সতত উন্মুখ থাকে। প্রাচীনপন্থীরা আরও বলতেন যে মানবসমাজের এতাবৎলব্ধ জ্ঞান এবং তার যুগাচরিত আদর্শ যখন সন্নিবদ্ধ থাকে পুস্তকের মধ্যে, তখন পুস্তকই হলো শিক্ষা এবং শিক্ষণের সর্বশ্রেষ্ঠ ও অব্যর্থ উপকরণ। এই সব পুস্তকের বিষয়বস্তু যদি শিক্ষকের অধিগত থাকে, তাহলে তিনি উপযুক্ত শিক্ষক হতে পারবেন—এই ছিল প্রাচীনপন্থীদের স্থির বিশ্বাস।

কিন্তু ডিউয়ি প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—এ শিক্ষাকে বাহির হ'তে শিশুর ওপর জোর করে চাপানো হয়েছে। ছেলেদের মন কি চায় তার দিকে কোন লক্ষ্য নেই এই শিক্ষা-ব্যবস্থায়। বয়স্কদের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী বিকাশোন্মুখ শিশুদেরকে চলতে হয়। শিশুর শক্তি, সামর্থ্য, আগ্রহ ও অভিলাষ কতখানি, সে দিকে লক্ষ্য রাখে না এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ; তাই শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষণরীতির সংগে বিদ্যার্থীর যেন কোন সংযোগ নেই এই পদ্ধতিতে। ফলে শিক্ষার্থীরা স্পন্দনহীন গ্রাহকের মত শ্রেণীকক্ষে বসে থাকে। শিশুদের আগ্রহ ও অনুরাগের প্রতি এই প্রাচীন পদ্ধতির কোন লক্ষ্য নেই ব'লে এই পদ্ধতি মুখ্যত শাসনমূলক হয়ে দাঁড়ায়। চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তন হয় মাত্র এই পদ্ধতিতে। বর্তমানে সমাজজীবনে যে পরিবর্তন এসেছে বা ভবিষ্যতে সমাজজীবনে যে পরিবর্তন আসতে পারে সে দিকে কোন লক্ষ্য নেই এই শিক্ষা-ব্যবস্থায়। অতীতের প্রতি অস্বাভাবিক মোহে আবদ্ধ ও মূঢ় হয়ে আছে এই ব্যবস্থা। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা অতীত-বিলাসী বলেই সমাজজীবনকে বোধ করি স্থাণুর মতন করে রাখতে চায়। কিন্তু তা তো হবার নয়। মানবসমাজ তার স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে যুগোপযোগী ব্যবস্থার আশ্রয় নেবেই।

ডিউয়ি বর্তমান প্রগতিবাদী নবতম শিক্ষা-পদ্ধতির এক মহা-সমর্থক। নবতম শিক্ষা-পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সবিশেষ

লক্ষ্যণীয়। বর্তমানের শিক্ষা-পদ্ধতিতে বাইরে থেকে কোন বিষয় তরুণমতি শিক্ষার্থীদের ওপর জোর করে চাপাবার অপপ্রয়াস নেই। শিশুর শিক্ষা-ক্রিয়া তার আগ্রহ, অনুরাগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। এখানে পুস্তক জ্ঞানের বাহন হলেও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ও জিজ্ঞাসার সাহায্যে বিদ্যার্থী যে জ্ঞান আহরণ করে, তা এক দিকে যেমন শাসন-ভয়-বিনির্মুক্ত অন্য দিকে তেমন তা নিজের জীবনের উৎসাহ ও ঔৎসুক্য-প্রণোদিত। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি মানবসমাজের যুগ-সঞ্চিত জ্ঞানের অন্ধ আয়ত্তীকরণ নয় অথবা তোতাপাখীর মত মুখস্থ করা নয়, এ হলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধ বাস্তব জ্ঞান, যে জ্ঞান তাকে এনে দেবে জীবনপথের পাথেয়, যে জ্ঞান তাকে পরিবর্তনশীল জগতের সংগে খাপ খাইয়ে চলতে শেখাবে, যে জ্ঞান তাকে বৃহত্তর সমাজ-দেহের সক্রিয় অংশ হিসেবে প্রয়োজনবোধে নিজ সত্তাকে বহুর উদ্দেশ্যে বিলুপ্ত করতে শেখাবে।

ডিউয়ি-প্রবর্তিত প্রগতিপন্থী শিক্ষার মূল সূত্র হচ্ছে এই যে তিনি শিক্ষাকে সমাজজীবনের ক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষার সংগে মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে তা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক শিক্ষাই মানুষের জীবন-প্রয়াসের অংশমাত্র। মানুষের সমাজবিচ্ছিন্ন জীবন কল্পনাতীত। গোষ্ঠীগত ও সমাজগত জীবনের পটভূমিকায় মানুষের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ডিউয়ির শিক্ষানীতি সামাজিক উত্তরাধিকারবোধকে কোন দিন অস্বীকার করেনি। মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই মানব-শিশু তার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা আহরণ করে। পরে পরিণত বয়সে কোন মানব হয়তো যুগান্তকারী বিপ্লবের প্রধান হোতা হয়ে গেলেন। কিন্তু অতীতের সংগে যে যোগাযোগ তা সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। মানবসমাজে যে কোন সংস্কার আসুক না কেন, তা অতীতকে কোন দিন অস্বীকার করতে পারে না। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

এক সূত্রেই গ্রথিত—আজ যা বর্তমান কাল তা অতীত ; আবার অনাগত কালই একদিন বর্তমানে হবে রূপান্তরিত। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—অতীত সংস্কার ও নবতম অগ্রগতি পরস্পর বিরোধী নয় ; বরং তাদের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সংযোগ। শিক্ষাক্ষেত্রে মানব-জীবনের অভিজ্ঞতা যে কতখানি স্থান জুড়ে আছে, সে কথা ডিউয়ি অতি সুন্দরভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। মনীষী এব্রাহাম লিংকন যেমন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এই ব'লে যে "গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন" তেমন ডিউয়ি শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এই বলে যে "শিক্ষা হ'লো অভিজ্ঞতার দ্বারা, অভিজ্ঞতার জন্য, অভিজ্ঞতার শিক্ষণ।" ডিউয়ির মতে শিক্ষা হবে অভিজ্ঞতা-নির্ভর। তাই শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, পরীক্ষা ও আলোচনার মাধ্যমে যা শেখে বা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তা কোন দিন শাসন-পীড়নের দ্বারা সম্ভবপর নয়। অভিজ্ঞতার পরিধি যতই বাড়বে, যতই তার সামঞ্জস্যকরণ হবে বিশ্বের সব কিছুর সংগে, ততই শিক্ষা হবে পরিপক্ক। এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জ্ঞানের পথ হয় সুগম এবং মানুষের জ্ঞানের পরিধিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। আবার শিক্ষার মাধ্যমেই হয় অভিজ্ঞতার যথাযথ মূল্যায়ন। সব অভিজ্ঞতা তো মানবজীবনের পক্ষে সমভাবে মূল্যবান নয়। যে-সব অভিজ্ঞতা ব্যক্তিকে সাহায্য করবে মানবের সমাজ জীবনের সংগে সামঞ্জস্য-বিধানে, যা সমাজজীবনের অভিজ্ঞতা-রসে লালিত-পালিত ও পুষ্ট এবং যে অভিজ্ঞতা সমষ্টিগত জীবনের বহুবিধ সমস্যা সমাধানে সহায়ক তাই আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ ও মূল্যবান। শিক্ষা সেই মূল্যবোধকে আমাদের হৃদয়ে সব সময়ে উদ্রিক্ত করে রাখে।

অভিজ্ঞতা-নির্ভর শিক্ষার অর্থই হলো তা হবে মনস্তত্ত্বসম্মত। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিলাষ, আগ্রহ, অনুরাগ প্রভৃতির উপর নির্ভর করেই শিক্ষাধারা অব্যাহতভাবে চলবে। শিক্ষাজগতের সকল পথিকৃৎই যেমন রুশো, পেষ্টালটসি, ফ্রেবেল, মন্‌টেসরী,

সকলেই এই অভিমত পোষণ করতেন। এই মতবাদের কার্যকরী দিক হ'লো কাজ ও গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি; সমস্যা ও তার সমাধানের মাধ্যমেও ব্যষ্টি-জীবনের শিক্ষা চলবে এগিয়ে। মনস্তত্ত্বকে ভিত্তি করে শিক্ষার অগ্রগতি হলেও তার সামাজিক উদ্দেশ্যের কথা আমাদের অবশ্য সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। রুশোর শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক; মনটেসরীর বেলায়ও তাই। ডিউয়ি শিক্ষাকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হিসাবে আংশিকভাবে স্বীকার করলেও, তিনি এর সামাজিক উদ্দেশ্যের ওপর জোর দিয়েছেন বেশী। তিনি সব সময় বলেছেন—শিক্ষা হচ্ছে একটি সামাজিক ক্রিয়া এবং তা সমাজজীবনের অংগ বিশেষ। সমাজজীবনের পট-ভূমিকায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে কুসুমিত; সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির উৎকর্ষলাভ, ডিউয়ির মতে অর্থহীন। তিনি উৎকট ব্যক্তিবাদ অথবা উগ্র সমাজবাদ, কোনটারই সমর্থক ছিলেন না। এ-দু'য়ের সমন্বয়ই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বলতেন—শিক্ষার্থী তো একটি সামাজিক জীব ছাড়া কিছুই নয়। আর সমাজও বিভিন্ন ব্যষ্টির অপূর্ব সমষ্টি। বিদ্যার্থীর জীবন থেকে যদি সমাজের সংস্কৃতিগত দানকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বিদ্যার্থী একটি বিমূর্তভাবে হয় পর্যবসিত; আর সমাজজীবন থেকে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তা হলো নিষ্প্রাণ বস্তুর সমষ্টি মাত্র। প্রতিটি ব্যক্তি যেন এক একটি কুসুমকোরক; সে আপন প্রয়োজনে ও প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে আপনা হতেই কুসুমিত হয়ে ওঠে—এই মতবাদ ডিউয়ি মান্‌তে চান না। প্রতিটি বিদ্যালয়ের সমাজগত জীবনে শিক্ষক যদি কেবল নিষ্ক্রিয় বা নির্বাক দর্শকমাত্র হয়ে থাকেন, তাহ'লে শিক্ষাকে উদ্দেশ্যমুখী করে তোলা যায় না। বিদ্যালয়-জীবনে এখানেই নিহিত রয়েছে শিক্ষকের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা। বিদ্যার্থীর স্বাভাবিক বিকাশ যাতে সমাজজীবনের সংগে সুসমঞ্জস হয় সে-দিকে লক্ষ্য রাখার এবং শিশুর সামর্থ্য, অভিরুচি ও আগ্রহকে সমাজ-কল্যাণের বৃহত্তর উদ্দেশ্যে পরিচালনার

দায়িত্ব শিক্ষকের উপরই ন্যস্ত। বিদ্যায়তনের কৃত্যালী যদি এইভাবে পরিচালিত হয়, তাহলে বাইরের সমাজ আর বিদ্যায়তনের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না—উভয়েই একাকার হয়ে যায়।

বিদ্যালয় সমাজজীবনের অংগ হিসেবে পরিচালিত হলেও, বর্তমান যুগের সমাজের যে-চিত্র আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা আদৌ সুখকর নয়। ডিউয়ি বুঝেছিলেন শিল্প-বিপ্লবোত্তর যুগের সমাজজীবন অত্যন্ত জটিল ও কৃত্রিম হয়ে গিয়েছে। সেই জটিল পরিবেশে যদি সুকুমারমতি শিক্ষার্থীকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে দিশেহারা হয়ে যাবে। নীচ স্বার্থ নিয়ে হানাহানি এই হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান সমাজের বৈশিষ্ট্য। এহেন সামাজিক পরিবেশে শিশুর শিক্ষা কখনো সার্থক হতে পারে না। বিদ্যালয়ের পরিবেশ যদি সরল, সুস্থ ও সুন্দর না হয়, তাহলে সেখানে শিশুর সম্যক বিকাশ কখনো সম্ভব নয়। আদর্শ গৃহের পরিবেশের মধ্যেই ডিউয়ি সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের আদর্শ। তিনি বলতেন—শিশুর জন্য সব সময় চাই শান্ত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ; শিশু যেন তার গৃহ-পরিবেশ আর বিদ্যায়তনের পরিগমের মধ্যে কোন পার্থক্য না খুঁজে পায়। তার গৃহে যেমন সে স্নেহ ও নিরাপত্তাবোধ অনুভব করে, বিদ্যালয়ে সেই বোধটি আপনা হতেই উদ্বুদ্ধ হলে শিশুর শিক্ষা হয়ে ওঠে সহজ ও সাবলীল। ডিউয়ি আর রবীন্দ্রনাথ এখানে একমত। কিন্তু রুশো বলতেন—শিশুর শিক্ষাক্ষেত্র গৃহ ও সমাজের কৃত্রিম ও বিকারদুষ্ট পরিবেশ থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হওয়াই বিধেয়। ডিউয়ি ছিলেন রুশোর এই মতবাদের ঘোরতম বিরোধী।

প্রাচীনপন্থী বিদ্যায়তনে দেখা যেতো যে শিক্ষক যেন বিদ্যালয়-বৃত্তের কেন্দ্র। তিনি সেখানে সমস্ত জ্ঞানের আকর হিসেবে, সমস্ত শক্তির আধার হিসেবে, সমস্ত নৈতিক শাসন ও আদর্শের মধ্যমণি হিসেবে বিরাজ করতেন। তিনিই ছিলেন সমগ্র বিদ্যালয়ের কর্ম-প্রেরণার উৎস। তিনি ছিলেন একাধারে শাস্তি-বিধায়ক আবার ত্রাসত্রাতা। এহেন পরিবেশে বিদ্যার্থীর স্বাভাবিক শিক্ষা হয় ব্যাহত।

মন্‌টেসরী শিক্ষা-প্রণালীতে শিক্ষিকা নিষ্ক্রিয়া পরিদর্শিকা মাত্র। বিদ্যার্থীদের ক্রিয়াকর্মে তিনি কোনপ্রকার বাধা সৃষ্টি করবেন না। তিনি অন্তরাল হতে তাদেরকে লক্ষ্য করবেন এবং প্রয়োজনবোধে তাদের কাজে সহায়তা করবেন। ডিউয়ি অবশ্য প্রাচীনপন্থী শিক্ষক-দের অথবা মন্‌টেসরী শিক্ষা-পদ্ধতির শিক্ষিকাদের কোনটাকেই পছন্দ করতেন না। ডিউয়ি ভাব্‌তেন—শিক্ষক হবেন বিদ্যায়তনের গণতন্ত্রমূলক সংস্থার একজন সদস্য। বিদ্যালয়-জীবনের সংগে তাঁর অংগাংগী সম্পর্ক। সেখানে তিনি একচ্ছত্র অধিপতি নন। বিদ্যালয়ের সমাজজীবনই হবে তাঁর সমগ্র শক্তি ও প্রভাবের উৎস। বিদ্যালয়ের সমষ্টিগত জীবনে নিয়মের ঘোরতম ব্যতিক্রম হলে যদি কোন বিদ্যার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিবিধান বা শাসনের প্রয়োজন হয়, তাহলে গোষ্ঠী-জীবনের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিদ্যায়তনে শাস্তি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। ছাত্র-সংসদের সহযোগিতায় সে-শাস্তি আরোপিত হবে। এর পশ্চাতে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর কারোরই কোনপ্রকার ব্যক্তিগত বিরাগ থাকবে না। ডিউয়ির বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিষ্ক্রিয় দর্শক নন; তিনি বিদ্যালয়-জীবনের সক্রিয় কর্মী। তাঁর অধিকতর পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে তিনি বিদ্যার্থীদের সহজাত প্রবৃত্তির এবং তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির গতিবিধান করবেন। তাদেরকে তিনি শেখাবেন কেমন করে দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে গোষ্ঠী-জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থ বলি দিতে পারে। কোন শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তি যদি বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে বিচ্ছেদ বহন করে আনে বা কোন বিরোধের সৃষ্টি করে তাহলে শিক্ষক সেখানে বাধা দেবেন, তার ব্যবহারকে সংযত করার চেষ্টা করবেন, তার সহজাত বৃত্তির স্বাভাবিক গতির মোড় ফিরিয়ে দেবেন। এ-দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে শিক্ষকের দায়িত্ব যথেষ্ট বেশী। এর জন্য তাঁর চাই অসীম ধৈর্য, অপরিমেয় সহানুভূতি ও ক্ষমা এবং সর্বোপরি প্রখর দূরদৃষ্টি।

বিদ্যায়তনে কি প্রকার পাঠ্যসূচী অনুসৃত হওয়া উচিত এই বিষয় আলোচনা প্রসংগে ডিউয়ি বর্তমান সমাজের জটিল ও কৃত্রিম জীবনের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলতে চান আমাদের আগেকার জীবন ছিল অপেক্ষাকৃত সরল ও আড়ম্বরবিবর্জিত। আগেকার দিনের শিশু তার গৃহ এবং তার পরিবেশ থেকেই রান্না করা, জামা-কাপড় তৈরী করা ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লাভ করতো এ-সবের প্রস্তুত প্রণালী দেখে। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় তার ক্রমবর্ধমান শিক্ষাপরিধির সংগে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল যা আজকাল দেখা যায় না। এখন শিশু তার আসবাবপত্র, তার জামা-কাপড়, তার ক্ষুধার অন্ন সবই একেবারে তৈরী অবস্থায় পায়। এই অন্ন-বস্ত্র আসবাবপত্র কোথা থেকে আসে, কিভাবে উৎপন্ন হয় তা সবের ব্যবহারিক জ্ঞান তার আদৌ নেই। আধুনিক বিদ্যালয়ের নিছক জ্ঞানমুখী শিক্ষার সংগে প্রাত্যহিক কর্মজীবনের কোন যোগাযোগ নেই। তাই আজকালকার শিশু হারিয়েছে তার অতীত বন্ধুদের কর্মকুশলতা; তাই তার জ্ঞানের ভিত্তি এত শিথিল, তাই সে এত অপটু, এত অকেজো। বর্তমান কালের শিক্ষা পুঁথিভারগ্রস্ত। বহু দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুর চাপে শিশু-চিত্ত হয় বিভ্রান্ত, পাঠ্যবস্তু মুখস্থ করার চাপে সে হাঁপিয়ে ওঠে। তখন তার মনপ্রাণ হাতে-কলমে কিছু করবার জন্য, বাস্তব জীবনের সংগে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য আকুল হয়ে ওঠে। এতাবৎকাল বিদ্যালয়ে যে-সব পাঠ্যবিষয় অনুসৃত হতো তার দোষত্রুটিগুলি দূর করবার জন্যই ডিউয়ি রান্নার কাজ, কাঠের কাজ, লোহার কাজ, ছুতোরের কাজ প্রভৃতি জীবনের প্রধান চাহিদাকে কেন্দ্র করে প্রবর্তন করলেন তাঁর অভিনব শিক্ষা-পদ্ধতি। এতে বাইরের বৃহত্তর সমাজের সংগে, সামাজিক জীবনের সংগে সংস্থাপিত হ'লো শিক্ষার প্রগাঢ় মিতালি। ডিউয়ির মতে মামুলি বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যবিষয় সকল নানা সূক্ষ্ম বিভাগে ভাগ করে শিক্ষা দেওয়া হয়; তাতে জ্ঞান ও সমাজের অখণ্ডত্ব

ব্যাহত হয়। কিন্তু সমাজের মধ্যে খণ্ডের কোন স্থান নেই: খণ্ড সেখানে বিলীন হয়ে যায়। এজন্য বিদ্যায়তনে পাঠ্যবিষয়গুলো পরস্পর-সম্পর্কিত হওয়া উচিত এবং এমনভাবে পড়াতে হবে যাতে জীবনের সংগে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শিশুর জ্ঞান ও সমাজ সম্বন্ধে ধারণা যথাসম্ভব পূর্ণ অখণ্ড বস্তু হয়ে দাঁড়ায় তার অভিজ্ঞতার সাহায্যে। এজন্যই ডিউয়ি ছিলেন অনুবন্ধ প্রণালীর মহাসমর্থক। শিক্ষার বিভাগীকরণের তিনি ছিলেন ঘোরতম বিরোধী। ভাগ করে শিক্ষা দিলে শিক্ষার মধ্যে অনেকখানি ফাঁক থেকে যায়; সে-শিক্ষা তখন বিচ্ছিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহের পর্যায়-ভুক্ত হয়। ডিউয়ি বলেন—শিশু তার বিদ্যালয়ের সমাজজীবনের মধ্যে বিভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা তার সমস্ত জ্ঞান ও কর্মের সংযোগসূত্র আবিষ্কার করে। সে বোঝে সাহিত্য সমাজজীবনের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়; সাহিত্যের মাধ্যমেই চলে সমাজের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য নির্ণয়। এই প্রকার সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিদ্যার্থী যখন দেখতে শেখে, তখনই সাহিত্য তার কাছে অনেকখানি সরল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ইতিহাস তার কাছে কেবল কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনা, তারিখ বা বিবরণের সমষ্টি নয়। ইতিহাস হ'লো মানব সভ্যতা-বিকাশের একটি ধারাবাহিক গতি। সমাজজীবনের প্রাণবন্ত প্রবাহের সংগে সংযুক্ত হয়ে তা তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে ওঠে।

ডিউয়ি-প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালীতে দেখা যায় যে বস্ত্রবয়ন ও শিল্পকার্য থেকে শিশু শুধু তূলোর সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে না; নানা ভৌগোলিক তথ্যের সংগে তার নিবিড় পরিচিতি ঘটে। শিল্প থেকে আবার ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখতে পারবে; রন্ধনের সাহায্যে রসায়ন এবং কাঠ ও লোহার কাজের মধ্য দিয়ে সে জ্যামিতি ও গণিত সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করবে। এই যে হাতের কাজের সংগে তাত্ত্বিক শিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এটি ডিউয়ির শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি প্রধান উপচার। গান্ধীজী পরিকল্পিত বুনিয়াদী

শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও ডিউয়ির শিক্ষাপদ্ধতির অনুবর্তন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মিলনই ডিউয়ির শিক্ষা-প্রণালীর মূল কথা এবং তা গংগা-যমুনার সংগমের মত সুফলপ্রসূ।

অনুষংগ প্রণালীর পক্ষপাতী বলে ডিউয়ি এ-কথা কোনদিন বলেননি যে এ-প্রণালীতে জ্ঞানের যে ফাঁক থেকে যাবে তা স্বাধীনভাবে শিক্ষা দিয়ে পূরণ করা হবে না। বরং জ্ঞানের অবিভাজ্যতা ও অখণ্ডত্ব যাতে শিশুর কাছে প্রকট হয় তার জন্য আলাদাভাবে শিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। তবে যথাসম্ভব অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন তিনি।

এখন ডিউয়ি-প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা কতখানি মনোবিজ্ঞানসম্মত তা বিচার করে দেখতে হবে। ডিউয়ি বয়সানুপাতিক সময়োপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরম আস্থাশীল। তিনি বিদ্যার্থীর শিক্ষাকালকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে শিশুদের খেলা ও পরিবেশ পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষা চলে। এই শিক্ষাকাল তিন থেকে আট বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী। এখানে শিক্ষার্থীদের কোন পাঠ্য পুস্তক অনুসরণের বালাই নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে এবং বিদ্যালয়ে খেলার মাধ্যমেই শিক্ষালাভ করবে। এই সময়ে শিশুজীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় করবে গৃহ ও গৃহের পরিবেশ থেকে, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া, বাগান করা, দোকানে যাওয়া, ঘর সাজানো ইত্যাদি নানা কাজের মাধ্যমেই শিশু তার নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষালাভ করবে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজভাবে পারিপার্শ্বিক হতে ক্ষেত-খামার, গোলা-বাড়ী, কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী এদের কাজ, বাড়ীঘর ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিচিত হবে। এই প্রাথমিক স্তরের শেষের দিকে কিছু কিছু লেখাপড়া ও গৃহের চারিদিককার ভৌগোলিক সংস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ অতি সহজেই করা চলবে।

ডিউয়ির শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বিতীয় স্তর হ'লো আট থেকে বার বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই স্তরকে ডিউয়ি স্বতঃমনোযোগের কাল

বলে আখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় স্তরে শিশুর অংগ-প্রত্যংগ ও মানসিক পুষ্টির সংগে সংগে তার মনে নানাবিষয়ে কৌতূহল জেগে ওঠে এবং সে আপনা হতেই আগ্রহাতিশয্যে সব কিছুতেই মন দিতে ভালবাসে। তাই এই সময়ে তাদের নানাবিধ জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করতে শেখাতে হবে, তা সাহিত্যিকই হোক, গাণিতিকই হোক বা কায়িক হোক। আর কাজের ভিতর দিয়েই শিশুর মস্তিষ্কে এই জ্ঞান প্রবেশ করবে। সেজন্য প্রত্যেকটি প্রণালীর অনুসরণ করতে হবে—শিশুরা একটা কিছু করবে বলে স্থির করে নেবে এবং সেই কার্য সমাধানের জন্য তারা যতটুকু অংক, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও হাতের কাজ আয়ত্ত করার প্রয়োজন অনুভব করবে, সবই আয়ত্ত করবে। এটাই হ'লো সমস্যা-সমাধান-পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সংগে অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিকের নাম বিজড়িত। কিন্তু এই পদ্ধতির সত্যিকারের প্রবর্তক হ'লেন ডিউয়ি।

ডিউয়ি বলেন—শিক্ষার্থী জীবনের তৃতীয় স্তরে বিদ্যার্থীর বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে তার চিন্তাশক্তির পূর্ণতর স্ফুরণ হবে। এই সময় বিদ্যার্থীকে সব কিছুই বিস্তৃততরভাবে শেখানো সম্ভব এবং এই সময় পাঠ্যতালিকায় অনেকগুলো বিষয়বস্তুর সমাবেশ হ'লে কোন ক্ষতি নেই। এই স্তরে সমস্যা সমাধান-পদ্ধতি ও হাতের কাজ তো চলবেই ; তা ছাড়া আরও উন্নততর উদ্ভাবনী প্রণালীর আশ্রয় নেওয়া হবে—যেমন ড্যাল্টন পদ্ধতি, হিউরিষ্টিক প্রণালী, উইনেট্‌কা প্ল্যান ইত্যাদি। ক্রমবর্ধমান মনন শক্তির ফলে এসব প্রণালীতে কাজ করা সম্ভব হ'বে এবং কিশোর-কিশোরীর ধীশক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়াও স্বাভাবিক।

এই প্রসংগে একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখার প্রয়োজন। ডিউয়ি একটি ব্যাপার ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়ে ছিলেন যে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির স্ফুরণের উপরেই শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। সুতরাং তাঁর শিক্ষাপ্রণালীর একটি বৈশিষ্ট্য হ'লো —শিক্ষার প্রতিটি স্তরে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিশুর

সামনে একটি সমস্যারূপে তুলে ধরতে হবে; সমস্যাটি সমাধান করতে তাকে যে সহজ চিন্তা করতে হবে তা থেকেই হবে তার সত্যিকারের ধীশক্তির বিকাশ। একটি দৃষ্টান্ত নিলেই বিষয়টি আমাদের নিকট সহজেই বোধগম্য হয়ে যাবে। সৌরকরোজ্জ্বল প্রভাতে শিশু দেখলো তার সামনে মাঠের সবুজ সবুজ ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু ঝল্‌মল্‌ করছে। শিশুর মনে স্বভাবতই কৌতূহল উদ্রিক্ত হলো। তার মনে প্রশ্ন জাগলো—এ শিশির এলো কোথা থেকে? এ সমস্যা তাকেই সমাধান করতে হবে। শিক্ষক বা অভিভাবক যদি তাকে বলে দেন এর উৎপত্তির কারণ তাহলে তার জ্ঞানের উৎস—চিন্তাশক্তির মূল যাবে শুকিয়ে—ক্ষণিকের উচ্ছিষ্ট জ্ঞান তার মন থেকে পড়ে যাবে ঠিকরে। তাই চিন্তামূলক পরীক্ষা-প্রণালীর আশ্রয় নিতে হবে শিশুকে। শিশু চিন্তা করলো—এই শিশির বৃষ্টি থেকে এসেছে, না ঘাসের উপর কেউ জল ফেলেছে। সে সন্ধান করে দেখলো গত রাতে বৃষ্টি হয়নি, রাস্তাঘাটও ভেজেনি, ঘাসের উপর কেউ জলও ফেলেনি। আর ঘাসের উপর কেউ যদি জল ফেলেও তাহলে ঘাসের এরূপ ঝল্‌মলানি থাকে না। এই সমস্যা তার কাছে আরও বিস্ময়াবহ হয়ে উঠলো। অনেক চিন্তা, প্রশ্ন ও অনুসন্ধানের ফলে সে জানতে পারলো, বায়ুমধ্যস্থ জলকণা শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে জলবিন্দু বা শিশিরে পরিণত হয়েছে, সেই শিশির ঘাসের উপর জমে সূর্যের কিরণে প্রভাতে ঝল্‌মল্‌ করছে। এর প্রমাণ হিসেবে তার মনে পড়লো—ভেতরে বরফ দেওয়া গ্লাসের বাইরের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর সৃষ্টি—আবার বরফ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো এটা ঠিক। এবার তার পূর্ণ সমাধান হলো ঘাসের উপর শিশির বিন্দুর ঝল্‌মলানির সমস্যার। সমস্যা সমাধানের সূত্র ধরে হার্বার্টের মত ডিউয়িও শিক্ষাদান-প্রণালীকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। প্রথম স্তর হ'লো সমস্যার উত্থাপন বা উদ্ভব; দ্বিতীয়টি হ'লো সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তন; তৃতীয় স্তরে হলো সমস্যা সমাধানের প্রয়াস ও সাফল্য; চতুর্থ

স্তরে সমস্যা সমাধানের পর অনুরূপ অবস্থার জন্য সূত্রগঠন এবং সর্বশেষ পঞ্চম স্তর হলো সমস্যা সমাধান-লব্ধ সূত্রের পরীক্ষা।

এই সমস্যা সমাধান-প্রণালীর হোতা হিসাবে জন ডিউয়ি সকল শিক্ষাবিদের নমস্য। ডিউয়ি জানতেন—প্রতিটি শিশুকে সমাজের সক্রিয় অংশীদার রূপে ভবিষ্যতে তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে জীবন-সংগ্রামে। সে-সব সমস্যার সুসংগত সমাধান করে সুস্থ ও সবল সমাজ গঠন করে তাকে জীবন-পথে অগ্রসর হতে হবে। কাজেই সে-সব সমস্যা সমাধানের শিক্ষা শিশুকে বিদ্যালয়েই পেতে হবে। তাই শিক্ষার্থীকে নানা দিক থেকে সমস্যা সমাধানের সুযোগ দিতে হবে। ডিউয়ির শিক্ষাপ্রণালীর নব দর্শনের মাধ্যমেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিজ্ঞানীরা অভিনব আলোকের সন্ধান পেলেন। তাই শিশুর ক্রমবর্ধমান জীবনের বিভিন্ন সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখেই জন্ম নিল সমস্যা সমাধান-পদ্ধতি, ড্যাল্টন প্রণালী, হিউরিষ্টিক প্রণালী প্রভৃতি যাবতীয় সমস্যা এবং কর্মমূলক পদ্ধতি। প্রতিটি শিশুর মাঝেই ঘুমিয়ে আছে এক একটি মানুষ। তাই তাকে সমাজের সুস্থ মানুষ হিসাবেই বাড়তে দিতে হবে। জীবনের বাস্তব কাজকর্মের মধ্য দিয়েই, স্বাধীন চিন্তার ভেতর দিয়েই সে স্বাবলম্বন, স্বাধীনতা ও আত্মপ্রত্যয়ের দীক্ষালাভ করবে। কোন কর্মের মাধ্যমে মনন শক্তির বিকাশসাধন করে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থার প্রথম ইংগিত করলেন জন ডিউয়িই।

শিকাগোর গবেষণামূলক বিদ্যালয়ে ডিউয়ি যখন শিক্ষা-গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন, প্রায় সেই সময়েই আমাদের দেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ পদ্ধতিতে তাঁর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে এই প্রকার কর্মমূলক শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন—সেখানে কর্মই ছিল শিক্ষার একটি প্রধান অংশ। শিল্পগত সাধনার ভেতর দিয়েই ছেলেরা ভবিষ্যতে চলবার সাহস ও শক্তি অর্জন করবে—এ তাঁরও কাম্য ও লক্ষ্য ছিল। আজ শ্রীনিকেতনের কুটীর শিল্পের শিক্ষা-কেন্দ্র কবিগুরুর সে-সাধনার সিদ্ধিরূপে দেখা দিয়েছে। ডিউয়ির

নিকট রবীন্দ্রনাথ এদিক দিয়ে ঋণী ছিলেন কিনা তা বলা সুকঠিন। এই দুই শিক্ষাবিদের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে অপূর্ব সাদৃশ্য সত্যই বিস্ময়াবহ। প্রায় একই সময়ে ডিউয়ি ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তন করেছিলেন। অবশ্য শিক্ষার ইতিহাসে দেখা গেছে বহুবার যে দু'জন বা ততোধিক শিক্ষাবিদ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন স্বাধীন চিন্তার ফলে অথবা স্বাধীনভাবে কাজ করে।

পরবর্তীকালে গান্ধীজী-প্রবর্তিত ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় কর্মভিত্তিক এবং অনুষংগ প্রণালীমূলক শিক্ষার অনুসরণ পরিলক্ষিত হয়। ডিউয়ি-প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির সংগে ওয়ার্ধা শিক্ষাপ্রণালীর যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের সমস্যা পূরণ করতে করতেই শিশুর অভিজ্ঞতার পরিসর বাড়বে এবং সেই সংগে তার বাস্তব শিক্ষালাভ হবে—এই ছিল ডিউয়ি, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর অভিমত। একদিক দিয়ে গান্ধীজী ডিউয়িকে ছাড়িয়ে গেছেন। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই হস্ত-শিল্পের প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন গান্ধীজী। শুধু তাই নয়—শিক্ষার্থীদের হাতের কাজ থেকে বিদ্যালয়ের আংশিক ব্যয়ভার মেটানো যাবে এ বিশ্বাস গান্ধীজীর নঈ-তালিমের ভিত্তিস্বরূপ বললেই চলে। নঈ-তালিমের অর্থকরী দিকটা অবশ্য আজও শিক্ষাবিদরা মান্‌তে রাজি নন। কার্যত এ ব্যাপারটি পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় কিনা তাও বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের যে সমন্বয় ডিউয়ি সাধন করেছেন, তা সত্যই অভূতপূর্ব। তাঁর পরবর্তী শিক্ষাবিজ্ঞানীরা এতে তাঁদের পথ খুঁজে পেয়েছেন সে-বিষয়েও সন্দেহ নেই। শিক্ষাবিজ্ঞানে ডিউয়ির দান আজ অবিস্মরণীয়। তবে গতানুগতিকের সীমার বাইরে যা-কিছু পড়ে, তারই সমালোচনা হয় তীব্র। কাজেই কর্মের ভিতর দিয়ে, স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে, ডিউয়ির বাঁধাধরা নিয়মের বহির্ভূত শিক্ষার সমালোচনাও হয়েছে যথেষ্ট। ডিউয়ি-

প্রবর্তিত শিক্ষার নবতম মন্ত্র শিক্ষাকে নিয়ে যাবে বিপথে, এই পদ্ধতি আয়াসলব্ধ জ্ঞানের প্রতি জাগাবে বিতৃষ্ণা, কেবল আরাম ও আমোদই হবে এই শিক্ষারীতির কাম্য, উগ্র স্বাধীনতার ফলে আসবে নিত্য পরিবর্তনশীল জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের আদর্শ —শাশ্বত আদর্শকে তা করবে ক্ষুণ্ণ, এতে নৈতিক আদর্শের বিচ্যুতি ঘটবে এবং সমাজজীবনে আসবে বিশৃংখলা ইত্যাদি অভিযোগ আনা হয়েছে ডিউয়ি-প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে।

ডিউয়ি ছিলেন সমাজের অগ্রগমনে এবং ব্যক্তির উন্নয়নে বিশ্বাসী। কিন্তু তার লক্ষ্য কী তার সম্বন্ধে তিনি নীরব। তাই তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি লক্ষ্যহীন এই অভিযোগ করা হয়েছে। এই প্রসংগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্যহীন" কবিতার কথা মনে পড়ে—সেখানে তিনি বলেছেন একদিন এক রথীর সংগে দেখা হ'লো এক গৃহীর। রথী অতি দ্রুতবেগে তাঁর রথ চালিয়ে যাচ্ছেন। গৃহী উচ্চৈঃস্বরে রথীকে জিজ্ঞাসা করলেন। "থামো থামো, এত জোরে কোথা যাচ্ছ?" রথী উত্তর দিল, "যেতে হবে আগে।" গৃহী জানতে চাইলো রথী যাবে কোনখানে। রথী তখন বল্‌লো— কোনখানে নয়, শুধু আগে। গৃহী তখন রথীকে প্রশ্ন করলো— কোন্ তীর্থে, কোন্ মন্দিরে? রথী আবার উত্তর দিল—'শুধু আগে'। ডিউয়ি ও রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখছি একেবারে একমত। তাঁরা উভয়েই উপনিষদের 'চরৈবেতি' মন্ত্রের উপাসক। ডিউয়ি স্থির ধ্রুব সনাতন সত্যে বিশ্বাসী নন। তাঁর সত্য চলমান ও পরিবর্তনশীল। তাঁর সত্য পরীক্ষার কষ্টিপাথরে হয় প্রমাণিত। ডিউয়ি একান্তভাবে ফলবাদী। তাই তাঁর মতবাদ তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। ফলবাদী ডিউয়ি বলতে চান—সনাতন সত্য বলে কিছু নেই। যা আমাদের কার্যের পক্ষে সহায়ক, তাই সত্য। সত্য হ'লো মানুষের চিন্তাপ্রসূত এবং তার কর্ম থেকেই সৃষ্ট। ভাব-বাদীরা এর বিপরীত মতবাদ পোষণ করেন। তাঁরা বলেন—সত্য স্থির ধ্রুব ও অপরিবর্তনীয়—আমরা যদি সেই সত্যকে যথাযথ

অনুসরণ করি, তাহ'লে আমাদের চিন্তা অথবা কর্ম ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। আমাদের কোন চিন্তা যখন কার্যে রূপায়িত হয় তখন তা সত্যে পরিণত হলো—এই মতবাদ ভ্রান্ত। বরং আমাদের চিন্তা যদি সত্যাশ্রয়ী হয়, তাহ'লে আমাদের কর্মও সফল হবে। মানুষের চিন্তা তো সতত পরিবর্তনশীল; কিন্তু সত্যের তো কোন পরিবর্তন নেই।

ফলবাদী ডিউয়ির বিজ্ঞানধর্মী মন সমস্ত জগৎ-ব্যাপারের পশ্চাতে যে একটি ঐশী চিৎশক্তি প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে এই মতবাদ মানতে চায় না। তিনি বলতে চান, জগতে যা কিছু রূপান্তরিত হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে মানুষের চিন্তা, তার কর্ম ও তার নিরলস উদ্যম। ডিউয়ির প্রতিপক্ষ ভাববাদী হর্ণ এই অভিমতের সমালোচনা করে বলেন—সমগ্র জগৎ একটি পরিপূর্ণ উন্নততর আদর্শের দিকে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে। এর পশ্চাতে রয়েছে পরম করুণাময় ও শিবময় পরমেশ্বরের অলক্ষ্য অভিলাষ। এই বাহ্য জগত তাঁর অন্তর্নিহিত অভিলাষের অভিব্যক্তি মাত্র।

অনেকে এই আপত্তি তোলেন যে ডিউয়ি-প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মের কোন স্থান নেই। ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীরা তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে থাকেন। তাঁরা বলেন—মানুষের জীবনের সার্থকতা পার্থিব এই জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর পরম সার্থকতা হ'লো অপার্থিব পরমার্থলাভে। ডিউয়ি ধর্মকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চান। তাঁর শিক্ষানীতিতে বিজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান হিসেবে সর্বোচ্চ আসন পেয়েছে। সাহিত্য, চারু শিল্পকলা, যা আমাদের এই জাগতিক জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে, কোনটাই ডিউয়ির শিক্ষানীতিতে তেমন সমাদরলাভ করেনি। ফলে তৎপ্রবর্তিত শিক্ষাবিধি যেন পেশাদারীতে পর্যবসিত হয়েছে। ডিউয়ির শিক্ষাদর্শ জীবনের অগ্রগতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। কিন্তু অনেক সমালোচক এই অগ্রগমনকে উদ্দেশ্যহীন বলে উপহাস করেছেন। তাঁর শিক্ষানীতি একটু মনোযোগসহকারে

অনুধাবন করলেই বোঝা যায় যে তাঁর শিক্ষাগত আদর্শ সত্যই লক্ষ্যহীন ও অস্পষ্ট।

ডিউয়ির বিরুদ্ধে সমালোচনা কম হয়নি। কিন্তু তবুও এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাজগতের ইতিহাসে ডিউয়ির অবদান অসাধারণ ও অলোকসামান্য। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্ব একজন অনন্যসাধারণ শিক্ষাবিদকে হারিয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নবতম ভাবধারা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে, বিশেষ করে বিভিন্ন যুগে শিক্ষাজগতে পথিকৃৎদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদর্শ আলোচনা প্রসংগে, শিক্ষাক্ষেত্রে নবতম ভাবধারা বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও এই অধ্যায়ে সেই সব ভাবধারার পৃথক্ আলোচনা করার পশ্চাতে একটা যুক্তি আছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই সব ভাবধারা আছে ছড়িয়ে। পাঠকবর্গের সহজ অবগতির জন্য সেই সব নবতম ভাবধারাকে এই অধ্যায়ে একত্র সন্নিবিষ্ট করার প্রয়াস করা হয়েছে।

শিক্ষাজগতে বিংশ শতাব্দীকে অনেকে "শিশু-শতাব্দী" বলে অভিহিত করে থাকেন। এর পশ্চাতে অবশ্য যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। "সব শিশুদের অন্তরে" "শিশুর পিতা" "ঘুমিয়ে আছে।" বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিক্ষাগুরু আমাদেরকে একটি মহাসত্যের কথা শুনিয়ে গেলেন যে "শিশুর ক্ষুদ্র চরণে জাতি অগ্রসর হয়।" কিন্তু শিশুদের সেই ছোট ছোট পাগুলি এতদিন "ছোট ছোট নিষেধের ডোরে" ছিল বদ্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শিশুদের পায়ের সেই নিগড় গেল ছিন্ন হয়ে। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম হোতা জাঁ জাক্‌স্ রুশো সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে গেলেন শিশুর জন্মগত অধিকারের দাবী—বিদ্রোহের তূর্য-নিনাদে দশদিশি হয়ে উঠ্‌লো

মুখরিত। মধ্যযুগের বিদ্যালয়-কারায় এতদিন শিশুরা ছিল অবরুদ্ধ। তিনিই প্রথমে শোনালেন মুক্তির গান—তিনিই তাদের জন্য সহজ স্বাভাবিক সুশিক্ষার দাবী সর্বসমক্ষে তুলে ধরলেন। রুশোর পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ নানাভাবে শিশু-শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাজগতে যুগান্তর আনতে লাগলেন। সুইট্সারল্যাণ্ডের শিশু-দরদী শিক্ষক পেস্টালট্সি রুশো-প্রবর্তিত সহজ স্বাভাবিক পরীক্ষায় ব্রতী হলেন। শিশুদের নিত্য সাহচর্যে তিনি শিশুদের কাছেই শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষার মূলমন্ত্র শিখতে চাইলেন। এর পরবর্তী কালে হার্বার্ট ইউরোপের শিশুশিক্ষা প্রণালীকে মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করতে চাইলেন। তারপর এলেন ফ্রেবেল। তিনি হলেন যেন শিশু-উদ্যানের মালী। শিশুরা হ'লো যেন সেই উদ্যানের ছোট ছোট চারা গাছ। শিশুচারাগুলিকে ফুলে-ফলে পূর্ণ পরিণতি দেবার জন্য মালী ফ্রেবেল তাঁর শিশু-কানন রচনা কর্লেন। সেই কাননের কুসুম-কোরকগুলি যথাসময়ে কুসুমিত হয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করতো। এরপর এলেন মাদাম মন্টেসরী। তিনি তাঁর বালমন্দিরে শিশুগণকে সক্রিয় করে তুললেন। সেই বালমন্দিরে শিশুরা যাতে স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পায়, তার জন্য তিনি উদ্ভাবন করলেন স্বয়ংক্রিয় শিক্ষা-পদ্ধতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ হতে সুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত এই সব শিক্ষাগুরুদের কর্ম-পরিধি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু মনোজগতে তাঁরা যে আলোড়ন তুলেছিলেন তার ফল ফল্তে বেশী দেরী হলো না। উপযুক্ত শিক্ষাগুরুদের মুষ্টিমেয় মন্ত্রশিষ্য নবতম শিশুশিক্ষার দিকে তাঁদের মনোযোগ দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে ইউরোপের শিক্ষকসাধারণের মধ্যে শিক্ষার নবতম ভাব-ধারা ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রাচীনপন্থী শিক্ষার অচলায়তনগুলি যেন একটু একটু টলে গেল। পাশ্চাত্যের বহু স্থানে প্রাণহীন প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির স্থানে সজীব সার্থক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠতে লাগলো।

কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এই নবতম ভাবধারার বৈশিষ্ট্য কি? বর্তমান শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যায়তনগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তাদের মধ্যে শিক্ষার নবতম ভাবধারার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি প্রথমত প্রগতি-পন্থী। দ্বিতীয়ত তা বিজ্ঞানসম্মত এবং তৃতীয়ত তা শিশু-মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক। এখানে বর্তমান শিক্ষাধারার এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

এখন প্রগতিপন্থী শিক্ষা-ব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝবো কি? প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল মুখ্যত বিষয়কেন্দ্রিক। শিশুর মানসিক বিকাশ, তার স্বাভাবিক অনুরাগ, অভিলাষ ইত্যাদির দিকে তৎ-কালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন দৃষ্টি ছিল না বললেই চলে। বিষয়-বস্তু যত কঠিন ও দুর্বোধ্য হতো, শিশুর শিক্ষা ততই সার্থক হবে, এই ছিল তদানীন্তন শিক্ষকদের বিশ্বাস। সেকালে শ্বাসরোধকারী নীরস শিক্ষার জগদ্দল পাথরের চাপে সুকুমারমতি শিশুরা কেবল নিষ্পেষিত হতো। তারা কেবল তোতাপাখীর মত বিদ্যাই আয়ত্ত করতো। এতে তাদের বোধশক্তি, বিচারশক্তি অথবা কল্পনাশক্তির কোন প্রকার বিকাশ হতো না। এতে না হতো তাদের চিত্তের প্রসার, না বা হতো তাদের চরিত্রের বলিষ্ঠতা সাধন। সেকালে শিক্ষা ছিল নিরানন্দ, নব নব ভাবধারা-বিবর্জিত। তাতে বিদ্যার্থীর তরফে স্বাধীন প্রয়াসের কোন প্রকার সুযোগ ছিল না। এতে শিশুদের প্রাণবত্তার কোন প্রকার স্বাভাবিক ও সাবলীল বিকাশসাধন হতো না। কিন্তু বিভিন্ন যুগে শিক্ষাজগতে শিক্ষার পথিকৃৎরা যে পথের নির্দেশ দিয়ে গেলেন তাতে বর্তমান যুগে শিক্ষা হয়েছে মুখ্যত শিশুকেন্দ্রিক। শিশুকে শিক্ষা দেবার আগে তার সামর্থ্য আর অনুরাগের প্রতি আজকাল সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া হয়। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় "ব্যক্তি" "দলে ডুবে যায় না।" ব্যক্তির স্বকীয় সত্তা বজায় রেখে তাকে বৃহত্তর সমাজদেহের সক্রিয় অংশ হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াস আছে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে।

যে-কোন মানব-শিশু রাষ্ট্রের নিকট শিক্ষালাভে অধিকারী। সুস্থ ও সবল শিশুদের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল। বিকলেন্দ্রিয়, বিকলমনা, অন্ধ, খঞ্জ, বাকশক্তিহীন শিশু, যারা এতদিন সমাজের করুণার ওপর নির্ভর করে থাকতো, তাদেরও বিশেষ বিশেষ ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্র নিজ স্কন্ধে বহন করছে। উত্তর-জীবনে এরা আর রাষ্ট্রের কাছে ভারস্বরূপ হয় না। এরা হয়ে ওঠে আত্মনির্ভর নাগরিক। আধুনিক শিক্ষাধারার পাঠ্যক্রম অভিনব-রূপে বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন শিশুর ভিন্নতর অনুরাগ ও সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই রচিত হয় তাদের পাঠ্যতালিকা। বর্তমানে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন নিষ্ক্রিয় পাঠদান এবং পাঠগ্রহণের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। বহুবিধ প্রাত্যহিক কৃত্যালীর মাধ্যমে শিশুরা আপন তাগিদে শেখে অনেক কিছু। শিক্ষক সেখানে শাসক নন, তিনি সেখানে পথপ্রদর্শক; শিক্ষার্থীর সহায়ক ও সুহৃদ্। এর ফলে বিদ্যালয়ে অযথা শাসন-পীড়নের স্থানে দেখা দিয়েছে এক সহজ আনন্দময় পরিবেশ। সেখানে ভাবী নাগরিকরা স্বাধীনভাবে আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠ্ছে। শিশুই এখন শিক্ষাজগতের মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দরদী শিক্ষকের নিত্য সাহচর্যে শিশু দিন দিন স্বাধীন স্বাবলম্বী নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। সে আজ পরমুখাপেক্ষী নয়। সে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ আত্মনির্ভর এবং বিদ্যালয়-পরিগমে তার ক্রিয়াকর্ম আগের চেয়ে অনেক বেশী সাবলীল, স্বাভাবিক, সহজ ও স্বয়ংক্রিয়।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতি বলিতেই বা কি বুঝায়? মনস্তত্ত্বসম্মত শিক্ষাদানের পরও শিক্ষার্থীদের অর্জিত বিদ্যার বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়নই হলো বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতি। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বহু শিক্ষাবিদের দীর্ঘস্থায়ী পরীক্ষামূলক গবেষণার ফলে বহুবিধ মূল্যবান তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে গুরুগৃহে অথবা বিদ্যানিকেতনে অর্জিত জ্ঞান কতখানি সফল বা বিফল হয়েছে তা নির্ধারণ বা পরিমাপের একমাত্র উপায় হলো পরীক্ষা। এতাবৎ

কাল শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা মুখ্যত রচনাবহুল ও ভাষা-বিধৃত। প্রাচীন পরীক্ষা-পদ্ধতি ছিল ত্রুটি-বহুল। রচনাত্মক পরীক্ষা বিদ্যার্থীর অর্জিত জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পরিমাপ নয়। ইহাতে প্রশ্নের ব্যাপকতা ও অনির্দিষ্টতার জন্য শিক্ষার্থীর চিন্তারও কোনরূপ সুনির্দিষ্ট যতি নেই। এখানে সময়ই একমাত্র নিয়ামক। এই পরীক্ষা-পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরীক্ষকের পরীক্ষারীতি নির্ভরযোগ্য নয়। এই সব কারণে পাশ্চাত্যের বহু শিক্ষাবিদ পরীক্ষামূলক গবেষণার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে, বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। তাঁরা এক অভিনব পরীক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। একে বলা হয় নবতম পরীক্ষা-পদ্ধতি। এই পরীক্ষায় শুধু শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানের যে পরিমাপ হয় তা নয়; এর সংগে অনর্জিত বুদ্ধিরও পরিমাপ হয়। এই নবতম পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত নির্ভুল, সুদৃঢ় ও সুনির্ধারিত বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক পরিমাপ। এই পরীক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু অনুসন্ধানী প্রশ্ন-সমন্বিত। এই পরীক্ষায় মাননির্ণয়ও বস্তুতান্ত্রিক। এই পরীক্ষায় পরীক্ষকের খামখেয়ালীর অবকাশ নেই। এই পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তার দায়িত্ব অধিক এবং ইহা তাঁর পক্ষে অধিকতর শ্রমসাপেক্ষ। ইহাতে শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানের মাননির্ণয়ের সুবিধা অধিক পরিমাণে নির্ভরযোগ্য। এই পরীক্ষার মাধ্যমে বহুসংখ্যক ছাত্রকে এক সংগে পরীক্ষার পর তাদের প্রশ্নপত্র দেখার সুবিধা অনেক। ইহাতে অনুমান, অনিশ্চয়তা নেই বললেই চলে এবং ইহাতে পরীক্ষকের অনুগ্রহ-নিগ্রহ, খামখেয়ালীর কোন বালাই নেই। এই পরীক্ষায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও পরখের দ্বারা পরীক্ষক যথাসময়ে একটি আদর্শ 'কাঠামো'তে উপনীত হতে পারেন। এর পর এই কাঠামোর মাপকাঠিতে একই বয়সের অথবা একই শ্রেণীর বহু ছাত্রকে পরীক্ষা করে, বিভিন্ন বয়সের বা বিভিন্ন শ্রেণীর জন্যে এক একটি সংখ্যাগড় নির্ণীত হয়। এইভাবে প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শীকৃত প্রশ্নের কাঠামোতে

উপনীত হওয়া যায়। তখন তা হয়ে যায় সাধারণের সম্পত্তি। এর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের দ্বারা বিদ্যার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ অভ্রান্তভাবে করা চলে। আজকাল যেমন শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমন অন্য দিকে আবার তার সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি, তার ব্যক্তিত্ব, তার চরিত্র ইত্যাদি সব পরিমাপের অভিনব মনস্তত্ত্বসমন্বিত উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এই নবোদ্ভাবিত পরীক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা আজকাল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানসম্মত পর্যায়ক্রম স্থাপনে সমর্থ হয়েছি। এই বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষণ-প্রণালী বর্তমান শতাব্দীর এক অভাবনীয় অবদান।

বর্তমান যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে ইহা আধুনিক যুগের শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে যথাযোগ্য দৃষ্টি রাখে। বিদ্যার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই আধুনিক যুগের বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন রীতি এবং এমনকি বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারও নির্ণীত হয়ে থাকে। বিকচোন্মুখ শিশুদেরকে যথাযথভাবে মানুষ করে তোলার ভার সমাজ শিক্ষকদের উপরই দিয়েছে। তাই শিক্ষকই বলি, উপদেষ্টা বলি আর গুরুই বলি, তাঁদের কর্মজীবনে যেমন আছে মহান গৌরব, তেমন আছে তাঁদের এক গুরুভার দায়িত্ব। শিক্ষাদাতা হবেন যিনি তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর সংগে হতে হবে সংবেদনশীল মনোবিজ্ঞানী। শিশু-জীবনের দাবী-দাওয়া, তাদের সুকুমার মনের অলিগলির সন্ধান না জানা থাকলে, সর্বোপরি তাদের ক্রিয়াকর্মের প্রতি দরদী না হলে শিক্ষককে প্রতিপদে বাধা পেতে হবে। সদাব্যস্ত কর্মচঞ্চল শিশুদের মনে কি তরংগ ওঠে এবং কোথায়ই বা তা যায় মিলিয়ে এ-সব জানা না থাকলে শিক্ষা-তরণী মাঝ দরিয়ায় বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। শিক্ষককে সব সময় শিশুর মানসিক গতিবিধির দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুকে ভেবে নিতে হবে পরিণত মানবের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে। পরিণত মানবের

সম্ভাবনা আছে তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রসুপ্তির অতল তলে। শিক্ষক তাঁর মনোবিজ্ঞানের যাদুদণ্ডের স্পর্শে তার সেই নিদ্রা ভাঙিয়ে জাগিয়ে দেবেন তাকে বিশ্বের জ্ঞানালোকের ভাণ্ডারে। তাই ব'লে বিদ্যায়তনকে মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগার ভাবলে চলবে না। মনোবিজ্ঞানের ধারণা অথবা জ্ঞান শিক্ষকের বৃত্তিগত জীবনে হয় সহায়ক। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য, তার সহজাত সম্পদ, তার বিকাশের বিধি, শিশুমনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা, শিশুর উপর পরিগমের প্রভাব, শিশুর জীবনে তার সতীর্থদের প্রভাব, তার গৃহের পরিবেশ এবং সে যে সমাজ থেকে আসে সেখানকার পরিবেশ, ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক যুগের শিক্ষকগণকে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। তাই দেখা যায় মনোবিজ্ঞানের আলোকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জীবনই হয়ে ওঠে আলোকিত। শিশুর বাইরের আচরণ, তার অন্তর্লোকের অভিব্যক্তি মাত্র। শিশুর সেই অন্তর্লোকের সংবাদ রাখতে হয় শিক্ষককে। তাই তাঁকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। মনোবিজ্ঞানের সংগে পরিচয় থাকলে শিক্ষক প্রথমে শিশুকে জানতে পারেন। তখন তিনি তার মানসিক ক্রমবিকাশের স্তর, তার মনোবিকাশের অনুকূল পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হন। এ-সব পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়ার ফলে পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বালশক্তির অপচয় হতো, তার সম্ভাবনা আজকাল অনেক কমে গেছে। শিশুর মানসিক প্রবণতা, অনুরাগ ইত্যাদি নির্ণয়ের পর তার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে আজকাল। প্রতিটি শিশু যাতে উত্তরকালে বৃহত্তর সমাজজীবনের একটি সক্রিয় অংগ হিসেবে পরিগণিত হয় তার দিকে শিক্ষকদের জাগর দৃষ্টি রয়েছে। এ তো গেল সাধারণ ছেলেদের কথা। কিন্তু যে-সব শিশু একটু বেয়াড়া, যারা বিদ্যালয়ের সমষ্টি-জীবনের সংগে ঠিকমত খাপ খাইয়ে উঠ্‌তে পারে না, যারা বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাদের ব্যবহারের মূলীভূত কারণ অনুসন্ধান করে, তাদেরও যথাযোগ্য

শিক্ষা-ব্যবস্থা আজকাল অবলম্বিত হচ্ছে। প্রগতিশীল দেশগুলি 'চাইল্ড গাইড্যান্স ক্লিনিকে'র মাধ্যমে এই সব করে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষাকে আজ সবায়ের দুয়ারে পেঁাছে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

তাই বিংশ শতাব্দীকে যদি শিশু-শতাব্দী বলা হয়, তাহলে বোধ করি সত্যের কোন অপলাপ করা হয় না। শিশুকেন্দ্রিকতাই হলো এ যুগের চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি মানব-শিশুর মনে যে সম্ভাবনা আছে অবরুদ্ধ হয়ে, আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা তার দুয়ার খুলে দিয়ে, তাকে বিশ্বের জ্ঞান-রাজ্যের অংশভাগী করে দিচ্ছে। শিশুদের জয় ধ্বনিতে আজ দিগ্‌বিদিক মুখরিত। অনাগত দিনের শিশুদেরও জয় হোক!

নির্ঘণ্ট

ই

ঢ

ত

থ

হ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হইবে
৩১৬	১	অধ-নিরক্ষর	অর্ধ-নিরক্ষর
৩১৬	২	কারখানা-কেন্দ্রীক	কারখানা-কেন্দ্রিক
৩১৬	১০	পালামেণ্টে	পার্লামেণ্টে
৩২৩	১৩	পেটালটসির	পেষ্টালটসির
৩২৬	১	কৃতজ্ঞতাচিত্তে	কৃতজ্ঞ চিত্তে
৩২৬	২৮	তস্য	সত্য
৩৩০	১১	সিসিরো	কিকিরো
৩৩৩	২৮	র্তবিবনকে	বিবর্তনকে
৩৩৬	১৩	অন্তহিত	অন্তর্হিত
৩৩৮	২৭	কণ-	কর্ণ-
৩৮০	১৭	সেণ্ডিকেটের	সিণ্ডিকেটের
৩৮৮	১০	ওয়াধা	ওয়ার্ধা
৩৯০	৭	উধ্বর্তন	উর্দ্ধতন
৩৯১	২২	অঙ্‌গুলিচালনার	অঙ্গুলিচালনার
৪০২	২৬	নিধারণ	নির্ধারণ
৪৩৭	১৭	অতীঃ	অভীঃ
৪৫৯	২৮	পর্যবসতি	পর্যবসিত
৪৬২	২৭	বাঞ্চনীয়	বাঞ্ছনীয়
৪৭২	২৫	সংগে সংগে তারা অন্যান্য হস্তশিল্প	সংগে সংগে অন্যান্য হস্তশিল্প
৫৩৫	১৭	সংক্বতিগত	সংস্কৃতিগত